নীললোহিত — সমগ্র

নীললোহিত-সমগ্র

পঞ্চম খণ্ড

নীললোহিত-সমগ্র

পঞ্চম খণ্ড

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

NILLOHIT-SAMAGRAH (Volume V)
Collected prose writings of SUNIL GANGOPADHYAY
Published by SUDHANGSHU SEKHAR DEY
Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073

Rs. 130.00

প্রকাশ : কলিকাতা পুস্তকমেলা
মাঘ ১৩৭২

প্রচ্ছদশিল্পী : দেবাশিস রায়
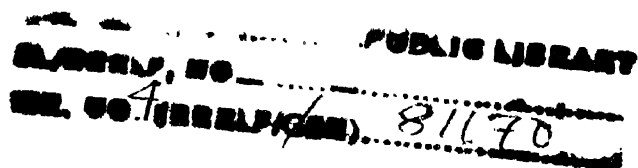
একশো তিরিশ টাকা

ISBN-81-7612-576-8

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭৩

শব্দগ্রন্থন : অরিজিৎ কুমার। লেজার ইম্প্রেশনস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন। কলকাতা ৪

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭৩

উ ৎ স র্গ

সুস্মিতা ও হিমাদ্রি দত্ত-কে

সূচি

আমার একটুকরো পৃথিবী

শিবানী ও শ্যামলকান্তি দাশকে

সন্ধে হয়ে এল, এবার এখান থেকে উঠতে হবে। এখন এই নদীর ঘাটে মেয়েরা আসবে।

প্রথম দিন যা বোকামিই করেছিলুম! জানতুম না তো কিছু। চন্দ্রনাথ হাটে গিয়েছিল। আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এক সময় নদীর ধারে। নদী মানুষকে টানে, আমাদের মতন শহরের মানুষদের তো হাতছানি দেবেই। যত ছোটই হোক, সব নদীরই একটা আলাদা রূপ আছে। এর নামটাও খুব কায়দার। এ নদীর নাম বৈতরণী। ভারতবর্ষের নানান জায়গায় এই বৈতরণী নামের অনেক নদীর কথা শুনেছি। এই বাঙালি গ্রাম্য বৈতরণীটি দামোদর থেকে বেরিয়ে রূপনারায়ণে পড়েছে। কলকাতার সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের চেয়ে বেশি চওড়া নয়। তা হোক, তবু মানুষ তো তৈরি করেনি। ফরাসী ভ্রমণকারী ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের সুন্দরবনের কাছে অজস্র নদীগুলি দেখে ভেবেছিলেন মানুষের কাটা খাল। প্রকৃতি যে এক জায়গায় এতগুলি নদী বানিয়ে রাখতে পারে, তা তিনি কল্পনাই করতে পারেননি।

আমাদের এই বৈতরণীর কাছে এসেই রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটা লাইন মনে পড়েছিল। 'ঐ দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা!' এটা এমন কিছু নয়, তবু আমি লাইনটা বিড়বিড় করছিলুম আপন মনে। 'সোঁতা' কথাটা আমি আর কোনো জায়গায় পড়িনি কিংবা শুনিনি। এমনও হতে পারে এরকম কোনো কথাই নেই। রবীন্দ্রনাথ 'কোথা'র সঙ্গে মিল দেবার জন্য 'সোঁতা' শব্দটি বানিয়েছেন। তাহলেও বেশ মানিয়ে গেছে। বৈতরণীকে দেখে 'মরা নদীর সোঁতা'ই মনে হয়।

মৃত্যুর পর বৈতরণী পার হয়ে স্বর্গে পৌঁছতে পারব কিনা, সে সম্পর্কে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। সুতরাং এই সুযোগে আগেভাগে একবার বৈতরণী পার হয়ে নেওয়া যাক ভেবে আমি জলে নেমে পড়েছিলুম। পায়জামা গোটাতে গোটাতে উরুর মাঝামাঝি পর্যন্ত তুলতে হলো, অর্থাৎ মেয়েদের কোমর পর্যন্ত ডুববে, আর সত্যজিৎ রায়ের নিশ্চয়ই হাঁটু জল। অশনি সংকেতে সত্যজিৎ রায় প্রায় এরকমই একটা নদী দেখিয়েছেন, তাতে অবশ্য আর একটু বেশি জল ছিল, বর্ষার সময় বৈতরণীও বোধহয় কানায় কানায় ভরে যায়।

এখন এপাশে ঐ সামান্য জল, তারপরই বালির চড়া। সেখানে দুটো নৌকোর

খোল ওল্টানো। তাহলে এই বৈতরণীতে নৌকোও চলে! জেলেরা এখানে মাছও ধরে নিশ্চয়ই। গ্রীষ্মকালে সেই মাছগুলো যায় কোথায়? একটা নৌকোর ওপর চড়ে বসে একটা সিগারেট ধরানো গেল। এই সব জিনিসগুলো দেখলে আমার বড় মায়া লাগে। একবার আমি এক জায়গায় মাঠের মধ্যে একটি ট্রেনের কামরা দেখেছিলুম। সেটা মাঠের মধ্যে কী করে গেল তা আমি জানি না, কিন্তু তার চারপাশে বড় বড় ঘাস আর আগাছা জন্মে গেছে। এমন মায়া হয়েছিল আমার, খুব ইচ্ছে হয়েছিল সেই কামরাটায় উঠে কিছুক্ষণ বসে থাকব, তারপর মনে মনে কাশ্মীর কিংবা কন্যাকুমারিকা চলে গেলেই হলো! কিন্তু কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখছিলাম, ভেতরটায় যাচ্ছেতাই রকমের নোংরা আর দুর্গন্ধ। ফাঁকা মাঠের মধ্যে একটা ট্রেনের কামরাকে বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহার না করে কারা যেন সেটাকে বাথরুম বানিয়েছে। অদ্ভুত মানুষের রুচি।

আমাদের এই বৈতরণীর ওপারে ধানখেত। ধান কাটা হয়ে গেছে। জেগে আছে খোঁচা খোঁচা ধান গাছের গোড়া। এদিকে কাছাকাছি কোনো গ্রাম নেই। কিছু দূরে পরপর সাতটি তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে লাইন করে, যেন ওরা কোনো গভীর শলাপরামর্শে ব্যস্ত। ওপারে আমাদের দিকে নদীর ধারে কিন্তু গাছপালা আছে। ঘাটের ধারেই তো বাঁশঝাড়।

সেই প্রথম দিন আমি আবার এপারে ফিরে এসে একা বসে বসে কবিত্ব করার চেষ্টা করছিলাম। নদীর ধারে একলা বসলে আপনিই কবিত্ব আসে, অন্তত অন্য কেউ দেখলে সেরকমই ভাববে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সেখানে আর একজন লোকও আসেনি। বিকেলের আলো মিলিয়ে যাবার পরই একসঙ্গে তিনজন স্ত্রীলোক এল সেখানে। মধ্যবয়স্কা, সুতরাং আমার চঞ্চল হবার কোনো কারণ নেই। আমি না দেখার ভান করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলাম। কিন্তু ষষ্ঠেন্দ্রিয়তে মনে হলো, সেই স্ত্রীলোকেরা যেন আমারই সম্পর্কে আলোচনা করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও কয়েকজন নারী সেখানে এসে উপস্থিত। প্রথমে তারা কলকল করে কিছু বলতে গিয়েই থেমে গেল হঠাৎ, তারপর ফিসফিস।

ওপারে তালগাছগুলোর মাথায় সদ্য উঁকি মারছে চাঁদ, আমার চোখ সেদিকে। আমার মনে হলো, এখানে আর আমার বসে থাকা চলে না। সন্ধেবেলাতে গ্রামের মেয়েরা নদীতে স্নান করতে আসে? এ সময় এ জায়গাটা পুরুষদের পক্ষে নিষিদ্ধ এলাকা? গোপিনীরা স্নানে নেমেছে আর ঘাটের কাছে গাছতলায় বসে আছে কৃষ্ণ। দৃশ্যটা ভাবতেই আমার হাসি পেল। আমার যা চেহারা, তাতে কলির কেষ্ট হিসেবে আমায় একেবারেই মানাবে না। অবশ্য, ক্যালেণ্ডারে ছাপা ছবির গোপিনীদের মতন মাখন রঙের ঢলঢলে মেয়েও এ গ্রামে একজনও আছে কিনা সন্দেহ। মুখটা

অন্যদিকে রেখেই আমি উঠে পড়েছিলাম। তখন দেখি আরও কয়েকটি মেয়ে নদীর দিকে আসছে। ফিরে এসে চন্দ্রনাথকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ব্যাপারটা। সন্ধের পর নদীর ধারে বসে থাকা কি আমার পক্ষে দোষের হয়েছিল? চন্দ্রনাথ প্রবল প্রতিবাদ করে বলেছিল, না, না, দোষ হবে কেন—? তোমার ইচ্ছে হলে নদীর ধারে বসে থাকবে... এখানে কেউ কিচ্ছু মনে করে না। আমি বলেছিলাম আর কোনো পুরুষ মানুষকে দেখিনি, কেউ বোধ হয় যায় না...। চন্দ্রনাথ বলেছিল, যাবে না কেন? আমরাই তো যাই...ওপারের গ্রামে যাবার জন্যে অনেকে নদী পেরিয়ে শর্টকাট করে। কিন্তু এসব বলার সময় মিটিমিটি করে হাসছিল চন্দ্রনাথ, ওর স্ত্রী হেসে একেবারে আকুল। আমি ভ্যাবাচ্যাকা।

পরে অবশ্য আমিও বুঝতে পেরেছিলাম আসল ব্যাপারটা।

তারপর থেকে আকাশের আলো নিবে আসার উপক্রম হলেই আমি চলে আসি নদীর ধার থেকে।

আলের ওপর দিয়ে হেঁটে আসার সময় কট কট কট কট শব্দ শুনতে পাই। এটা কিসের ডাক, কিছুতেই বুঝতে পারি না। চন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে বলেছিল, ব্যাঙ-ট্যাঙ হবে বোধহয়। ব্যাঙ কট কট করে ডাকে? ব্যাঙের ডাক হচ্ছে গ্যাঙর গ্যাঙ—এই রকমই তো কবি-প্রসিদ্ধি। একরকম আছে সাহেব ব্যাঙ, বেশ মোটাসোটা, তারা ডাকে মোয়াট মোয়াট! সাপের মুখে ব্যাঙ ধরার দৃশ্য আমি মাত্র একবারই দেখেছি, দমদমে যখন ভি আই পি রোড় তৈরি হচ্ছিল, সেই সময়, সল্ট লেকের কাছে। ব্যাঙটা ছিল সায়েব ব্যাঙ, তার চোখ দুটো ঠিকরে যেন বেরিয়ে আসছে, আর সাপটা ছিল অতিকায়, বলরামের নাক থেকে বেরিয়ে আসা মহানাগের মতন। একটা ইট তুলে সাপটা মারতে গিয়েছিলাম, একজন কন্ট্রাক্টর বলেছিলেন, মেরো না, ভাই, মেরো না। সব সাপ যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীটা ব্যাঙে ভর্তি হয়ে যাবে। ওটা ঢ্যামনা!

এই আল পথ ধরে স্কুলে যাওয়া যায়। স্কুলটা মাঠের মধ্যে এমনই জায়গায় যে কাছাকাছি তিনটি গ্রাম থেকে সমান দরত্ব পড়ে। নিরাপদ থেকে ছেলেমেয়েরা এই আল পথ ধরে স্কুলে আসে। নিরাপদ একটা গ্রামের নাম। বাসন্তী, সোনারং, হৃদয়পুর এমন মিষ্টি মিষ্টি গ্রামের নাম যেমন শুনেছি, তেমনি ঘুটুট, কোতরং, বাণীতবলা ইত্যাদি বিচিত্র নামের জায়গাও চিনি, কিন্তু গ্রামের নাম নিরাপদ হতে পারে, তা আগে ধারণাতেই ছিল না। গ্রাম, জনপদগুলোর নাম কে রাখে কে জানে! কেউ কেউ অবশ্য ন্যাড়াপদ কিংবা নিরাপদা বলেও কাজ চালায়। কিন্তু গ্রামের চিঠি আসে, পোঃ নিরাপদ, ভায়া মামুদপুর, জেলা মেদিনীপুর।

গ্রাম থেকে স্কুলে যাবার কোনো রাস্তাই নেই, এটা প্রথমে আমি বিশ্বাস করতে

পারিনি। এটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি নয়? স্কুল হতে পারে, আর রাস্তা হতে পারে না? শুধু যে রাস্তা নেই তা নয়, এখানেও রাস্তা বানাবার কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও নেওয়া হয়নি। ছেলেমেয়েরা এই আলের ওপর দিয়েই বেশ দৌড়ে চলে যায়। আমি পায়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাঁটি।

আমি ছেলেবেলায় স্কুলে যেতাম নৌকোয়। এখন যেমন কলকাতার ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুলের বাস আসে, আমাদের জন্য তেমনি নৌকো আসত। রাস্তা বানাবার কোনো ঝামেলাই নেই। একবার নৌকো উল্টে গেল, আমিও টুপ করে ডুবে গেলুম গুড়ের কলসির মতন। আমাকে যথা সময়ে ঈষৎ নীল চেহারায় উদ্ধার করা হলেও আমার বই খাতা উদ্ধার করা যায়নি। অন্যান্য বইয়ের মধ্যে আমার ইতিহাস বইটিও ছিল। জলের তলায় ডুবে আছে আমার ক্লাস সিক্সের ইতিহাস। এখানে নয়, আমার শৈশব কেটেছে অন্য এক পৃথিবীতে।

স্কুল অনেকক্ষণ ছুটি হয়ে গেলেও হেড মাস্টারকে এখনো পাওয়া যাবে। টানা লম্বা টিনের শেডে স্কুল, এখন পাকা বাড়ি তৈরি হচ্ছে, হেড মাস্টারমশাই সেই কাজ দেখাশোনা করেন।

বিরাট কল্পনা শক্তি থাকলেও শ্যামপুর ব্লক জুনিয়র হাই স্কুলের হেড মাস্টারের চেহারা আন্দাজ করা যাবে না। আমাদের হেড মাস্টারমশাইয়ের নাম ছিল রাসমোহন ভৌমিক। রাসমোহন নামটার মধ্যেই বেশ রাশভারি ব্যাপার আছে, আমার জ্যাঠামশাইয়ের বয়েসী, উনি সোনার ফ্রেমের চশমা পরতেন, মুখখানা ঝুনো নারকোলের মতন। হেড মাস্টারমশাইকে দেখলেই আমরা ভয় পেতাম। একবার আমাদের ক্লাসের জয়ন্ত আড়াল থেকে হেড স্যারকে হেড়ু বলেছিল, তারপর—

এখানকার হেড মাস্টার প্রথম দিন আলাপ হবার পর আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে এসেছিলেন!

তার মানে এই নয় যে আমার বয়েস দারুণ বেশি, নীললোহিতের বয়েস সাতাশের বেশি হয় না। ইনি আমার পদবী শুনে ব্রাহ্মণ বলে চিনতে পেরেছিলেন। ব্রাহ্মণের যে এখনো কত খাতির, তা গ্রামে না এলে বোঝা যায় না।

হেড মাস্টারমশাইয়ের বয়েস ছাব্বিশ, দেখলে মনে হয় উনিশ, খুব রোগা পাতলা চেহারা, হাফ প্যান্ট পরিয়ে অনায়াসে স্কুলের ফুটবল টিমে নামিয়ে দেওয়া যায়। ইনি সবুজ রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবি পরেন এবং তাঁতের ধুতি। খানিকটা ভারিক্কী ভাব আনবার জন্য ইনি মোটা গোঁফ রেখেছেন। সরু মুখখানিতে মোটা গোঁফ বেশ মজার দেখায়।

এই ছোকরাটির অধীনে কয়েকজন বয়স্ক ও বুড়ো শিক্ষক আছেন। বুড়োদের মাথার ওপরে এই অল্পবয়েসী ছেলেটি হেড মাস্টার, কারণ ইনি বর্ধমান

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করে তারপর বি. টি. ডিগ্রি নিয়ে নিজেকে যথেষ্ট যোগ্য করে নিয়েছেন। বাংলার এম. এ. বলাই বাহুল্য।

পাম গাছের সারি, পেয়ারা গাছ বা ফুল বাগান নয়, এই স্কুলটির কম্পাউণ্ডে রয়েছে দুটি বাবলা কাঁটার গাছ। অতি উত্তম জিনিস। ক্লাসে ছেলে মেয়েরা দুষ্টুমি করার সময় অনায়াসে বাবলা কাঁটার নানারকম ব্যবহার দেখায়। আমি যদি এখানকার ছাত্র হতাম, তাহলে মাস্টারমশাইয়ের চেয়ারে।

হেড মাস্টারমশাইয়ের চেহারাটি যতই ছোট্টখাট্টো হোক, নামে সেটা পুষিয়ে নিয়েছেন। এঁর নাম দুর্জয় নন্দী। লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এবং মতি নন্দীকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি বলে এখানে আমি নন্দী পদবী নিয়ে একটা ছোট ইয়ার্কির লোভ সম্বরণ করলুম। ইন্দোর শহরে এই নন্দী নিয়ে আমার একটা দারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

হেড মাস্টার এবং স্কুল কমিটির সেক্রেটারি পাকা বাড়ি তৈরির তদারকি করছেন। সেক্রেটারি লুঙ্গি পরা, খালি গা, বুক ভর্তি লোম। এঁর হাতে একটি হুঁকো থাকলে বেশ মানাত, কিন্তু ইনি সিগারেট খান। লুঙ্গির ট্যাঁকে গোঁজা থাকে একটি ছোট কৌটো, যার মধ্যে সিগারেট ও কেরোসিন-লাইটার।

হেড মাস্টার আমাকে দেখে এগিয়ে এসে হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, দেখছেন সব ? কেমন লাগছে ? আমাদের এই পাড়া গা জায়গায় কীই-বা দেখবার আছে !

নেতারহাটে দিগন্ত বিস্তৃত উপত্যকার সামনে এসে দাঁড়ালে প্রথমেই বুকটা ধক করে ওঠে। চোখ ফেরানো যায় না। একজন মারোয়াড়ী সেখানে তার সঙ্গীদের প্রতি খুব রাগারাগি করে বলছিল, এখানে আসবার কী মানে হয় ? এখানে কী দেখবার আছে ? আমার মনে হয়, সে ব্যক্তি নেতারহাটে কোনোরকমের মিথুন মূর্তির মতন কিছু দেখার আশা করেছিল।

দুর্জয় নন্দী অবশ্য সেরকম কিছু ভেবে বলেননি।

আমি বললাম, অন্ধকারে রাস্তা চিনতে পারব না, আপনার সঙ্গে ফিরব।

দুর্জয় নন্দী বললেন...

বাচ্চা চেহারার একটি ছাব্বিশ বছরের ছেলেকে আপনি আপনি বলার কোনো মানে হয় না। কিন্তু হেড মাস্টার বলে কথা, সম্মান দিতে হবে।

দুর্জয়বাবু বললেন, বেশ তো, আমি এখুনি ফিরব। চা খাবেন ?

আমি অবাক হয়ে বললাম, চা ?

তিনি দয়াল, দয়াল বলে হাঁক দিলেন।

সেক্রেটারির সঙ্গে আলাপ হলো। এঁর নাম সদাইবাবু। গদাই নয়, সদাই। পুরো

নামটি জানা গেল না। এঁর ডান হাতের তর্জনীতে একটি তামার আংটি। এরকম তামার আংটি তো কত লোকের আঙুলেই দেখেছি। পরে যেদিন সদাইবাবুর পুরো নাম জেনেছিলাম, সেদিন জেনেছিলাম যে ঐ আংটিরই দারুণ বৈশিষ্ট্য আছে।

আমি চন্দ্রনাথের বন্ধু শুনে সদাইবাবু বললেন, চাঁদু গাঁয়ে এয়েছে নাকি? তার তো পাত্তাই পাওয়া যায় না। একবার দেখা করতে বলবেন তো আমার সঙ্গে।

দয়াল এই স্কুলের দফতরি। বই বাঁধায় না, দফতর রক্ষা করে এই অর্থে। বেয়ারা শব্দটির প্রচলন নেই এখানে। সে এখানকার দারোয়ানও বটে, সারা রাত সে এখানে থাকে। ইঁট-সুরকি তো পাহারা দিতেই হবে। সিমেন্টের বস্তা এখানে রাখা হয় না।

দয়াল তিন কাপ চা নিয়ে এল। সে নিজেই চা বানায়।

জীবনের নিকৃষ্টতম চা আমি খেয়েছিলাম দক্ষিণ ভারতের বোজোয়াডা স্টেশনে। বমি এসে গিয়েছিল। তারপরেই এই। অবিকল একদিনের বাসি ষাঁড়ের রক্তের মতন স্বাদ। তা বলে ষাঁড়ের রক্ত যে আমি কখনো খেয়েছি তা নয়। খেলে এরকমই লাগত।

সদাইবাবু খুব তৃপ্তির সঙ্গে সেই চা খেলেন। এমন সুড়ুৎ সুড়ুৎ শব্দ করতে লাগলেন, যেন বাজ ডাকছে। তারপর আঃ বলে কাপটা নামিয়ে রাখলেন। অথচ আমি আধ কাপও শেষ করতে পারলাম না। এটা বড় লজ্জার বিষয়।

চায়ের পর সিগারেট লাগে। সদাইবাবু নিজের ট্যাঁক থেকে কৌটো খুলে একটি সিগারেট ধরিয়ে কৌটোটা আবার গুঁজে রাখলেন। আমি আমার সিগারেটের প্যাকেটটা দুর্জয়বাবুর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। তিনি জিভ কেটে না না না বললেন।

মাঝে মাঝে আমি বড় অন্যমনস্ক হয়ে যাই। একদিন বাথরুমে স্নানের পর পাজামা না পরেই বেরিয়ে এসেছিলাম। আর একদিন নিজের বাবাকে ভুল করে ডেকেছিলাম সন্তোষদা। দুর্জয় হেড মাস্টার যে পরশু দিনই আমার কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে খেয়েছেন, সে কথা আমার মনে পড়ল না। আমি নিজেই একটা সিগারেট ধরালুম। সদাইবাবু আমার দিকে আড় চোখে তাকালেন।

কচি হেড মাস্টার সেক্রেটারির সামনে সমীহ করে সিগারেট খান না। সদাইবাবু আমার সিগারেট টানাও পছন্দ করেননি। আমি চাঁদুর বন্ধু, চাঁদু ওঁর ছেলের সমান। খালি গা, বুকে লোমওয়ালা, তামার আংটি পরা সদাইবাবু যে কত গণ্যমান্য লোক তা আমি বুঝিনি তখন। পরে আর কোনোদিন ওঁর সামনে সিগারেট ধরাইনি।

অন্ধকার হয়ে এসেছে, তার মধ্যেও কাজ করে চলেছে কয়েকজন মিস্ত্রি। সদাইবাবু আর হেড মাস্টারমশাই মেতে উঠলেন সিমেন্ট-বালি-সুরকির গল্পে। আমি একটু দূরে সরে গিয়ে ছোট ছেলের মতন হাতের টর্চটা একবার জ্বেলে

একবার নিবিয়ে খেলতে লাগলুম। যেন আমি দূরে কারুকে কোনো সঙ্কেত জানাচ্ছি।...দেখেছিলাম একবার, ডিগরিয়া পাহাড়ে, অনেক উঁচুতে কে যেন বারবার জোরালো টর্চের আলো ফেলছিল নানাদিকে। ঐ পাহাড়ের ওপর মন্দির নেই, সন্ধের পর কারুর থাকার কথা নয়, কে জানে কে!

এই রকম একটা নিরিবিলি গ্রামের ছোট্ট স্কুলে মাস্টার হয়ে সারা জীবনটা কাটিয়ে দিলে কেমন হয়? নাঃ, আমার দ্বারা সম্ভব নয়। এসব রোমান্টিক কথা ভাবতেই ভালো লাগে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই পারেননি! একসময় ভেবেছিলাম, জাহাজের খালাসী হয়ে সারাজীবন সমুদ্রে ঘুরব। তারপর একবার চারদিন জাহাজে থাকার পরই আমার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল! মাটি যে মানুষের কী প্রিয় প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম সেবারই।

হঠাৎ যেন পুরো অন্ধকার হয়ে গেল। কোনো দিকে আর কিচ্ছু দেখা যায় না। এমন মিশমিশে অন্ধকার অনেকদিন দেখিনি, ঠিক যেন চাঁদের উল্টোপিঠ।

চাঁদটা কোথায় গেল? কয়েকদিন আগেই তো চাঁদটাকে দেখেছিলাম, আজ আকাশের কোনোখানে তার চিহ্নমাত্র নেই। আজ কী তিথি? শহরে থাকতে আমরা বাংলা তারিখের কোনো ধার ধারি না। রবীন্দ্রনাথের জন্য পঁচিশে বৈশাখ আর ছুটির জন্য ১লা বৈশাখ শুধু মনে থাকে। আর বিয়ে, পৈতে, শ্রাদ্ধের তারিখ। আর কবিতায়। শরতের আলো, পৌষের নির্জন মাঠ, জ্যৈষ্ঠর ভ্রূকুটি। সেপ্টেম্বরের আকাশ, মার্চ মাসের নদীতীর কিংবা জুন দুপুরের ছটফটানি, এরকম লেখা এখনো চালু হয়নি।

আমার কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই সদাইবাবু চলে গেলেন হনহনিয়ে। ওঁর টর্চ লাগে না। পথঘাট সব মুখস্থ। হেড মাস্টারমশাই বললেন, একটু দাঁড়ান, নীলুবাবু, আপিসঘর থেকে একটু আসচি।

দয়াল একটা লণ্ঠন এনে কিছুটা তামস ভেঙেছে। আমি অসাবধানে একটা চায়ের কাপে আর একটু হলে লাথি কষিয়েছিলুম আর কি! দয়ালকে চায়ের দাম দেওয়া উচিত কিনা ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না। যাই হোক, এ বিষয়ে হেড মাস্টারের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

দুর্জয় নন্দী স্থানীয় লোক নন, ওঁর বাড়ি হুগলি জেলায়। স্কুলের সঙ্গে হেড মাস্টারের কোনো কোয়ার্টার নেই। উনি নিরাপদ গ্রামে একটি বাড়িতে সন্ধের পর দুটি ছেলেমেয়েকে পড়ান। তার বিনিময়ে সে বাড়িতেই খাওয়া-থাকা।

—দিন, এবার আপনার একটা সিগারেট দিন!

দুজনে হাঁটতে শুরু করলাম আলের ওপর দিয়ে। দুর্জয় নন্দীর হাতেও টর্চ আছে, আমারটা জ্বালছি বলে উনি ওঁরটা ব্যবহার করছেন না। আমারই হাতে

আলো, তবু দু একবার আমি পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিলাম আল থেকে। উনি আমার হাত ধরে বললেন, দেখবেন, দেখবেন!

আমি জিজ্ঞেস করলাম সাপ-টাপ নেই তো?

উনি হাসলেন।

—খুব সাপের ভয় বুঝি?

—আপনার ভয় নেই?

—নাঃ। যেদিন কামড়াবার হয় কামড়াবে। তবে এক মানুষকে বোধহয় দুবার কামড়ায় না।

—সে কি? আপনাকে একবার সাপে কামড়েছিল নাকি?

—হুঁ। চোদ্দ বছর বয়েসে।

দুর্জয় নন্দী খুব একটা গপ্পে ছেলে নয়। সাপে কামড়াবার মতন একটি লোমহর্ষক ঘটনা আমি সবিস্তারে শুনতে চাই, কিন্তু উনি দু-চার কথায় সংক্ষেপে সেরে ফেললেন। গোয়ালঘরে সাপ ছিল, গোখরো। এক ঘন্টার মধ্যেই এসে পড়ল ওঝা। সেটাই বরাৎ জোর। মহাদেব ওঝা খুব নামকরা গুণিন—সব রকম সাপের বিষ সে ঝেড়ে দিতে পারে।

আমি বললাম, ওঝা এসে আপনার বিষ নামিয়ে দিল? তাহলে সাপটা নিশ্চয়ই পুরোপুরি বিষ ঢালতে পারেনি। এরকম অনেক সময় হয় শুনেছি।

—আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? আমিও বোধহয় অন্য কারুর মুখে শুনলে অবিশ্বাস করতাম। কিন্তু আমার নিজের জীবনে হয়েছে, কোনো ডাক্তার দেখানো হয়নি, ওঝাই সারিয়ে দিয়েচে। ওরা পারে, ওদের কিছু কিছু বিশেষ ক্ষমতা আছে। ওদের ওপর বিশ্বাস রাখলে সত্যি কাজ হয়।

—আপনাদের গ্রামে হেলথ সেন্টার নেই?

—তখন ছিল না, এখন হয়েচে। তা বলে কি ভাবছেন, হেলথ সেন্টারে গেলেই সব সময় সিরাম পাবেন?

—শুনুন দুর্জয়বাবু আপনাকে একটা কথা জানিয়ে রাখছি। এখানে থাকতে থাকতে যদি আমায় সাপে কামড়ায়, তখন কিন্তু ওঝা ডাকবেন না! আমাকে ডুলিতে চাপিয়ে মোল্লাখালি হেলথ সেন্টারেই নিয়ে যাবেন। ঐ যে বললেন না বিশ্বাসের কথা? আমার বিশ্বাস নেই।

হেড মাস্টার হাসতে হাসতে বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা। ভয় নেই। আপনাকে সাপে কামড়াবে না।

—না, আমার খুব চানস্ আছে।

—কেন?

—খুব ছেলেবেলায় জানেন, আমিও একটা গ্রামে থাকতাম। একদিন দুপুরবেলা আমার হাতে একটা দা ছিল, দা বোঝেন তো? কাটারি যাকে বলে, সেটা নিয়ে আমি পুকুরঘাটের কাছে একটা পুরনো কাঠের গুঁড়ির তলা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কেঁচো বার করছিলাম।

—কেঁচো?

—হ্যাঁ, ছোট ছোট বঁড়শিতে কেঁচো গেঁথে মাছ ধরা যায়—সেই কেঁচো বার করছি এমন সময় কিলবিল করে বেরিয়ে এলো দুটো সাপের বাচ্চা—খুব বাচ্চা নয় মাঝারি—তখন খুব ছোটো তো বুদ্ধিও হয়নি ভয়ও হয়নি, হাতের কাটারি দিয়ে একটা সাপের গায়ে মারলাম এক কোপ।

—ইস, খুব ভুল করেছিলেন। তারপর?

—সেই তো, বোঝার বয়েস হয়নি...তারপর কী হলো, সেই এক কোপে একটা সাপ দু টুকরো হয়ে গেল লেজের দিকটা পড়ে রইল। আর মাথার দিকটা জ্যান্ত অবস্থায় এঁকে বেঁকে পালিয়ে গেল। আমি কাটা ল্যাজটা হাতে ঝুলিয়ে বাড়িতে নিয়ে এলুম। তারপর আমার বাড়িব লোকের কী ভয়! সবাই বলল, সাপরা ভীষণ প্রতিশোধ নেয়। ঐ সাপটাকে একদম মেরে ফেলা হয়নি, ও ঠিক ফিরে এসে আমায় কামড়াবে। একটা সুতোয় তামার পয়সা বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো আমার কোমরে। মন্ত্রটন্ত্রও পড়া হয়েছিল বোধহয়। তিনদিন আমায় বাড়ি থেকে বেরুতেই দেওয়া হয়নি। কিছুদিন পর অবশ্য চলে এলাম কলকাতায়। কিন্তু এখনো কোনো ফাঁকা জায়গায় এলে আমার মনে হয়, সেই সাপটার হয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য অন্য কোনো সাপ আমায় ঠিক কামড়াবে।

—তাহলে দেখলেন তো, আপনারও কুসংস্কার আছে? সাপের কোনো মেমারিই নেই। তাছাড়া সেই সাপটার কথা অন্য সাপেরা জানবে কী করে। সাপেদের কী ল্যাঙ্গোয়েজ আছে? সাপ অতি নিরীহ, মূর্খ প্রাণী—

আমি খুশি মনে আর একটি সিগারেট ধরালুম। ঘটনাটি যে আমার এই মাত্র বানানো, তা হেড মাস্টারপ্রবর বুঝতে পারেননি। উনি এখন সাপ বিষয়ে আমায় অনেক জ্ঞান দিচ্ছেন।

কথা বলতে বলতে আমরা আলপথ ছেড়ে এলাম রাস্তায়। এই সেই নদীতে যাবার পথ। স্কুলে যাবার জন্য কোনো নির্দিষ্ট পথ নেই কিন্তু নদীর জন্য আছে।

ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটার গায়ে অসংখ্য জোনাকি। টুনি বালবের চেয়ে জোনাকি দিয়ে গাছ সাজানো অনেক ভালো।

একটু পরেই হেড মাস্টারমশাই ডান দিকে বেঁকে যাবেন। এই পথ দিয়ে প্রতিদিন যাওয়া, প্রতিদিন আসা। দিনের পর দিন মাসের পর মাস। সারাজীবন।

মাঝে ছুটিছাটায় বাড়ি যাওয়া।

—আপনার এখানে কেমন লাগছে?

হেড মাস্টারমশাই প্রশ্নটি শুনে একটু অবাক হলেন। এই প্রশ্নটি আমাকেই উনি করেছেন কয়েকবার। আমি কেন ওঁকে করব?

—আমার আর লাগালাগি কী বলুন!

—তবু নিজের গ্রাম ছেড়ে দূরে থাকতে হচ্ছে তো। আপনাদের গ্রামে স্কুল নেই?

—আছে কিন্তু কোনো পোস্ট খালি নেই। এখানে বেশ ভালোই আছি, তেমন কোনো ঝঞ্ঝাট ঝামেলা নেই। ভাবছি আর একটা সাবজেক্টে এম-এ দেব, ইশলামিক হিস্ট্রিতে।

—বইপত্র পাওয়ার তো অসুবিধে—

—কিছু কিছু কিনেছি তবে সময় পাই না, দুবেলা টিউশানি...সকালে সদাইবাবুর বাড়িতে পড়াই...এখানে একটা অলেখা নিয়ম আছে, যে হেড মাস্টার হবে, তাকে সেক্রেটারির বাড়িতে টিউশানি করতেই হবে। আগের হেড মাস্টারও করতেন।

—সদাইবাবুর অনেক ছেলেমেয়ে বুঝি?

—পাঁচ-ছ'টা হবে বোধহয়। তার জন্য তো কিছু না, কিন্তু সদাইবাবু বড্ড পেড়াপিড়ি করছেন ওঁর এক মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য।

—সে কি, আপনি বিয়ে করেননি?

ছাব্বিশ বছরের যুবক বিয়ে করবে না, এ কখনো হতে পারে? দুর্জয় নন্দী লেখাপড়া জানা অতি ভালো পাত্র, গ্রামের কন্যাদায়গ্রস্ত বাবারা তাকে এতদিন অবিবাহিত অবস্থায় থাকতে দেবে কেন?

দুর্জয় নন্দী বললেন, হ্যাঁ বিয়ে করেছিলাম। আমার একটি চার বছরের ছেলেও আছে, কিন্তু আমার বউ মারা গেছে, এই বছর দেড়েক হলো।

দুর্জয় নন্দী কি পত্নীর শোকে আর বিয়ে করবেই না ঠিক করেছে নাকি? ছেলেটিকে ঠিক সেই জাতীয় ভাবুক মনে হয় না। খুব চাঁছাছোলা সাদাসিধে।

—ছেলে কার কাছে থাকে?

—আমার মায়ের কাছে। আর একটু বড় হলে এখানেই এনে রাখব।

—আর বিয়ে করবেন না?

—হ্যাঁ। বিয়ে তো আর একটা করতেই হবে, বিশেষ করে ছেলেটার জন্য।

—সদাইবাবুর মেয়েকে আপনার পছন্দ হয়নি বুঝি?

মেয়েদের পছন্দ করা কি সোজা কথা?

সদাইবাবুর মেয়েকে আমি দেখেছি, মোটামুটি সুশ্রীই বলা যায়।

—তাহলে আমি থাকতে থাকতেই লাগিয়ে দিন বিয়েটা। একটা বেশ জমাটি নেমন্তন্ন খেয়ে যাই।

—দাদা, অন্য ঝামেলা আছে যে। সদাইবাবুরা সদগোপ, আর আমরা হলুম গে এগার ধারার তিলি। ইনটারকাস্ট বিয়ে আপনাদের শহরে চলে, গ্রাম দেশে চলে না, বুঝলেন, ও মেয়েকে বিয়ে করলে আমার বাড়ির লোক খুব রেগে যাবে।

অন্ধকারের মধ্যে আমি জিভ কাটলাম।

তিলি আর সদগোপের মধ্যে বিয়ে হলে যে সেটা ইনটারকাস্ট হয়, তা আমার জানা ছিল না। এমনকি তিলি আর সদগোপের মধ্যে যে কী তফাত, সে সম্পর্কে আমার ধারণা নেই। আমরা কত কম জানি!

২

আমাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে এ গ্রামের শ্রেষ্ঠ ঘরখানিতে। তাসখেলা শেষ হতে হতে প্রায় সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছিল। মল্লিকা অনেকবার লোক পাঠিয়ে তাড়া দিয়েছে খেতে যাবার জন্য। যখন খেতে গেলাম, তখন চারদিক একেবারে সুনসান। মল্লিকাও ঘুমিয়ে পড়েছিল, উঠে আবার উনুনে আঁচ দিয়ে খাবার গরম করতে বসল, আমাদের কোনো আপত্তিই শুনল না।

পুকুরঘাটে আঁচিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ চন্দ্রনাথের সঙ্গে গল্প করলাম মাঠে দাঁড়িয়ে। তারপর চন্দ্রনাথ হ্যারিকেন দেখিয়ে আমায় পৌঁছে দিয়ে গেল। এবং বারবার বলে গেল, রাত্রে হিসি পেলে আমি যেন মাঠে না যাই, বারান্দাতেই—সবাই তাই করে।

বাড়িটি গ্রামের একেবারে এক টেরেয়, নতুন তৈরি হয়েছে। মাটির দোতলা। *এটা চন্দ্রনাথের গ্রাম সম্পর্কে এক মেজদার বাড়ি। মেজদারা বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ।* আলাপ হবার পর আমিও ওঁকে মেজদা মেজদাই বলে আসছি, নামটা মনে নেই।

দোতলার একপাশের সবচেয়ে বড় ঘরটি আমার। খাটের উপর সুন্দর করে বিছানা পাতা, মশারি টাঙানো। একপাশে একঘটি জল ও কাচের গেলাস।

ঘরে দুটি জানলা। ডানপাশের জানলা দিয়ে দেখা যায় বহুদূর পর্যন্ত ছড়ানো মাঠ, তারপর গাছপালার সারি। দূর থেকে মনে হয় যেন একটা বন। আসলে রয়েছে ওখানে আর একটি গ্রাম। এসব দিকে মাঠের মধ্যে বিশেষ গাছপালা থাকে না। হাঁটতে হাঁটতে দূরে গাছপালা দেখা গেলেই বোঝা যাবে, সেখানে একটি গ্রাম

আছে। শুয়ে পড়ার পর পায়ের কাছের জানলা দিয়ে দেখা যায় আকাশ। প্রথম রাতে চাঁদ খুব জ্বালিয়েছিল। জানলা বন্ধ করে দিলে গরম লাগে, আবার মুখের ওপর সরাসরি জ্যোৎস্না এসে পড়লে কি কেউ ঘুমোতে পারে? আজ চাঁদ নেই। আমি ডান পাশের জানলা দিয়ে অন্ধকার মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। কিছুই দেখার নেই। তবু দেখতে ইচ্ছে করে।

ঘুমের আশা খুব কম। এখন শুধু শুয়ে শুয়ে প্রতীক্ষা করা। কখন তারা আসবে।

কথাটা ক'দিন ধরে লজ্জায় কিছুতেই বলতে পারছি না চন্দ্রনাথকে। চন্দ্রনাথ আর মল্লিকা এত খাতির যত্ন করছে যে মাঝে মাঝে অস্বস্তিতে পড়তে হয়। আমার খাতির পাওয়ার অভ্যেস নেই। যাই হোক, ওরা এত যত্ন করছে যে দু-একটা ছোটোখাটো অসুবিধের কথা আর মুখ ফুটে বলতে ইচ্ছে করে না।

প্রথম রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে রীতিমতন ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, কে? কে?

আমার ভূতের ভয় নেই। ভূতেরা যদি থাকেও তাহলে তারা ঠিক করেছে যে তারা কখনো আমাকে দেখা দেবে না। আমি বহুবার বহু ফাঁকা বাড়িতে থেকেছি। এমনকি ভাঙা, পুরোনো বাড়ি, যে-সব জায়গায় একটু একটু ভূত-প্রসিদ্ধি আছে, সেখানেও একা শুয়ে থেকেছি, কিন্তু কোনো ভূত দেখা দেয়নি।

কিন্তু মাঝরাতে তো শুধু ভূতরাই ভয় দেখাতে আসে না, চোর-ডাকাতরা আসে। আমি চোর-ডাকাতদের ভয় পাই।

জানলা দুটোর নিচের দিকের পাল্লা বন্ধ, ওপর দিকের পাল্লা খোলা। প্রথম রাতে কে যেন দুম দুম করে সেই পাল্লায় ঘা মারছিল। আমি ঘুম ভেঙে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। আমার গলা শুনেই সেই শব্দ থেমে গেল। একটু পরে আবার।

তখন কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে আমি একটা জানলার নিচের পাল্লা খুললাম। কেউ নেই। আমার কপালে একটু ঘাম দেখা দিল। চোরেরা আওয়াজ করে দেখছে আমি জেগে আছি কিনা? আমার কাছে যে কিছুই পাবে না তা তো চোরেরা জানে না। শহুরে বাবু এসেছে, ওরা ধরেই নেবে যে অনেক কিছু আছে।

চন্দ্রনাথ আমায় রাত্রে বাইরে যেতে নিষেধ করে কেন?

খানিকবাদে একটু চোখ বুজেছি, আবার মনে হলো ঘরের মধ্যে কারা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। জানলার ওপর কালো রঙের কী যেন, ঠিক যেন একটা হাত গরাদ চেপে আছে। বুকের মধ্যেটা ধক্ করে উঠেছিল।

না। হাতটাত কিছু নয়, ঘর ভর্তি ইঁদুর। একটা ইঁদুর লাফিয়ে পড়ল মশারির ছাদে। ইঁদুরটা অন্তত একহাত লম্বা।

এমন ভয় অনেকদিন পাইনি। অতবড় ইঁদুরের ভারে মশারিটা ছিঁড়ে পড়তে পারে। বালিশের পাশেই টর্চটা রাখা ছিল সেটা দিয়ে খুব জোরে এক ঘা কষাতেই ইঁদুরটা ছিটকে পড়ে গেল।

টর্চের আলোয় দেখলাম, এরকম রয়াল বেঙ্গল সাইজের কেঁদো-কেঁদো ইঁদুর হুটোপুটি করছে ঘরের মেঝেতে। এই সব ইঁদুরের অসাধ্য কিছু নেই, আমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলতে পারে।

একটা কিছু অস্ত্র দবকার। মনে পড়েছিল দরজার আলগা খিলটার কথা। কিন্তু বিছানা থেকে যে দবজা পর্যন্ত যাব, সে সাহসও নেই। টর্চের আলোয় ইঁদুরগুলো সরে যাবার কোনো লক্ষণ দেখাল না, বরং বিরক্ত হয়ে কিচকিচ করতে লাগল।

খাটের নিচের মেঝেতে বাখা আছে মন দুয়েক আলু, ইঁদুরগুলো এসেছে সেই লোভে। ওদের মধ্যে আলুর মহোৎসব পড়ে গেছে। কিন্তু শুধু আলুতেই ওরা সন্তুষ্ট নয়, মাঝে মাঝে ওবা জুলজুল করে তাকাচ্ছে আমার দিকে। আমার মাংস নিশ্চয়ই আলুর চেয়ে সুস্বাদু।

হুস হাস করতে কবতে কোনো রকমে এক লাফ মেবে দবজার কাছে গিয়ে খিলটা খুলে আমি এলোপাথাড়ি ঘোরাতে লাগলুম।

আমি তলোযার চালাতে জানি, খিল চালাতে জানি না। একটারও গায়ে লাগল না। তবে সাময়িকভাবে তারা প্রস্থান করল। আমি আবার ফিরে খিলটা হাতে নিয়ে বসে রইলুম।

ইঁদুরে কামড়ালে প্লেগ হয় না; বাগবাজারে আমার ছোটকাকার পায়ের আঙুল কামড়ে ধরেছিল একটা ধেড়ে ইঁদুর। মাংস খুবলে নিয়েছিল। তারপর ছোটকাকাকে অনেকগুলো ইঞ্জেকশান নিতে হয়। রোমিও আর জুলিয়েটের যে মিলন হলো না, তারও কারণ ঐ, প্লেগ অর্থাৎ ইঁদুর!

একটু বাদেই ইদুরগুলো ফিরে এলো আবার। যুক্তি থাকুক বা না থাকুক, আমার বারবার মনে হচ্ছিল, ইঁদুরগুলো ঠিক এক সময় খাটের ওপর উঠে আসবে। তুচ্ছ মশারিটা ছিঁড়ে ফেলতে আর ওদের কতক্ষণই বা লাগবে। একটু ঘুমিয়ে পড়লেই আর নিস্তার নেই। আমি খিলটা বাড়িয়ে মাটিতে ঠুকলে একটুক্ষণের জন্য ওরা নীরব হয়, আবার হুটোপুটি চলে।

এমনকি একবার উঠে আমি খিল-চালনা করে সব কটা ইঁদুরকে তাড়িয়ে সব কটি জানলা ও দরজা বন্ধ করে দিলাম। তাতে আরও বিপদ বাড়ল। দরজা-জানলা বন্ধ করে আমি নিশ্চিন্তভাবে শুয়েছিলাম, একটু পরেই মনে হলো ঘরের ছাদের ওপর দাপাদাপি চলছে। গণ্ডায় গণ্ডায় ইঁদুর ক্রুদ্ধ হয়ে দৌড়োচ্ছে, নিশ্চয়ই

ঢোকার রাস্তা খুঁজছে। ওরা ঠিক রাস্তা জানে। আবার আমার খাটের তলায় পাওয়া গেল সেই শব্দ। তখন আমার আবার ভয় হলো, এবার ওরা নিশ্চয়ই আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইবে। আমি দুটো ইঁদুরের গায়ে আঘাত দিয়েছি, একেবারে মেরে ফেলতে পারিনি। ওরা কি আমায় ছাড়বে?

খিলটা বাগিয়ে ধরে বসে রইলাম ঠায়। যখনই আমার বিছানার খুব কাছে শব্দ পাই, তখনই মাটিতে খুব জোরে খিলটা ঠোকাঠুকি করি। একবার সত্যিই খাটের পায়া বেয়ে একটা ইঁদুর ওঠবার চেষ্টা করেছিল। কী অসম্ভব হিংস্র তার মুখ। আবার খিল-চালনা।

সেই ভাবে কেটে গেল সারা রাত। ভোরের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুরেরা উধাও। আমি তখন চোখ বুজলাম। চন্দ্রনাথদের বাড়ির একটি বাচ্চা মেয়ে দুবার আমার জন্য চা এনে ফিরে গিয়েছিল, আমার ঘুম ভাঙল সাড়ে নটায়। গ্রামে কেউ এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় না। ওরা নিশ্চয়ই ভেবেছিল আমি শহরের লোক, আমাদের ব্যাপারই আলাদা।

মেঝেতে আট দশটি আধ খাওয়া আলু ছড়িয়ে আছে। ইঁদুররা নিশ্চয়ই প্রত্যেকদিন এসে এইভাবে আলু খেয়ে যায়। তাতে চাষীগৃহস্থের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা ধরেই নিয়েছে, কিছু আলু ইঁদুরের ভোগে যাবে। সারা ভারতবর্ষে ক লক্ষ টন শশা যেন ইঁদুরে নষ্ট করে? এদেশে বহু মানুষ ক্ষুধার্ত থাকে, কিন্তু ইঁদুররা বেশ হৃষ্টপুষ্ট। কে জানে, কোথাও আবার ইঁদুরের পুজো হয় কি না। হতেই তো পারে, গণেশের বাহন।

কয়েকটা রাত এইভাবে কেটেছে। এ ঘর থেকে আলুগুলো সরিয়ে নিলে হয়তো ইঁদুরের উপদ্রব কমত। কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারিনি চন্দ্রনাথকে। ও রোজ জিজ্ঞেস করে, তোমাকে মশা কামড়ায়নি তো? আমি জোর দিয়ে বলি, না, না!

এখানকার মশারা আমার সঙ্গে অতি ভদ্র ব্যবহার করেছে। কামড়ানো দূরে থাক, কানের পাশে পিঁ পিঁ শব্দ পর্যন্ত করে না!

লক্ষ্য করে দেখেছি, ইঁদুরগুলো আসে রোজ প্রায় রাত সাড়ে বারোটার পর। ওদের নিশ্চয়ই নিজস্ব কোনো সময়ের হিসেব আছে। সেই সময়টুকু পর্যন্ত ঘুমিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু উদ্বেগে ঘুম আসে না। বরং অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করি ওদের জন্য। খিলটা বিছানার ওপরে রেডি।

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। ইফ ইউ ক্যানট বীট দেম, জয়েন দেম। আমি খাটের তলা থেকে দু হাতে অনেকগুলো আলু তুলে আনলাম। ইঁদুরেরা আলু খাবেই, তা বন্ধ করার সাধ্য আমার নেই, ওরা ঘরের বাইরে বসে খাক।

আলুগুলোর সাইজ বেশ বড় বড়, আট দশটাতেই এক কিলো হয়ে যাবে। এক কিলো আলু আমি ভাগাভাগি করে সাজিয়ে রাখলাম দুটো জানলার বাইরে।

মধ্যরাত্রির একটু পরেই হাজির হলো তারা। আমার একটু তন্দ্রা এসেছিল, চিকি চিকি আওয়াজ শুনে উঠে বসলাম, খিলটা হাতে শক্ত করে ধরা। টর্চটা জ্বেলে দেখলাম, একটি প্রায় ছোটখাটো শুয়োরের সাইজের ইঁদুর জানলা দিয়ে মুখ বার করে আছে। খুবই অবাক দৃষ্টি। তাতে যেন একটু সন্দেহও লেগে আছে। এরকম অভ্যর্থনা ওরা কখনো পায়নি।

জানলার ওপাশের সব জায়গাটুকুতে আলুগুলো সাজানো। সেই আলুতে ইঁদুরেরা মুখ দিতেই সেগুলো গড়িয়ে পড়ে গেল নিচের মাঠে। ইঁদুরগুলোও তাদের পশ্চাৎবর্তী হলো। বেশ কিছুক্ষণ কোনো আওয়াজ নেই। ঘরের মধ্যে একটা ইঁদুরও ঢোকেনি। আমার পরিকল্পনা সার্থক।

ঘন্টা দেড়েক বাদে আবার জানলার কাছে ঘটর ঘটর শব্দ। আমি এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, উঠে বসে বললাম, আরো চাই? দিচ্ছি দিচ্ছি, এর মধ্যেই খাওয়া হয়ে গেল?

আবার কয়েকটা আলু তুলে ছুঁড়ে দিলাম জানলার বাইরে। খাও বাবা যত পার, শুধু আমায় ঘুমোতে দাও।

মোট তিনবার আমায় আলু পরিবেশন করতে হলো। একই ইঁদুরেরা তিনবার এসেছিল কিংবা প্রত্যেকবার নতুন ইঁদুরের দল, তা আমি জানি না। চার্লি চ্যাপলিন মশাদের দেখলে আলাদা আলাদা চিনতে পারতেন, আমার ইঁদুরের মুখ চেনার ক্ষমতা নেই।

সকালবেলা ঘুম ভাঙার পর টের পেলাম, চোখ কড় কড় করছে না। আজই প্রথম। জানলা দিয়ে দেখলাম গ্রাম বাংলার বিখ্যাত ভোর। মাঠগুলি শস্যশ্যামল নয়, কয়েকদিন আগে লাঙ্গল চষা হয়েছে, এবড়ো খেবড়ো, রুক্ষ, খুব একটা লোচনসুখকর নয়। ধুলোর মধ্যে গড়াগড়ি দিচ্ছে অনেকগুলো ধুলো রঙের ছাতারে পাখি। এই পাখিগুলো ভীষণ ঝগড়ুটে হয়। দু-একটা দোয়েলের শিস টিস শুনলে ভালো লাগত বরং। এদিকে টেলিগ্রাফের তার নেই, তাই ফিঙে পাখিও দেখা যায় না। তবে গলার কাছটা হলদে আর সারা গাটা কালো, এমন দুটো পাখিকে প্রায়ই দেখি পুকুর ধারের তেঁতুল গাছটায়। আগে জানতুম, এই পাখিগুলোর নাম বউ কথা কও। এখন কেউ কেউ বলে পিউ কাঁহা, এই গ্রামের লোকেরা সাদামাটা ভাবে বলে শুধু হলদে পাখি।

আমাদের ছেলেবেলায় একটা পাখির ডাক ছিল, ভাই সহদেব, তুমি কোথায়? হুবহু এই ডাক। পাখিটা কী রকম দেখতে ছিল মনে নেই, সেই ডাকও আর শুনি

না। তবে নির্জন দুপুরে ঘুঘুর ডাক ছিল এইরকম, ঠাকুর গোপাল, ওঠো, ওঠো ওঠো! এখনো ঘুঘুরা ঠিক ঐভাবে ডাকে, দুপুরবেলা। সকালবেলা ঘুঘুর ডাক শোনা যায় না। নিরাপদ গ্রামেও কিছু ঘুঘু আছে।

মেয়েটি আজ চা নিয়ে এসে আমাকে জেগে বসে থাকতে দেখে অবাক। কেটলিতে অনেকখানি চা, একটা খালি কাপ ও দুটি থিন অ্যারারুট বিস্কুট। চন্দ্রনাথকে রোজ বলি যে চায়ের সঙ্গে আমার বিস্কুট লাগে না, ও শুনবে না, রোজ পাঠাবেই। থিন অ্যারারুট বিস্কুটের মতন অখাদ্যবস্তু বোধহয় পৃথিবীতে আর কিছু নেই।

—তোমার নাম কী?

মেয়েটির বয়েস দশ বা এগারো। এই বয়েসী মেয়েদের শাড়ি পরতে দেখা আমাদের অভ্যেস নেই। মেয়েটি পরে আছে একটা লাল ডুরে শাড়ি। আমার চা খাওয়া শেষ না-হওয়া পর্যন্ত ও দরজার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ভারতীয় মেয়েরা নিজেদেব নাম বলতে লজ্জা পায়। হায়দরাবাদ শহরে এই মেয়েটির চেয়ে একটু বড়, এই তেরো-চোদ্দ বছরের একটি মেয়ের নাম আমি জানতে চেয়েছিলাম, সে আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল, যেন নাম জিজ্ঞেস করাটা অসভ্যতম ব্যাপার।

তিনবার জিজ্ঞেস করার পর আমার চা-দাত্রী জানাল যে তার নাম দুর্গারানী মণ্ডল।

—তোমার ছোট ভাই আছে?

—না, আমার এক দাদা আর চার বোন।

ছোট ভাই আছে কিনা কেন জিজ্ঞেস করলাম? বোধহয় দুর্গা শুনেই আমার মনে পড়েছিল পথের পাঁচালির কথা। তবে একটা জিনিস আমি আগেই বাজি রেখে বলতে পারতাম, ওর নাম কোনো ঠাকুর দেবতার নামে হবেই। এ পর্যন্ত এমন একজনের নামও শুনিনি এ গ্রামে, যার নাম ঠাকুর-দেবতা নিরপেক্ষ।

—তুমি কী পড়ো, দুর্গা?

—ক্লাস সিকস।

যে-স্কুলটি আমি দেখেছি, সেখানে ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে পড়ে। অধিকাংশ গ্রামের স্কুলেই তাই। এদিক থেকে শহরের চেয়ে গ্রাম বেশি প্রগতিশীল।

—তোমার বিয়ে হয়েছে, দুর্গা?

দুর্গারানী শরীরে একটা মোচড় দিল। এই প্রশ্নটা করা আমার ভুলই হয়েছে। এখনকার মেয়েদের চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স না হলে বিয়ের কথা ওঠে না। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের মেয়েরাও অবিবাহিতা থাকে। গ্রাম আর শরৎচন্দ্রের আমলে পড়ে নেই।

দুর্গারানী কেটলি ও কাপ নিয়ে চলে গেল, তাকে আমি বিস্কুট দুটো কিছুতেই খাওয়াতে পারলুম না। ও দুটো সে ফেরতও নেবে না।

রাত্রে ইঁদুরদের বিস্কুট খাওয়ালে কেমন হয়? বিস্কুট খাইয়ে ওদের একটু সভ্য করা যাবে।

এর পরের ব্যাপারটাই বড় অস্বস্তিকর। দু-চারজন লোক গাড়ু হাতে নিয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম, গ্রামে এসে আমি সব কিছুই মানিয়ে নিতে পারব। শুধু এই একটা ব্যাপারেই বুঝতে পারছি, মানুষ কতখানি অভ্যেসের দাস।

গোটা নিরাপদ গ্রামে কারুর বাড়িতেই কোনো বাথরুম নেই। বাথরুম যে থাকা দরকার, এমন চিন্তাই নেই কারুর মাথায়। চারদিকে এত মাঠ রয়েছে, এত বাঁশ ঝাড়, এত মজা-ডোবা। বাইবেলের যুগেও খুব সম্ভবত বাথরুম ছিল না। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা এবং পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী যথাক্রমে অন্তত চোদ্দ ও বারো বছর বিনা বাথরুমে কাটিয়েছেন। কল্পনা করুন তো একবার, বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন সকালবেলা জল ভর্তি পিতলের গাড়ু নিয়ে মাঠে যাচ্ছেন। একবার এক যাত্রাগানের আসরে, গ্রীনরুমের পাশে সীতাকে বিড়ি খেঁতে দেখেছিলাম।

কোথাও কোনো ব্যস্ততা নেই। এখানে কোনো প্রয়োজন নেই ঘড়ির। আকাশেই তো সূর্য ঘড়ি রয়েছে। তবু অবশ্য গ্রামের অনেক লোক এখন ঘড়ি পরে, মেয়েরাও কেউ কেউ অন্য গ্রামে বেড়াতে যাবার সময় ঘড়ি হাতে দেয়। আংটির মতন ঘড়িও একটা গয়না।

জানলার নিচে চন্দ্রনাথের সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শুনতে পেলাম। মুখ বাড়িয়ে বললাম, আসছি। চন্দ্রনাথ এরই মধ্যে রামজীবনপুরের বাজার ঘুরে এসেছে, একটা থলিতে কিছু তরিতরকারি আর মাছ। এই মাছের ব্যাপারটা নিয়েও চন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার রোজ ঝগড়া হচ্ছে। দুপুরে খাওয়ার সময় আবার প্রসঙ্গটা তুলতে হবে।

চন্দ্রনাথ নৈহাটি কলেজে পড়ায়, থাকে মানিকতলা হাউসিং এস্টেটে। চন্দ্রনাথ পুরোপুরি কলকাতার ছেলে, কলকাতায় দেখলে সেইরকমই মনে হয়। বছরে দু-তিনবার সে তার গ্রামের বাড়িতে আসে। সে গ্রামের বাড়ি বলে না, বলে শুধু বাড়ি। এক সময় কলকাতার বাঙালরা তাদের গ্রামকে বলত দেশ, তারা বছরে দু-তিনবার দেশে যেত, এখন আর তাদের দেশ নেই।

গ্রামে আসার পর থেকেই চন্দ্রনাথ জুতো খুলে ফেলে খালি পায়ে হাঁটে। তার পরনে লুঙ্গি আর গেঞ্জি। সে এই গ্রামের প্রতিটি মানুষকে চেনে। এখন চন্দ্রনাথকে দেখলে বোঝাই যায় না যে সে কলকাতার কফি হাউসে আধুনিক বাংলা

সাহিত্যের নৈরাজ্য বিষয়ক তর্কে টেবিল ফাটায়।

চন্দ্রনাথের স্ত্রী পাশের গ্রামের মেয়ে। চন্দ্রনাথ বিয়ে করতে গিয়েছিল পাল্কিতে চেপে। এখন হেঁটেই শ্বশুর বাড়ি যায়। মাইল পাঁচেকের পথ। একদিন দুপুরে খেতে বসে পাতিলেবু চাওয়ায় চন্দ্রনাথ টপ করে উঠে সাইকেলে চেপে শ্বশুর বাড়ির উঠোন থেকে লেবু ছিঁড়ে নিয়ে এসেছিল।

প্রথম দিন মল্লিকা আমায় জলখাবার দিয়েছিল লুচি, বেগুন ভাজা আর রসগোল্লা। আমি খুবই রাগারাগি করেছিলাম সেদিন। আমি তো আর এ গ্রামের জামাই নই যে খাতির করতে হবে আমায়! লুচি ভাজবার জন্য খুব ভোরে উঠে মল্লিকাকে আটা মাখতে হয়েছে। এদিকে ময়দা পাওয়া যায় না, তবে ঘিটা বাড়ির তৈরি। খাঁটি ঘি আমার একদম সহ্য হয় না এবং লুচি-ফুচিও পছন্দ করি না। জোরজার করেই আমি গ্রামের নিত্য নৈমিত্তিক যা জলখাবার, তার পুনঃপ্রবর্তন করিয়েছি।

জলখাবার মুড়ি, কাঁচা পেঁয়াজ এবং আলু ভাজা। আলুর সঙ্গে আমার সকাল থেকে মধ্যরাতের-পর পর্যন্ত দেখা সাক্ষাৎ হয় এখানে। দুপুরে ভাতের সঙ্গে আলু সেদ্ধ, আলু পোস্ত, আলু ভাজা, আলুর টক এবং মধ্যরাতে কাঁচা আলু।

আলু ভাজার সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকা আমায় দুটো শুকনো লঙ্কাও ভেজে দেয়। আমি কাঁচালঙ্কার ভক্ত। কিন্তু নিরাপদ গ্রামে কেউ কাঁচালঙ্কা খায় না। কোনো রান্নাতেও কাঁচালঙ্কার ব্যবহার নেই। মেদিনীপুরের রান্নায় ঝালের বদলে মিষ্টি বেশি থাকে। মেদিনীপুরের কোনো লোক যদি কখনো টেকনাফ শহরে গিয়ে হোটেলে খেতে বাধ্য হয়, তা হলে কী হবে? টেকনাফ শহরটি অন্ধ্রপ্রদেশে। আমি ঝাল খাওয়ায় মোটামুটি একজন চ্যাম্পিয়ন, একবার ঐ টেকনাফে এক হোটেলে খেতে গিয়ে সেই আমারও অন্তরাত্মা পর্যন্ত জ্বলে গিয়েছিল। ঐ রকম ঝাল আর মাত্র একবারই আমি খেয়েছিলাম, মেকসিকোর নোগালিস নামের একটি ছোট্ট শহরে। কাঁচালঙ্কা জিনিসটাই শুনেছি আমাদের দেশে এসেছে ঐ মেকসিকো অঞ্চল থেকে। চিলি নামেই পরিচয়।

চন্দ্রনাথদের বাড়িটি মাটির দোতলা। নিচতলায় দুটি ঘর, সামনে বেশ চওড়া দাওয়া। এই দাওয়া কথাটি অলিন্দ থেকে এসেছে কিনা আমি জানি না, তবে গ্রামে আজকাল বারেন্দা শব্দটি[illegible] [illegible] [illegible]। সেই দাওয়ায় পাটি পেতে বসে চলে আমাদের জলখাবার পর্ব। সামনে একটি ছোট্ট উঠোন, তার ওপাশে গোয়াল ঘর ও প্রতিবেশীদের [illegible]বাখানের বেড়া। চন্দ্রনাথদের প্রতিবেশীদের সব কথা এখানে বসে শোনা যায়। ও-বাড়ি স[illegible] অনেক কিছুই আমি এই ক-দিনে জেনে গেছি।

উঠোনে ব[illegible] [illegible] [illegible] একটি প্রভুভক্ত কুকুর। সেও মুড়ি খায়।
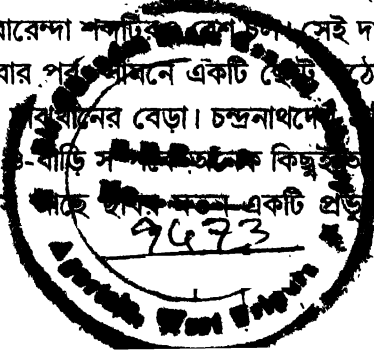
এমনকি আলু ভাজাও খেয়ে নেয় টপ টপ করে। একটু দূরে দূরে তাকে আলু ভাজা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিই।

গোয়াল ঘরেব পাশের বেড়ার গায়ে কিছু একটা লতানো গাছ। ওটা শশা না ঝিঙে গাছ ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। আমাব বাল্যস্মৃতির গ্রামের বাড়িতেও বেড়াব গায়ে শশার গাছ ছিল, তাতে সত্যিকারের শশা ঝুলে থাকত। 'দু-একটা নষ্ট সাদা শশা', জীবনানন্দের এই লাইনটি পড়লেই আমার সেই বেড়ার ছবিটি মনে আসে।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করল, আজ বেলডাঙ্গায যাবে?

আমি আমাব থালা থেকে তিন-চতুর্থাংশ মুড়ি চন্দ্রনাথেব থালায় উঠিয়ে দিলাম।

চন্দ্রনাথ হা-হা করে বলে উঠল, ও-কী, ও-কী?

আমি বললাম, খাও, খাও, তুমি খাও।

আমি মুড়ি ভালোবাসি, তা বলে একটা মস্ত বড় কলাইকরা বাটিতে একসের মুড়ি খাওয়া আমাব সাধ্যাতীত। একটুক্ষণ মুড়ি চিবুলেই আমার চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়। চন্দ্রনাথেব চোয়ালেব কোনো আলস্য নেই। শেষেব দিকে ও ব্যাপারটা অনেক সংক্ষিপ্ত করে ফেলে। কাঁসাব ঘটি থেকে খানিকটা জল ঢেলে নেয মুড়ির থালায। মুড়িগুলো চুপসে গেলে সে এক একটা করে মণ্ড পাকিয়ে ফেলে দেয় গলায। এমন ভাবে মুড়ি-ভোজনেব ব্যাপার আমি আগে দেখিনি।

—বেলডাঙ্গায কী আছে?

—কিছু না, এমনিই ঘুরে আসা যায়।

মল্লিকা তার স্বামীকে বলল, শুধু শুধু এই রোদ্দুরের মধ্যে আবার নীলুদাকে বেলডাঙ্গায হাটিযে নিয়ে যাবে কেন? কিচ্ছু নেই সেখানে।

চন্দ্রনাথ বলল, দেখি যদি একটা সাইকেল পাওয়া যায়। তাহলে আর ওকে হাঁটতে হবে না।

মল্লিকা তবু বলল, না, বেলডাঙ্গায যেতে হবে না।

আমাব কৌতূহল জাগল। চন্দ্রনাথ বেলডাঙ্গায যেতেই বা চাইছে কেন আর মল্লিকারই বা আপত্তি কিসেব?

আমি চন্দ্রনাথেব দিকে চেয়ে ভুরু নাচালাম।

চন্দ্রনাথ লাজুক অপরাধীর ভঙ্গিতে বলল, বেলডাঙ্গায় আজ ব্রীজ কম্পিটিশন আছে।

মল্লিকা অমনি বলে উঠল, দেখেছেন। দেখেছেন! আপনাকে নিযে এসে তাসের এমন নেশা...

চন্দ্রনাথ গ্রামের অধিকাংশ জমি বিক্রি করে সেই টাকায় কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনেছে। তার পরের জেনারেশান পুরোপুরি শহুরে হয়ে যাবে। চন্দ্রনাথের এই গ্রামের বাড়িতে তার এক দিদি-জামাইবাবু এসে থাকেন এখন এবং বাকি জমির দেখাশুনা করেন। চন্দ্রনাথ এখন নিছক বেড়াতেই আসে গ্রামে আর মল্লিকাও পাশের গ্রামে বাপের বাড়ি ঘুরে যায়।

কিন্তু গ্রামে এসে চন্দ্রনাথ গ্রামের জীবনযাত্রার সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে নেয় নিজেকে। সে অভিজ্ঞের মতন চাষবাসের খবর নেয়, গ্রাম সম্পর্কিত খুড়ো, জ্যাঠা দাদাদের জমি সংক্রান্ত গোলমালে পরামর্শ দেয়। গোরুর বাঁটে পোকা হলে কী চিকিৎসা করতে হয়, তা সে জানে। আমি এসব কিছুই জানি না।

সীজনের সময় গ্রামে গ্রামে ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা চলে যদিও কিন্তু সব সীজনেই কাছাকাছি গ্রামগুলির প্রধানতম চিত্ত বিনোদনের সামগ্রী হলো তাসের কমপিটিশান। এতে হার-জিতের ওপর গ্রামের সম্মান নির্ভব করে। চন্দ্রনাথ গ্রামে এসে এই ব্যাপারেও মেতে ওঠে। শহরে ও গ্রামে সে সম্পূর্ণ দুটো আলাদা জীবন তৈরি করে নিতে পেরেছে।

পুরুষদের ঘন্টার পর ঘন্টা বিভোর হয়ে তাস খেলা কোনো মেয়েই পছন্দ করে না। কী শহরে, কী গ্রামে।

আমি বললাম, তুমি ঘুরে এসো না। বেলডাঙ্গা থেকে!

চন্দ্রনাথ বলল, নাঃ! তুমি গেলে আমি যেতাম; তোমার সময় কাটত। তোমাকে আমাদের গ্রামের টিমে...

আমার অবশ্য সময় কাটাবাব কোনো সমস্যা নেই। ঘন্টার পর ঘন্টা চুপ করে একলা বসে থাকলেও আমার চমৎকার সময় কেটে যায়। এখানে অবশ্য এমন নিস্তব্ধতা যে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেই ঘুম পায়।

মল্লিকা বলল, বাজে কথা বলো না। নীলুদাকে ওরা খেলতে দেবে না। ওরা এ গ্রামের টিম চেনে, নীলুদাকে দেখলেই বুঝবে...

চন্দ্রনাথ এক ঘটি জল খেয়ে বলল, আঃ! তোমার পেট ভরল না, নীলু তুমি ঐটুকু মোটে খেলে...

সকালবেলা জলখাবারেব সময় যে পেট ভরিয়ে ফেলতে হয়, এটাও তো আমার কাছে একটা নতুন খবর! চন্দ্রনাথও নিশ্চয়ই কলকাতায় সকালবেলা উঠেই পেট ভর্তি খাবার খেয়ে নেয় না।

গ্রামের লোকেরা বেশি খায়, না শহরের লোকেরা বেশি খায়? শহরের লোকরাই নিশ্চয়ই, কিন্তু সেটা বোঝা যায় না। গ্রামের লোকরা খায় এক থালা মুড়ি, দুপুরের ভাত খায় অন্তত এক কিলো চালের, সে যেন ভাতের একটি

ছোটখাটো পাহাড়, ডাল তরকারি না থাকলেও ক্ষতি নেই, শুধু নুন আর পোস্তবাটা দিয়েই সাবড়ে দেয়। এতখানি ভাত খাওয়া দেখলে শহরের লোক আঁতকে উঠবে, কিন্তু এত এত মুড়ি আর ভাত খেয়েই গ্রামের লোক প্রোটিনের অভাব পুষিয়ে নিচ্ছে। এখানে ভালো মাছ বা মাংস খাওয়া হয় শুধু বছরের মধ্যে কোনো কোনো উৎসবে। প্রতিদিনের রান্নায় মাছ মাংস, ডিমের গন্ধও থাকে না। মাঝে মাঝে কখনো কুচো মাছ, পুটি খলসে বা চ্যাং যেগুলো পাওয়া যায় ধান খেতে বা নালায় সেইগুলো বিক্রি করতে আনে বাগদি মেয়েরা। তারও দাম যথেষ্ট। একটু ভালো মাছ কেউ ধরলেই তা চলে যাবে শহরে। মাছের জন্য বড় বড় শহরগুলো বিরাট হাঁ করে আছে।

চন্দ্রনাথ আমার জন্য রামজীবনপুরের হাট থেকে খুব চড়া দাম দিয়ে অতি বিস্বাদ মাছ কিনে আনে। ছোট ছোট পোনা মাছ, যেগুলো কাঁটা ভর্তি, কলকাতায় আমি কক্ষনো খাই না। চন্দ্রনাথকে হাজার নিষেধ করলেও শুনবে না।

নিরাপদ গ্রামের অতি প্রিয় খাবার হলো পোস্ত। আলু ও পোস্তের দু-তিনরকম কোর্স থাকবেই। কথায় বলে, লুঙ্গি না থাকলে পরতি কী, আর পোস্ত না থাকলে খেতি কী?

চন্দ্রনাথদের উঠোন দিয়ে অনবরত মানুষজন যাতায়াত করে। লোকের উঠোনের ওপর দিয়ে না গেলে লোকে যাবেই বা কী করে? গ্রামে মূল রাস্তা মাত্র একটা, তার থেকে ডাইনে বাঁয়ে যেতে হলেই আর লোকের বাড়ি ভেদ করা ছাড়া উপায় নেই।

দুজন রমণী ও দুজন পুরুষ এই মাত্র চলে গেল। তাদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, তারা মুসলমান। পাশের মামুদপুর গ্রামটি মুসলমান-প্রধান। ওখানকার লোক এই গ্রামে ঘরামির কাজ করতে আসে।

মামুদপুরের মুসলমানরা নিশ্চয়ই আরবদেশ থেকে আসেনি। দু-একশো বছর আগে ধর্মান্তরিত হয়েছে। মামুদপুর ও নিরাপদ গ্রামের লোকেরা নিশ্চিত একই নরগোষ্ঠীর অন্তর্গত, তবু আলাদা ধর্মের জন্য চেহারাতেও কিছু কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য এসে যায়? মুসলমান দেখলেই চেনা যায়। মুসলমানরাও নিশ্চয়ই হিন্দুদের চিনতে পারে। বসিরহাটের কাছে একটি সম্পূর্ণ মুসলমান গ্রামে আমি কিছুদিন ছিলাম, আমার মতন সে গ্রামের অনেক ছেলেই প্যান্ট শার্ট পরে। কিন্তু আমাকে দেখলেই সবাই হিন্দু বলে চিনতে পারত। অথচ আমি তেমন হিন্দুও নই বোধহয়।

বসিরহাটের কাছের সেই গ্রামটি বিষয়ে আর একটি কথা মনে পড়ল। একটি মুচি পরিবার ছাড়া সে গ্রামে আর সবাই মুসলমান, কিন্তু সেখানে মাত্র একজন ছাড়া আর কেউই উর্দু কোরান পড়তে পারে না। কিছু কিছু বয়েৎ দু-চারজনের মুখস্থ আছে। কিন্তু উর্দু পড়তে জানেন শুধু একজনই, তিনি এক প্রৌঢ়া রমণী,

পাটনা থেকে তাঁকে সেই বাংলার গ্রামের বউ করে আনা হয়েছিল এক সময়।

মামুদপুরের অনেকেই চন্দ্রনাথকে চেনে। একজন ঘরামি চন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে সেলাম জানিয়ে বলল, সার, কবে এলেন?

চন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য এখানকার স্কুলে মাস্টারি করে গেছে, অনেকের কাছে এখনো তার সেই পরিচয়।

চন্দ্রনাথ বলল, কেমন আছ, কাশেম? এই, আলিমুদ্দিন এখন কোথায় থাকে? এখানে আছে?

—সে তো দুর্গাপুরে...

বাংলা বিভাগের অন্যতম প্রধান কারণ, পূর্ব বাংলায় হিন্দুদের বাড়ির উঠোনের ওপর দিয়ে মুসলমানদের যাওয়ার অধিকার না দেওয়া। মেদিনীপুরেও সে রকম বিভেদ কখনো ছিল কি না জানি না। যাক, এখন যে নেই, তাতেই আমি নিশ্চিন্ত।

চন্দ্রনাথের উঠোন দিয়ে সারা গ্রামের লোক, এমনকি পাশের মামুদপুর গ্রামের মুসলমানরা যাতায়াত করতে পারলেও তার ঠিক প্রতিবেশীদের কারুর যাওয়ার অধিকার নেই। ওদের সঙ্গে চন্দ্রনাথদের দু পুরুষের ঝগড়া, বাক্যালাপ বন্ধ। তাই উঠোনের মাঝখানে বেড়া। ও বাড়ির লোকেরা এ বাড়ির লোকদের শুনিয়ে শুনিয়ে ঠেক দিয়ে কথা বলে প্রায়ই। ও বাড়ির গরু এ বাড়ির উঠোনে ঢুকে পড়লে তুলকালাম কাণ্ড হয়। ঐ বাড়িটি চন্দ্রনাথের বাবার আপন জ্যাঠতুতো ভাইয়ের। "বঙ্গে প্রতিবেশীরাই দুর্জন।"

বেড়ার ফাঁক দিয়ে ও বাড়ির উঠোনটি পরিষ্কার দেখা যায়। সেখানে ধান শুকোচ্ছে। ওটা খোরাকির ধান। ওদের একটা ঢেঁকিঘরও আছে।

ঐ উঠোনে একটি লোককে রোজ সকালেই দেখতে পাই। ওরকম রূপবান পুরুষ খুব কমই দেখা যায়। বার্নিস করা খয়েরি গায়ের রং, মেদহীন ঝকঝকে চেহারা, সরু কোমর, চওড়া কাঁধ, মাথাভর্তি স্বাস্থ্যবান তেল চুকচুকে ঝাঁকড়া চুল। তার বয়েস বছর পঁচিশেক হবে, চোখ দুটি উজ্জ্বল, বাঙ্ময়। বিখ্যাত অভিনেতা সিডনি পয়টিয়েরের সঙ্গে ওর খুব মিল আছে।

এমন একজন দারুণ সুন্দর চেহারার যুবকের নাম দামু কিংবা দামা। একজন মহিলা মাঝে মাঝে বাড়ির ভেতর থেকে কখনো দামু, কখনো দামা বলে ডাকেন ওকে। যুবকটি তার উত্তরে বলে, কী বল্লেন, মা ঠাকরুন?

ঐ দামু বা দামা ঐ বাড়ির বচ্ছরকি জন। অর্থাৎ সারা বছরের জন্য বাঁধা লোক। এক বছরে ওকে দেওয়া হবে ন' শো টাকা, ছ প্রস্থ জামাকাপড় আর পেট ভরতি খাদ্য, এর বিনিময়ে যে কোনো কাজ ওকে দিয়ে করানো যাবে। দিনে

রাতে যে-কোনো সময়ে। অর্থাৎ এক বছরের চুক্তির ক্রীতদাস।

দামু সকালবেলা উঠোনে বসে গোরুর জন্য জাব কুচোয়। এর মধ্যেই আমি দামুর কাছ থেকে দুটি নতুন শব্দ শিখেছি।

দামু খানিকটা বাদেই জিজ্ঞেস করে গোরু নামাব, মা ঠাকরুন?

কথাটা প্রথম দিনই আমার কানে লেগেছিল। আমি চন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, গোরু নামানো মানে কী?

চন্দ্রনাথ বুঝতে পারেনি। সে বিস্মিতভাবে উত্তর দিয়েছিল, গোরু নামানো? তার মানে গোরু নামানো! আবার কী জানতে চাও?

চন্দ্রনাথের কাছে ব্যাপারটি এতই পরিচিত আর সাধারণ যে সে আমার প্রশ্নটাই ধরতে পারছিল না।

গোয়াল থেকে গোরুটাকে বার করাকে গোরু নামানো বলে তা আমরা জানব কী করে? দামু সকালবেলা গোরু নামায় আর সন্ধেবেলা গোরু তুলে দেয়। ঠিক যেন মোটর গাড়ি, আর গোয়ালটি একটি গ্যারাজ।

গলায় কাছা দেওয়া অশৌচের পোশাক পরা একজন শীর্ণকায় কিশোর উঠোনে এসে বলল, ও চাঁদু দা।

চন্দ্রনাথ মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, ও, গোলোকবিহারী।

কিশোরটি বলল, আমার বাবার ছেরাদ্দ করব তোমরা যদি অনুমতি দাও।

চন্দ্রনাথ বলল, ব্রাহ্মণ অনুমতি দিয়েছে তো? তাঁর অনুমতিতেই আমাদের অনুমতি।

ছেলেটি বলল, এক গেলাস জল খাব।

মল্লিকা একটি পেতলের রেকাবিতে করে দুটি নারকোল ছাপা ও দুটি বাতাসা এবং এক গেলাস জল দিল কিশোরটিকে। সে উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মিষ্টি ও জল খেল।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করল, পুরুষ-দফা করবি না দেশামো?

কিশোরটি বলল, দেশামো পারব না। পুরুষ-দফাতেই...পরশু বিকেলে মিটিন হবে, তুমি একটু মিটিনে আমার হয়ে বলো, যাতে পুরুষ-দফায় রাজি হয়—

চন্দ্রনাথ বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক আছে। ঐ পুরুষ-দফাই করিস।

কিশোরটি চলে যাবার পর চন্দ্রনাথ আমাকে বলল, চলো, একটু ঘুরে ঘেরে আসি, শুধু বসে থেকে কী হবে।

কিশোরটি যে কী বলে গেল, তার অর্ধেকই আমি বুঝলাম না। চন্দ্রনাথও বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করল না। ওর কাছে তো সবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, দেশামোটা আবার কী? আর পুরুষ-দফা?

চন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে বলল, তুমি দেশামো মানেও জানো না ? তুমি দেখছি সাহেব একেবারে!

আমি বললাম, ভাই, সাহেবরা হয়তো দেশামো কথাটার মানে জানলেও জানতে পারে, সাহেবরা অনেক কিছুর খোঁজখবর রাখে, কিন্তু আমরা যারা কলকাতায় বড় হয়েছি, আমরা জানি না।

মল্লিকা বলল, দেশামো হলো গ্রামসুদ্ধ সবাইকে খাওয়ানো, আর পুরুষ-দফা মানে শুধু পুরুষদের। দেখুন না, ও কেমন স্বার্থপরের মতন শুধু পুরুষ-দফার কথা বলল।

চন্দ্রনাথ বলল, গোলোকদের অবস্থা এখন খুব খারাপ, দু বছর আগে ওর কাকাটা মারা গেল, আর এবার ওর বাপ।

মল্লিকা বলল, ওর দাদা সেটলমেণ্ট অফিসে কাজ করে; অনেক টাকা ঘুষ পায়।

চন্দ্রনাথ বলল, ঐ বৈকুণ্ঠটা একটা চাষা।

ঐ গ্রামের প্রায় সবাই চাষবাসের সঙ্গে জড়িত, তবু এখানকার লোকদের প্রধান গালাগাল চাষা, এটা আমি আগেই লক্ষ্য করেছি।

চন্দ্রনাথ আবার বলল, দ্যাখো, মিটিং-এ সবাই পুরুষ-দফায় রাজি হয় কি না। অনেকদিন এখানে বড় রকম খাওয়াদাওয়া হয়নি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কারুর বাড়িতে শ্রাদ্ধের সময় কতজনকে খাওয়াতে হবে, তা বুঝি মিটিং ডেকে ঠিক করা হয় ?

—হ্যাঁ!

—আর ঐ ব্রাহ্মণের অনুমতির ব্যাপারটা কী ?

—আমাদের গ্রামে এক ঘর ব্রাহ্মণ আছে, এইসব কাজে আগে ব্রাহ্মণের অনুমতি নিতে হয়।

তখন আমার আবার মনে পড়ল বসিরহাটের কাছে সেই গ্রামটির কথা, যেখানে আমি কিছুদিন ছিলাম। সেখানে একটি মুচি পরিবার ছাড়া আর সবাই মুসলমান। অবশ্য মুচিরাও ঠিক হিন্দু কিনা, তাই বা কে জানে! হিন্দু সাহিত্যে আমি এ পর্যন্ত কোনো মুচির উল্লেখ দেখিনি। এ গ্রামের একমাত্র ব্রাহ্মণ পরিবারটির অবস্থা সেই মুচি পরিবারের মতন কি ? একবার দেখে আসা দরকার।

৩

দুপুরে শুনলাম, সদাইবাবু চন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাকেও খাবার নেমন্তন্ন করেছেন তাঁর বাড়িতে। সেখানে দেখতে পেলাম তাঁর বিবাহযোগ্য কন্যাটিকে। ভুল হলো, কন্যাটি নয়, কন্যা দুজনকে।

সদাইবাবু তাঁর দুই মেয়েকে এক সঙ্গে বিয়ে দিতে চান।

সদাইবাবুর বাড়িটি তিন মহলা। যদিও মাটির তৈরি এবং একতলা, তাহলেও প্রথমে কয়েকটি ঘর ও একটি উঠোন, তারপর আবার কয়েকটি ঘর ও পেছনে আর একটি উঠোন, তারপর অন্দরমহল।

প্রথম উঠোনটিতে আট-দশজন লোক বসে আলু কুটছে খুব মন দিয়ে। প্রত্যেকের পাশে একটি ছোটখাটো আলুর পাহাড়। আমাদের দু-তিনজনকে নেমন্তন্ন খাওয়াবার জন্য এত আলু কোটা হচ্ছে নাকি? ভাবলেই আতঙ্ক হয়।

ব্যাপারটা আসলে অবশ্য তা নয়। এগুলো বীজ-আলু। আলু অনেকদিন ঘরে রেখে দিলে তার একদিক থেকে শুঁটি বেরোয়। তখন সেইদিক থেকে খানিকটা কেটে নিয়ে মাটিতে পুতলেই আলু গাছ হয়। আলুর বাকি অংশটা কাজে লাগে না; তা বলে সেগুলো ফেলেও দেওয়া হয় না, বিক্রি হয়। রামজীবনপুরের হাটে, এমনকি আরামবাগ শহরেও আমি আধখানা কাটা আলু স্তূপীকৃত ভাবে বিক্রি হতে দেখেছি। দাম ঠিক অর্ধেক।

এদিকে আলুর চাষ বেশ লাভজনক। আমার শয়নকক্ষের খাটের নিচে আলুগুলো রাখা আছে, সেগুলোও বীজ করার জন্যই। তার কিছু অংশ ইঁদুর ভোগের জন্য নির্দিষ্ট।

নিরাপদ গ্রামে কোনো জমিদার নেই। ঠিক জোতদারও কারুকে বলা যায় না। তবে ছদ্মবেশী জোতদার ঠিকই আছে, এই সদাইবাবুই তো একজন।

দু-তিনখানা গ্রাম পরে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে জমিদার ছিল। সেই প্রাক্তন জমিদারদের এক বংশধরকে দেখেছিলাম বাস স্ট্যাণ্ডে। ফুটফুটে ফর্সা রং, সুন্দর চেহারা। এখন কলকাতায় ইলেকট্রিক সরঞ্জামের দোকান খুলেছে। জমিদারের ছেলেরা বড় সুন্দর চেহারার হয়। জমিদারি হারিয়ে বংশানুক্রমিকভাবে এরা ইলেকট্রিকের দোকান চালালে তারপরও কি এদের চেহারা এমন সুন্দর থাকবে? দু-একটি জমিদারের ছেলেমেয়েকে মিউজিয়ামে রেখে দেওয়া উচিত।

রোগা-পাতলা চেহারা হলেও সদাইবাবু মানুষটি বেশ রাশভারী। লোকের দিকে সোজা চোখ তুলে তাকিয়ে কথা বলেন।

তাঁর অন্দরমহলের সামনের উঠোনটাতে একটি বড় কাঁঠাল গাছ। তার ছায়ায় একটি টিনের চেয়ার পেতে তিনি বসে আছেন। আমাদের দেখে খুব একটা সাড়ম্বর

অভ্যর্থনা কিংবা বিনয়-বিগলিত ভাব না দেখিয়ে তিনি শুকনো ভাবে বললেন, চাঁদু এসচিস, আয়। ওরে দুটো চেয়ার দে।

চন্দ্রনাথ বলল, আমার এক বন্ধুকে এনেছি।

সদাইবাবু বললেন. হ্যাঁ, দেখেছি ওনাকে। আমাদের গাঁয়ের অতিথি, ঠিক মত যত্ন-আত্তি হচ্ছে তো?

এই চেয়ারে বসতে দেওয়াই বিশেষ খাতির দেখানো। সাধারণত বাড়ির দাওয়াতে বসেই বাইরের লোকের সঙ্গে কথা হয়। কারুর কারুর বাড়িতে একখানা ঘবে চৌকির ওপব বারো-মেসে বিছানা পাতা থাকে, অন্য গাঁয়ের কেউ এলে বসানো হয় সেখানে। অন্য গাঁ থেকে কেউ এলে সাধারণত দুপুরটা ঘুমিযে বা রাত কাটিয়ে পরের দিন ফেবে।

চেয়ার একটি দুর্লভ বস্তু। চন্দ্রনাথের মুখে শুনেছি, এ গ্রামের মধ্যে একমাত্র সদাইবাবুই এক সঙ্গে ছ'খানা চেয়ার বার করতে পাবেন। সেই জনাই ক্বচিৎ কখনো পুলিশের কোনো কনস্টেবল বা দাবোগা এলে সদাইবাবুব বাড়িতেই বিশ্রাম নেয়। নিরাপদ গ্রামে শেয পুলিশের আবির্ভাব ঘটেছিল ঠিক দু বছর আগে, এক ডাকাতির সূত্রে, তারপবেও কিছু চুরি. ডাকাতি মারামারি হযেছে. কিন্তু পুলিশ আসাব গরজ কবেনি। আসবেই বা কী করে. নিকটস্থ পাকা রাস্তা থেকে নিরাপদ গ্রাম পাকা পাঁচ মাইল হাঁটা পথ। পুলিশরাও আজকাল জিপ গাড়িতে ঘুবে ঘুবে স্বভাব খারাপ কবে ফেলেছে, তাদের সকলের বেশ একটা সুখী সুখী ভাব।

—মশায়ের কী করা হয় কলকাতায়?

সদাইবাবু চন্দ্রনাথের সঙ্গেই কথাবার্তা বলছিলেন, হঠাৎ আমাকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করায় আমি একটু চমকে গেলুন।

ঘাড় না চুলকেও সেই ভঙ্গি করে আমি বললুম, আজ্ঞে, বিশেষ কিছু না, এই সামান্য একটু লেখা-টেখা—

আমার সম্পর্কে আর বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না করে তিনি চন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই নাকি কলকাতায় বাড়ি করিচিস? কত খর্চা হলো?

চন্দ্রনাথ বলল, বাড়ি কোথায় সদাই জ্যাঠা? ছোট ফ্ল্যাট। দু'খানা ঘর, কল পায়খানা, একটা রান্নাঘর, আর একটা বারান্দাও আছে, সেই বারান্দায় দাঁড়ালে হাওড়া ব্রীজ দেখা যায়।

—কত খর্চা পড়ল?

—সব মিলিযে সত্তর বাহাত্তর হাজার পড়বে, সবটা এখনো দিইনি।

—সে বাড়িতে আরও লোক থাকে?

চন্দ্রনাথ হেসে ফেলে বলল, অনেক লোক। সে বাড়িতে বাইশখানা অমন

ফ্ল্যাট, সদাই জ্যাঠা। সকলকে চিনিই না।

—এজমালি সিঁড়ি?

—হ্যাঁ!

—ছাদ আলেদা আলেদা।

—না।

—সামনে মাঠ আছে?

—না।

—কলের জল খেতে হয় তো? কলকেতার কলের জল খেলে কলেরা হয়। এত গুচ্ছের টাকা দিয়ে এক বাড়িতে এতগুলো লোক গাদাগাদি করে থাকা, এ যে চাষাভূষোর মতন অবস্থা? এমন অখদ্যে বাড়ির জন্য তুই অত ভালো দো-ফসলা বারো বিঘে জমি বেচে দিলি?

—কী করব, কলকাতাতেই যখন থাকতে হবে...মাস মাস বাড়ি ভাড়া কত গুনতে হতো জানেন? দুশো পঁচিশ।

—বাপ রে বাপ!

—তাও তো সস্তায় ছিলাম, এখন আরও ভাড়া বেশি। আর এখানে জমি রেখেই বা কী লাভ হতো বলুন, নিজে বাইরে থাকি...বর্গাদাররাই তো সব লুটে পুটে নিতো!

সদাইবাবু মুখের এমন একটা ভাব করলেন যেন চন্দ্রনাথের মতন নির্বোধ ও কাপুরুষ তিনি দ্বিতীয়টি দেখেননি।

তারপরই একটা হুংক দিয়ে বললেন ওরে, কই, তিন কাপ চা দিয়ে গেলি না।

দুপুর সাড়ে বারোটা বাজে। সদাইবাবু আমাদের দুপুরে ভাত খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছেন। এখন চা?

আমি মৃদু আপত্তি জানাতে যাচ্ছিলাম, চন্দ্রনাথ আমায় চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ জানাল।

চা খাওয়ানো আপ্যায়নের একটি পরম চিহ্ন। গ্রামের সব বাড়িতে চা হয় না। সদাইবাবুর বাড়িতে যে চা তৈরি হয়, সেটা আমাকে দেখাতেই হবে। তা দিনের যে-কোনো সময়েই হোক।

সদাইবাবুর বাড়িতে পর্দা প্রথা নেই।

অবিলম্বে একটি সতেরো-আঠারো বছর বয়েসী মেয়ে নিয়ে এলো তিন কাপ চা ও ছখানি থিন অ্যারারুট বিস্কুট।

আমি এই মেয়েটির সঙ্গেই হেড মাস্টার দুর্জয় নন্দীর বিয়ের কথাবার্তা চলছে

ভেবেছিলাম। কিন্তু সেটা ভুল।

মেয়েটি রোগা, মুখখানি লম্বা ধরনের, এবং চোখের পল্লবগুলি দীর্ঘ। মোটামুটি একটা শান্ত শ্রী আছে।

সদাইবাবু বললেন, পেন্নাম কর!

চন্দ্রনাথ বেশ স্বাভাবিক ভাবেই পা দুটি এগিয়ে দিল। সে আগে ছিল স্কুল মাস্টার, এখন অধ্যাপক, প্রণাম নেবার তার অভ্যেস আছে। আমি কারুর প্রণাম গ্রহণ করি না। বয়েসে ছোট কেউ জোর করে প্রণাম করতে এলে আমি বলি যে তাহলে আমিও তোমায় প্রণাম করব। একবার মহিষাদল কলেজে কয়েকটি ছাত্রছাত্রী হুড়োহুড়ি করে অন্য কয়েকজনের সঙ্গে আমাকেও প্রণাম করে ফেললে আমিও তাদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কবে তাদের খুব লজ্জায় ফেলে দিয়েছিলাম।

সদাইবাবুর সামনে সে রকম ইয়ার্কি করার সাহস পেলাম না। শুধু অভ্যেস বশত হাত বাড়িয়ে বললাম, আরে না-না, আমায় না আমায় না—

সদাইবাবু আমাকে এক ধমক দিয়ে বললেন, আপনি ব্রাহ্মণ।

মেয়েটির হাতের সঙ্গে আমার হাতের ছোঁয়া লেগে গেল। জানি না, সেটা কোনো অপরাধ কি না!

ইস্কুলের দফতরি দয়াল যে চা বানিয়েছিলেন, সদাইবাবুর বাড়ির চা তারই উনিশ-বিশ মাত্র। আমার ধারণা, প্রত্যন্ত গ্রামের দিকে পুরোনো জুতোর সুখতলা কুচি কুচি করে সেগুলোকেই চায়ের নামে চালানো হয়। কলকাতা থেকে চা আনতে ভুলে যাওয়ায় আসবার পথে আরামবাগ থেকে চন্দ্রনাথ চা কিনেছিল। সে শহরের সবচেয়ে বড চায়ের দোকানে গিয়ে চন্দ্রনাথ বলেছিল, সবচেয়ে দামী, আপনার বেস্ট কোয়ালিটির চা দিন! সেখানে বেস্ট কোয়ালিটি চায়ের কিলো বাইশ টাকা। পাউণ্ড নয়, কিলো, সেই চা যে আমরা প্রতিদিন উপভোগ করে পান করছি তা নিতান্তই মল্লিকার হাতের গুণ। মল্লিকা সত্যিই ভালো চা বানায়।

সদাইবাবু ও চন্দ্রনাথ বিস্কুটগুলো চায়ে ডুবিয়ে ডুবিয়ে খাচ্ছে—আমি আমার ভাগের বিস্কুট দুটি আগেই লুকিয়ে পকেটে ভরে রেখে দিয়েছি। রাত্তিরবেলা ইঁদুরের জন্য কাজে লাগবে। ইঁদুরগুলোর সঙ্গে শিগগিরই আমার বন্ধুত্ব হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত হয়তো আমি এ গ্রামের পাইপ পাইপার হয়ে যাব। বাঁশি বাজিয়ে সব ইঁদুরবাহিনী নিয়ে যাব শহরে।

সদাইবাবু চন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলেন, এবার কিছুদিন থাকছিস তো? তোর বন্ধুকেও ধরে রাখ। সামনের মাসের পাঁচুই বীণাপাণির বিয়ে। তোকে থেকে অনেক কাজ করতে হবে!

চন্দ্রনাথ বলল, বলেন কী, এত তাড়াতাড়ি। সব ঠিক হয়ে গ্যাছে?

—হ্যাঁ। বেলডাঙ্গার ঘনশ্যাম দাসের ছেলে শ্যামানন্দ, এবার বি এ পাশ দিয়েছে, বেশ ভালো ছেলে।

—চিনি তাকে। এই রে, আমাদের যে ১লা তারিখেই ফেরার কথা, একটা কাজ আছে।

—রাখ তোর কাজ। ছুটি নিবি। তোর বন্ধুকেও ধরে রাখবি, তোমারও নেমন্তন, বুঝলে ?

আমি সবিনয়ে বললাম, থাকতে পারলে খুবই ভালো লাগত, কিন্তু আমার সত্যিই বিশেষ কাজ আছে, আমায় ফিরে যেতেই হবে—

—এই বললে তুমি কোনো কাজ করো না!

সদাইবাবু এর মধ্যে আমার প্রতি সম্বোধনে আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছেন। তা আসুন, সেটা কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু এর খানিকবাদেই যে আমি একটি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার শুনতে পাবো, তা কল্পনাই করিনি তখন।

বীণাপাণি এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, বিয়ের প্রসঙ্গ উঠতেই সে শরম জড়িত পায়ে বাড়ির মধ্যে ফিরে গেল।

সদাইবাবু বললেন, ভাবছি ঐ দিনেই সতীর বিয়েটাও লাগিয়ে দেব!

চন্দ্রনাথ বলল, একই দিনে ? কেন এত তাড়াহুড়ো কিসের ?

—আমার তো আয়ু ফুরিয়ে এল!

—কী যে বলেন, সদাই জ্যাঠা!

—তোর বাপ কত বছর বয়েসে মারা গেসলো ?

—আমার বাবার তো উদুরী হয়েছিল, আসলে পেপটিক আলসার, অনেক চিকিৎসা করিয়ে ফল হলো না। আপনার তো রোগ ভোগ কিছু নেই।

—আরে আয়ুর সঙ্গে রোগ ভোগের কিছু সম্বন্ধ নেই। আয়ু ফুরিয়েছে, আর কী করা যাবে! আমার কুষ্ঠিতে আছে একষট্টি বছর বয়েসে মরণ।

—কে আপনার কুষ্ঠি করেছে ?

—কামারপুকুরের মহেশ আচার্যি।

—ও তো একটা বুজরুগ। আমার বাবারও কুষ্ঠি করেছিল ঐ মহেশ।

—তা তোর বাপের বেলায় মেলেনি ?

—ও বলেছিল, আমার বাবার অপঘাতে মৃত্যু। পেপটিক আলসার কি অপঘাত ?

—ঐ একই হলো। ইংরেজি অসুখের কথা আমাদের শাস্ত্রে লেখা থাকে না। শুধু কি মহেশ আচার্যির কথা আমি বিশ্বেস করে বসে আছি ভাবছিস ? সাতশো টাকা খর্চা করে আর একখানা কুষ্ঠি করিয়েছি কলকেতার কালীঘাট থেকে।

দুটোতেই এক কথা। আসছে বৈশাখে বুধের ওপর শনি বক্রি হবে, তখনই আমার আয়ু শেষ!

—জ্যাঠা, এসব আজকাল মেলে না।

—দু বছর আগে কাশী গেসলুম। সেখানে ভৃগু করিয়েছি। ইণ্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত ভৃগু মেনে চলতেন। ঐ জওহরলাল নেহরু যে টপ করে মারা গেলেন, আগে থেকে তিনি জানতেন সে কথা। কাশীর গুরুদেব তাঁকে দিনক্ষণ হিসেব করে বলে দিয়েছিলেন।

জওহরলাল নেহরু যে কোনোদিনই ভারতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন না, সে কথা আমি আর সদাইবাবুকে মনে করিয়ে দিলাম না।

—কিন্তু একটা কিছু অসুখ বিসুখ হলে তবে তো মানুষ মরবে। আজকাল কতরকম ওষুধ পত্তর বেরিয়েছে।

—জওহরলালের ওষুধ পত্তরের অভাব ছিল? ওরে, আমরা হলুম গে গুরু-বংশ, আমাদের বংশে সবাই হৃদরোগে মরে, অন্য অসুখ হয় না, ডাক্তার বদ্যি ডাকার সময় দেয় না। আমি হিসেব করে দেখেছি, আমার আয়ু আছে মাত্র তিন মাস দশ দিন সাড়ে সাত ঘণ্টা—

তারপর সদাইবাবু চকিতে একবার কাঁঠাল গাছের ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদাস ভাবে বললেন, আর সময় বেশি নেই, সাড়ে তিন মাসও না, এর মধ্যে অনেক কাজ মিটিয়ে যেতে হবে। আমি থাকতে থাকতেই যাতে ইস্কুল বিল্ডিংটা পাকা হয়, সেজন্য দিন রাত খাটছি, মেয়ে দুটোর বিয়ে দিতে হবে যেমন করে হোক, মামুদপুরের জমির মোকদ্দমাটার রায় যদি এর মধ্যে না বেরোয়, তাহলে সালিসী ডাকব, শিবমন্দিরটার পলেস্তারা খসে গেছে, আমি মলে নতুন পলেস্তারা দেবার দায় কে নেবে বল তুই আমাকে? শ্যামপুরের বড় ঝিলটা নিলামে ডেকেছি, এখনও দখল নেওয়া হয়নি।...

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, জন্মেছিস তো একটা দাগ রেখে যা! নিরাপদ গ্রামের সদাইবাবু অনেকগুলো দাগ রেখে যেতে চাইছেন।

উনি আর একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, যেতে যখন হবেই তখন ভালোয় ভালোয় যাব! কিন্তু হাতে অনেক কাজ, অথচ সময় এত কম, বিশেষ করে মেয়ে দুটোর বিয়ে দিতে না পারলে—

এই রকম একটা ভাবগম্ভীর বিষাদঘন মুহূর্তে আমার মাথায় হঠাৎ একটা অবান্তর চিন্তা এলো। শুধু অবান্তর নয়, হাস্যকর।

সদাইবাবু যতবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছিলেন, আমিও ততবার কাঁঠাল গাছটিকে দেখছিলাম। গাছটায় বেশ কয়েকটা নধর এঁচোড় ফলে আছে। আমি

একবাব ত্রিপুবায কাঁঠাল গাছকে এচোড গাছ্ বলায অনেকে খুব আপত্তি কবেছিল ও হেসেছিল। নাবকেল গাছকে কি ডাব গাছ্ বলা যায না? পাকা কাঠাল জিনিসটা আমাব মতে অতি অখাদ্য জিনিস। দু কোযাব বেশি তিন কোযা খেলেই পেট কামডায। তাব বদলে ঠিক-বযেসী এচোড অতি উত্তম বস্তু, গবম মশলা-টশলা দিযে তবকাবি বাধলে ঠিক মাংসেব মতন লাগে। অনেক অঞ্চলে এচোডকে লোকে বলে গাছ-পাঁঠা। সদাইবাবু কি আজ দুপুবে আমাদেব এচোডেব তবকাবি খাওযাবেন, নাকি উনি এই সবগুলো পাকিযে কাঠাল কববেন?

নিজেই লজ্জিত হযে জোব কবে এই চিন্তাটা মন থেকে ঝেডে ফেলে আমি একটু গলাখাঁকাবি দিযে বললুম, আপনাব কুষ্টিটা একবাব দেখতে পাবি?

সদাইবাব বললেন, ওসবেব চচা কবা হয নাকি?

এবাব আমাব ব্রাহ্মণ্য গৌবব দেখাবাব সুযোগ এসে গেল। আমি জিজ্ঞেস কবলাম, আপনি মহামহোপাধ্যায ভবনাথ শাস্ত্রীব নাম শুনেছেন নিশ্চযই। বাজজ্যোতিষী ছিলেন?

কোনো একটা গালভাবি নাম উচ্চাবণ কবে কাকুকে যদি জিজ্ঞেস কবা যায, নাম শুনেছেন নিশ্চযই, তা হলে অধিকাংশ লোকই ভ্যাবাচাকা খেযে হ্যা বলে দেয।

সদাইবাবুও ঘাড নাডলেন।

যদিও আমাব তিনকুলে কেউ কোনোদিন মহামহোপাধ্যায ছিলেন না এবং কোনো বাজজ্যোতিষীকেও এ পর্যন্ত চমচক্ষে দেখিনি। এ দেশে আব কোনো বাজাই নেই, তবু বাজজ্যোতিষীদেব নাম এখনো বিজ্ঞাপনে দেখতে পাই।

যাই হোক, আমি বললাম, উনি আমাব আপন দাদু। আমাব বাবা-ঠাকুর্দাও জ্যোতিষ চর্চা কবতেন, আমি একটু একটু জানি।

চন্দ্রনাথ দু চোখে বীতিমতন শ্রদ্ধাব ভাব এনে বলল, একটু নয, আমাব এই বন্ধু জ্যোতিষী নিযে দাৰুণ পডাশুনো কবেছে। সাযেন্টিফিক ভাবে ক্যালকুলেশান কবতে পাবে। ওকে আপনাব কুষ্ঠিটা একটু দেখান না।

সদাইবাবু কুষ্ঠি আনতে বাডিব মধ্যে উঠে গেলেন।

আমি অমনি ফস কবে একটা সিগাবেট ধবিযে ফেললাম। চা খাওযাব পব সিগাবেটেব জন্য আমাব ঠোঁট সুল সুল কবে। সদাইবাবু তো নিজে দিব্যি ট্যাঁক থেকে জাবমান সিলভাবেব কৌটো বাব কবে তাব থেকে পবপব সিগাবেট খেযে যাচ্ছিলেন। অথচ ওব সামনে আমাদেব খাওযাব উপায নেই।

চন্দ্রনাথ বলল, কুষ্ঠিটা দেখতে দেখতে তুমি দু-চাবটে সংস্কৃত শ্লোক আউডে দিও।

আমি বললাম, মেঘদূত থেকে খানিকটা আবৃত্তি করলে চলবে?

সদাইবাবু ফিরে আসতেই সিগারেটটা পায়ের তলায় চেপে হাত দিয়ে ধোঁয়া তাড়ালাম।

কুষ্ঠিটা বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লেখা। মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝবার উপায় নেই। আসল সংস্কৃত কি না, তাই বা কে জানে! অন্য কেউ যাতে বুঝতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যেই তো এগুলো লেখা হয় এইরকম ভাবে। পরিষ্কার চলতি বাংলায় লিখলে বুঝি ধর্মনাশ হয়ে যায়!

কশ্চিৎ কান্তা বিরহ গুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ ইত্যাদি গুনগুন করতে করতে আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে কুষ্ঠিটি দেখতে লাগলুম। গোটানো জিনিসটি খুলতে খুলতে অনেকখানি লম্বা হয়।

এক জায়গায় হঠাৎ থমকে গিয়ে আমি বললুম, হ্যাঁ, লেখা আছে বটে একষট্টি বছর বয়সে আপনার গুরুতর ফাঁড়া...

সদাইবাবু বললেন, দেখলে তো!

আমি বললাম, কিন্তু পরেই যে আর এক জায়গায় আছে, পঁয়ষট্টি বছর বয়েসে আপনার পঞ্চতীর্থ ভ্রমণ যোগ, এক জায়গায়, ইয়ে হরিদ্বারে প্রকৃত গুরুর দর্শন প্রাপ্তি। তা ছাড়া, কা তব কান্তা কস্তে পুত্রং, অর্থাৎ সেই বছরেই আপনার মেয়ের একটি ছেলে হবে, আপনি নাতির মুখ দেখবেন।

সদাইবাবু বললেন, এসব কথা তো আমায় কেউ বলেনি আগে।

চন্দ্রনাথ বলল, মহামহোপাধ্যায় বংশের লোক আপনাকে বলছে, সায়েন্টিফিক হিসেব, কখনো ভুল হয় না।

আমি বললাম, একষট্টিতে আপনার একটা ফাঁড়া আছে ঠিকই কিন্তু প্রাণঘাতী নয়, হাতে বা পায়ে চোট লাগবে কিন্তু পঁয়ষট্টি বছর বয়েসে আপনার খুব ভালো সময়, তীর্থভ্রমণ...বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে...আপনার মেয়ে বীণাপাণির সন্তান হবে সে সময়।

সদাইবাবু গলা চড়িয়ে ডাকলেন, সতী! সতী!

এবারে একটি পনেরো-ষোলো বছরের মেয়ে বেরিয়ে এলো বাড়ি থেকে। এর পোশাক একটু বিচিত্র ধরনের। হালকা-নীল শালোয়ার কামিজের ওপর আবার অতিরিক্ত একটি লাল রঙের ব্লাউজ। যাত্রা-থিয়েটারে মোগল-পাঠান রমণীদের অনেকটা এইরকম সাজ থাকে। এটা বোধহয় এখন এখানকার চলতি আধুনিক পোশাক। মেয়েটিকে বেশ মানিয়েছে। যদিও কলকাতার মেয়েরা দেখলে নিশ্চয়ই বলবে গাঁইয়া, গাঁইয়া!

মেয়েটির মুখখানায় বেশ একটি তেজী ভাব আছে। গায়ের রংও মাজা মাজা।

আগের মেয়েটির চেয়ে এর চেহারাই বেশি দৃষ্টি-আকর্ষণীয়। শালোয়ার কামিজের ওপর আরও একটি ব্লাউজ পরার এও একটি কারণ হতে পারে যে এর বুকের ঢেউ দুটি বেশ বড়।

সদাইবাবু বললেন, সতী মা, এই খালি কাপগুলো নিয়ে যা আর খাতা-প্যান্সিল নিয়ায় তো!

সদাইবাবু কোনো কারণে উত্তেজিত হয়ে আছেন, তাই একে আর প্রণাম করতে বললেন না।

মেয়েটি কাপগুলো তুলে নিয়ে যাবার পর সদাইবাবু বললেন, এই আমার ছোট মেয়ে, এর বিয়েটা দিয়ে যেতে পারলেই নিশ্চিন্দি!

সতী খুব তাড়াতাড়ি একটি খাতা আর ডট পেন নিয়ে ফিরে এলো। ডট পেন জিনিসটা গ্রামেও ঢুকে গেছে, কিন্তু তার নাম এখনো পেন্সিল। আসল পেন্সিল তো প্রায় উঠেই গেল পৃথিবী থেকে। আমাদের ছেলেবেলায় গুরুজনরা পেন্সিলকে বলতেন, উড পেন্সিল। স্কুলের মেয়েরা বলত উটপেন্সিল।

সদাইবাবু তাঁর মেয়েকে বললেন, ঐ ভদ্দরলোকটিকে দে।

আমাকে বললেন, আমি আমার জন্মতারিখ আর টাইম আর রাশি বলে দিচ্ছি, আপনি আমার একটা ছক তৈরি করে দেখান তো!

এবারে একেবারে হাতনাতে ধরা পড়ে গেছি! আড় চোখে চন্দ্রনাথের দিকে তাকালাম।

চন্দ্রনাথ বলল, না, না সদাই জ্যাঠা। আপনি ভুল বুঝেছেন, ও রাস্তার সাধারণ জ্যোতিষীদের মতন ছক কেটে একটা কিছু যা-তা বলে দেয় না। ও একেবার আসল মানে, সায়েন্টিফিক্যালি

আমি আমতা আমতা করে বললাম, আজ্ঞে মানে আপনার কুষ্ঠিতে সংস্কৃতে যা লেখা আছে, তা দেখে যা মনে হয়।

সদাইবাবু ইংরেজি বা সংস্কৃত না জানলেও তাঁর বুদ্ধি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। তিনি বিষয়ী লোক, লোক চরিয়ে তাঁকে খেতে হয়। আমাদের মতন চ্যাংড়া তিনি ঢের দেখেছেন।

আমার কাছ থেকে খাতা ও ডট পেনটি প্রায় কেড়েই নিয়ে তিনি বিষণ্ণ হাস্যে বললেন, আমায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা কচ্ছিলেন তো? তা বুঝিচি। কিন্তু আমি তো আর ছেলেমানুষটি নই যে পাঁচ জনের কথায় নাচব! নিজে সব জিনিসটা গুলে খেয়েছি!

ঝটিতি কাগজের ওপব ট্যাঁড়া কেটে একটা ছক এঁকে ফেলে তিনি বললেন, এই দেখুন বুধ, এই সময় শনি বক্রি হবে। আমার মিথুন রাশি, তখন রবি আবার

সপ্তমে চলে যাসসেন, জাতকের অবধারিত মৃত্যু। পাক্কা হিসেব কষা আছে, আজকের দিনটা পার হলে আমার আয়ু তিন মাস দশ দিন সাড়ে ছ ঘণ্টা।

সদাইবাবু অবিকল কী কী বলেছিলেন আমার মনে নেই, তবে বুধ, শনি, রবি বক্রি এই ধরনের কিছু কথা মনে আছে। আরও কিছু ছিল বোধহয়।

—চাঁদু, তুই যেন সে-সময় আসতে ভুলিস না! তোকে কাঁধ দিতে হবে কিন্তু, আগে থেকেই বলে রাখলুম।

সতী নামের মেয়েটি তার বাবার পাশে পাথর প্রতিমার মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কোনো মিশনারি স্কুলে পড়া শহুবে মেয়ে হলে নিশ্চয়ই এই সময়ে আদুরে আদুরে গলায় বলত, বাবা কিংবা বাপি (অনেক অবাঙালিরা আবার বলে ড্যাডিজী) তুমি কী রোজ রোজ শুধু মরে যাবার কথা বলো, ভাল্লাগে না! নো, ইউ মাস নট টক লাইক দ্যাট!

কিন্তু এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও সতী সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। সদাইবাবুকে অবশ্য দেখলেই বোঝা যায়, তিনি নিজের পরিবারে হিটলার।

কথা ঘোরাবার জন্য চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করল, বেলডাঙ্গার ছেলেটি কী রকম নিচ্ছে?

এবার সদাইবাবু বললেন, আমি কোনো খামতি রাখছি না। দশ হাজার টাকা নগদ।

চন্দ্রনাথ বলল, দশ হাজার?

—তোদের সময় রেট ছিল আট হাজার। এখন বারোতে উঠেছে, কিছুই তো খপর রাখিস না। তোরও তো মেয়ে হয়েছে—বুঝবি! এ ছেলেটিও গ্র্যাজুয়েট, বারো চাইতেই পারে, আমি টেনে টুনে দশে নামিয়েছি, আর দশ হাজার টাকার সোনা, তাছাড়া সাইকেল, রিস্টওয়াচ, মেয়ের জন্য ডেরেসিং টেবিল, একশোজন বরযাত্রী আসবে, আমি ঠিক করেছি তাদের বরফের সরবৎ খাওয়াব। এ গাঁয়ে আগে কেউ কোনোদিন বরফ এনেছে, তুই বল?

—ওরে বাবা, আপনি তো এলাই কারবার করছেন।

—তা ছাড়া ডায়নামো ভাড়া করে এনে ফিট করব! সারা রাত্র ইলেকটিরিকের আলো জ্বলবে! ধরা বিয়ে নয়, একেবারে সাজল্লতা বিয়ে দেবো! আমরা গুরু বংশ।

সব কথার মানে বোঝা যায় না, জিজ্ঞেসও করা যায় না। তবে এটুকু বুঝলাম, আজকাল যাকে জেনারেটর বলে, এক সময় তাকেই বলা হতো ডায়নামো, এখনো গ্রামে তাই বলে। কিংবা কে জানে দুটো একই জিনিস কি না।

সদাইবাবু সতীর পিঠে হাত দিয়ে বললেন, এই মেয়েটাকেও যদি এই এক সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া যেত, তাহলে সব দিক থেকেই ভালো হতো। আমি নিশ্চিন্তে চোখ বুজতে পারতুম!

এবার সতীর চলে যাবার পালা। খাতা, ডট পেন গুছিয়ে নিয়ে সে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। লক্ষণীয় বিষয় এই যে এ পর্যন্ত সে একটিও শব্দ উচ্চারণ করেনি। খানিকটা গিয়ে সে ফিরে তাকাল একবার। চোখাচোখি হলো আমারই সঙ্গে। মনে হলো যেন, সেই দৃষ্টিতে কিছু একটা কাতর আবেদন ফুটে উঠেছে। আমি তার মর্ম বুঝতে পারলাম না।

সদাইবাবু চন্দ্রনাথকে বললেন, চাঁদু, দ্যাখ না, যদি একটা পাত্র জোগাড় করতে পারিস, তোর তো অনেক চেনাশুনো...আমি ভালো টাকা দেবো—

সদাইবাবু একবার আপাদমস্তক আমাকে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আমি যেহেতু ব্রাহ্মণ, তাই পাত্র হিসেবে এখানে একেবারেই অযোগ্য। নইলে তাঁর যেমন মরীয়া অবস্থা, তিনি হয়তো জোর জবরদস্তি করেই আমার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিতেন। কিংবা, জোর জবরদস্তি করার দরকারও হয়তো হতো না, আমাকে দু-একবার সাধলেই—।

চন্দ্রনাথ বলল, পাত্র দেখতে পারি, কিন্তু এত তাড়াতাড়ির মধ্যে, সামনের মাসের পাঁচুই, আর তো মোটে এগারো দিন...

—কী করি বল, আমার যে আর টাইম বেশি নেই।

সদাইবাবুর মধ্যে হঠাৎ যেন একটা ছটফটানি এসে গেল। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উঠোনে পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর এক সময় আমাদের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে বললেন, ঐ যে হেডম্যাস্টার দুর্জয়, ওর সঙ্গে বিয়েটা লাগিয়ে দেবো ভেবেছিলুম। ওর জন্য আমি নগদ আর সোনা মিলিয়ে পঁচিশ হাজার পর্যন্ত খর্চা করতে রাজি আছি। তা ও ছোঁড়া আবার জাতের বড়াই করে। বলে কিনা, এগারো ধারাব তিলি! আরে আমরা হলুম গে গুরু বংশ, আমাদের তাঁবা আছে, আমি যে রাজি হয়েছি, এই যথেষ্ট। নেহাৎ কপালের ফের। হাতে টাইম নেই। আমার কী মনে হয় জানিস চাঁদু, ও আমাকে টাইট কষাসসে। মনে হয়, তিরিশ হাজার চায়। এম-এ পাশ কিনা! তুই একটু কথা বলে দ্যাখ না!

পণপ্রথা নিবারণ বিষয়ে কিছু একটা আইন হয়েছিল না? সঞ্জয় গান্ধী নামে এক দুর্বিনীত বখাটে ছোকরা এই নিয়ে কিছু হৈচৈও করেছিল শুনেছি। নিরাপদ গ্রামে তার ছায়ামাত্র পড়েনি। এখানে হাল-বলদ, পুরুষ্টু পাঁঠা বা চর্বিওয়ালা মুরগির মতন বিভিন্ন ধরনের পাশ করা পাত্রের নির্দিষ্ট রেট আছে।

চন্দ্রনাথ বলল, সেকি, দুর্জয় নন্দী তো দোজবরে। তার সঙ্গে সতীর বিয়ে দেবেন?

সদাইবাবু বললেন, দোজবরে তো কী হয়েছে! তোর জ্যেঠিকেও তো আমি দোজবরে অবস্থায় বিয়ে করেছিলুম। তোর জ্যেঠি কি অসুখী হয়েছে? যা না, জিজ্ঞেস করে দ্যাখ না?

এর পর আর কোনো যুক্তি চলে না।

বিনা কারণে সদাইবাবু হনহন করে হেঁটে গেলেন দ্বিতীয় উঠোনটির দিকে। সেখানে দু পাশে দুটি গোয়াল, তাতে দুটি দুধেলা গোরু। এ ছাড়া ওঁর দু জোড়া হাল বলদও আছে। দুটি বড় মরাই ভর্তি ধান। একটি বড় পুকুর, তাতে ভালো জাতের মাছ জিয়োনো আছে। মেয়ের বিয়ের সময় জাল ফেলে সেই মাছ ধরা হবে। দু দিকে অনেকখানি চোখ যাওয়া পর্যন্ত ধানজমি সদাইবাবুর নিজস্ব। এত জমি রক্ষার জন্য তাঁকে বিশেষ কিছু তঞ্চকতা করতে হয়নি। তিনি গুরু বংশের লোক বলে বর্গাদাররা নিজেদের অধিকার জাহির করার জন্য নাম লেখায়নি সেটলমেন্ট অফিসে গিয়ে। সরকারি বা বে-সরকারি কেউ এসে জিজ্ঞেস করলেও তারা বলে, না গো, ও জমি আমরা বাবুর জন্যি ডেলি রেটে চষে দি! সদাইবাবু গুরু বংশের লোক!

গুরু বংশ অর্থে সদাইবাবুরা ধর্মঠাকুরের শিষ্য। আধা-হিন্দু, আধা বৌদ্ধ ধর্ম ঠাকুরের কথা আমি বইতেই পড়েছি। কিন্তু তাঁর যে এতখানি প্রভাব আছে, আমার জানা ছিল না। নিম্নবর্ণের লোকেদের মধ্যে সদাইবাবুর মতন লোকেরা দীক্ষা দেবার অধিকারী। এক হিসেবে ব্রাহ্মণের মতনই তাঁর সম্মান। হাতে তামার আংটি তাঁদের বংশচিহ্ন। এরকম তামার আংটি অন্য কেউ ধারণ করতে পারে না।

তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির দিকে তাকিয়ে সদাইবাবু উদাসীনভাবে বললেন, এ সবই আমি নিজে করিছি। তুই তো সবই জানিস চাঁদু! সবই ফেলে যেতে হবে, হাতে মোট তিন মাস দশ দিন সময়। এর মধ্যে যে কত কাজ সারতে হবে, সব কিছুর বিলি ব্যবস্থা না করলে...

চন্দ্রনাথ বলল, সদাই জ্যাঠা, যদি তারপরও আপনি বেঁচে থাকেন, তা হলে কী হবে।

—*যদি বাঁচি, তা হলে বুঝব, সেটা ভগবানের দয়া! কিন্তু ভগবানের দয়া পাবার মতন কিছু কাজ কি করিছি। শিব মন্দিরের পলেস্তারা গত পাঁচ ছ বছর ধরে করব করব বলে আর পাঁচ রকম ঝঞ্ঝাটে করে ওঠা হয়নি। সব মামলারই আপীল করার একটা তারিখ থাকে, বুঝলি? ডেট পেরিয়ে গেলে আর কিছু হয় না। আমারও তারিখ খারিজ হয়ে গেছে। এখন যা ভবিতব্য, তা মানতে হবে বৈকি!*

এমন সময় ছোট্টখাট্টো চেহারার, অল্পবয়েসী, মোটা গোঁফ সমেত ভারিক্কি ভাবের হেড মাস্টার দুর্জয় নন্দীর প্রবেশ। তিনিও নিমন্ত্রিত। স্কুলের টিফিনের সময় চলে এসেছেন।

আর কথা না বাড়িয়ে সদাইবাবু বললেন, চলো, এবার গিয়ে খেতে বসা যাক। হেড মাস্টারমশাইকে আবার তো স্কুলে ফিরতে হবে!

খাওয়া দাওয়ার পর চন্দ্রনাথও আর দেরি করতে চাইল না। সে বেলডাঙ্গায় তাস খেলতে যাবার জন্য উসখুস করছে। আমাকে বাড়ি পৌঁছেই সে চলে যাবে। ব্রীজ কমপিটিশানে নিরাপদ গ্রামের সম্মান রক্ষার দায়িত্ব নির্ভর করছে তার ওপর। সে নাকি খুব ভালো খেলে। বস্তুত, খেলার তারিখ হিসেব করেই চন্দ্রনাথ বেড়াতে এসেছে গ্রামে।

সদাইবাবুর তিনমহলা মাঠকোঠার দ্বিতীয় মহলের পর থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে বলল, ও চাঁদুদা, পান খেলে না।

মেয়েটির বয়স কুড়ি একুশ। পরনে কালো নরুন পাড়ের সাদা শাড়ি। কারুকে বলে দিতে হয় না যে, মেয়েটি বিধবা। মুখের মধ্যেও একটা নিরিমিষ্যি খাওয়া ভাব এসে গেছে।

চন্দ্রনাথ বলল, কী রে লক্ষ্মী, তোকে এতক্ষণ দেখিনি কেন?

মেয়েটি বলল, আহা, খোঁজ করলে তো, দেখবে!

আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সিগারেট ধরালাম।

চন্দ্রনাথ বলল, এই আমার এক বন্ধু—এর নাম নীলু। নারে, আজ আর পান খাব না।

মেয়েটি বলল, তোমার মেয়েকে নিয়ে এলে না? তোমার মেয়েকে তো দেখলামই না!

চন্দ্রনাথের একটি চার বছরের ছেলে ও একটি আট-ন মাসের মেয়ে আছে। ছোট মেয়েটি ভারি ফুটফুটে।

চন্দ্রনাথ বলল, কেন, তুই আমাদের বাড়িতে যেতে পারিস না? মেয়েকে এনে দেখাতে হবে? আয় একদিন আমাদের বাড়িতে।

মেয়েটি বলল, দেখি! যাব অখন! মল্লিকা ভালো আছে?

—হ্যাঁ।

—তোমার জন্য পান সেজে রেখেছিলাম কিন্তু!

—তুই নিজে খেয়ে নে! আমার বন্ধুও পান খায় না!

সদাইবাবুর বাড়ি ছেড়ে কিছুদূর এগোবার পর চন্দ্রনাথ খানিকটা সলজ্জভাবে বলল, ঐ যে মেয়েটিকে দেখলে, লক্ষ্মী—ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা ছিল।

শেষ পর্যন্ত ওকে বিয়ে করিনি বলে সদাই জ্যাঠা অনেকদিন রেগে ছিলেন আমার ওপর।

—ওকে বিয়ে করলে না কেন?

—করতাম। প্রায় ঠিকঠাক। সেই সময় শামপুরে একটা ফাংশান দেখতে গেলাম। সেই ফাংশানে মল্লিকা রবীন্দ্রনাথের আফ্রিকা কবিতাটা বই না দেখে পুরো আবৃত্তি করল। আমার এমন ভালো লেগে গেল যে আমি গোঁ ধরলাম, ঐ মেয়েকেই বিয়ে করব। মল্লিকা তখন পার্ট ওয়ানের ছাত্রী, আমাদের সঙ্গে জাতেরও মিল আছে।

—তা ভালোই করেছ। মল্লিকা মেয়েটি চমৎকার।

চন্দ্রনাথ হেসে বলল, তা ছাড়া, ঐ লক্ষ্মীকে বিয়ে করলে আমি নিশ্চয়ই এতদিন মরে ভূত হয়ে যেতাম। ওর কপালে বৈধব্য যোগ আছে।

আমি বললাম, যাঃ, ও কথা বলছ কেন? তোমায় বিয়ে করলে ও বেচারা বোধহয় বিধবা হতোই না! তোমার তো আর অকালমৃত্যু যোগ নেই!

চন্দ্রনাথ আরও জোরে হেসে বলল, আরে, তুমি হঠাৎ এত সীরিয়াস হয়ে গেলে কেন? লক্ষ্মীকে আমি বিয়ে করিনি অন্য কারণে। মেয়েটি ভালো, ওকে বিয়ে করলে অনেক টাকা পয়সাও পেতাম, কিন্তু তা হলে আর আমার কলকাতায় গিয়ে থাকা হতো না। সদাই জ্যাঠা আমায় এখানেই জমিজমা তদারক করার জন্য আটকে রাখতেন। আমি এ গ্রামে হাঁপিয়ে উঠছিলাম।

এটা একটা যুক্তিপূর্ণ কথা। কেউ কেউ গ্রাম ছেড়ে শহরে যাবেই। নইলে শহর গড়ে উঠবে কী করে? চন্দ্রনাথ গ্রামে থাকতে চায়নি, তাকে জোর করে আটকে রাখার কোনো মানে হয় না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ আমরা হাঁটতে লাগলাম।

আবার দুটি পরস্পর-বিরোধী চিন্তা আমার মাথায় এলো।

এই মেদিনীপুরেরই এক বেঁটে খাটো বামুন গত শতাব্দীতে কলকাতায় গিয়ে বিধবা বিবাহের ব্যাপারে খুব শোরগোল তুলেছিলেন। কিন্তু স্বয়ং মেদিনীপুরেই তার কতটা প্রভাব পড়েছে, তা তো দেখাই যাচ্ছে। ঐ লক্ষ্মী নাম্নী কুড়ি-একুশ বছরের বিধবা মেয়েটির কি আবার বিয়ে হবে? কেউ নিশ্চয়ই সে কথা মনেও স্থান দেয় না!

আমার দ্বিতীয় চিন্তাটি আর একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সদাইবাবুর বাড়িতে দুপুরের ভোজটি বেশ ভালো হলেও আমাদের এঁচোড়ের তরকারি খাওয়ানো হয়নি। তা হলে উনি নিশ্চিত পাকা কাঁঠালে বিশ্বাসী। উনি যদি সত্যিই আর তিন মাসের মতন বাঁচেন, তবে তার মধ্যেই যে এচোঁড়গুলো পেকে কাঁঠাল হয়ে যাবে, সে সম্পর্কে ওঁর কোনো সন্দেহই নেই।

৪

এটা কী গাছ আমি জানি না। দুই খেতের মাঝখানে আলের ওপর ছোট্টখাট্টো বেশ সুশ্রী গাছটি। এটা কি বনতুলসী? অনেকটা সেই রকম পাতা, কিন্তু ঠিক নয়। বনতুলসীর ঝাড় আমি দেখেছিলাম সাঁওতাল পরগনার খুব নগণ্য, নাম-না-জানা একটি জায়গায়, দুমকা থেকে খানিক দূরে, অজস্র বনতুলসীর ঝাড়। তার মধ্যে ঢুকলে হারিয়ে যাওয়া যায়। মনে আছে, সেই বনতুলসীর ঝাড়ের মধ্যে আমি হারিয়ে যেতে উদ্যত হয়েও হঠাৎ মনে পড়েছিল, ঠিক এরকম একটি গল্প আছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের। নিজের জীবনে আমি কোনো গল্পের অনুকরণ পছন্দ করি না।

গাছটার গায়ে আমি হাত বুলোলাম।

গাছেরা গায়ে হাত দিয়ে আদর করা ভালোবাসে। ওরা মেয়েদের মতন নয়, অচেনা গাছদেরও এ ভাবে আদব করা যায়। ওরা ভালোবাসা বোঝে. গাছকে যে ভালোবাসে গাছ তাকে চিনে রাখে। গাছকে যে ভালোবাসে তাকে দেখলেই গাছ উৎফুল্ল হয়, আর যে অকারণে গাছের পাতা ছেঁড়ে তাকে দেখলে আগে থেকে গাছ শিউরে ওঠে। আমি যদি একটা গাছকে খুব মন দিয়ে ভালোবাসি, তা হলে সত্তর আশি মাইল দূরে আমি কোথাও হোঁচট খেয়ে পড়ে আহত হলে, সেই গাছটা টের পেয়ে দুঃখিত হবে।

এসব গাঁজাখুরি কথা নয়, সাহেবরা লিখেছে।

গাছের জঠর নেই, তবু খায়, নাক নেই নিশ্বাস নেয়। এবং মস্তিষ্ক নেই, তবু স্মৃতিশক্তি আছে। এমন একটা অদ্ভুত প্রাণী আমাদের কাছাকাছি সব সময় থাকে আমরা খেয়াল করি না।

সামনের মাঠটা পেরুলেই মামুদপুর। এক একবার ভাবছি, ঐ গ্রামটা ঘুরে আসব। মামুদপুর একটু সমৃদ্ধ, বড় জায়গা. দু-একটা দোকানপাট আছে। তাছাড়া শুনেছি, মামুদপুরের একজন লোকের কাছে নাকি বিকেলবেলা খবরের কাগজ আসে।

চন্দ্রনাথ ব্রীজ খেলতে চলে গেছে। আমারও এক সময় তাসের নেশা সাঙ্ঘাতিক ছিল। কিন্তু আমায় ওরা কমপিটিশান খেলায় নেবে না, গিয়ে কী লাভ। তার চেয়ে এই ঘোরাঘুরিই তো বেশ।

রাস্তা চেনার কোনো অসুবিধে নেই। সোজাসুজি মাঠ পেরুনো। বিকেল শেষ হয়ে এসেছে। মামুদপুরের ওপরের আকাশে চলেছে রঙের দাঙ্গা। সন্ধ্যায় নদী-তীরে বসে কবিত্ব করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ, ঐ নিরাপদ গ্রামের নারীরা ওখানে বাথরুম করতে যায়।

দুটি হাল বলদ মাঠে চরিয়ে সেই লোকটি ফিরছে। চন্দ্রনাথদের পাশের বাড়ির সেই বছর-বাঁধা মুনিষ। ছোট্ট শিশুকে যেমন বলা যায় মানবক, তেমনি চাকরির জগতে যারা নিকৃষ্টতম, অর্থাৎ দিনমজুর তারা মানুষ নয় মুনিষ।

লোকটি এবার গোরু দুটিকে গ্যারাজে তুলবে। কী যেন নাম ওর?

আমি ওর পথ জুড়ে দাঁড়ালাম।

খবরের কাগজে দেখেছি চাষী ও মজুরদের আজকাল আপনি সম্বোধন চালু হয়েছে। বজ্রপাতে দুজন চাষী মারা গেছেন, কিংবা তিরিশজন শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছেন, এরকম লেখা হয়। কিন্তু মাঠেঘাটে রাস্তায় ওরকম এখনো কারুকে বলতে শুনি না। এক ডাকবাংলোর চৌকিদারকে আমি প্রথম কিছুক্ষণ আপনি বলায় সে আমায় স্নানের জল দেয়নি। খেতে বসে একটি কাঁচা পেঁয়াজ চাওয়ায় সে বলেছিল, ওসব এখানে পাওয়া-টাওয়া যায় না!

—তোমার নাম কী ভাই?

ওর মালিকের বাড়ির সঙ্গে আমার মালিকের বাড়ির ঝগড়া। সুতরাং আমার সঙ্গে কথা বলা উচিত কি না, সে সম্পর্কে ও একটু চিন্তা করল।

--দামু।

কয়েক শো বছর আগে কোনো বাঙালিরই পদবী ছিল না, শুধু নাম দিয়েই পরিচয় ছিল। সুতরাং দামুও পদবী জানানো নিষ্প্রয়োজন মনে করল।

গরু দুটির মধ্যে একটা বিষম পাজি, আমায় শিং নেড়ে গুঁতোতে এলো। ও-ও কি বুঝে গেছে যে আমি ওর মালিকের বিরুদ্ধপক্ষীয় লোক।

গোরুটিকে সামলানোর জন্য দামু হট-ট-র-র ধরনের একটা অদ্ভুত শব্দ করল তাতেই গোরুটি শান্ত। আমি শেক্সপীয়ারের নাটক পড়তে পারি দামু তা পারে না। আবার গোরুদের বকুনি দেবার জন্য দামু যে-রকম শব্দ করতে পারে, তা পারা আমার পক্ষে অসম্ভব।

—সিগারেট নেবে, দামু?

সে গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ল। সিগারেট খায় না, কিংবা আমার দেওয়া সিগারেটকে সে ঘুষ হিসেবে ভাবছে, তা ঠিক বোঝা গেল না।

—কেন, খাও না, আমি দিচ্ছি; নাও।

দামু আবার মাথা নাড়ল। আর জোর করা যাবে না।

আমি তোষামুদে হাসি হেসে, মুখখানা তেলতেলে করে বললাম, আমি কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে এসেছি। তোমার বাড়ি কি এই গাঁয়েই?

—না।

—কোথায়?

দামু চিবুক উঁচু করে একটা দিক নির্দিষ্ট করে বলল, হোথা। লারাণপুর।

—তুমি রোজ রাতে বাড়ি ফিরে যাও?

দামুর সুদর্শন মুখখানিতে একটা বেশ সুন্দর গাম্ভীর্য আছে। সিডনি পয়েটিয়ের-এর কথা আমার ঠিকই মনে পড়েছিল। চিত্রতারকা হিসেবে দামুকে খুব ভালোই মানাত।

দামু ওর গম্ভীর ও কিছুটা বিস্মিত দৃষ্টি আমার ওপর স্থাপন করল। যেন আমার প্রশ্নটা সে বুঝছে না। সত্যিই তো এসব আজেবাজে প্রশ্ন করে কেন আমি ওর সময় নষ্ট করছি! ও রাতে বাড়ি ফেরে, কি ফেরে না, তাতে আমার কী আসে যায়?

—যেদিন যাই, যেদিন যাই না।

কথা অসমাপ্ত রেখে দামু একটা গোরুর ল্যাজ মোচড়াতেই দুটো গোরু একসঙ্গে চলতে শুরু করল। দামুও আর দাঁড়াল না।

লাল রঙের বিকেলে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার ইচ্ছে ছিল দামুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করার। কিন্তু ওর সঙ্গে যোগাযোগের ভাষা আমি জানি না। শুধু শুধু কয়েকটি অবান্তর প্রশ্ন করছিলাম।

পলিটিক্যাল লোকজনরা ওদের সঙ্গে কী ভাবে কথা বলে কে জানে! যত দূর শুনেছি, ভোটের সময় ছাড়া এই গ্রামে রাজনীতির কোনো পদার্থ ঘটে না। মেদিনীপুর বিরাট জেলা, এই শতাব্দীর বিভিন্ন সময়ে মেদিনীপুরের অনেক অংশে নানান রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে, আবার কোথাও তার চিহ্নমাত্রও পড়েনি। যেমন এই নিরাপদে। কিন্তু রাজনীতি থেকে দূরে আছে বলেই নিরাপদ গ্রাম মোটেই নিরাপদ নয়। এটা ভুল ধারণা।

কখনো সখনো রিপোর্টাররা এসে ওদের সরাসরি জিজ্ঞেস করে, পরিবারে কতজন লোক, কে কে কাজ করে, কোনো কৃষিঋণ পায় কি না, সরাসরি দিন মজুরির রেট আট টাকা দশ পয়সা ঠিকঠাক দেয় কিনা মালিকরা, বন্যায় ওদের বাড়িঘর পড়ে গেছে কিনা, কী কী সরকারি সাহায্য পেয়েছে, ইত্যাদি। এতেই ফুটে ওঠে পল্লীচিত্র।

ওসব অনেক খবরই আমি চন্দ্রনাথের কাছ থেকে আগে জেনে নিয়েছি। দামুদের মতন লোকদের পরিবারে দুটো একটা বুড়োবুড়ী, বৌ আর দুটো তিনটে ছানা-পোনা থাকবেই। পরিবারের অন্য কেউ রোজগেরে থাকলে কিংবা সারা বছর স্বাধীন ভাবে উপার্জনের সুযোগ থাকলে কেউ সহজে বছর-বাঁধা মুনিষ হতে চায় না। বছর-বাঁধা মুনিষের পরিবার এ দেশের দারিদ্র্য সীমার নিম্নতম জায়গায় রয়েছে।

কিছুদিন আগেই এক পত্রিকায় পড়েছি, এক সমীক্ষক হিসেব দেখিয়ে বলেছেন, এ দেশে একজন মানুষের দু বেলা শুধু নুন ভাত, হ্যাঁ, শুধু নুন ভাত আর কিছু না, তাই খেতেই সারা বছর খরচ পড়ে ছশো তিরিশ টাকা। দামু নিজে দুবেলা খেতে পায় আর ওর সারা বছরের মোট উপার্জন ন' শো টাকা। চন্দ্রনাথকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তা হলে দামুর পরিবারের তিন চারজন লোক সারা বছর কী খেয়ে থাকে? বেঁচেবর্তে তো আছে ঠিকই, ওরা চালায় কী করে?

চন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে খুব চমৎকার উত্তর দিয়েছিল।

—ম্যাজিক!

পেছন ফিরে দেখলাম, মাঠের শেষ প্রান্তে গোরু দুটোর সঙ্গে দামু খুব জোরে দৌড়োচ্ছে। কী সাবলীল দৌড়।

দামুর মতন একজন মানুষের সঙ্গে আমি কোনোক্রমেই বন্ধুত্ব করতে পারব না, এই ভেবে আমার সামান্য মন খারাপ লাগল।

হয়তো ওর ব্যক্তিগত প্রশ্ন না করে চাষের অবস্থা, গোরুর স্বাস্থ্য এই সব বিষয়ে সরাসরি কিছু জিজ্ঞেস করলে ও সহজ ভাবে কথা বলতে পারত। আকাশ মাটি রোদ বৃষ্টি ধান হাল-গোরু এই সব এলিমেন্টাল ব্যাপার নিয়েই ওর জগৎ।

আরও একটা ব্যাপার, সবসুদ্ধ বোধহয় একশো-দেড়শো শব্দ দিয়ে ও ওর জীবনের সব কথাবার্তা চালিয়ে দেয়। এত কম ভোকাবুলারি দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে আমরা ভুলেই গেছি।

মামুদপুরে শুধু অন্য দোকান নয়, একটি চায়ের দোকানও আছে। প্রতি মঙ্গলবার এখানে হাট বসে। আজ মঙ্গলবার নয়, কয়েকটা চালাঘর ফাঁকা ফাঁকা দাঁড়িয়ে আছে।

একপাশে কিছু মানুষের ভিড় দেখে উঁকি মারলুম। সেখানে মাংস বিক্রি হচ্ছে। সাইজ দেখেই বুঝতে পারলুম কিসের মাংস। বোধহয় আজ কোনো পরব আছে। পরব ছাড়া মাংসের ক্রেতা পাওয়া নিশ্চয়ই দুর্ঘট ব্যাপার।

কয়েকজন লোক কিছুটা অস্বস্তি ও কিছুটা আপত্তির চোখে আমার দিকে তাকাল।

আমি ক্রেতা নই, এবং আমার গায়ে নিশ্চয়ই হিন্দু হিন্দু গন্ধ আছে। সুতরাং গোরুর মাংস বিক্রির কেন্দ্রে আমার উপস্থিতির কোনো অধিকার নেই।

হঠাৎ আমার খুব রাগ হয়ে গেল।

কতকগুলো বদমাস বুড়ো মিলে চেষ্টা করছে এ দেশে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করার। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার একটি মূল কারণ যে গোরুর মাংস খাওয়া বা না-খাওয়া, তাতে কোনো সন্দেহ আছে কি? হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ ঘোচাবার

একটি উপায় হিসেবে স্বাধীনতার পর থেকেই উচিত ছিল সরকারি কো-অপারেটিভ দোকান মারফত গোরু ও শুয়োরের মাংস বিক্রি করা এবং সকলকে ঐ সব মাংস খেতে উৎসাহ দেওয়া। ঐ দুটিই এখন পর্যন্ত সস্তা প্রোটিন। এক রকম খাদ্য, রুচি এবং একরকম পোশাক না হলে কখনো একটা জাতি গড়ে ওঠে?

মুসলমানরা শুয়োর খায় না, কিন্তু অন্য জাতের লোক শুয়োর মেরে খেলে তারা ধর্মের জিগির তোলে না। মুসলমানরা অত্যন্ত বোকা, তাই তারা শুয়োরের মাংসের মতন এমন একটা চমৎকার জিনিসেব স্বাদ পেল না। তা তারা শুয়োরের মাংসকে অপবিত্র মনে করে যদি না খেতে চায় তো না খাক। সব হিন্দুদেরই যে গোরুর মাংস খেতে হবে তারও কোনো মানে নেই। কিন্তু খাদ্য হিসেবে পাঁঠা, মুরগি এবং ইলিশ মাছের মতন গোরু ও শুয়োরের মাংসও যে নিষ্পাপ খাদ্য, এই কথাটা দুই সম্প্রদায়ের লোক যতদিন না আন্তরিক ভাবে মেনে নেবে, ততদিন এই উপ-মহাদেশের কোনো মুক্তি নেই। চীনেরা দু বেলা পেট ভরে শুয়োবের মাংস খায় বলে তারা এত বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী। অথচ বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তানে যেসব চীনে রেস্তোরাঁ আছে, সেসব রেস্তোরাঁয় কোনো রকম শূকর-মাংস থাকে না। এমন কি বোম্বাইতেও। বোম্বাইতে এক পরিচিত চীনে হোটেলে গিয়ে আমি পর্ক চপ অর্ডার দিয়েছিলুম। তখন সেখানকার চীনে স্টুয়ার্ড আমার কানে কানে বাংলায় (ওরা প্রায় সবাই কলকাতা থেকে যায়), বলেছিল, চুপ, চুপ, ও কথা উচ্চারণ করবেন না, আমরা আজকাল আর পর্ক-হ্যাম কিছু রাখি না। কেন? এখানে আরব শেখেরা খেতে আসে।

হাস্যকর ব্যাপার।

আমার মতে, এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কয়েকটি খাবারের মধ্যে দুটি হচ্ছে শূকর-মাংসের পাটিসাপটা পিঠে, অর্থাৎ সসেজ এবং হাড়হীন, নরম, ঝলসানো গো-মাংস অর্থাৎ বীফ স্টেক।

আরও একটা কথা মনে পড়ল। পৃথিবীর যে-কটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে সব দেশে সবাই গোরু ও শুয়োরের মাংস দুটোই খায়। সুতরাং একটা শ্লোগান তোলা যায় অনায়াসে, "যদি সমাজতন্ত্র আনতে চাও, গোরু-শুয়োর দুটোই খাও!"

হিন্দুরা গোরুর মাংস খায় না বলে তারা অন্য জাতের লোকদের তো দূরের কথা, অন্য হিন্দুদেরও ভালোবাসতে জানে না। সর্ব জীবে দয়ার কথা বলে যে হিন্দুরা তাদের কোনো দয়া মায়া নেই মানুষের ওপর। ভারতের নিরামিষভোজী হিন্দুরা খাদ্যে ভেজাল দিয়ে ব্ল্যাক মার্কেট করে অসংখ্য মানুষ মারে। কতকগুলো নেতা নামধারী বদমাস বুড়ো খোকা এখনো যে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করার বায়না

ধরে লক্ষ মানুষের শুধু জীবিকা নয়, জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, এই ভেবে রাগে আমার শরীর জ্বলে যায়।

গোঁয়ারের মতন ভিড় ঠেলে ঢুকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কত করে?

দোকানদার কোনো উত্তর দেয় না।

আমি আবার গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করি, কত করে?

এবার সে যেন অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বলে, তিন ট্যাহা কিলো!

আমিও উৎফুল্ল হয়ে বলি, বাঃ, বেশ সস্তা তো। আমাদের কলকাতার নিউ মার্কেটে এখন সাড়ে সাত টাকা। দেখি, আমায় এক কিলো দিন তো। রাং-এর কাছ থেকে দেবেন।

—কিসে নেবেন কিসে, বাবু?

—শালপাতা টাতা নেই?

এদিকে যে শালপাতার প্রচলন নেই, তা আমার খেয়াল ছিল না। মালদার দিকে দেখেছি, পদ্মপাতায় দোকানে জিনিস মুড়ে দেয়। এমন কি হোটেলেও থালার বদলে ভাত দেয় পদ্মপাতায়।

ক্রেতাদের মধ্য থেকেই একজন উৎসাহ করে তার নিজের কলাপাতার খানিকটা অংশ আমায় দিল।

যেন দারুণ একটা প্রগতিশীল কাজ করে ফেলেছি, এরকম একটা গর্বিত মুখে আমি মাংস কিনে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলাম বাইরে। আমি তো আমার নিজের মুখ দেখতে পাইনি তবে ঐ রকমই মুখের ভাব হয়েছিল নিশ্চয়ই। এটা এড়ানো যায় না।

চায়ের দোকানটিতে টেবিল নেই। দুটি বেঞ্চি পাতা।

জনা পাঁচ ছয় লোক সেখানে রীতি-মতন চ্যাচামেচি তর্কে মত্ত ছিল, আমাকে ঢুকতে দেখেই তারা চুপ করে গেল। এরকম হবেই জানা কথা।

একটি বেঞ্চের এক পাশে বসে আমি জনগণের উদ্দেশ্যে বললাম, নিরাপদ গ্রামের যে চন্দ্রনাথ মণ্ডল অনেকে যাকে বলে চাঁদু মাস্টার, আগে এখানকার ইস্কুলে পড়াত, এখন কলকাতায় থাকেন আমি তার বন্ধু। এমনি হাঁটতে হাঁটতে আপনাদের গ্রামটা দেখতে এলাম।

একজন বলল, আমি চন্দ্রনাথ স্যারের কাছে পড়েছি।

আমি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। যাক, তাহলে তো পরিচয় পাকা হয়েই গেল।

যুবকটির বয়স বোধহয় চন্দ্রনাথের চেয়ে বেশিই হবে। সে নিজের থেকেই আমায় জিজ্ঞেস করল, চন্দ্রনাথ স্যার গেরামে এসেছেন? উনি আমার কাছ থেকে

পাঁচটা ট্যাকা পাবেন। দেখা করতে যাব একদিন!

দোকানদারের দিকে ফিরে বললাম, এক কাপ চা!

যদিও মফঃস্বলের কোনো দোকানেই কাপ থাকে না, ছোট ছোট গেলাসে চা দেয়। তবু এক গেলাস চা দিন, এমন বলা আমাদের অভ্যেস হয়নি। এত ছোট ছোট গেলাস এরা কোথা থেকে পায়? শুধু মফঃস্বলের চায়ের দোকানগুলোর জন্যই তৈরি হয় এ রকম গেলাস?

দোকানদাবটির বয়স কুড়ি-বাইশের বেশি নয়। চালাঘরটি নতুন, বোধহয় বেকার যুবকের স্বাধীন ব্যবসার প্রয়াস। বেশ হাসিখুশি মুখ। সে আমায় জিজ্ঞেস করল, আপনি কলকাতায় থাকেন?

আমি মাথা নাড়লুম। এবং পরবর্তী প্রশ্নটি অনুমান করে আগেই উত্তর দিলুম, এখানে দিন সাতেক হলো এসেছি।

যুবকটি হেসে বলল, এখানে বেড়াতে এসেছেন! এখানে কী দেখবার আছে, কিচ্ছু নেই।

একথাও অনেকেই বলে। নিউইয়র্কে অ্যালেন গীনসবার্গ আমাকে বলেছিল, তুমি কি এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, স্ট্যাচু অব লিবার্টি এইসব এলেবেলে জিনিস দেখে সময় নষ্ট করবে নাকি? আমি উত্তর দিয়েছিলাম, মাথা খারাপ! স্রেফ আড্ডা দেব আর রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াব!

বেঞ্চে বসা একজন আমায় জিজ্ঞেস করল আপনি তো কলকাতার লোক, বলুন তো, দিল্লির এই নতুন সরকার টিকবে? চায়ের দোকান মানেই রাজনীতি। তাও কোনো রাজনৈতিক তত্ত্ব বা রাজনৈতিক কার্যপ্রণালী নিয়ে আলোচনা নয়, সারা দেশের মানুষ এখন স্রেফ রাজনৈতিক দলাদলির ব্যাপার নিয়ে মেতে আছে। চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে আমি বললাম, ওসব আমি কিছুই বুঝি না। আচ্ছা বলতে পারেন, এখানে খবরের কাগজ কোথায় পাওয়া যায়? শুনেছি এ গ্রামে একজনের বাড়িতে খবরের কাগজ আসে।

ওরা পরস্পরের মুখের দিকে চাইল। আশ্চর্যের ব্যাপার, ওরা কেউ খবরের কাগজের খবর রাখে না। তবে কি আমারই খবর ভুল? কিন্তু চন্দ্রনাথ যে বলেছিল, মামুদপুরে একজনের কাছে রোজ আসে, কী যেন নামও বলেছিল লোকটির।

চায়ের দোকানের মালিক বলল, থাকলে থাকতে পারে রহমান ভাইয়ের কাছে। তখন আরেকজন সমর্থন করে বলল, তা হতে পারে, রহমানভাই অনেক বইটই কাগজ-পত্তর পড়েন দেখেছি।

আসলে আমার যে খবরের কাগজ পড়ার জন্য খুব একটা আগ্রহ আছে তা নয়। এটা একটা কথাবার্তা চালাবার উপলক্ষ মাত্র। এই গ্রামে কেন এসেছি, তার

একটা ছুতো তো থাকা চাই। আমার কাগজ পড়ার তীব্র নেশা নেই। বাইরে গেলে অনেক সময় পনেরো কুড়ি দিন ইচ্ছে করেই সংবাদপত্র ছুঁয়ে দেখি না। একবার বেতলার জঙ্গলের মধ্যে শুনেছিলাম, একজন লোক ঢোল পিটিয়ে পিটিয়ে বলে যাচ্ছে, লালবাহাদুর শাস্ত্রী মর গ্যায়া। ভারতকা প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুরজী আউর নেহি হ্যায়...ইত্যাদি।

একজন বলল, কিন্তু রহমানভাই কি এখন বাড়ি থাকবেন? উনি তো আটটার পর ফেরেন।

অন্য একজন বলল, আজ শবে-বরাত, আজ বাড়িতেই থাকবেন।

পরবটা তা হলে শবে-বরাত। এদিন খোদার ফেরেস্তা এসে ঘুমের মধ্যে কপালে ভাগ্যলিপি লিখে দিয়ে যান। এদিন সারাদিন শুদ্ধভাবে থাকতে হয়, শুদ্ধ চিন্তা করতে হয়। গরীব-দুঃখী এবং অতিথিদেরও খাওয়াবার নিয়ম।

আমার হাতের মাংসের প্যাকেটটার দিকে ওরা প্রথম থেকেই আড়চোখে তাকাচ্ছে। একজন প্রসঙ্গটা তুলেই ফেলল।

—আপনি ন্যাড়াপদ গ্রামে উঠেছেন। ও গ্রামে তো কেউ বড় গোস্ত খায় না!

—আমি নিজে রান্না করে খাব।

—আপনাকে একটা কথা বলব দাদা? জানাজানি হলে মানে, ও গ্রামের মাটিতে আপনি বড় গোস্ত নিয়ে গেলে একটা কিছু ঝঞ্ঝাট হতে পারে।

—আপনাদের এদিকে ঝঞ্ঝাট হয়েছে কোনোদিন?

যুবকটি জিভ কেটে বলল, নাঃ! এ একটা জিনিস, মিদনাপুরে কখনো রায়ট হয় না। আমাদের এখানে খুব হেপিনেস আছে।

—জমি নিয়ে ঝগড়া টগড়া হয় না?

—তা হয়। কিন্তু সে হলো পার্সোনাল টু পার্সোনাল। এই তো এখন বর্গাদারের নাম রেজিস্ট্রিরি করার জন্য ডিফারেন্ট জায়গায় গোলমাল হচ্ছে, কিন্তু সেও পার্সোনাল টু পার্সোনাল—

আমাদের দেশে কথাবার্তার মধ্যে অনাবশ্যক ইংরেজি বলে দুই শ্রেণীর লোক, যারা লেখাপড়া খুব কম জানে এবং যারা মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, কোনো চিন্তা নেই, আমি কোনো ঝঞ্ঝাট পাকাব না। রহমান সাহেবের সঙ্গে একটু দেখা করে খবরের কাগজ আছে কিনা একটু দেখে যেতে চাই। ওঁর বাড়িটা কোন দিকে?

একজন বলল, চলেন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

আমি বললাম, না, না, সঙ্গে যেতে হবে না। রাস্তাটা বলে দিন।

—খুব কাছেই, এই ডানদিক দিয়ে সোজা চলে যান। খুব কাছেই, প্রথম যে

বড় পুষ্করণীটা দেখবেন, তার ধারেই পাকা বাড়ি। রাস্তায় যারে জিজ্ঞাসা করবেন সেই দেখিয়ে দেবে।। আতিকুর রহমান নাম বলবেন।

—আচ্ছা, চলি!

চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। পাঞ্জাবির পকেট থেকে টর্চটা বার করে নিলাম। মামুদপুরের রাস্তা নিরাপদ গ্রামের চেয়ে বেশি মজবুত। পরে জেনেছিলাম, এ গ্রামে একজনের মোটর সাইকেল আছে নিরাপদে কারুর নেই।

হঠাৎ দুম করে একটা বোমা ফাটার শব্দ হলো।

অন্য কেউ হলে নিশ্চয়ই খুব চমকে যেত। বিশেষত অচেনা জায়গায়। কিন্তু আমি শবে-বরাতের রাত কাটিয়েছি বসিরহাটের কাছাকাছি একটি গ্রামে। এই উৎসব উপলক্ষে অনেকে বাজি ফাটায়।

ঠিকই ধরেছি, এর পর কিছু দূরে দেখতে পেলাম কয়েকটি ফুলঝুরির আলো।

ঐসব বাজি ফাটানো ও পোড়ানো হচ্ছে আতিকুর রহমানের বাড়িতেই। পুকুরের ধারে চমৎকার সাদা রঙের ছিমছাম একতলা ইঁটের বাড়ি। সামনে খানিকটা বেড়া দেওয়া বাগান। আমি একটি বাচ্চা ছেলেকে আতিকুর রহমানের কথা জিজ্ঞেস করলুম, সে দৌড়ে চলে গেল ভেতরে এবং আতিকুর রহমান বেরিয়ে এলেন অত্যন্ত বিস্মিত মুখে।

বয়েস হবে পঞ্চাশের কাছকাছি, মানুষটি বেশ শৌখীন মনে হয়, কারণ এঁর লুঙ্গি ও গেঞ্জি দুটিই সিল্কের মনে হলো। দাড়ি কামানো গাল, মাথায় অল্প টাক।

আমি এক হাত তুলে বললুম, সেলাম আলেকুম, আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলুম।

রহমান সাহেবের চোখের দৃষ্টি রীতিমতন সন্দিগ্ধ। বার বার তিনি আমার আপাদমস্তক দেখছেন। আমার পাজামা পাঞ্জাবি সত্ত্বেও তিনি বললেন, নমস্কার, কী ব্যাপার বলুন তো!

রহমান সাহেবের বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হবার যথেষ্ট কারণ আছে। হঠাৎ সন্ধেবেলা এক অচেনা হিন্দু ছোকরা এসে ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে চাইবে কেন?

গলা চড়িয়ে তিনি উঠোনের একটি ছোট ছেলের উদ্দেশে বকুনি দিয়ে বলে উঠলেন, এই গিয়াস্! ওদিক না, ওদিকে যাবি না, এদিকে সরে আয়!

উঠোনের এক কোণে একটি মোটর সাইকেল দাঁড় করানো। সেই ছেলেটি তার কাছে গিয়ে রংমশাল জ্বালছিল।

আমি বললাম, আমি নিরাপদ গ্রামে চন্দ্রনাথ মণ্ডলের...ইত্যাদি। আপনার বাড়িতে খবরের কাগজ আসে শুনলাম, তাই এসেছি, যদি আজকের কাগজটা

একটু পড়তে দেন।

একটা বিশ্বাসযোগ্য কারণ পেয়ে তিনি আশ্বস্ত হয়ে বললেন, ও হ্যাঁ। কাগজ আছে। আসুন, আসুন ভেতরে আসুন!

একটা চৌকির ওপর বিছানা পাতা, একটা লম্বা বেঞ্চ, একটা ছোট টেবল, দেয়ালে একটি বুক শেলফ। আমি বেঞ্চটিতে বসলাম, রহমান সাহেব আমার দিকে কাগজটা এগিয়ে দিলেন। দেখলাম, ডাক সংস্করণ অর্থাৎ তারিখটা আজকের হলেও খবর সবই আগের দিনের।

—আপনি এখানে কটার সময় কাগজ পান?

রহমান সাহেব বললেন, এ গাঁয়ে তো কাগজ আসে না। আমার একটা দোকান আছে কামারপুকুরে। কাগজ আসে সেখানে। এই দুপুর বারোটা নাগাদ।

—কিসের দোকান?

—একটা দোকান ইলেকট্রিক গুডসের আর একটা সারের এজেন্সিও আছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে টেবিলের ওপর হ্যারিকেনটার দিকে তাকালাম। যার বিদ্যুতের সরঞ্জামের দোকান আছে, তার নিজের বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই কেন?

আমার দৃষ্টির অর্থ বুঝেই বোধহয় রহমান সাহেব বললেন, অন্ধকার হয়ে গেছে, নইলে আপনাকে দেখাতাম, আমাদের এদিকে ইলেকট্রিকের পোস্টও আছে তারও আছে। দু বছর ধরে। কিন্তু কারেন্ট আসেনি। কত লেখালেখি করছি...গ্রামের মেয়েছেলেরা এখন ঐ তারের ওপব কাপড় মেলে দেয়, অনেক জায়গায় ঘরের খুঁটি বাঁধবার জন্য চাষাভুষোরা ঐ তার কেটেও নিয়েছে।

হঠাৎ আমার মনে পড়ল, একটি দিনের কথা। তিন-চার বছর আগে এক গ্রীষ্মের রাতে পাঞ্জাবে ট্রেনে করে যাচ্ছিলাম। সে রাতটি মনে আছে দুটি কারণে, হঠাৎ আঁধি উঠেছিল, আর সেদিনই বুঝে ছিলাম আঁধি কী সাঙ্ঘাতিক জিনিস, চলন্ত মেল ট্রেনও থামিয়ে দিতে পারে। মাঠের মধ্যে থেমে রইল ট্রেন, আর ঝড়ের ধাক্কায় কাঁপতে লাগল। আর একটি কারণ এই যে, সেই রাতেই ট্রেনের কামরার মধ্যে পাশের এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে তাঁর খবরের কাগজটি পডতে নিয়েছিলাম। স্থানীয় একটি ইংরেজি সংবাদপত্র। তার প্রথম পাতার বড় বড় অক্ষরে প্রথম সংবাদ, পাঞ্জাবের শতকরা একশোটি গ্রামেই আজ বিদ্যুৎ এসে গেল।

আমার সেদিন হঠাৎ খুব গর্ববোধ হয়েছিল। পাঞ্জাবের শতকরা একশোটি গ্রামে ইস্কুলও আছে। পাঞ্জাব কি আমাদের দেশেব মধ্যে, না বিলেতে?

মামুদপুরে তবু বিদ্যুতের জন্য খুঁটি এবং তার এসেছে। নিরাপদ গ্রামে সেগুলোও পৌঁছোয়নি। নিরাপদ গ্রামের বেচারি মেয়েরা সরকারি তারে কাপড় মেলার সুযোগও পেল না।

আমি কলকাতায় থাকি কিনা এবং কেন এখানে এসেছি সে সব খবর রহমান সাহেবকে দিতে হলো। তিনি বেশ খুশি হয়ে উঠলেন। একজন কলকাতার লোক তাঁর বাড়িতে খবরের কাগজ পড়তে এসেছে, এতে তিনি নিজেকে বেশ কিছুটা খ্যাতিমান মনে করলেন।

—এদিকে তো কাগজ-টাগজ বিশেষ কেউই পড়ে না। আমি রাখি, আমার আবার পলিটিকসে ঝোঁক আছে কি-না, সামনের বার পঞ্চায়েতের ইলেকশনে দাঁড়াব!

রহমান সাহেবের বাবা বেচে আছেন, তিনি পুরোনো কংগ্রেসী। রহমান সাহেবের বড় ভাই একটি প্রধান বামপন্থী দলের সমর্থক, তিনি নিজে আর একটি বামপন্থী দলের এবং তাঁর এক ছোট ভাই বরকত গনি খান চৌধুরীর চেলা, অর্থাৎ ইন্দিরা-সঞ্জয় পন্থী। তাঁর এক কাকাও আগে রাজনীতি করতেন, এখন নাকি ছেড়ে দিয়েছেন অর্থাৎ সন্দেহ হলো তিনি মুসলিম লীগের। বেশ সুবিধাজনক ব্যবস্থা। দেয়ালের র‍্যাকে পাঁচ মিশেলী ধরনের বই, এ পরিবারের কার কোনটা পছন্দ বলা শক্ত।

—আপনি চা খাবেন?

—আজ্ঞে না, আমি এই একটু আগে চা খেয়েছি, আপনাদের গাঁয়েই হাটতলায় যে দোকানটা আছে।

—ঐ চা, ধুর! আরে খান মশাই, আর এক কাপ খান। সঙ্গে আর কিছু? মানে, ইয়ে, শবে-বরাতের দিনে বাড়িতে অতিথি এলে তাকে আমরা...

আমি চুপ করে রইলাম। চিন্তা করে ঠিক গুছিয়ে উত্তর দিতে হবে। চিন্তা করতে গেলে সিগারেট লাগে।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করতেই রহমান সাহেব বললেন, সিগারেট? আমার আছে, নেন নেন। আমার থেকে একটা নেন। আপনি আমাদের বাড়িতে মেহমান, মানে অতিথি এসেছেন আজ।

রবাহূত হলেও কি তাকে অতিথি বলা যায়? আমি তো প্রায় উড়ে এসে জুড়ে বসেছি।

সিগারেট ধরিয়ে জুৎসই টান মেরে বললাম, চাল গুঁড়িয়ে খুব মিহি করে ছেঁকে সেই জিনিস দিয়ে এক রকম রুটি হয় না? আপনাদের এদিকে শবে-বরাতের দিন সে রকম রুটি হয়? তাহলে সেই রুটি আর বড় গোস্ত পেলে খেতে পারি।

রহমান একটু চমকে উঠলেন শুধু। তারপর বললেন, আপনি খাবেন? নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, খুব আনন্দের কথা, হ্যাঁ চাল গুড়োর রুটি আছে, আর মুরগি জবাই করা হয়েছে। বড় গোস্ত নেই, আমার বাবা খান না, তাই বাড়িতে বিশেষ আনা হয় না।

—আপনি খান তো, আপনাদের বাড়িতে রান্না হতে কোনো আপত্তি নেই তো?

—তা নেই! কেন, মুরগি আপনি খান না?

আমি এবার আমার হাতের কলাপাতার প্যাকেট রহমান সাহেবের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, এতে খানিকটা বড় গোস্ত আছে, যদি রান্না করার ব্যবস্থা করেন একটু। মানে আপনাকে বুঝিয়ে বলছি, এখানে বিক্রি হচ্ছে দেখে কিনলাম, পরে একজন বলল নিরাপদ গ্রামে ও জিনিস নিয়ে গেলে ঝঞ্ঝাট হতে পারে।

রহমান সাহেব এমন চোখ গোল গোল করে আমার দিকে তাকালেন যেন এমন অদ্ভুত কথা কিংবা আমার মতন একটা বিচিত্র জীব উনি আগে কখনো দেখেননি। উনি নিশ্চয়ই আমায় পাগল-টাগল ভাবছেন।

হঠাৎ প্রগতিশীল সাজতে গিয়ে আমি খুব প্যাঁচে পড়ে গেছি। অন্যের বাড়িতে বেড়াতে এসে ঝোঁকের মাথায় হাট থেকে এক কিলো গো-মাংস কিনে ফেলার কোনো মানে হয়।

আমি লজ্জিত মুখে মিনতিমাখা স্বরে রহমান সাহেবকে বললাম, যদি কোনো অসুবিধে থাকে, তাহলে দরকার নেই, মানে, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, সত্যিই যে বাড়িতে আমি উঠেছি, সেখানে এ মাংস...আবার মিথ্যে কথাও বলা উচিত নয়...আপনার এখানে অসুবিধে থাকলে দরকার নেই...দাম তো বেশি নয়।

আমার হাত থেকে কলাপাতায় মোড়া জিনিসটা নিয়ে রহমান সাহেব খুলে দেখলেন। তারপর বললেন, দাঁড়ান, ব্যবস্থা করে আসছি।

রহমান সাহেব বাড়ির মধ্যে চলে গেলে। ফিরতে বেশ দেরি হলো। বাড়ির লোককে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে নিশ্চয়ই তাঁকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। আমি ঘন ঘন হাঁটু দোলাতে লাগলুম। খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে পরিস্থিতি, আমি ঠিক সেই রকম একটা অবস্থায় পড়ে গেছি। বাড়ির মধ্যে বোধহয় খুব হাসাহাসি চলছে আমাকে নিয়ে।

ফিরে এসে রহমান সাহেব বললেন, চা আসছে। হুড়োতাড়া নেই তো আপনার? আমি সঙ্গে লোক দিয়ে আপনাকে মাঠ পার করে দেবার ব্যবস্থা করে দেব!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি বেশ গাবলু গুবলু চেহারার বাচ্চা মেয়ে দুকাপ চা নিয়ে এলো। এক চুমুক দিয়েই বুঝলাম, এটা নিছক চায়ের ছদ্মবেশ। আসলে প্রায় পুরো এক কাপ দুধে খানিকটা চায়ের লিকার মেশানো। খাঁটি গোরুর দুধের গন্ধ। খাঁটি দুধ আমার আবার সহ্য হলে হয়।

বহমান সাহেব বললেন, আপনাদেব এক সাধু তো অনশন কবেছিলেন গোহত্যা বন্ধ কবাব জন্য।

বাজনীতিব ঘ্রাণে শঙ্কিত হযে উঠে আমি বলি, আপনাদেব মানে কাদেব বলছেন? তিনি মোটেই আমাদেব নন। তাছাড়া আমি কোনো দলে নেই।

—গোরু কাটা বন্ধ হলে হিন্দু চাষীদেবই ক্ষেতি হবে বেশি।

—কেন বলুন তো?

—ব্যাপাবটা আপনাকে বুঝোযে বলি। সাধাবণ গবীব চাষীব কাছে এক জোড়া হেলে বলদ যেমন সম্পদ বটে তেমনি ঝামেলাও বটে। যে-কোনো চাষীব কাছে যেচে দেখুন।

—একটু বুঝিযে বলুন। হাল বলদেব কী ঝামেলা?

—হাল বলদ না হলে চাষীকে বাবো টাকা ডেলি বেটে ভাড়া কবতে হয। আবাব এক জোড়া বলদ কেনাব খবচা পড়ে ধরুন দেড় হাজাব টাকা। তেমন তেমন ভালো বলদ হলে দু আড়াই হাজাব টাকাও দাম ওঠে। হিসেব কবলে দ্যাখবেন, সাবা বছবে হাল চাষেব জন্য একশো দিনেব বেশি ঐ বলদ জোড়া কাজে লাগে না। তাহলে বাকি কতদিন থাকল? দুইশো পযষট্টি দিন, ঐ অতগুলোন দিন, বলদ জোড়াকে এমনি এমনি বসে খাওযাতে হয। তাব খর্চা আছে।

—কিসেব খবচা। গ্রামেব চাষীকে ঘাস কিনতে হয?

—ঘাস খেযে গোরু বাচে? এ যে একেবাবে বিনোদানন্দ ঝাযেব মতন কথা বললেন।

—তিনি কে?

—কে জানে, নামটা এমনিই মনে পড়ল।

আমি মুচকি হাসলাম। বহমান সাহেবকে এব আগে কোনো প্রকাব বসিকতা কবাব চেষ্টা কবতেও দেখিনি।

—গোরুকে খাওযানোব খবচ আছে তাহলে?

—নিশ্চয। আপনি চাবদিক ঘুবে ঘুবে দেখে আসুন তো, কোথায ঘাস জমি আছে? সবই তো চাষেব জমি। মিদনাপুবেব মাটিতে ঠিক মতন চাষ দিতে পাবলে সোনা ফলে। হ্যা, যা বলছিলাম, প্রত্যেকদিন এক জোড়া বলদেব জন্য লাগে দশ গণ্ডা খড, এখন কাহন পঞ্চাশ ট্যাকা, তাহলে হিসেব ধরুন—

এ হিসেব কষা আমাব ক্ষমতাব বাইবে। খডেব ওজনে কত গণ্ডায যে এক কাহন হয, তাই-ই তো আমি জানি না। আমি আবাব অঙ্কে ববাববই কাচা। এসব হিসেব কি শুভঙ্কবেব আর্যায থাকে?

গম্ভীরভাবে বললুম, হ্যাঁ, ধরেছি হিসেব।

—তারপর লাগে সরষের খোল, এখন দু ট্যাকা দশ পয়সা কেজি, তারপর ভূষি কাঁজি, কুঁড়চি—

কাঁজি, কুঁড়চি কী, বুঝলাম না, তবু বললাম, বুঝেছি, গোরুকে খাওয়াবার বেশ খরচ আছে।

—বুঝলেন তো? তবে?

—কিন্তু এর সঙ্গে হিন্দু চাষী আর গোহত্যা বন্ধের সম্পর্কটা ঠিক—

—আরও বুঝোতে হবে? হাল বলদের জন্য চাষীর এইসব খর্চা আছে। তারপর চোদ্দ-পনেরো বছরের বেশি সে বলদ দিয়ে আর হাল টানা যায় না। বলদ বুড়ো হয়ে যায়। আবার নতুন বলদ খরিদ করতে হবে। আবার ট্যাকা চাই। সেই সময় চাষী ঐ পুরোনো বলদ জোড়া বেচে দেয়। ঐ বুড়ো বলদ আর কে কিনবে কন, কশাইরা কেনে, চাষীও তিন-চারশো টাকা যা পায়। তাতেই সেই এক জোড়া বলদ বেচে দেয়। তিন-চারশো টাকা চাষীর কাছে কম?

আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে তিন-চারশো টাকা শুধু চাষীর কাছে কেন, আমার কাছেও কম নয়। দামু সারা বছরে মাইনে পায় ন' শো টাকা। ভারতে একজন মানুষের সারা বছর শুধু দুবেলা নুন ভাত খাবার খরচ ছ'শো তিরিশ টাকা।

রহমান সাহেব আবার বললেন, এখন যদি গোহত্যা বন্ধ করেন, মাংস খেতে না দেন, তাহলে হিন্দু চাষীর ঐ বুড়ো বলদ কশাইরা কিনবে না। আর কে কিনবে? চাষীর তিন-চারশো টাকা মার যাবে তো বটেই, তাছাড়া ঐ অকম্মা বুড়ো বলদ জোড়াকে বসিয়ে বসিয়ে খাইয়ে তাকে ফতুর হতে হবে!

—ও। তার মানে কি তবে এই যে এদেশে যে বড় গোস্ত পাওয়া যায়, তা শুধু বুড়ো বলদের।

—তা এক রকম ধরতে পারেন বটে। গাভীন গোরুকে মুসলমানেও মারে না। আর বাছুর মারা আইনের নিষেধ। জোয়ান হেলে বলদের যা দাম, তার মাংস বেচলে সে দাম ওঠে না। তবে বুড়ো অকম্মা বলদ ছাড়া আর কিসের মাংস পাওয়া যাবে?

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। গোরু বড় সুন্দর প্রাণী। তাকে কেটে মাংস খাওয়ার এতখানি আলোচনা আমারও পছন্দ হয় না। রেস্তোরাঁয় গিয়ে অর্ডার দেব, গরম গরম বীফ স্টেক আসবে, খেতে বেশ ভালোই লাগে, কিন্তু চোখের সামনে কাটতে দেখা কিংবা ঐ বিষয়ে এত কথা হলে পরে খাওয়ার রুচি থাকে না। সতেরো বছর বয়েসে মধুপুরে আমরা কয়েক বন্ধু বেড়াতে গিয়েছিলাম। হাট

থেকে মুরগি কিনে এনে রাখা হয়েছে, পরদিন সকালে কাটা হবে, সন্ধেবেলা সেই মুরগি হঠাৎ দড়ি ছিঁড়ে পালাল। তারপর আমরা চারজন বন্ধু এবং বাড়ির মালি সারা মাঠময় তাকে ধরার জন্য কী ছুটোছুটি! মুরগিটা আমাদের একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাকে ধরা হলো ঠিকই কিন্তু তার পরাজিত, করুণ চোখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকটা ধক করে উঠেছিল। আমি একবার মাত্র ক্ষীণ কণ্ঠে বন্ধুদের বলেছিলাম, ওটাকে ছেড়ে দিলে হয় না! কিন্তু মুরগিকে কেউ কখনো স্বাধীনভাবে উড়িয়ে দেয় না। সুতরাং আমার কথায় কেউ পাত্তাই দেয়নি। তবে পরদিন, কী একটা ছুতো দেখিয়ে আমি সেই মুরগির মাংস খাইনি! তারপর থেকে আবার খাই, আমার চোখের আড়ালে অন্য লোকেরা যে-সব মুরগি কাটে এবং রান্না করে।

পাখি হিসেবে মুরগিকেও দেখতে বেশ সুন্দর। ময়ূরের চেয়ে এমন কিছু খারাপ নয়। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, এই একটা পাখি যাকে দেখলে শুধু খাবার কথাই মনে পড়ে। মুরগির রূপ-বন্দনা কেউ করে না। স্বাদের বর্ণনা অনেকেই করেছে। গত শতকের বাংলা সাহিত্যে দেখেছি, মুরগির আর একটি নাম ছিল যবন পালিত পক্ষী। এখন মুরগির মাংস বাঙালি হিন্দুর ঘরে ঘরে। ডাক্তাররাও বলেন, রেড মীট বেশি খাবেন না, হোয়াইট মীট খান।

আর একজন লেখক খুব একটা ঠিক কথা বলেছিলেন (নীরদচন্দ্র চৌধুরী নাকি ?)। তিনি বলেছিলেন, সাহেবরা গোরুর মাংস খাওয়ায় কোনো রকম গ্লানি বোধ করে না, কারণ তাদের কাছে গোরু অন্য আর পাঁচটা প্রাণীর মতনই একটি। গাভী থেকে তারা দুধ পায়, আর যেহেতু বলদ দিয়ে তারা হাল চাষ করে না, তাই স্বাস্থ্যবান যুবক বলদ বা ষাঁড়ের মাংস তারা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। তাদের গোরুগুলোর গায়ের রং লালচে, ছোট ঘাড়, কুতকুতে চোখ খাড়া শিং দেখলে কোনো বুনো প্রাণী বলেই মনে হয়। যেমন আমাদের মোষ, এখনো আমরা মোষকে বুনো প্রাণী বলেই ভাবি, যে-জন্য মোষ বলি চলে অবাধে। নেপালে দেখেছি, সব হোটেলেই সস্তায় মোষের মাংস পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের গোরুর রং যেহেতু সাদা, গাঢ় কাজলটানা চোখ, মুখখানিতে শান্ত, লাবণ্য মাখা তাই গোরুর প্রতি আমাদের যেন স্নেহ-মমতার সম্পর্ক। সাহেবদের গোরু আর আমাদের গোরু অনেক আলাদা।

কিন্তু মানুষ প্রয়োজনের জন্য কত কী-ই তো করে। গরীব চাষী তার বুড়ো বলদ জোড়া কেন বেচে দেবে না তিন-চারশো টাকায় ? ঐ টাকা যে তার পরিবারের একজন মানুষের ছ-মাসের খোরাক। আর সত্যিই তো, কশাই ছাড়া, বুড়ো বলদ অন্য কে কিনবে ? প্রোটিনের অভাবে এদেশে শতকরা আশিভাগ লোকের স্বাস্থ্য খারাপ।

মনে পড়ে গুড আর্থ উপন্যাসে ওলান নামে সেই বউটির কথা। ক-দিন ধরে টানা উপবাস চলছে, পঙ্গপাল সব নষ্ট করে দিয়ে গেছে, ক্ষুধার্ত ছেলে-মেয়েদের কান্না আর সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সে নিজেই ছুরি হাতে নিয়ে কাটতে গেল তাদের অতি প্রিয় পোষা গোরুটিকে। ভারতীয় দর্শন বুঝি বলে তার ছেলেমেয়েদের ক্ষুধার জ্বালায় মরতে দিয়েও ওলানের উচিত ছিল ঐ গোরুটিকে বাঁচিয়ে রাখা? তাহলে এ দর্শন ভ্রান্ত এবং মূর্খ রচিত।

এক বৃদ্ধ এই সময় ঘরে ঢুকলেন। লুঙ্গির ওপর একটি অতি কুঁচকানো মুগার পাঞ্জাবি পরা, মনে হয় এই মাত্র সেটিকে কোনো পুরোনো সিন্দুক থেকে বার করে আনা হলো। দেখলেই বোঝা যায়, ইনি রহমান সাহেবের বাবা।

বয়স্ক ব্যক্তিদের দুপায়ের পাতা ছুঁয়ে কদমবুসি করাই প্রথা। আমি কস্মিনকালেও কারুকে প্রণাম করি না, এখানেও শুধু একটু আদিখ্যেতা দেখাবার জন্য কমদবুসি করার ভান করলুম বৃদ্ধ তার আগেই আমায় জড়িয়ে ধরে বললেন, আরে আরে, ভাই দাদা করো কী করো কী! তুমি কলকাতা থেকে আসতেছ? বসো বসো, তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইতে এলাম। কী নাম? কী করা হয়।

আত্মপরিচয় ব্যক্ত করলাম।

বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কলকাতায় কোথায় থাক?

আমি বললাম, বালিগঞ্জ!

কলকাতার যেখানেই বাড়ি হোক, বাইরের লোকের কাছে বালিগঞ্জ বলাই শ্রেয়। বিশেষত রেলেব কামরায় প্রবাসী বাঙালিদের কাছে বালিগঞ্জ নাম উচ্চারণ করে দেখেছি বেশি খাতির পাওয়া যায়।

বৃদ্ধ বললেন, হ্যাঁ, চিনি বালিগঞ্জ, আমি গেছি সেখানে। তুমি বালিগঞ্জের বলাই সরকারকে চেনো? সরকার বড় অফিসার, আগে আমাদের এই হরিশপুরেই থাকত, এখন বালিগঞ্জে বাড়ি কিনেছে—চেনো?

এখানে যদি কেউ বলে কেষ্টপুরের ঘনাই সামন্তকে চেনো, তেলের ঘানি আছে—তাহলে সবাই এক ডাকে চিনবে। কিন্তু বালিগঞ্জের বলাই সরকার যত বড় সরকারি অফিসারই হোক, তিনি আমার প্রতিবেশী হলেও যে তাঁকে আমার চেনা সম্ভব নাও হতে পারে, সেটা এখানে এরা বুঝবেন না। এবং এঁদের পক্ষে ধারণারও অতীত যে কলকাতায় শুধু বালিগঞ্জের জনসংখ্যাই এখানকার অন্তত পঞ্চাশটা গ্রামের সমান।

ঘাড় নেড়ে বললাম, হ্যাঁ চিনি।

—তারে আমার নাম বুইললেই চিনবে। তার বাপ ছিলেন আমার ন্যাংটা বেলার

বন্ধু, যে বার আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেসের প্রেসিডেন হলিন...

আলোচনা আর বেশি দূর গড়ালো না। বাইরে একটা কোলাহল শোনা গেল। তার মধ্যে স্ত্রীকণ্ঠও আছে। রহমান সাহেব এবং তাঁর পিতা বেরিয়ে গেলেন। জানলা দিয়ে আমি দেখলাম, একটি বছর পঁয়তিরিশের রমণী উঠোনে নেচে নেচে কী যেন বলছে। তবে ভাবভঙ্গিতে বোঝা যায় নাচ দেখানো তার উদ্দেশ্য নয়, ওটা ক্রোধের প্রকাশ। কিন্তু তার কথা একটাও বোধগম্য হলো না, তাকে ঘিরে কয়েকজন হাসছে, কয়েকজন বকুনি দিচ্ছে। তার পর সে দুম করে মাটিতে পড়ে গেল।

জানলা দিয়ে আর কিছু দেখা যায় না, বেশি কৌতহল প্রকাশ করা উচিত নয় বলে আমিও আর জানলার ধারে উঠে গেলাম না।

রহমান সাহেবের বাবা ঘরে ফিরে এসে বিরক্তির সঙ্গে বললেন, ঐ এক বেঁওয়া মেয়েছ্যালে।

রহমান সাহেব আর একটু পরিষ্কার করে বললেন, মাঝের পাড়ার ইরফান আলীর বউ, মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে। যখন তখন ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে আসে, ওর একটা ছেলে পুকুরে ডুবে মারা যাওয়ার পর থেকেই...ইরফানকে যত বলি ঘরে বেন্ধে রাখ...এ বাড়িতে এসে বলে, ও নাকি আমারে শাদী করবে। আচ্ছা বলেন দেখি, কী খিটকেল? হে হে হে হে।

আমার নাসিকা সজাগ হলো। আমি যেন এর মধ্যে একটা গল্পের সন্ধান পেলাম। মাঝবয়েসী পাগল স্ত্রীলোকটি রহমান সাহেবকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রশ্ন করা উচিত নয় বলেই আমায় অতৃপ্ত থাকতে হলো।

এর পরই আবার দুজন লোক বাইরে থেকে আতিকুল ভাই ও আতিকুল ভাই বলে ডাকাডাকি করতে লাগল। রহমান সাহেব আবার বেরিয়ে গেলেন। আমি তাঁর বাবার সঙ্গে টুকিটাকি কথা চালাতে লাগলাম।

এবারও বাইরে বেশ উত্তেজিত কথাবার্তা। দু-একটা শব্দ কানে আসছে। রহমান সাহেবের বাবার অধিকাংশ কথাই আমি বুঝতে পারি না, বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটা একঘেয়েমি আছে। তা ছাড়া খিলাফৎ আন্দোলন বা মহাত্মা গান্ধী যেবার মেদিনীপুর এলেন—এই সব বিষয়ে আমার কৌতূহল নতুন করে জাগ্রত হয় না।

বরং অন্য একটি বিষয়ে আমার কৌতূহল হলো। আমি ফস করে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি মাও সে তুং-এর নাম শুনেছেন?

বৃদ্ধ বললেন, হ্যাঁ, শুনিছি। চীন দ্যাশের প্রেসিড্যান।

কয়েক বছর আগে আমাদের কলেজের ছেলেরা এই একটা কাজ করেছে,

মাও সে তুং-এর নাম বাংলার গ্রামেগঞ্জেও ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। তবে মাও সে তুং যে এখন বেঁচে নেই সে খবর এই বৃদ্ধ জানেন না। ওর ছেলেরা জানে নিশ্চয়ই।

রহমান সাহেব আবার ফিরে আসার পর বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, কে?

—গজব আর কেরামৎ।

—কী চায়?

—পাম্প সেট। এগুলোরে বোঝালেও কিন্তু বোঝে না। কেরোসিন নেই, শুধু পাম্প নিয়ে কী করবে? কেরাসিন ডিজেল ছাড়া যে পাম্প চলে না তা এই কথাগুলো বুঝবে না কিছুতে।

—আষাঢ় মাস পইড়ে গেল, তা বৃষ্টির দেখা নেই। অরাই বা করবে কী? এখন মাঠে জল না পেলে...গত বৎসর আকাশ ভাসাইয়ে দেল, আর এ বৎসর আকাশ এখনো শুকনা—

—বেলাকে কেরাসিন কিনলে যে পাম্পের ভাড়া বাড়াতে হয় তাও ঐ চাষাগুলান বুঝবে না। ভাড়া বাড়াবার নাম শুনলেই তো ওরা তিড়িং বিড়িং করে লাফায়।

আমার দিকে তাকিয়ে রহমান সাহেব বললেন, আপনারা তো কলকাতার লোক একটু খবরের কাগজে লেখেন না যাতে গ্রাম দেশে আমরা কেরাসিন পাই।

এবার রহমান সাহেবের দিকে আমার সন্দেহসঙ্কুল চোখে তাকাবার পালা। আগে লোকের মুখের কথা সবই বিশ্বাস করতাম, এখন করি না। সত্যিই কি কেরোসিন পাওয়া যাচ্ছে না। অথবা কেরোসিনের কৃত্রিম অভাব ঘটিয়ে পাম্প সেটের দাম বাড়াবার চেষ্টা চলছে?

গ্রামাঞ্চলে এরা এক নতুন শ্রেণীর বড়লোক। জমিদার কিংবা জোতদার নয়। এদের হাতে থাকে সারের এজেন্সি, এরা চাষীদের জলের পাম্প ভাড়া দেয়। চন্দ্রনাথের কাছে শুনেছি দু-তিন খানা গ্রাম পরে এক ভদ্রলোক নাকি ট্রাকটারও ভাড়া দিচ্ছেন। নিরাপদ গ্রামের সদাইবাবুও এই শ্রেণীর ধনী। এক সঙ্গে দুই মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য তিনি পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা খরচ করতে রাজি এবং সে কথা বলতে তাঁর চোখের একটা পাতাও কাঁপেনি। অথচ সদাইবাবু খালি পায়ে হাঁটেন এবং খালি গায়ে থাকেন। পুরোনো জুতোর শুকতলা গুঁড়োকে চা হিসেবে খান। উনি বোধ হয় জানেনই না যে, কিছু পয়সা খরচ করে গান বাজনা শুনলে জীবনে এক রকমের মাধুর্য থাকে।

সদাইবাবুর বাড়িতে বন্দুক আছে। রহমান সাহেবের বাড়িতেও বন্দুক থাকা খুবই সম্ভব। ডেবরা-গোপীবল্লভপুর এই জেলার মধ্যে হলেও, যত দূর শুনেছি

এ অঞ্চলে বন্দুক কাড়াকাড়ি কখনো হয়নি।

এর পরে খাওয়াটা বেশ ভালোই জমলো। খুব পাতলা নরম, সুস্বাদু রুটি আর বড় গোস্তের কাবাব, তার ওপর আবার মুরগির মাংস। মুসলমানদের আতিথেয়তা সুবিদিত। আমাকে প্রচুর খাওয়ার জন্য ওঁরা খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। মুরগির মাংসে নুন বেশি। মাছ-মাংস রান্না খারাপ হলেও খেয়ে নিতে পারি। কিন্তু নুন বেশি হলে মুখে তোলা অসম্ভব ব্যাপার।

ভোজনপর্বের মাঝখানে নামল বৃষ্টি। যে-চাষী দুজন পাম্পসেট ভাড়ার জন্য এসেছিল তারা নিশ্চয়ই খুশি হবে। অনেকদিন পর মাঝ রাতে হঠাৎ বৃষ্টি নামলে আমি এক চাষীকে সত্যি সত্যি মাঠে গিয়ে একবার নাচতে দেখেছিলাম। হে বরুণদেব, তুমি আজ প্রচুর বৃষ্টি দাও।

তারপরই মনে হলো, এই যে এখন আমি ফিরব কী করে? অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে বৃষ্টি মাথায় করে ফেরা! আছাড় খাওয়ার থেকেও বড় কথা, যদি সাপ টাপ বেরোয়। দূর ছাই এই হতচ্ছাড়া বৃষ্টি আর নামবার সময় পেল না? আমি ঠিকঠাক নিরাপদে ফেরার পর নামলেই তো পারত।

রহমান সাহেব বললেন, আপনি চিন্তা করবেন না। ভালো করে খান তো? ছাতা হ্যারিকেন দিয়ে দুজন মুনিষ সঙ্গে দিয়ে আপনাকে মাঠ পার করে দেবখন। দিনকাল ভালো না, রাত বিরেতে একা চলাফেরা করা এমনিতেই...তার ওপর আপনি আবার নতুন মানুষ।

—কেন, কিসের ভয়?

—বছরের এই সময়টায় অনেকেরই তো অবস্থা খারাপ থাকে, ধান রোয়ার আগে হাতে ট্যাকা থাকে না। তাই দু পাঁচ ট্যাকার জন্যেও মাথায় ডাণ্ডা মেরে দেয়। গত পরশুই তো কালভার্টের ধারে ব্রজেন সাহার সাইকেল কারা কেড়ে নিয়েছে, তখনও বেশি রাত নয়।

খেয়ে উঠে আঁচাতে আঁচাতেই চন্দ্রনাথ এসে গেল। সঙ্গে দু-তিন জন লোক। উঠোনে দাঁড়িয়ে চন্দ্রনাথ তম্বি করতে লাগল আমার ওপরে। আমি বাড়িতে কিছু বলে আসিনি। সবাই চিন্তা করছে, একা একা এত রাত পর্যন্ত...

চন্দ্রনাথের সঙ্গে আতিকুর রহমানের মুখ চেনা আছে। কিন্তু চন্দ্রনাথ আর একটুও বসবে না। তার বাড়িতে ব্যস্ত হয়ে আছে সবাই, কারুর খাওয়া হয়নি।

রহমান সাহেবদের বাড়ির সকলকে শহুরে ভাষায় প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম আমরা।

গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠে পড়বার পর চন্দ্রনাথ বলল, তোমার জন্য আজ আমায় প্রচুর বকুনি খেতে হলো!

—মল্লিকার কাছে ?

—হ্যাঁ, যত দোষ সব আমার তাস খেলার। শ্যামপুর থেকে ফিরে এসেই দেখি সারা বাড়ি থমথমে। তোমায় নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তোমার ভালোমন্দ যদি কিছু হয় তা হলে সব দোষ আমার! আমার মতন এমন একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন, অসভ্য মানুষ আর হয় না! আমি যত বলি যে, নীলু তো আর ছেলেমানুষ নয় যে হারিয়ে যাবে, তা কিছুতেই শুনবে না! মল্লিকা বলছে, তুমি যদি মাঠের মধ্যে কোথাও হাত পা ভেঙে পড়ে থাক তাহলে কী হবে ? বকতে বকতে মল্লিকা যেন একটা ঝড় তুলে দিল।

—মল্লিকার মতন অমন শান্ত মেয়ে যে বকতে পারে, তাই তো ভাবা যায় না!

—ঐ শান্ত মেয়েরাই যখন খেপে যায় ?

—তুমি বকুনি খেয়েছ বটে, কিন্তু একথা শুনে আমার বেশ ভালো লাগছে। আমার জন্য কেউ চিন্তা করে, এটা জানতে পারলে বেশ একটা মনে মনে সুখ হয়।

—দ্যাখো না, তোমার সুখ বার করছি। বাড়ি গিয়ে তোমায় আবার খেতে হবে।

—অ্যাঁ ? অসম্ভব! মামুদপুরে এত বেশি খেয়েছি।

—বললেই হলো। মল্লিকা আজ মুরগি আনিয়ে রেঁধেছে। সেগুলো নষ্ট হবে ?

—সে কাল খাবো।

—কাল! গ্রামে কি ফ্রিজ আছে যে মাংস রেখে দেওয়া যাবে ?

—বাসী মাংস খেতে চমৎকার লাগে! আমি যে মামুদপুর গ্রামে আছি, তা বুঝলে কী করে ?

—সেই তো, কোনদিকে খোঁজাখুঁজি করব, ভাবছিলাম। আমার জ্যাঠার বাড়ির যে মুনিষটা আছে, দামু, সে বলল ঐ বাবুটাকে দেখলাম মামুদপুরের দিকে যাস্যেন।

—ও নিজে থেকেই বলল ?

—হ্যাঁ, কেন ?

আমার একটু মজা লাগল। ফাঁকা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি দামুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চেয়েছিলাম, সে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু আমি কোনদিকে যাচ্ছি, তা সে নজর রেখেছে এবং নিজে থেকেই সেকথা জানিয়েছে শত্রুপক্ষের বাড়িতে। কেন ?

চন্দ্রনাথ বলল, এই দেখো, দেখো, সামনে একটা আল আছে।

কিন্তু সাবধান হবার আগেই আমি ধপাস! পাজামা, পাঞ্জাবি কাদায় মাখামাখি এবং পকেট থেকে কিছু খুচরো পয়সা ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। এখন সেগুলো আবার খুঁজতে হবে।

তবু ব্যাপারটাকে আমার বেশ সুসংগতই মনে হলো। আমি অনেক বছর শহরবাসী, বৃষ্টির রাতে মাঠের জল কাদার মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একবারও আছাড় খাব না, তা কি হয়? আমার এই সর্বাঙ্গে কাদা মাখা অবস্থা দেখে মল্লিকাও খুশি হবে। সে বুঝবে যে, তার এতখানি দুশ্চিন্তা করা ঠিকই হয়েছিল। চোখ কপালে তুলে সে বিস্মিত উচ্চারণে জানাবে, তখনই বলেছিলাম না—।

উঠে দাঁড়িয়ে পেছন দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম, বৃষ্টি ও অন্ধকারের মধ্যে মামুদপুর গ্রামটি অদৃশ্য হয়ে গেছে।

৫

চ্যাটার্জি, ব্যানার্জি, ঘোষ-বোস-মিত্তির, সরকার, সেন, রায় চৌধুরী ইত্যাদি কয়েকটি নির্দিষ্ট পদবীধারী মানুষজনের মধ্যেই আমরা সাধারণত ঘোরাফেরা করি। বামুন কায়স্থ ও বৈদ্য। আমাদের লেখক অভিনেতা ও রাজনীতিবিদরাও এদের মধ্যে থেকেই আসে। এক তরুণ লেখকের পদবী ছিল ধাড়া, সে নিজেই বদলে রায় হয়ে গেছে। আর এক লেখকের পদবী কুণ্ডু, শুনেছি এক শুভানুধ্যায়ী তাঁকে বলেছে, কুণ্ডু নামের কোনো লেখক হয়? তুমি গুপ্ত হয়ে যাও!

নিরাপদ গ্রামে মাত্র একঘর ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ, বাকি আর কেউই আমাদের এই চেনা পদবীর গণ্ডির মধ্যে নয়। এদের জাতি-পরিচয় তাঁতি, তিলি ও সদগোপ, কিন্তু কেউ তাঁত চালায় না বা অন্য কোনো পেশা নেই। সকলেই জমির চাষ নির্ভর। কাছাকাছি তিন গ্রামের কেন্দ্রস্থলে জুনিয়ার হাইস্কুলটি বছর কুড়ি-পঁচিশ আগে গ্রামের লোকের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এখানকার প্রত্যেক পরিবারেরই দু-একজন কিছু লেখাপড়া জানে। এদের মুখের ভাষা, দু-চারটে এদিকে ওদিক শব্দ বাদ দিলে প্রায় রেডিওর সংবাদ পাঠকের মতনই। খবরের কাগজ বা বিদ্যুৎ না এলেও ট্রানজিস্টার রেডিও প্রায় প্রতিটি পাঁচখানা বাড়ির মধ্যে একটি বাড়িতে ঢুকে গেছে।

চন্দ্রনাথের কথাতেই আমি ব্রাহ্মণ পরিবারটিকেই দেখতে গেলাম। সর্বমোহন ভট্টাচার্যের বাড়িটি গ্রামের এক টেরেয়। কাছেই অতিশয় সাদামাটা একটি শিব মন্দির। তার সামনে একটি পুকুর। সে পুকুরে অজস্র শালুক (আমি আগে বলতাম

সাপলা) ফুল ফুটে আছে, তার মধ্যে মিশে আছে কয়েকটা পদ্ম। কয়েকটি ফড়িং ও ভ্রমর বেছে বেছে শুধু পদ্ম ফুলগুলোর ওপরেই ওড়াউড়ি করছে। ওদের এই নির্বাচন দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, শালুক ফুলে মধু হয় না।

সেই পুকুরে একজন লোক দুটি মোষের গা ধোয়াচ্ছে, তার অদূরেই কয়েকজন নারী-পুরুষ স্নান সেরে নিচ্ছে। আর আমি ইহজীবনে একই পুকুরে মোষের সঙ্গে স্নান করতে পারব না। ছেলেবেলায় পারতুম। এখন দু-একটা ইংরিজি স্বাস্থ্যের বই পড়ে ফেলেছি যে!

পুকুরের এক ধারে একটি বেশ পুরোনো তেঁতুল গাছ। এত বড় ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছ সহসা চোখে পড়ে না। ঐ একটা গাছই অন্তত চল্লিশ পঞ্চাশটা পাখি পরিবারকে আশ্রয় দিতে পারে।

সর্বমোহন ভট্টাচার্যের বাড়িতে ঢোকার আগে চন্দ্রনাথ বলল, উনি আমার ওপর রেগে আছেন বোধহয় এখনো। যদি গম্ভীর হয়ে থাকেন, তাহলে দু-চারটে কথা বলে চলে আসব!

—কেন রেগে থাকবেন কেন?

—আমি একদিন ওঁর পা ধুইয়ে দিইনি। ব্রাহ্মণ আমাদের বাড়িতে এলে পা ধোয়ার জল দিতে হয়, কারুকে পায়ে হাত দিয়ে ধুইয়ে দিতে হয়।

—এখনো? ওঁরা রাজি হন?

—রাজি মানে, পা বাড়িয়ে থাকেন! উনি আবার আমাদের কুলগুরু কিনা। তা তখন আমি সদ্য এম-এ পাশ করেছি, ফট করে মেজাজ গরম হয়ে গেল, ভাবলুম পা-ফা ধুইয়ে দিতে পারব না। আমার মা-ও খুব রেগে গিয়েছিলেন সেই জন্য। মা তখন পা ধুইয়ে দিলেন।

আমার মনে হলো, আমি এসব কী শুনছি? রূপকথার গল্প নাকি?

আমি বললুম, তা আমি তোমাদের বাড়িতে আসবার পর কেউ আমার পা ধোওয়ার জল দেয়নি কেন? আমিও কি কম বামুন নাকি?

চন্দ্রনাথ হেসে ফেলে বলল, তাই তো, খুব ভুল হয়ে গেছে। আজই মল্লিকাকে বলব!

সর্বমোহন ভট্টাচার্যেরও মাটির দোতলা বাড়ি। সামনে খানিকটা জায়গা বেড়া দিয়ে একটি ফুলগাছের বাগান। সব মিলিয়ে বেশ পরিচ্ছন্ন।

বাগানের গেট খুলে চন্দ্রনাথ হাঁকল, ভটচায্যিকাকা, বাড়ি আছেন নাকি?

দু-তিন পুরুষ আগে এই গ্রামের লোক অন্য জায়গা থেকে ডেকে এনে এই ব্রাহ্মণ পরিবারকে বসায়। সবাই মিলে কিছু জমিও দান করে। এখন সর্বমোহন ভট্টাচার্যের মোট তিরিশ বিঘে জমি। ব্রাহ্মণের কখনো লাঙলে হাত দিতে নেই

বলে ভাগচাষীরা এর জমি চষে দেয়।

কলকাতায় ব্রাহ্মণরা জুতোর দোকান পর্যন্ত খুলেছে। মনে আছে খুব ছেলেবেলায় শ্যামবাজার অঞ্চলে নব প্রতিষ্ঠিত ভট্টাচার্য সু স্টোর দেখে এসে আমার বাবা বাড়িতে খুব বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। বিড়বিড় করে বলেছিলেন, দোকান খুলেছিস খুলেছিস, তা বলে নামও ঐ দিতে হবে?

আমি কিছুদিন একটি সরকারি অফিসে কেরানীগিরি করেছিলাম। সেখানে একটি বেয়ারার পদবী ছিল মুখার্জি। সরকারি অফিসের বেয়ারাদের কাজ তো শুধু এ টেবিল থেকে অন্য টেবিলে ফাইল এনে দেওয়া আর কেরানীবাবুদের চা-জল খাওয়ানো। একটি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় পোস্ট। যাক তবু তো কিছু লোক কাজ পাচ্ছে। ঐ বেয়ারাটি, কী যেন মুখার্জি, একদিন আমাদের সুপারিনটেনডেনট অর্থাৎ বড়বাবুর কাছে খুব ধমক খাবার পর দু হাত কপালে তুলে বলেছিল, ব্রাহ্মণ হয়েও পাঁচ জাতের লোকের হুকুমে জল এনে খাওয়াচ্ছি, হা অদেষ্ট! এই বলে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল হঠাৎ।

বড়বাবু তখন অপরাধী মুখ করে নিজে তাকে তুলে টেবিলের ওপর শোওয়ান। আমরা অতি ছোকরা কেরানীরা অবশ্য বলাবলি করেছিলাম, ঐ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়াটা ওর নিপুণ ভান। সে চাকরি আমি ছেড়ে দিয়েছি কবে, তবু পথে হঠাৎ দেখা হলে সেই কী যেন মুখার্জি বেয়ারাটি হাত তুলে নমস্কার করে বলে, বাবু ভালো আছেন? আমার চেয়ে সে বয়েসে বড়, এবং আমি আর তার বাবু নই, তবু সে ঐ রকম বলে। শুনেছিলাম, সরস্বতী পুজোর সময় পুরুতগিরি করে তার কিছু উপরি পয়সা রোজগার হয়। সংস্কৃত কথাটা বাংলা অক্ষরে বানান করার বিদ্যেও নেই তার।

সর্বমোহন ভট্টাচার্যের বৃত্তান্ত শুনে আমি চন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আজকালকার নতুন নিয়মে বর্গাদাররা ওঁর জমি নিজেদের নামে লিখিয়ে নেয়নি?

চন্দ্রনাথ বলেছিল, বামুনের জমি বর্গাদাররা রেকর্ড করাবে? সে সাহস এখনো কারুর নেই। সে রকম করতে গেলে গাঁয়ের অন্য লোকেরাই তাকে পিটিয়ে শায়েস্তা করে দেবে।

চন্দ্রনাথের হাঁক শুনে একটি রোগা, বেঁটে খাটো লোক বেরিয়ে এসে বলল, কে?

লোকটির পরনে ধুতি, ঊর্ধ্বাঙ্গে শুধু মোটা পৈতেটিই বসন বা ভূষণ। মাথায় চকচকে টাক, গায়ের রং বেশ ফর্সা তো বটেই, টাকটি আরও বেশি ফর্সা। বামুনদের মধ্যে অনেকেই এখনো বেশ গৌরবর্ণের হয় (আমি ব্যতিক্রম), এর কারণ কী? আর্য রক্ত? রোগা, বেঁটে বোঁচা নাক, তবু আর্য?

চন্দ্রনাথ ভেতরে ঢুকে ভট্টাচার্য মশায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। আমি সেই সময় একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে বাগানের একটি লম্বা জবাগাছের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করি। আতিকুর রহমান সাহেবের বাবা যে তাঁর পায়ে আমাকে হাত ছোঁয়াতে দেবেন না, তা আমি জানতাম। কিন্তু এ ব্রাহ্মণকে বিশ্বাস নেই, পা দুটি ব্যগ্র এবং একটি হাত আশীর্বাদের ভঙ্গিতে উদ্যত হয়েই আছে।

চন্দ্রনাথ বলল, কাকা, এই এদিকে এলুম, ভাবলুম একটা কথা বলে যাই। বলছিলাম কী, ঐ যে গোলোকের বাবার শ্রাদ্ধ হবে, সবাই দেশামো করাতে বলছে, শুধু পুরুষদফা করলে হয় না? ওদের এখন বিশেষ টাকা পয়সা নেই।

সর্বমোহন ভট্টাচার্য বললেন, হবে না কেন? হলেই হওয়ানো যায়। যার যেমন ইস্যে।

—কাকা, আপনি যদি সবাইকে বলে দ্যান।

—এ তো তোমাদের ব্যাপার। তোমরা সভা করে যা ঠিক করবে, এর মধ্যে আমার তো কিসু বলার নেই।

চন্দ্রনাথ একটু বিশেষ খাতিরের ভাব দেখিয়ে বলল, কাকা, আপনার কথা সবাই মানে। গোলোকের দাদা বৈকুণ্ঠ তো এখন পরিবারে পয়সা কড়ি কিছু দেয় না।

—আমি তো সভায় বলতে যাব না, আমায় যদি কেউ এসে শুধোয় তখন বলব, তুমি যা বললে!

তিনি প্রশ্নসূচকভাবে দু-একবার তাকালেন আমার দিকে। চন্দ্রনাথ বলল, এ আমার এক বন্ধু। কদিনের জন্য বেড়াতে এসেছে।

চন্দ্রনাথকে আমি আগেই বলে দিয়েছিলাম যে ওঁর কাছে আমার নাম যেন না জানায়। নেহাৎ যদি উনি আমার নাম জিজ্ঞেস করেন, তা হলে পদবীটা বদলে দাস করে দেবে। উনি অবশ্য আমার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করলেন না।

—তুমি তো গাঁয়ে থাকো না, চাঁদু। তুমি অনেক কিছু জানো না। গোলোকের বাপ সুরেশ্বর প্রায়ই বড় গলায় বলত, আমি মলে আমার ছেলেরা বৃষচ্ছুগ্য করাবে। এই এক বৎসর আগেও ঐ তেঁতুল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বলেসে। এখন নমো নমো করে তার ছেরাদ্দ করালে তার আত্মা যদি অনাতৃপ্তি থাকে?

আমি ফস্ করে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, ভট্টাচার্যি মশাই, আত্মা বলে সত্যিই কি কিছু আছে?

আশা করেছিলাম, উনি এর উত্তরে কয়েকখানা সংস্কৃত শ্লোক ঝাড়বেন! কিন্তু উনি সেদিক দিয়েই গেলেন না। খানিকটা ভর্ৎসনা ও খানিকটা অবজ্ঞার সুরে বললেন, নাস্তিকের থাকে না, ধার্মিকের থাকে।

খুব সম্ভবত সর্বমোহন ভট্টাচার্যের সংস্কৃত শ্লোকের স্টক বিশেষ নেই। এইমাত্র তিনি অনাতৃপ্তি বলে একটা শব্দ ব্যবহার করলেন। কোনো অভিধানে ঐ শব্দ পাওয়া যাবে না। আমি ওঁকে প্রণাম করিনি বলেই কি উনি আমায় নাস্তিক আখ্যা দিলেন?

চন্দ্রনাথ বলল, কাকা, সুরেশ জ্যাঠা কি খুব একটা ধার্মিক ছিলেন?

—সে তো তোমরাই ভালো জানো!

সম্ভবত ব্রাহ্মণের বাড়ির মধ্যে ডেকে অন্য জাতের লোকদের বসাবার নিয়ম নেই, তাই কথাবার্তা চলতে লাগল বাগানে দাঁড়িয়ে। আমি আড়চোখে দু-একবার ওঁর বাড়ির দিকে তাকালাম। কারুকে দেখা গেল না।

প্রসঙ্গ বদলে ফেলে চন্দ্রনাথ বলল, কাকা, আপনার শরীর গতিক এখন ভালো আছে?

—কোথায় আর ভালো? কিছু হজম হয় না, যা খাই তাতেই অম্বল! এই শীতে মেয়ের বাড়িতে গেসলুম, বিষ্টুপুরে, শুনেছিলুম তো সেখানকার জল নাকি ভালো, কই, সেখানেও অম্বল, পেট জ্বলে যায়। আর তোমাদের এ গ্রামের জল তো কহতব্য নয়, পেটের মধ্যে গিয়ে কলকল করে।

নিজের গ্রামের কোনো নিন্দে চন্দ্রনাথ সহ্য করতে পারে না। তিন পুরুষ ধরে বসবাস করলেও সর্বমোহন এখনো বলেন, তোমাদের এ গ্রাম।

চন্দ্রনাথ বলল, কাকা আমাদের নিরাপদের জল তো খুব ভালো। আমি ছোট বেলায় দেখেছি শামপুরের লোক আমাদের এখানকার পুকুর থেকে জল নিয়ে যেত। এখানকার জলে মটোর ডাল তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়।

—আমি মটোর ডাল খাই না, কোনো ডালই খাই না! পোস্ত বাটা দিয়ে এই একটুখানি আলোচালের ভাত খাই, তাতেই অম্বল।

—এখন তো টিউকল হয়েছে। আপনি টিউকলের জল খেয়ে দেখেছেন? আমাদের গাঁয়ে এখন তিনটে স্যালো বসেছে--

চন্দ্রনাথের চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে এবং ওষ্ঠ বাঁকিয়ে তিনি বললেন, কলির এখনও পাঁচ পোয়া হয়নি। গরমেন্টের লোক যখন টিউকল বসাতে আসে তখন আমি বলিসিলাম নল বসাবার কাজটা বামুনদের দিয়ে কবাতে হয়। কেউ কানেই তুলল না সে-কথা। মিদনাপুর টাউনে দেখিসি উড়িষ্যাদেশের বামুনরা ঐ কাজ করত। এখন দেখি বারো জাতের লোক! সেই জল আমি খাব?

—ঐ জলে হজম কিন্তু আরও ভালো হয়।

—আমরা চলে যাব, আমাদের ছেলে-মেয়েরা বোধহয় এসব কিসু মানবে না। আমরা আর ক-দিন। দিনকাল বদলাস্যে।

বুঝলুম এ ব্রাহ্মণের সঙ্গে গল্প টল্প বিশেষ জমবে না। আমি শরীরে চাঞ্চল্য ফোটালুম। তা লক্ষ্য করে চন্দ্রনাথ বলল :

—আচ্ছা কাকা, চলি।

আবার সে নিচু হয়ে সর্বমোহনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে তিনি হাত তুলে বললেন, জীব জীব।

সর্বমোহন ভট্টাচার্য লেখাপড়া বিশেষ না জানলেও তিনি যে এই গ্রামের আর সকলের চেয়ে আলাদা, এ রকম একটা অহংকারী ভাব চোখে মুখে ফুটিয়ে রাখতে পেরেছেন। বসিরহাটের সেই মুচিটির মুখেও একটা আলাদা আলাদা ভাব দেখেছিলুম। শুধু এই অহংকারটুকু ছিল না। ব্রাহ্মণের এখনো এইটুকু বৈশিষ্ট্যই টিকে আছে।

খানিক দূর এসে আমি জিজ্ঞেস করলাম, উনি রোজ পুজো করেন? কতক্ষণ ধরে পুজো চলে?

চন্দ্রনাথ বলল, খুব বেশি হলে পাঁচ মিনিট। আমি তো কখনো দেখিইনি।

—ইনি তো হাল চাষ করেন না। তাহলে ইনি সারাদিন কী করেন?

—কী আর করবেন? খান আর ঘুমোন! শুধু শিবরাত্তিরের সময় এখানে খুব ধুমধাম হয়, একটা মেলাও বসে।

—তাহলে ওঁর অম্বলের অসুখ হবে না তো কার হবে?

—ভটচায্যিকাকার কিন্তু একটা গুণ আছে। উনি খুব ভালো ছবি আঁকেন। আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি, উনি পুকুর ধারে কাঁচা মাটির ওপর কঞ্চি দিয়ে পটাপট ছবি এঁকে ফেলেছেন। বেশ ভালো ছবি। শিব দুর্গা কালী এমনকি কাছে কোনো লোক দাঁড়িয়ে থাকলে তার ছবিও এঁকে দিতেন। ঠিক চেনা যায়, হুবহু। উনি আর্ট কলেজে শিখলে বোধহয় বড় শিল্পী হতে পারতেন, কিন্তু কুঁড়ে তো ভীষণ!

এই স্বার্থসর্বস্ব, চাঁছাছোলা লোকটিকে দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না যে ইনি একজন শিল্পী। অবশ্য শুধু আঁকতে জানলেই একজন শিল্পী হয় না। ইনি যদি প্রকৃত শিল্পী হতেন তাহলে নিশ্চয়ই এই ছোট গণ্ডির বাইরে চলে যেতেন!

সকাল সাড়ে নটা, পৌনে দশটা, রোদ চড়েনি, আকাশ আজ মেঘলা। এই রকম সময় হেঁটে বেড়াতে ভালোই লাগে।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করল, তুমি গোসাপ দেখেছ?

—আছে নাকি এদিকে?

—এই পুকুরটার পুব দিকে যে ঢোল কলমীর ঝোপ, ঐ দিকে প্রায়ই দেখতাম ছেলেবেলায়। দু-তিনটে গোসাপ আছে।

আমি জানি গোসাপ তেমন বিপজ্জনক নয়। দেখতে বেশ নিষ্ঠুর ধরনের হলেও ওরা মানুষ দেখলেই পালায়। হাতে কোনো কাজ নেই, এখন গোসাপ দেখতে গেলেই বা ক্ষতি কী?

বড় পুকুরটা সম্পূর্ণ ঘুরে আমরা চলে গেলাম পুব দিকে। সেখানে বুনো ঝোপ বেশ রয়েছে। আমি একটা শুকনো গাছের ডাল কুড়িয়ে নিয়েছি, বলা তো যায় না, একটা কিছু অস্ত্র থাকা ভালো।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও গোসাপ দেখতে পাওয়া গেল না। সেখানে গুচ্ছের ব্যাঙ রয়েছে অবশ্য। ব্যাঙের লোভে গোসাপদের আসবার কথা। কিন্তু আজ তারা নেই।

স্মৃতি রোমন্থনের ভঙ্গিতে চন্দ্রনাথ বলল, ছেলেবেলায় এখানে এসে গোসাপ দেখলে খুব রোমাঞ্চ হতো...গোসাপের আলজিভ দেখলে নাকি দিন ভালো যায় —তাই আমরা হাঁ করে থাকতাম, যদি গোসাপও সেই রকম হাঁ করে—

একটু থেমে সে আবার বলল, কে জানে, বোধহয় সাঁওতালরা মেরে গোসাপগুলোকে খেয়ে নিয়েছে।

—এদিকে সাঁওতাল আছে?

—মাঠে কাজ করতে আসে মাঝে মাঝে।

পুকুর ধার ছেড়ে মাঠে নেমে পড়তেই শুনলাম পেছন থেকে কে ডাকছে, চাঁদুদা, এই চাঁদুদা।

একটি মেয়ে, কিশোরী মতন মুখ, কাছে আসতে বুঝলাম, সে সদাইবাবুর ছোট মেয়ে সতী। আজ আর শালোয়ার কামিজ পরেনি—একটা ডুরে শাড়ি, সেই জন্য তাকে দেখাচ্ছে বয়েসের তুলনায় বড়।

চন্দ্র বলল, কি রে সতী, কি ব্যাপার?

মেয়েটি দৌড়ে আসছিল, আমাদের থেকে ফুট দশেক দূরে থেমে গিয়ে বলল, এই চাঁদুদা, কোথায় যাচ্ছ?

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করল, কেন রে সতী? কী হয়েছে?

—তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল!

—বল!

সতী আমার দিকে দুবার অপাঙ্গে তাকাল। ওর কচি মুখখানিতে লজ্জার অরুণ ছায়া। দৌড়ে এসেছে বলে ঠোঁটের ওপর সরু গোঁফের রেখার মত ঘাম। শরীর স্পন্দনশীল।

চন্দ্রনাথ আবার বলল, কী হয়েছে, বল না?

সতী গা মুচড়ে অস্ফুট গলায় বলল, তুমি একটু এদিকে এসো—

আমি হেসে বললাম, আমায় লজ্জা পাচ্ছো তো? আমি একটু দূরে গিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়াচ্ছি!

চন্দ্রনাথ আমার কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলল, আরে না না! কী এমন গোপন কথা আছে? ও সবতাতেই লজ্জা পায়! কী রে বল!

সতী একেবারে নীরব।

আমি আর দেরি না করে মাঠের মধ্যে খানিক দূর এগিয়ে গেলাম। চারটি আলের চৌরাস্তার মোড়ে একটি ছোট গাছ। এ গাছটারও নাম আমি জানি না। আকাশ মেঘলা, এই সময় সব গাছের পাতার রঙ বদলে যায়। ঝকঝকে রোদ্দুরে যে পাতাগুলোকে মনে হয় পাতলা সবুজ, মেঘলা দিনে সেগুলিই গাঢ় হয়ে যায়।

হয়তো এই গাছটির সঙ্গে আমার আর কখনো দেখা হবে না, তবু আমি ওর গায়ে কোমলভাবে হাত বুলিয়ে আদর করলাম। যদি ও আমায় মনে রাখে।

গাছেরা গান ভালোবাসে। আমার গলা সুরেলা হলে আমি ওকে এখন একটা গানও শোনাতে পারতাম। হাওয়ায় ছোট গাছটি এমন মাথা দোলাচ্ছে যেন ও কিছু কথা বলতে চায় আমার সঙ্গে। কিংবা হয়তো কথা বলছে, আমি বুঝতে পারছি না। একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলাম গাছটার পাতায় কিছু পোকা লেগেছে। খুব ছোট ছোট পোকা, হঠাৎ মনে হয়, গাছটায় কে যেন পেনের কালি ছিটিয়েছে। দু-একটা পোকাকে আঙুলের ডগা দিয়ে টেনে তোলার চেষ্টা করলাম। কোনো লাভ নেই, পোকাগুলোকে তোলা খুব শক্ত, নখ দিয়ে চেপে তুলতে গেলে গাছের পাতার খানিকটা অংশ ছিঁড়ে উঠে আসে।

পেছন ফিরে চকিত একবার দেখলাম, সতী মেয়েটি অত্যন্ত করুণ মুখ করে কী যেন বলছে, আর চন্দ্রনাথ হাসছে ফিকফিক করে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি আলের ওপর বসলাম, ওদের দিকে পেছন ফিরে। বসামাত্র চোখে পড়ল সামনে একটি গর্ত থেকে খুব গম্ভীরভাবে উঠে আসছে একটি খয়েরি রঙের কেন্নো। সম্পূর্ণ ওপরে উঠে আসার পর সে রেলগাড়ির ভঙ্গিতে এগোতে লাগল আমারই দিকে। আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, সব রকম পোকা মাকড়ের মধ্যে কেন্নোরাই বোধহয় সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন, ওদের গায়ে কক্ষনো ধুলো-ময়লা লেগে থাকে না। আর কী লাজুক, একটু ছোঁয়া লাগলেই মুখ গুটিয়ে ফেলে।

মাঠের পোকামাকড়দের জগতে নিশ্চয়ই একটা বিস্ময়কর আলোড়ন এসেছে। আগে ওরা জানত যে বছরে মাত্র কয়েক মাস জমিতে ফসল থাকে, আর বাকি সময় সব দিক খাঁ খাঁ করে। কিন্তু এখন সব ওলোট পালোট হয়ে গেছে। আই আর এইট জাতীয় নতুন ধরনের ধানের বীজের জন্য এবং পাম্পের

সাহায্যে জল আনার কারণে বছরে দুবার এমন কি তিনবারও চাষ হয় অনেক জায়গায়। পোকারা তাদের অনুভূতি দিয়ে জানত বছরের কোন সময় মাঠ ফাঁকা থাকবে। এখন সেই সময়ই মাঠ জুড়ে চাষের জন্য দাপাদাপি। ওরা ঘাবড়ে যাবে না? বাংলা গল্প-উপন্যাসে এখনো লেখা হয় চৈত্রের রুক্ষ মাঠ কিন্তু মধ্য চৈত্রের ভর দুপুরে বর্ধমানের এক জায়গায় দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানের খেত দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল। চৈত্র মাসে এতখানি সবুজ দেখা কি পোকামাকড়দের এখনো অভ্যেস হয়েছে।

আর একবার মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম, সতী তখনো কথা বলে যাচ্ছে, কিন্তু চন্দ্রনাথ এখন গম্ভীর।

কেন্নোটা প্রায় আমার পায়ের কাছে পৌঁছে গেছে। আমার হাতে যে গাছের ডালটা ছিল সেটা দিয়ে ওকে সামান্য একটু ঠেলে দিলুম। সঙ্গে সঙ্গেই ও কুণ্ডলী পাকিয়ে গতিহীন হয়ে গেল।

পরক্ষণেই খুব অনুশোচনা হলো আমার। ইস—বেচারিকে কেন এই অবস্থায় ফেললুম? কেন্নোবা খুব নিরীহ প্রাণী, কোনো ক্ষতি করে না, আমি ওর পথ ছেড়ে একটু সরে বসলেই তো হতো। এর আগেও আমি অনেক কেন্নোকে ছুঁয়ে গুটুলি পাকিয়ে দিয়েছি, কিন্তু কতক্ষণ পরে ওরা আবার খোলে, তা কখনো লক্ষ্য করিনি। ও কি সারাদিনই এই অবস্থায় থাকবে! মুশকিল হচ্ছে এই, একটা কেন্নো এরকম গুটুলি পাকালে তাকে সোজা করার কোনো উপায় নেই। আমি হাত দিয়ে জোর করে ওকে টেনে খুলে দিলেও ছেড়ে দেওয়া মাত্র ও আবার কুণ্ডলী পাকাবে! এ কী অদ্ভুত আত্মরক্ষার প্রণালী?

এই অবস্থায় কোনো পাখি যদি ওকে টপ করে মুখে তুলে নিয়ে যায়?

তখনই আর একটা চিন্তা মাথায় এলো। পাখিরা কি নির্বিচারে আজকাল পোকা-মাকড় খেতে পারে? ওদের ভয় করে না? বর্ধমানের যে গ্রামে আমি চৈত্রের দুপুরে আদিগন্ত সবুজ ধানখেতে বাতাসের লুটোপুটি দেখেছিলুম, সেখানেই দেখেছিলুম আর একটি নিষ্ঠুর দৃশ্য। এক জায়গায় তিনটি টিয়াপাখি মরে পড়ে আছে। একজন গ্রামসেবককে জিজ্ঞেস করেছিলাম তার কারণ।

কারণটি অতি সহজ ও জটিল। বুলবুলিতে ধান খেয়ে যায় বলে প্রসিদ্ধি আছে কিন্তু টিয়াপাখিরা ধানের এমন কিছু ক্ষতি করে না। চাষীরা টিয়াপাখিগুলোকে মারতে চায়নি। কিন্তু ধানে নানা রকম পোকার আক্রমণ হয় বলে আজকাল নানা রকম সাঙ্ঘাতিক বিষ ছড়ানো হয় ফসলের ওপর। কিছু পোকামাকড় সেই বিষে মরে, কিছু আবার বিষ গায়ে মেখে পালিয়ে যায়। আকাশের পাখিরা সরল বিশ্বাসে সেই বিষাক্ত পোকাগুলিকে খায় এবং প্রাণ হারায়।

রেল লাইনের দু-পাশে টেলিগ্রাফের তারে কতরকম ফিঙে দেখা যায় আজকাল!

—এই নীলু, নীলু এদিকে এসো—

মেঘ কেটে রোদ বেরিয়েছে, আর বেশিক্ষণ এখানে বসে থাকা যেতো না। কেন্নোটিকে তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম চন্দ্রনাথের দিকে।

সতী তখনো দাঁড়িয়ে আছে। এক পা সোজা, আর একটা পা বেঁকিয়ে যেমন বিচিত্র একটা ভঙ্গিতে মেয়েরা দাঁড়ায়, সেই ভাবে।

চন্দ্রনাথ বলল, ঠিক আছে, তুই যা সতী! আমি দেখছি কী করতে পারি!

সতী আমার দিকে একবার কাতরভাবে তাকাল। অর্থাৎ আমাকে এতক্ষণ দূরে গিয়ে বসে থাকতে হয়েছে সেই জন্য ক্ষমা প্রার্থনা। আমি একখানা অভয়দান সূচক হাসি উপহার দিলাম ওকে।

সতী পেছন ফিরে প্রথমে খানিকটা ধীর পায়ে হেঁটে তারপর পুকুর পাড়ে উঠেই দৌড়োতে শুরু করল।

চন্দ্রনাথ আমায় বলল, মজার ব্যাপার!

—কী?

—দুর্জয় নন্দী বিয়েতে রাজি হয়েছে, আরও দু-হাজার টাকা পণ বাড়ানোর পর। সদাই জ্যাঠা একই দিনে দু-মেয়ের বিয়ে লাগিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু অন্যদিকে একটা গোলমাল দেখা দিয়েছে। চলো, পুকুর ধারটায় গিয়ে বসি—ওখানে ছায়া আছে।

পুকুরের উঁচু পাড়ে মাঠের দিকে মুখ করে আমরা বসলাম। জলের দিকে ফিরে বসলেই ভালো লাগত কিন্তু তাতে চন্দ্রনাথের সিগারেট খাওয়ার অসুবিধে। বয়স্ক কেউ দেখে ফেলতে পারে।

চন্দ্রনাথ সিগারেটে টান মেরে বলল, ব্যাপারটা অনেকটা যোগ-বিয়োগ অঙ্কের মতন। বেলডাঙ্গার শ্যামানন্দের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল বীণাপাণির। সদাই জ্যাঠা সতীর সঙ্গে হেড মাস্টার দুর্জয় নন্দীর বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

—সে তো জানি!

—দুর্জয় নন্দী পরশু সন্ধেবেলা রাজি হয়েছে বটে কিন্তু সে বলছে সতীর বদলে বীণাপাণিকে সে বিয়ে করবে। কারণ সতীর বয়েস বড্ড কম। দুর্জয় নন্দীর আগের পক্ষের একটি ছেলে আছে, সতী তাকে সামলাতে পারবে না। সুতরাং সে বীণাপাণিকে চায়। সদাই জ্যাঠার তাতেও আপত্তি নেই।

—কিন্তু বেলডাঙ্গার সেই শ্যামানন্দ? সে তো বীণাপাণিকেই দেখে পছন্দ করে গেছে?

—তার দিক থেকে কোনো আপত্তি নেই, তাকে বাজিয়ে দেখা হয়েছে। তার বাড়ির লোকেরও মত আছে। শ্যামানন্দের বয়েস বাইশ তেইশ, সতীর সঙ্গে তাকে মানাবে ভালো। বীণাপাণির চেয়ে সতীকে দেখতেও একটু বেশি ভালো, তাই না?

—কিন্তু বীণাপাণির সঙ্গে তার বিয়ের সব ঠিকঠাক। হঠাৎ কনে বদলে যাবে? অন্য লোকজন অবাক হয়ে যাবে না?

—তুমি কি ভাবছ, গ্রামের বিয়েতে নেমন্তন্নর চিঠি ছাপা হয় যে কনের নাম বদলাতে হবে? সবাই জানে সদাইজ্যাঠার এক মেয়ের সঙ্গে বেলডাঙ্গার ঘনশ্যাম দাসের ছেলে শ্যামানন্দর বিয়ে হচ্ছে। মেয়ের নাম কী, তা বেশির ভাগ লোকই জানে না। লোকে মেয়ের নাম জানতেও চায় না, কত টাকা পণ, কী জিনিসপত্তর দেবে থোবে, সেই সম্পর্কেই লোকের আগ্রহ। ঐ শ্যামানন্দ ছোঁড়াও টাকার লোভেই বিয়ে করছে, সে কি আর মেয়ে দেখে বিয়ে করছে?

—তারপর কী হলো?

—সবই তো বেশ মানানসই ছিল। দুর্জয় নন্দীর বয়েস বেশি আর বীণাপাণিরও বয়েস বেশি আর সতী আর শ্যামানন্দ দু-জনেই ছোট। এখন ঝঞ্ঝাট পাকিয়েছে বীণাপাণি। সে নাকি ভীষণ কান্নাকাটি করছে সে দুর্জয় নন্দীকে বিয়ে করতে চায় না। সে দোজবরকে বিয়ে করবে না। তাও না হয় হত যদি আগের পক্ষের ছেলে না থাকত। আগের পক্ষে ছেলে থাকলে নাকি স্বামীরা পরের বউকে ভালোবাসে না। আসলে, শ্যামানন্দর সঙ্গে তো বীণাপাণির বিয়ে ঠিক হয়েছে অনেকদিন, ও এর মধ্যে শ্যামানন্দকে নিজের স্বামী ভেবে নিয়ে কত কী স্বপ্ন দেখেছে তো।

—তাহলে এখন কী হবে।

—সদাই জ্যাঠাকে বাড়ির সবাই যমের মতন ভয় পায়। সদাই জ্যাঠার কথার ওপর কেউ কথা বলতে পারবে না। শিগগির মরে যাবার চিন্তায় উনি এখন আরও বেশি রাগী হয়ে উঠেছেন। সতী তাই এসেছিল আমি যাতে সদাই জ্যাঠাকে একটু বুঝিয়ে বলি। উনি হয়তো আমার কথা শুনলেও শুনতে পারেন। আমি এ গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লেখাপড়া জানি তো, তাই বয়েসে ছোট হলেও অনেকে আমাকে মোড়ল গোছের মনে করে। হে-হে-হে!

—কিন্তু তুমি কী বুঝিয়ে বলবে?

—ব্যাপারটাকে আবার উল্টে দিতে। যেমন ঠিক ছিল, সেই বীণাপাণির সঙ্গে শ্যামানন্দেরই বিয়ে হোক, আর দুর্জয় নন্দীকে আর একটু চাপ দিলেই সে সতীকে বিয়ে করবে। একবার যখন বিয়েতে রাজি হয়েছে।

—কিন্তু সতী রাজি হবে তাতে?

—সতী তো আমায় বলে গেল, ওর তাতে অমত নেই। দিদি এত কান্নাকাটি করছে। দিদির সারা জীবন দুঃখ থাকবে, সেই জন্য ও নিজে হেড মাস্টারকে বিয়ে করতে রাজি আছে।

আমি চমৎকৃত হয়ে গেলুম। আর্কিমিডিসের মতন আমার ইউরেকা বলে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল।

এই তো একটা গল্প! এতদিন পর আমি এখানে একটা গল্প খুঁজে পেয়েছি। নিরাপদ গ্রামটা এমনই সাদামাটা যে এখানে অভাবনীয় বা রোমাঞ্চকর কিছুই ঘটে না। চন্দ্রনাথের কাছে আমি বার বার তন্নতন্ন করে জিজ্ঞেস করেছি। আজকাল থিয়েটারে আমরা যেমন দেখি, সে রকম কোনো জোতদার এ গ্রামে কোনো গরীব চাষীর সুন্দরী বউকে ধরে এনে সবলে সতীত্ব নাশ করেনি। এখানে কোনো অত্যাচারী ধনী কোনো ভূমিদাসকে চাবুকের প্রহার করেনি, কেউ এ পর্যন্ত কোনো প্রতিবেশীর স্ত্রীকে ফুসলে নিয়ে পালায়নি, কোনো বিদ্রোহী বর্গাদারকে জমির মালিক চক্রান্ত করে খুন করায়নি। এমন অনাটকীয় গ্রামের কথা আমি শুনিনি কক্ষনো। একেবারে যা তা।

তা বলে কি নিপীড়ন শোষণ নেই? আছে ঠিকই, কিন্তু তা চলছে উত্তেজনাহীনভাবে, চিরকালের নিয়মে প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে মিশে এবং ভাগ্যের দোহাই দিয়ে। দামু নামের লোকটির মতন মানুষেরা নিজেদের ভাগ্যে জন্মেছে ভূমিহীন মজুরের ঘরে, সুতরাং সাবা জীবন তাকে মুনিষের কাজই করে যেতে হবে!

আমি সোৎসাহে বললুম, সতী নিশ্চয়ই দুর্জয় নন্দীর প্রেমে পড়েছে!

চন্দ্রনাথ খুব মজা পেয়ে হাসতে লাগল।

—ঠিক বলেছি না? সতীর এত গরজ কেন? ও দৌড়ে তোমার কাছে বলতে এসেছে তার মানে ও নিজেই বিয়ে করতে চায় দুর্জয় নন্দীকে।

চন্দ্রনাথের হাসি তবু থামে না।

—দুর্জয় নন্দী ওকে পড়ায়। প্রেম হওয়া তো স্বাভাবিক!

এবার হাসি থামিয়ে চন্দ্রনাথ বলল গত বছর দুর্জয় নন্দী ঐ বীণাপাণিকেও পড়াতো!

—পড়ালেই যে প্রেম হবে।

—শোনো, ঐসব প্রেমট্রেম শহরে হয়, গ্রামে হয় না। গ্রামে কেউ ওসব বোঝে না। এখানে লোকে বোঝে খাওয়া-পরার নিশ্চিন্দি, কার কতটা জমি জায়গা, আর কিছু দেহজ ব্যাপার। প্রেম জিনিসটাই এসেছে পাশ্চাত্য জগৎ থেকে। আমাদের ভারতবর্ষে প্রেমের কোনো কনসেপশনই ছিল না। কে কাকে কতক্ষণে বিছানায়

পাবে, সব লেখাটেখা তো এই নিয়েই। রোমান্টিক প্রেমের চিন্তা আমাদের দেশে এসেছে গত শতাব্দীতে, পাশ্চাত্য প্রভাবে। গ্রামের জীবন এখনো সেই প্রাচীন ধারায় চলছে।

ফাঁকা জায়গায় পেয়ে চন্দ্রনাথ আমার ওপর একটা লেকচার ঝেড়ে দিল। কলেজে অধ্যাপনা করে তো, তাই সুযোগ পেলেই জ্ঞান দিতে ছাড়ে না।

এ গ্রামে কোনো নাটকীয় ঘটনা ঘটে না বলে যে কেউ প্রেমেও পড়ে না, এতটা আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই।

—শোনো, ঐ দুর্জয় নন্দীকে দেখলে যতটা শান্তশিষ্ট ভালোমানুষ মনে হয় ও কিন্তু ততটা নয়। একটু মিটমিটে ধরনের। গতবার এসে আমি হঠাৎ দেখে ফেলেছিলাম, ও বীণাপাণিকে জড়িয়ে ধরে হামলে চুমু খাচ্ছে!

—অ্যাঁ ?

—আমি নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু কিছু মনে করিনি। একটু আধটু হয়ই। আড়ালে আবডালে একটু আধটু জড়াজড়ি, চুমোচুমি হবেই, মানুষের শরীর তো। কিন্তু তার বেশি নয়, তারপরই ভয়।

—তাহলে তো আমি ঠিকই বলেছি! দুর্জয় নন্দী ভালোবাসে বীণাপাণিকে, কিন্তু বীণাপাণি তাকে ভালোবাসে না। এদিকে সতী বাচ্চা মেয়ে, সে তার মাস্টারমশাইয়ের প্রেমে পড়ে গেছে।

চন্দ্রনাথ হো-হো করে হেসে উঠে বলল ত্রিভুজ! এ যে দেখছি ত্রিভুজ প্রেম বানিয়ে ফেললে! আসলে ব্যাপারটা কী জানো ? ঐ সতী মেয়েটা বিয়ে-পাগলা! ওকে আমি ভালো করে চিনি। বারো-তেরো বছর বয়স থেকেই ও বিয়ের জন্য খেপে আছে। ওর শরীরটাও একটু বেশ ডেভেলপড! এখন বিয়ের একটা সুযোগ এসেছে, কোনো ঝঞ্ঝাটে যদি সেটা কেঁচে যায়, তাই ও দুর্জয় নন্দীর মতন দোজবরকেই বিয়ে করতে রাজি। তাছাড়া ওর বাবা তিন মাস বাদে সত্যি সত্যি মরে গেলে তখন কে ওর বিয়ে দেবে তার তো ঠিক নেই ? সে চিন্তাও আছে। সেই জন্য যার সঙ্গে হোক ও বিয়েটা চুকিয়ে ফেলতে চায়।

—ঐটুকু মেয়ে এত কথা বোঝে ?

—ঐটুকু মেয়ে ? কে বলল ঐটুকু মেয়ে ? ঐ বয়েসে অনেক মেয়ের বিয়ে হয়ে একটা দুটো ছেলেমেয়ে হয়ে যায়। ও নিজেই তো আমায় এক্ষুনি বলল ওর বাবা হঠাৎ মরে গেলে কে ওর বিয়ে দেবে ?

তবু আমি জোর দিয়ে বললুম, তুমি যাই বলো—দেখো ঠিক এর মধ্যে প্রেমের কোনো ব্যাপার আছে।

চন্দ্রনাথ বলল আচ্ছা দেখা যাক!

৬

পর পর দুজন লোককে দেখে আমার দুটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো।

ক্যাওট পাড়াটা এড়িয়ে আমি আর চন্দ্রনাথ মাঠ ভেঙে ফিরছিলাম। কাল বৃষ্টি হয়েছে বলে এদিকের মাঠে কয়েকজন এদিক ওদিক ছড়িয়ে বসে মাটি ভেঙে ভেঙে কাদা করছে। এরপর সেখানে ধানের বীজতলা বসানো হবে।

ওদের মধ্য থেকে একজন চাষী উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করল। পরনে লুঙ্গি খালি গা বুক ভর্তি কাঁচা-পাকা লোম দু-হাতে কাদা মাখা। এমন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটার নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে।

চাষীটি আমাদের কাছাকাছি আসবার পর চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করল সত্যহরিদা চললে কোথা?

গ্রামদেশে কারুর কাছাকাছি দিয়ে কেউ গেলেই কিছু না কিছু কথা বলতেই হয়। সবচেয়ে বেশি প্রচলিত কথা হলো, কিগো কোথায় চললে? এবং তার উত্তর একটু থুতনি উঁচু করে, এই তো একটু এদিকে। নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় সংলাপ, তবু শহুরে লোকেদের মতন পাশাপাশি সবাই মুখ গোমড়া করে হাঁটার চেয়ে অনেক ভালো। পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠের একটি উন্নত দেশের গ্রামেও এরকম প্রথা দেখেছি। সেখানে অচেনা মানুষের সঙ্গেও চোখাচোখি হলে তারা বলে, হাই অর্থাৎ কী খবর? প্রথম প্রথম আমি চমকে উঠতাম। পরে বুঝেছিলাম, সেদেশে কারুর সঙ্গে চোখাচোখি হলে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটা অভদ্রতা বলে গণ্য।

লোকটি না থেমেই বলল, ওরে বাপরে বাপ বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলে, এত দৌড়োচ্ছো কেন। পাইখানা পেয়েছে নাকি?

সত্যহরি নামের লোকটি জবাব দিল, নারে, ইস্কুলে যেতে হবে, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে না?

চন্দ্রনাথ হাতের ঘড়ি দেখে বলল, হ্যাঁ, এগারোটা বেজে গেছে, তোমার ছেলে কোথায়?

—তার জ্বর।

লোকটি দৌড়োতে দৌড়োতে গ্রামের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

এরকম একজন মাঝবয়স্ক চাষীর ইস্কুলে যাবার গরজ দেখে আমার বেশ অবাক লাগল। পড়াশুনোয় এত আগ্রহ? চাষের কাজ ফেলে এত জোর ছুট।

কয়েক কদম এগিয়ে যাবার পর আমি চন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলুম, বয়স্কদের জন্য ইস্কুল রাত্তিরে বসে না?

চন্দ্রনাথ বোধহয় অন্য কিছু ভাবছিল, আমার কথা শুনে একটু চমকে উঠে বলল, অ্যাঁ? কী বললে? রাত্তিরে ইস্কুল, সে আবার কী?

আমি আমার প্রশ্নটি পুনর্বার জানালুম।

—রাত্তিরে ইস্কুল? কেন, রাত্তিরে ইস্কুল হতে যাবে কেন? কেরাসিন খর্চা কে দেবে? কেরাসিন তো পাওয়াই যায় না।

—তবু একজন চাষী চাষের কাজ ফেলে দুপুরে পড়তে যাবে, এটা কি ঠিক।

—চাষী পড়তে যাবে?

তারপরই চন্দ্রনাথ হো-হো করে হেসে উঠল।

—তুমি কি ভাবলে সত্যহরিদা স্কুলে পড়তে যাচ্ছে?

—তা হলে?

—সত্যহরিদা প্রাইমারি স্কুলের টিচার।

এবার আমার অবাক হবার পালা। আমাদের মধ্যে স্কুল শিক্ষকের একটা বাঁধা-ধরা ছবি আছে। স্কুল মাস্টাররা অতি কম মাইনে পায়, কিন্তু তাদের পরিচ্ছন্ন ধুতি পাঞ্জাবি পরতে হয় রোজ। মাথার চুল পরিপাটি ভাবে আঁচড়ানো। মাসের শেষে সংসারে চাল বাড়ন্ত হলেও মুখ দেখে তা বোঝবার উপায়টি নেই। একজন খনি শ্রমিক একজন স্কুল মাস্টারের অন্তত চারগুণ টাকা রোজগার করে কিন্তু তার খালি পা, খালি গা এবং কোমরে একটা ময়লা ধুতি জড়ানো থাকলেই যথেষ্ট। খনি শ্রমিক দেশী মদের দোকানে আকণ্ঠ গিলে হল্লা করলেও সেটা বেমানান কিছু নয়, কিন্তু একজন স্কুল মাস্টার চায়ের দোকানে ঢুকে আস্তে সলপ সলপ করে চায়ে চুমুক দেবে এবং পকেট থেকে টিপে টিপে খুচরো পয়সা বার করবে। ঐ চায়ের খরচের মধ্যেই খবরের কাগজ পড়া হয়ে যায়।

লুঙ্গি পরা, খালি গা, দুহাতে চাষের জল-কাদা মাখা কোনো স্কুল শিক্ষককে কল্পনা করা আমার পক্ষে সত্যিই শক্ত।

—সত্যহরিদার ওপর অনেকেরই খুব হিংসে।

—কেন?

—ঐ যে মাস্টারিটা বাগিয়ে নিয়েছে। এখানে প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারির জন্য দারুণ কমপিটিশান। প্রাইমারি স্কুল গভর্নমেন্টের, দু-তিন মাস অন্তর হলেও মাইনে পাওয়া যাবেই। ঐ ক্যাশ টাকাটার ওপর সবারই খুব লোভ। চাষের কাজ যারা করে, তাদের অনেকেরই হাতে এক এক সময় কোন ক্যাশ টাকা থাকে না। মেজদা বলি যাকে—যার বাড়িতে তুমি আছো, তিনিও প্রাইমারি টিচার।

—যারা চাষ করছে, তাদের মাস্টারি করার যোগ্যতা আছে?

—অনেকেরই। আমাদের এদিকের হাই স্কুলটা খুব পুরোনো তো, অনেকেই ম্যাট্রিক বা স্কুল ফাইনাল পাশ।

চন্দ্রনাথ এর পর আর একটি তথ্য সরবরাহ করল।

—সত্যহরি বছরের ধানকাটার মরশুমে যখন স্কুলে যাবার একদম সময় পায় না, তখন সে তার বারো বছরের ছেলেটিকে পাঠিয়ে দেয় চাকরি রক্ষার জন্য। প্রাইমারির বেশির ভাগ ছাত্রেরই মতে, ঐ ছোট মাস্টার তার বাপের চেয়ে ভালো পড়ায়।

দ্বিতীয় মানুষটিকে দেখলাম আরও কিছুদূর যাবার পর।

একটা বাঁশঝাড় পেরতেই একটি বেশ সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ি। সম্পন্ন যে তা বোঝা যায় গোয়ালে দুটি দুগ্ধবতী গোরু দেখে। এবং উঠোনে একটি বেশ নিটোল ধানের মরাই।

উঠোনের ডান পাশে একটি বেগুন খেত। সেখানে একজন মাঝবয়সী রোগা পাতলা লোক একটা খুরপি হাতে নিয়ে নিবিষ্ট মনে গাছের গোড়া খুঁড়ছে।

লোকটি মুখ তুলে বলল, কে রে, চাঁদু নাকি? কবে এলি?

চন্দ্রনাথ বলল, এই এলাম। তুমি আজ অফিসে যাওনি, খুড়ো?

—তিনদিন ছুটি নিয়েছি। ক্যাজুয়াল লীভ পাওনা ছিল—

—বাঃ, বেশ বেগুন হয়েছে তো।

—নিবি নাকি, নে না।

—না থাক, আর একটু বড় হবে।

—বড় হবার কি জো আছে, যা পোকার উৎপাত।

আমি মুগ্ধভাবে বেগুন খেতের দিকে তাকিয়ে রইলাম। গাছে ঝুলন্ত বেগুনের রংয়ের চেকনাই-ই আলাদা। বেগুনগুলি বেশ নধর। টাটকা টাটকা ভাজা খেতে নিশ্চয়ই চমৎকার লাগবে। চন্দ্রনাথ নিতে চাইছে না কেন?

একটু লোভীর মতনই আমি বললাম, গাছের বেগুনের স্বাদই আলাদা।

চন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে বলল, কলকাতার বাজারে যেগুলো পাওয়া যায়, সেগুলো ফ্যাকটরির বেগুন নয়, সেগুলোও গাছের।

বেগুন খেতের মালিক হেসে ফেললেন।

তারপর একটা বড় কাঁচি দিয়ে কচ কচ করে পাঁচ-ছটা বেগুনের বোঁটা কেটে চন্দ্রনাথের হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি?

চন্দ্রনাথ আমার পরিচয় দিল।

বেগুন খেতের মালিকের চেহারাটি ছোট্টখাট্টো হলেও বেশ ব্যক্তিত্ব আছে। নাম, পঞ্চানন দাস। দু-দিকে দু-হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে ট্যাঁক থেকে একটি কৌটো বার করে তার থেকে একটা বিড়ি ধরালেন। তার আগে বিড়িটির দু দিকে ফুঁ দিয়ে নিলেন যথারীতি।

—চাঁদু তুই জমি বিক্রি করে দিলি, আমায় একবার বললি না?

—তুমি তখন এখানে ছিলে না, খুড়ো। আমার জরুরি টাকার দরকার ছিল।

—জমি হলো লক্ষ্মী, অমন হুট করে লক্ষ্মী বিদায় করতে নেই। তুই একেবারে আমাদের পর হয়ে গেলি।

—সে কি গো, পর হয়ে যাবো কেন?

—জমি বেচে কলকাতায় বাড়ি করেছিস, আর কি তুই গাঁয়ে আসবি? তোর টাকার দরকার ছিল, আমরা পাঁচজনে কি কিছু কিছু করে দিতে পারতুম না? এক কথায় জমি বেচতে হবে? তোর বাপের আমলের সেরা জমি।

—আজকাল জমি রক্ষা করাই দায়।

—কলকাতায় বাড়ি করেছিস, বেশ ভালো কথা। ছেলেমেয়ে দুটোকে মাঝে মাঝে গাঁয়ে নিয়ে আসিস, এখানকার ধুলো-কাদা মাখাস। ওরা যেন বাপ-দাদার ভিটেমাটির কথা ভুলে না যায়।

পঞ্চানন দাসের কথার মধ্যে বেশ একটা উপদেশের সুর আছে। এবং অন্যদের তুলনায় বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারেন। উচ্চারণ ভালো। বেতার নাটকে অভিনয় করলে ইনি বেশ উন্নতি করতে পারতেন মনে হয়।

পঞ্চানন দাস বিড়ির টুকরোটা যেখানে সেখানে ছুড়ে দিলেন না। খুব যত্ন সহকারে নরম কাদা মাটির মধ্যে পুঁতে দিলেন। ছেলেবেলায় এবকম কিছু দেখলে নিশ্চয়ই ভাবতাম, ওখানে একটা বিড়ির গাছ হবে।

হঠাৎ তিনি একদিকে মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর ভাবে ধমক দিয়ে উঠলেন, এই হারামজাদা, চোখ নেই, গোরু সামালি দিতে পারিস না? আমরা তাকিয়ে দেখলাম, একটা গোরু বেগুন খেতের একদিকে ঢুকে পড়বার চেষ্টা করছিল, দামু তাকে ফেরাচ্ছে। ধমক খেয়ে দামু একটা শব্দও উচ্চারণ না করে গোরু নিয়ে চলে গেল।

কথা ঘুরিয়ে চন্দ্রনাথ বলল, তোমার প্রোমোশন হবার কথা শুনেছিলাম, হলো?

অসীম বিরক্তির ভান করে পঞ্চানন দাস বললেন, কই আর হলো। সেই যে ফাইল আটকে আছে তো আটকেই আছে।

—ইস।

—যাকগে, আর কদ্দিনেরই বা চাকরি। আট বছর পরেই তো রিটায়ার করছি। প্রমোশনটা হলে গ্র্যাচুইটি বেশি পেতাম, এই যা। সদাইদা চারদিকে কী বলে বেড়াচ্ছে শুনেছিস? ওর নাকি তিন মাস বাদে মরণ একেবারে ধ্রুব। ঘুঘু লোক, এই বলে ফয়দা তুলতে চায়।

—এতে কী ফয়দা হবে?

—বুঝলি না? এই তালে মেয়ে দুটোর বিয়ে সেরে ফেলছে। যে-কোনো

পাত্তরই ভাববে, তিন মাসের মধ্যে যদি শ্বশুর মারা যায়, তাহলে শ্বশুরের সম্পত্তির ভাগ পাওয়া যাবে, সেই জন্যে যে-কোনো কথায় রাজি। ঐ হেড মাস্টার দুর্জয় নন্দীও সম্পত্তির লোভে এক মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে শুনলাম।

—কিন্তু সদাই জ্যাঠা সত্যিই বিশ্বাস করেন যে উনি মারা যাবেন!

—রাখ ওসব কথা। অতি ধূর্ত লোক, এই বাজারে দু মেয়ের বিয়ে দেওয়া তো সহজ কথা নয়, তাই এই ফিকিরে কাজ সেরে নিচ্ছে। বিয়ে হয়ে গেলে জামাইদের কলা দেখাবে। বছর দশেক আগেও সদাই এরকম একবার রটিয়েছিল।

—তখন কী কারণ ছিল?

—কী যেন একটা বখেড়া ছিল, ঠিক মনে নেই। তবে ও সব সময় কোনো না কোনো মতলবে থাকে। তবে একথা জেনে রাখ, মতলববাজ লোকরা জীবনে প্রকৃত সুখী হয় না।

আর কথা না বাড়িয়ে পঞ্চানন দাসের কাছ থেকে আমরা বিদায় নিলাম। চন্দ্রনাথ হাতের বেগুনগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। একটা বেগুনে ফুটো।

একটু পরে চন্দ্রনাথ বলল, পঞ্চানন খুড়ো সদাই জ্যাঠাকে একদম দেখতে পারে না। ওদের মধ্যে খুব আকচা আকচি। দুজনের মধ্যে কে যে সত্যি কথা বলছে, তা বোঝা শক্ত।

—উনি কী চাকরি করেন?

চন্দ্রনাথ মুচকি হেসে আমায় পাল্টা প্রশ্ন করল, বলো তো উনি কী চাকরি করেন? তিনটে চান্স পাবে, তার মধ্যে যদি বলতে পারো তাহলে তোমায় আমি দশ টাকা দেব।

—না পারলে আমায় দশ টাকা দিতে হবে?

—তাকেই তো বাজি ধরা বলে।

ক্যাজুয়াল লীভ, প্রমোশানের ফাইল, গ্র্যাচুইটি এইসব কথাগুলো আমার মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল। শব্দগুলোর মধ্যে কেমন যেন সরকারি গন্ধ আছে।

—জে এল আর অফিসের আমীন?

চন্দ্রনাথ মাথা নেড়ে বলল, না।

—ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্মচারী?

—না।

তারপর চন্দ্রনাথ আর একটু যোগ করল, আর একবার মাত্র চান্স। আমি একটু ধরিয়ে দিচ্ছি, পঞ্চানন খুড়ো চাকরি করেন কলকাতায়, প্রতি শনিবার বাড়িতে আসেন।

—রাইটার্স বিল্ডিংস-এর কেরানি ?

চন্দ্রনাথ আমার দিকে এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দাও পাঁচ টাকা।

—কেন?

—তুমি রাইটার্স বিল্ডিংসটুকু ঠিক বলেছ। উনি হেলথ ডিপার্টমেণ্টের বেয়ারা।

—অ্যাঁ ?

—পঞ্চানন খুড়োবা তিন ভাই, তার মধ্যে দু ভাই চাষবাস দেখে আর উনি চাকরি করতে যান।

আমি নিজেকে ধিক্কার দিয়ে মনে মনে বললুম, ওহে নীললোহিত, তুমি যে খুব অহংকার করো, কোনো মানুষকে দেখলেই মোটামুটি তার অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেবার ক্ষমতা তোমার আছে। এই তোমার সেই ক্ষমতা ?

সত্যিই, পঞ্চানন দাসের এই পরিচয়ের কথা অনুমান করা আমার পক্ষে স্বপ্নেও অসম্ভব ছিল। বেগুন খেতে দাঁড়ানো ঐ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটি রাইটার্স বিল্ডিংস-এর বেয়ারা ? বাবুদের জল খাওয়ানো, পান-সিগারেট, টোস্ট-ওমলেট এনে দেওয়া ওঁর কাজ ? সারাদিন একটা টুলে বসে থাকা এবং বাবুদের দেখলে বিড়ি লুকোনো! কেরানি ও অফিসাররা সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই ওঁকে তুমি বলে, কেউ কেউ পাঁচু বলে ডাকে নিশ্চয়ই।

পরিবেশ মানুষকে এতখানি বদলে দেয়! নিজস্ব বাড়িব সামনে, নিজের বেগুন খেতে দাঁড়ানো আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ঐ লোকটিকে বেয়ারা বা ভৃত্য মনে কবা অসম্ভব যেন। সরকারি অফিসের বেয়ারা সকলেই খুব আস্তে আস্তে হাঁটে, একটু যেন কানে কম শোনে, তিন বার না ডাকলে সাড়া দেয় না, সেই টাইপের সঙ্গে এই সাবলীল চটপটে মানুষটির কোনো মিলই নেই। যে-কেরানিবাবুটি বড় জোর সাড়ে পাঁচশো টাকা মাইনে হাতে নিয়ে যায়, দেড়শো টাকা ভাড়ার ফ্ল্যাটে থাকে, বিশ্ব সংসারে যার বিষয় সম্পত্তি কিছুই নেই, সে এই পঞ্চানন দাসকে সিগারেট আনতে পাঠাবার হুকুম করবার সময় ভাবতেই পারে না যে এই লোকটি তার তুলনায় অনেক বেশি অবস্থাপন্ন, যথেষ্ট জমি জায়গার মালিক এবং গ্রামের একজন বিশিষ্ট নাগরিক। চন্দ্রনাথ জমি বিক্রি না করলে ইনি তাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারতেন এবং সদাইবাবুর মতন একজন প্রতাপশালী লোকের সঙ্গে টক্কর মারবার স্পর্ধা রাখেন।

কলকাতায় পঞ্চানন দাস একজন সামান্য বেয়ারা, ক্লাস ফোর স্টাফ। কিন্তু শনিবার কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরে এসে অফিসের জামা-কাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরে খালি গায়ে বেগুন খেতে দাঁড়ালেই ইনি একজন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। ইনি রাশভারী গলায় অন্য একজনকে হারামজাদা বলে ধমক দিতে পারেন।

আমি চন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলুম, আচ্ছা, এঁদের তো বাড়ির অবস্থা বেশ ভালোই মনে হয়, খাওয়া-পরার অভাব নেই তবু কলকাতায় ঐ সামান্য চাকরি করতে যান কেন?

চন্দ্রনাথ বলল, বুঝলে না, এও তো সেই ক্যাশ টাকার ব্যাপার। সারা বছর তো চাষের কাজ থাকে না, এই তিনচার মাস। তার মধ্যে ক্যাজুয়াল লীভ, আরনড লীভ, সিক লীভ নিয়ে পঞ্চানন খুড়ো নিজেই মাস দেড়েক হাত লাগাতে পারেন, রোববারগুলো তো আছেই। বাকি দিনগুলোতে নগদা মুনিষ লাগালে সব মিলিয়ে খর্চা পড়ে বড় জোর দু-তিন শো টাকা। এখন গভর্নমেন্ট অফিসের বেয়ারাদের মাইনেও চারশো সাড়ে চারশো টাকার কম না। কলকাতার বাসা খরচ বাদ দিলেও পঞ্চানন খুড়োর প্রতি মাসে নীট দুশো টাকা জমে। তুমি আমি মাসে দুশো টাকা জমাতে পারি?

আমি হাসলাম।

জাতিভেদ প্রথার কথা আমার আবার মনে পড়ল।

আমি যে অফিসে কিছুদিন কাজ করতুম সেখানকার মুখার্জি নামের বেয়ারাটি ছিল পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু। বাঁচবার জন্য যে-কোনো চাকরিই তার পক্ষে যথেষ্ট। দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত না হয়ে যে ঐ বেয়ারার চাকরির জন্য সে কলকাতায় টিকে গিয়েছিল, তাতেই তার ধন্য হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা সে হয়নি। সে মুখ গোমড়া করে থাকত সব সময়। পাঁচ জাতের লোকের জন্য তাকে জল আনতে হয়, এটা সে সহ্য করতে পারত না। পঞ্চানন দাসের নিশ্চয়ই সে-রকম কোনো সংস্কার নেই। মন পরিষ্কার। কলকাতায় এক রকম মুখ, দেশে ফিরে এসে লুঙ্গিটি পরলেই আর একরকম মুখ।

হঠাৎ চন্দ্রনাথের কথা আমার অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো। পুরোটাই ধাপ্পা দিচ্ছে না তো?

—কিন্তু প্রমোশানের কথা কী যেন বলাবলি করছিলে? বেয়ারার চাকরিতে আবার প্রমোশান কী?

চন্দ্রনাথ বলল, আছে, তাও আছে। উনি অনেকদিন ধরেই রেকর্ড সাপ্লায়ার হবার জন্য চেষ্টা করছেন। ক্লাস এইট পর্যন্ত বিদ্যে আছে তো।

হ্যাঁ, রেকর্ড সাপ্লায়ার বলে একটি পদ আছে, আমি জানি, মনে ছিল না। রেকর্ড সাপ্লায়াররা বাবুদের জন্য জল বা চা-সিগারেট এনে দেয় না ফাইল খুঁজে এনে দেওয়া তাদের কাজ। কাছেই র‍্যাকের ওপর ফাইল সাজানো, কিন্তু কেরানিবাবু নিজে উঠে ফাইলটি আনবেন না, রেকর্ড সাপ্লায়ারের উদ্দেশ্যে বলবেন, এই যে অমুক থার্টি এইট হেডের ই এস আই স্কীমের ফাইলটা এনে দাও তো।

দাও না দিন? বেকর্ড সাপ্লায়াববা ক্লাস ফোব না ক্লাস থ্রি স্টাফ?

প্রাচীন আর্য চতুর্বর্ণ সমাজেব মতো এখনকাব সবকাবি অফিসগুলিতেও চাবটি বর্ণ। সে অনুযায়ী তুমি আপনিব তাবতম্য হয়।

৭

নদীতে জল খুব কম এবং কাদাকাদা বলে সেখানে স্নান কবা চন্দ্রনাথেব পছন্দ নয়। আমাব আবাব পুকুবে স্নান কবায় আপত্তি। তুমুল শব্দে জল আছড়ে ছেলেবেলাবই মতন সাঁতাব কেটে স্নান কবা বহুদিন হয় না। আমি নদী বা সমুদ্রকে বিশ্বাস কবি, বমতা সাধু আব বহতা জল, এদেব অঙ্গে কোনো মালিন্য লাগবাব কথা নয়। কিন্তু যে পুকুবে একই সঙ্গে গোরু মোষ গা ধোয়, সেখানে স্নান কবতে আমাব প্রবৃত্তি হয় না। এব আগে মনেব ভুলে কোনো গ্রামে গিয়ে পচা পুকুবেব জল দাপিয়ে স্নান কবে দেখেছি, আমাব জ্বব হয়ে যায় চট কবে। বাইবে বেড়াতে এসে জ্বব কে চায়।

দু একদিন স্নান না কবলে যে মহাভাবত অশুদ্ধ হয় না, সে কথা চন্দ্রনাথ কিছুতেই বুঝবে না, সে জোবাজুবি কবে।

স্বাস্থ্যকব স্নানেব একটি মাত্র জায়গা আছে।

চাষেব জমিব মাঝখানে একটি টিউবওযেল। এব নাম শ্যালো। চাষীব ভাষায় ছ্যালো, অর্থাৎ অগভীব নলকূপ যা এক জায়গা থেকে তুলে অন্য জায়গায় বসানো যায়। এব জল পাম্প কবে লাগানো হয় চাষেব কাজে। ছ্যালো আব ডিপ এই দুটি কথা এখন গ্রাম্য মাঠে খুব চলতি।

শ্যালোব জল বালতিতে ভবে আলেব ওপব বসে মাথায় ঢেলে স্নান। এব একটি অন্য উপকাবিতাও আছে। নিজেব স্নান তো হলোই, তা ছাড়া জলটাও নষ্ট হলো না। সেই জলই আলেব পাশে পাশে নালা দিয়ে বয়ে খেতেব কাজে লাগবে।

চন্দ্রনাথ সাবান মাখতে বললে আমি একটু চিন্তিত হই। সাবানগোলা জলও কি খেতেব কাজে লাগে? তাতে আবাব ফসলেব কোনো ক্ষতি হবে না তো?

চন্দ্রনাথকে এ প্রশ্ন করলে সে হো-হো করে হাসে।

—তুমি দেখছি চাষবাস নিয়ে খুব মাথা ঘামাতে শুরু করে দিলে।

—এখানে এসে তো দেখছি সেটাই প্রধান ব্যাপার?

—ধান গাছ খুব সাবান ভালোবাসে। আলো চালের ফেনা ভাত খাবার সময়

মনে হয় না, ভাতগুলো সাবান মাখা?

শহরবাসীদের নিজস্ব বাথরুমে নগ্ন হয়ে স্নান করাই অভ্যেস। একটা তালগাছের আড়ালে গিয়ে আমি ভিজে ধুতি ছেড়ে শুকনো পাজামা পরে নিই। চিরুনিটা আনলেই হতো। এরপর প্রায় সিকি মাইল হেঁটে বাড়ি ফিরে তবে চুল আঁচড়াতে হবে। একদিন চুল না আঁচড়ালেই বা ক্ষতি কী? তবু অভ্যাসবশত ডান হাতের আঙুলগুলো মাথায় চিরুনি হয়ে যায়।

চন্দ্রনাথের নিজের হাতে কাটা এবং নিজের রান্না করা মুরগির মাংস। আজ আর নানারকম আলু কিংবা পোস্তর তরকারি নেই। শুধু ভাত আর মুরগির ঝোল। আমার জন্য বিশেষ দূত পাঠিয়ে অন্য গ্রাম থেকে কয়েকটি কাঁচা লঙ্কা আনিয়েছে চন্দ্রনাথ।

দাওয়ার ওপর দুটি নকশা করা আসন পেতে দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি। দুটি ঝকঝকে কাঁসার গেলাসে জল। বেশ সুদৃশ্য, পরিচ্ছন্ন ব্যাপারই। কিন্তু এর মধ্যেও আছে অসুন্দরের উপদ্রব।

আমি যদি নেপোলিয়ান, হিটলার, স্ট্যালিন, আইয়ুব খাঁ এমনকি গান্ধীও হতাম, তাহলে প্রথমেই এক বছরের মধ্যে গোটা ভারতবর্ষ থেকে মশা, মাছি এবং ইঁদুর নির্বংশ করার প্রোগ্রাম নিতাম। প্রত্যেককে দিনে চার ঘণ্টা মশা-মাছি-ইঁদুর নিধনের কাজে বাধ্য করতাম শ্রমদান করতে। কেউ যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেললে তাকে দিতাম পাঁচ বছর জেল। একটাও মশা-মাছি-ইঁদুর না থাকলে এদেশে স্বাস্থ্য খাতে বেঁচে যেত বিপুল টাকা, সেই টাকায় দেশ-বিদেশ থেকে খাদ্য কিনে এনে বলতাম, সারা দেশের সমস্ত স্কুলের ক্লাস টেন পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর খাওয়া ফ্রি। শিক্ষকদের অতিরিক্ত যোগ্যতা হবে রান্না করা। বাংলা, সংস্কৃত ও হাইজিন টিচারদের তো রান্না জানতেই হবে। তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের খাওয়াবেন এবং পড়াবেন, বাকি টিচারদের জানতে হবে খেলাধুলো, ছেলেমেয়েরা স্কুল গিয়ে তিন ঘণ্টা পড়বে, দেড়ঘণ্টা ধরে খাবে আর দেড় ঘণ্টা খেলবে। দশটা থেকে চারটে। দেখা যাক, তাতে কী রকমভাবে গড়ে ওঠে নতুন জেনারেশন।

হঠাৎ এইসব অবান্তর কথা কেন?

আসনে বসবার পরই আঁতকে উঠলাম।

মল্লিকা একটি থালায় আমার ভাত বেড়ে দিয়েছে, তাকে ভাত না বলে সুমেরু পর্বতই বলা উচিত। তার পাশে একটি ঢেউ খেলানো কানাওয়ালা বাটিতে আর একটি মাংস ও ঝোলের পাহাড়। আজ মুরগির মাংসের মতন দারুণ সুখাদ্য রান্না হয়েছে বলেই দেওয়া হয়েছে অতখানি ভাত। আবার অতখানি ভাত খাবার জন্য এত বেশি মাংস এবং ঝোল। একেই বলে না ভিসাস সার্কল।

আমি নেপোলিয়ান, হিটলার ইত্যাদি হলে এতখানি খাদ্য পরিবেশন করার জন্য মল্লিকাকে জেলে দিতাম।

চন্দ্রনাথ বলল, খেয়েই দ্যাখো না, কেমন রেঁধেছি। ভালো যদি না লাগে...

ভালো লাগলেই বেশি খেতে হবে, এই বা কেমন যুক্তি ? এও জেলে দেবার কেস।

যত বলি তুলে রাখো, লাগলে আবার নেব, তা কিছুতেই শুনবে না। স্বামী-স্ত্রী দুজনে সমস্বরে বলতে লাগল, খেতে আরম্ভ করো না। যতটা পারবে খাবে, বাকিটা পড়ে থাক—

আবার জেলে দেবার মতন কথা।

আমার পাতের এঁটো ভাত অন্য কেউ খাবে, আমি তা পছন্দ করি না। আরম্ভ করার আগে মুঠো মুঠো ভাত তুলে দিতে লাগলাম চন্দ্রনাথের থালায়। মাংসটা বাটি কাত করে, একটু একটু ঢেলে নিলেই হবে।

চন্দ্রনাথ সত্যিই ভালো রাঁধে। তবে উৎসাহের আতিশয্যে তেল বেশি দিয়েছে। তা হলেও স্বাদ চমৎকার!

কিন্তু সুস্থির হয়ে কি খাওয়ার উপায় আছে। অজস্র মাছি। আজ মাংসের স্বাদ পেয়ে বোধহয় আরও বেশি মাছি উড়ে এসেছে। ঝাঁক ঝাঁক মাছি।

দ্বারভাঙ্গাতে আমার এক বন্ধুর বাড়ি উঠেছিলাম কয়েকদিন, কী দারুণ খাওয়া-দাওয়া। আমি ভোজনবিলাসী নই, একথা বলা যায় না। ওদের ওখানে আবার খাঁটি দুধে তৈরি নানারকম খাবার। ওদের বাড়িতে গোরু আছে। রান্নাঘরের উল্টোদিকেই গোয়াল ঘর। যে-সব মাছি ঐ গোরুর গায়ে এবং গোবরে বসে, সেগুলিই উড়ে উড়ে এসে বসে খাবারে। সেই কথা ভেবেই আমার বমি আসার উপক্রম হয়েছিল।

চন্দ্রনাথের বাড়িতে গোয়াল নেই, কিন্তু তাদের প্রতিবেশী, সম্পর্কিত জ্যাঠাদের গোয়ালটি উঠোনের এদিকের ধার ঘেঁষেই। ওরা শত্রুপক্ষ বলেই কি এদিকে গোয়াল ঘর তুলেছে ? পচা গোবর থেকে এমনিতেই দুর্গন্ধ আসে, এখন সেখানে থেকে ঝাঁক ঝাঁক সর্বভুক মাছি এসে বসতে চাইছে মাংস-ভাতে।

গোরুর গায়ের মাছি আমার ভাতে বসছে, এ চিন্তাটা কিছুতেই মাথা থেকে তাড়াতে পারি না। আমার গ্রাম-প্রীতি লাটে উঠবার জোগাড়।

আমার বিব্রত অবস্থা দেখে মল্লিকা একটি মেয়েকে হাতপাখা দিয়ে আমার কাছে বসিয়ে দিল। অপরের সেবা নিতে আমার অস্বস্তি লাগে, তবু এক্ষেত্রে আমি আপত্তি জানালাম না। এমন ভালো মাংস-রান্নার প্রতি সুবিচার করা উচিত।

মুখ তুলে দেখি, যে পাখা দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে, সে সদাইবাবুর মেয়ে সতী। আজও শাড়ি পরা।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করল, কিরে, তোর বিয়ের কিছু ঠিক হলো?

মেয়েটি উত্তর দিল না। মল্লিকা তার স্বামীক বলল, হেড মাস্টার রাজি হচ্ছে না কিছুতে। তুমি একটু বুঝিয়ে বলো না?

—আমি বললেই হেড মাস্টার শুনবে কেন?

—একটু ভালো করে কথা বলে দ্যাখো না। বীণাকে তো বিয়ে করতে চেয়েই ছিল।

—বীণাটা বড্ড পাকা হয়েছে। একটা ছোট বাচ্চা আছে বলে দুর্জয় নন্দীকে ওর অত অপছন্দ কিসের।

সতী পাখা দিয়ে আমার কপালে একটা ঠোকর মারল। অর্থাৎ অন্যমনস্ক। তাড়াতাড়ি পাখাটা মাটিতে ঠুকল। বেচারি লজ্জা পেয়ে গেছে খুব। আমি বললাম, ঠিক আছে, ঠিক আছে।

চন্দ্রনাথ বলল, বীণাকে বরং পাঠিয়ে দাও আমার কাছে—আমি তাকে টাইট দিয়ে দিচ্ছি। ছোটবোনকে দোজবরের কাছে পাঠাবে আর নিজে বেশ ছোকরা বর বিয়ে করবে। বাঃ বেশ।

মল্লিকা বলল, বীণা একটু নরম সরম—ও পরের ছেলে মানুষ করতে পারবে না। ও যা বলছে ঠিকই বলছে।

—তা বলে ছোটবোন বেশি বয়সের লোককে বিয়ে করবে এটাই বা কেমন কথা। তুই এক কাজ কর সতী, আমাদের সঙ্গে কলকাতায় চল, তোর জন্য আমি খুব ভালো পাত্র খুঁজে দেবো।

সম্ভবত আমি উপস্থিত আছি বলেই সতী একেবারে নীরব। তবে তার বিবাহ বিষয়ক কথাবার্তাতে তার লজ্জা পেয়ে উঠে যাবার উপায় নেই।

যে-বাটি ভর্তি করে আমায় মাংস দেওয়া হয়েছে, তার চারভাগের একভাগ খাওয়াই যথেষ্টর বেশি, আমি তার চেয়েও খানিকটা বেশি খেলাম। আমাকে খাওয়া শেষ করতে দেখে মল্লিকা চোখ কপালে তুলে বলল, ও মা, হয়ে গেল? নিশ্চয়ই ভালো লাগেনি। কী ছিরির রান্না করেছে ও কে জানে। আমি কত বললাম।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করল, খারাপ রেঁধেছি?

—চমৎকার হয়েছে। এবার থেকে কলকাতায় প্রায়ই তোমার বাড়িতে খেতে যাব।

—মুরগি নিয়ে এসো, রান্না করে দেবো।

মল্লিকা আরও খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতেই আমি বললাম, আর যদি বলো, তাহলে কিন্তু আমি কেঁদে ফেলব।

এই কথায় ফিক করে হাসল সতী। হেসেই অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

মল্লিকা খানিকটা নালিশের সুরে আমায় জিজ্ঞেস করল, নীলুদা, আপনি নাকি মামুদপুরে গিয়ে—

চন্দ্রনাথ চোখের ইশারায় তাকে চুপ করিয়ে দিল।

আঁচাবার পর আমি নিচের ঘরটায় খাটে শুয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। এত গুরু ভোজনের পর হাঁটা চলা করাও মুশকিল।

বাংলার গ্রামাঞ্চলে দারুণ খাদ্যাভাব। অথচ খাদ্যের অত্যাচারেই আমায় এ গ্রাম ছেড়ে শিগগির পালাতে হবে। চন্দ্রনাথ মল্লিকা কিছুতেই কথা শুনবে না।

মল্লিকার বাপের বাড়ি থেকে লোক এসেছিল আজ সকালে। কয়েকদিনের জন্য ওরা সেখানে থেকে আসবে। চন্দ্রনাথ আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। সে বাড়িতে চন্দ্রনাথের জামাই আদর, আমাকেও নিশ্চয়ই সমান আদরই করবে, অর্থাৎ আরও খাওয়াদাওয়ার উৎপাত। ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়।

পুরো একটা চার কেজি মাছকে রোস্ট করা হয়েছিল। পৃথিবীর অন্য প্রান্তে অন্য একটি নেমন্তন্নর কথা। আমরা তিন চারজন বাঙালি ছিলাম বলে বিশেষ করে মাছের ব্যবস্থা। লেক মিশিগানের স্যামন মাছ, তার স্বাদই অপূর্ব, তা ছাড়া পেট থেকে শুধু পিত্ত আর নাড়িভুঁড়ি বার করে আস্ত মাছটাই রান্না হয়েছে। ওদেশের নিয়ম, সামনে দিয়ে প্লেটসুদ্ধ খাবার নিয়ে যাবে, যে-টুকু ইচ্ছে কাঁটা চামচ দিয়ে তুলে নেবে। একসঙ্গে বেশি কেউ নেয় না বলে প্রথমবার পাতে খানিকটা নিয়েছে, অথচ আরও খানিকটা খাওয়ার পুরোপুরি ইচ্ছে, কিন্তু বাঙালি অভ্যেস যাবে কোথায়, ঘাড় নেড়ে বলেছিলুম, না না ঠিক আছে। ধরেই নিয়েছিলাম, গৃহকর্ত্রী বারবার সেধে বলবে, আর একটু নাও, আর একটু নাও। ওরা তার ধার ধারে না। আমি না বলা মাত্রই সামনে থেকে প্লেট নিয়ে চলে গেল। আর এলোই না।

উঃ, কী আফসোস হয়েছিল তখন। অমন সুস্বাদু স্যামন মাছের রোস্ট আশ মিটিয়ে খেতে পারিনি বলে সে দুঃখ আমার রয়ে গিয়েছিল অনেক দিন।

কম খেলেও ওরা বেশিবার সাধে না, আর আমার দেশে বেশি খাওয়া হলেও তার উপরে আরো জোর করা হয়। অথচ ওদের দেশে প্রচুর খাদ্য, প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি, আর আমাদের দেশ হা-অন্ন, যো-অন্ন। আসলে আমাদের দেশ বলে কিছু নেই। ভারত একটা অলীক রূপকথার নাম।

চন্দ্রনাথ দোতলায় গেছে। মল্লিকা ও সতীর সঙ্গে কিছু পরামর্শের জন্য যা আমার সামনে করা যায় না।

আমার চোখে সামান্য তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, সেই সময় ফিরে এলো চন্দ্রনাথ।

—তুমি ঘুমোবে? ঘুমোও, আমি একটু ইস্কুল থেকে ঘুরে আসি।

দুর্জয় নন্দীর সঙ্গে দেখা করতে?

—হ্যাঁ। আমার ওপর গুরুদায়িত্ব পড়েছে, দেখি একবার কথা বলে। সতী একেবারে কান্নাকাটি শুরু করেছে।

আমি উঠে বসলাম।

তুরুপের তাস মারার মতন বললাম, কান্নাকাটি? তোমায় বলেছিলাম না, এটা প্রেমের ব্যাপার।

চন্দ্রনাথ দাপটের সঙ্গে বলল, প্রেম? আচ্ছা দাঁড়াও। বাইরে মুখ বাড়িয়ে সে ডাকল, মল্লিকা, মল্লিকা, একবার শুনে যাও তো।

তারপর সে একটা সিগারেট ধরিয়ে ঠোঁটে পাতলা হাসি মেখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে।—কী ব্যাপার?

—দাঁড়াও, আগে মল্লিকা আসুক।

চন্দ্রনাথ রীতিমতন একটা সাসপেন্স রাখতে চায়।

মল্লিকা এসে দরজার কাছে দাঁড়াতেই চন্দ্রনাথ বলল, তুমি এখানে থাকো, নইলে নীলু বিশ্বাস করবে না। তুমি সাক্ষী দাও। সতীকে আমরা বলেছিলাম ওকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ওর পাত্রের সন্ধান করব। তাতে ও রাজি?

মল্লিকা বলল। না। বাঃ রাজি হবেই বা কী করে।

—বেশি কথা বলবে না, যা জিজ্ঞেস করব শুধু তার উত্তর দেবে। সতী দুর্জয় নন্দীকে বিয়ে করার জন্য খেপে উঠেছে কি না।

—হ্যাঁ।

—সামনের লগ্নে ওর দিদির সঙ্গে একই সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে যাক, ও তাই চায় কি না।

—হ্যাঁ।

—আমাদের লেখক বন্ধুটি ভাবছেন, এর মানেই এই যে সতী ঐ গুঁফো দুর্জয় নন্দীর প্রেমে পড়ে গেছে। প্রেম ছাড়া তো সাহিত্য হয় না।

মল্লিকা ফিক করে হেসে ফেলল।

চন্দ্রনাথ আবার জিজ্ঞেস করল, এবার বলো, বীণাপাণি যদি মন পাল্টায় সে যদি দুর্জয় নন্দীকে বিয়ে করে, তাহলে সতী ঐ নতুন গ্রামের ছেলেটাকেও বিয়ে করতে রাজি কিনা।

—হ্যাঁ।

—এমনকি, এর মধ্যে যদি নতুন একটি পাত্র জোগাড় করা যায় তা হলে সতী দুর্জয় নন্দীর বদলে তাকে বিয়ে করতে রাজি কিনা।

—হ্যাঁ, তাতেও রাজি।

চন্দ্রনাথ দু হাত ছড়িয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, মাই অনার, দিস ইজ মাই কেস।

মল্লিকা বলল, জানেন নীলুদা, সদাই জ্যাঠা না মামলা মিটিয়ে ফেলেছেন, নিজে থেকে যেচে। এমন উনি কক্ষনো করেন না, মামলা মোকদ্দমার ব্যাপারে উনি এমন জেদি।

চন্দ্রনাথ বলল, শুধু তাই না, অন্য গ্রামের যে পুকুরটা জমা নেবার জন্য এতদিন চেষ্টা করছিলেন, সেটাও ছেড়ে দিলেন এক কথায়। সদাই জ্যাঠাকে এমন কাণ্ড করতে কেউ কখনো দেখেছে ?

মল্লিকা বলল, সবাই ভাবছে, সদাই জ্যাঠা শিগগিরই নিশ্চয় মরে যাবেন। নইলে এরকম কাজ তিনি কখনো করেন না। টাকাপয়সার ওপরেও কোনো মায়া দয়া নেই। সেই জনাই সতী ভয় পাচ্ছে। ওর বাবা যদি সত্যিই মরে যায়, তাহলে ওর বিয়ে কে দেবে ? কোনো রকমে এখন কারুর সঙ্গে বিয়েটা হয়ে যাওয়াই ভালো। ও তাই চাইছে।

আমি আহতভাবে বললুম, ওইটুকু মেয়ে এতখানি বোঝে ? ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখন যাকে তাকে বিয়ে করতে চাইছে।

চন্দ্রনাথ বলল, ওইটুকু মেয়ে। মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়ে গেছে। এবার স্কুল ফাইনাল দেবার কথা ছিল। দেয়নি। ওই বয়েসী মেয়ে নিজের ভালো-মন্দ বুঝবে না ? গোকুল মামা হঠাৎ মারা যাওয়ায় তার দু মেয়ের আর বিয়েই হলো না। কে বিয়ে দেবে। সেসব কথা ওরা জানে।

মেয়েদের বিয়ে না হলে সমাজে কথা ওঠে না ? বেশি বয়েসের মেয়েরা কুমারী থাকে ?

—এ কি শরৎ চাটুজ্যের গপ্পো পেয়েছ, এ তোমাদের বামুনদের সমাজ নয় —এখানে অনেক অরক্ষণীয়া মেয়ে আছে, সারাজীবন বিয়েই হলো না।

আমি চুপ করে রইলাম।

মল্লিকা বলল, সতীর বিয়েটা এই সময় চুকে গেলেই ভালো হয়। সদাই জ্যাঠার সত্যিই যদি কিছু একটা হয়ে যায়...ওদের আর দেখবার কেউ নেই।

চন্দ্রনাথ বলল, তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও নীলু। আমি বরং ঘুরে আসি, দেখি দুর্জয় নন্দীর সঙ্গে একবার কথা বলে—

আমি খাট থেকে নেমে পায়ে চটি গলিয়ে বললাম, চলো, আমিও যাচ্ছি।

বাইরে গনগনে রোদ বলে চন্দ্রনাথ একটা ছাতা নিয়ে নিল। বাড়ির পেছন দিকে খানিকটা আম কাঁঠালের বাগান, একটা পানায় ভরা পুকুর। এই পুকুরটাতে নাকি বড় বড় মাছ আছে, সেগুলি ধরা নিষিদ্ধ। পুকুরটার পাঁচজন শরিক, তাদের

বাড়িতে বিয়ে, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি উৎসব উপলক্ষে মাছ ধরা হয়।

বাগানের মধ্য দিয়ে খানিকটা ছায়ায় ছায়ায় গিয়ে তারপর মাঠের আল পথ। চন্দ্রনাথ ছাতা মেলে বলল, তোমায় বললাম না, এখানে কেউ অত প্রেম-ট্রেম বোঝে না। সব মেয়েই শুধু বোঝে, কোনোক্রমে একটা বিয়ে হওয়া দরকার। বিয়ে না হলে বড় অপমানের জীবন কাটাতে হয়।

—গ্রামে প্রেম নেই? তা হলে এতসব পল্লীগীতিতে যে প্রেমের কথার ছড়াছড়ি?

—আজকাল পল্লীগীতি লেখে অধিকাংশই শহুরে অ-কবিরা। তুমি অমুক পত্রিকার অমুক বাবুকে চেন না? তিনি কত পল্লীগীতি লিখেছেন। আসল পল্লীগীতি সবই স্বামী-স্ত্রীর প্রেম নিয়ে। আর রয়েছে রাধা—কেষ্টর গান, অবৈধ যতরকম চিন্তা সবই চাপিয়ে দেওয়া হয় ঐ রাধা কেষ্টর ওপর।

—গ্রামে প্রেম হয় না, একথা এখনো আমি মানতে রাজি নই, চন্দ্রনাথ। তুমিও সে গ্রামে থাকবার সময়ই বিয়ে করেছ, আর তুমি মল্লিকার প্রেমে পড়েই—

এতক্ষণ বাদে চন্দ্রনাথকে একটু লজ্জা পাওয়ানো গেল।

সে হাতের তালুতে চিবুক ঘষতে লাগল অপ্রস্তুত মুখে।

দুর্জয় নন্দী সদ্য একটা ক্লাস শেষ করে বেরুচ্ছেন, এই সময় আমরা পৌঁছলাম।

চন্দ্রনাথ বলল, ও মাস্টারমশাই, পরের পীরিয়ডে আপনার কোন ক্লাস?

হেড মাস্টার একটু অবাক হয়ে বললেন, ক্লাস সেভেন। আপনারা এসময়?

চন্দ্রনাথ বলল, ক্লাস সেভেনে দু পাতা হাতের লেখা লিখতে দিয়ে চলে আসুন, আমরা দাঁড়াচ্ছি, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।

হেড মাস্টার বললেন, এই রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন? আসুন, আপনি ঘরে এসে বসুন।

ঘরে দুটিমাত্র চেয়ার। দুর্জয় নন্দী ব্যস্ত হয়ে বললেন, আপনারা বসুন, আপনারা বসুন। আমার লাগবে না।

হেড মাস্টারের নিজস্ব চেয়ারটিতে চন্দ্রনাথ গিয়ে বসে পড়ে বলল, কিছুদিন আমি এখানে বসেছি, আমি এ চেয়ারে বসলে বেমানান লাগবে না।

দুর্জয় নন্দী বললেন, আপনি এখন ইয়ে...আপনাকে এখন এই সামান্য জায়গায় মানাবে কেন।

দুর্জয় নন্দীর কথায় একটু যেন ঈর্ষার সুর আছে। চন্দ্রনাথও এম. এ. পাশ, দুর্জয় নন্দীও তাই। কিন্তু দুর্জয় নন্দী ছোট গ্রাম্য স্কুলেই রয়ে গেলেন আর চন্দ্রনাথ শহরের কলেজের অধ্যাপক। ঈর্ষা তো হতেই পারে। দুর্জয় নন্দীও আর একটা

এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে কলেজে কাজ পাবার উদ্যম চালিয়ে যাচ্ছেন।

চন্দ্রনাথ বলল, যান, যান ক্লাসটা ম্যানেজ করে আসুন। ক্লাস সেভেনের ছেলেমেয়েরা প্রত্যেক বছরই সবচেয়ে বেশি তেঁড়েটে হয়!

দুর্জয় নন্দী বললেন, আমি ক্লাসে না গেলেও কেউ টুঁ শব্দ করবে না।

—খুব ভয় পায় বুঝি আপনাকে? তা তো পাবেই, অত বড় গোঁফ রেখেছেন।

দুর্জয় নন্দী একটু সময় চেয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ঘরটিতে আসবাবপত্র অত্যন্তই কম। একটি টেবিল, দুটি চেয়ার, একটি বইপত্রের র‍্যাক, একটি সুভাষ বোসের ছবিওয়ালা পুরোনো ক্যালেণ্ডার। এবং হেড মাস্টারের চেয়ারের পেছন দিকে একটি পুরো ভারতবর্ষের ম্যাপ ঝোলানো। ঐ ম্যাপে এই গ্রামের নাম নেই। বলাই বাহুল্য। এমনকি এই মহকুমারও উল্লেখ নেই। তবু ঐ ম্যাপটা ঝুলছে কেন এখানে?

ওপরে টিনের চালে দুটি কাক হাঁটাহাঁটি করছে ঠিক বৃষ্টি পড়ার মতন শব্দ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সতী কি এই স্কুলেই পড়ে?

চন্দ্রনাথ বলল, গত বছর পর্যন্ত পড়ত। তারপর ফাইনাল পরীক্ষা দেয়নি। বীণাপাণি স্কুল ফাইনাল পাশ।

—এই স্কুলের কতজন প্রতি বছর পাশ করে?

—কোনোবার দুজন, কোনোবার তিনজন। আমার সময় একবছর সাত জন পাশ করেছিল...কী, বিশ্বাস হচ্ছে না? জিজ্ঞেস করে দেখো, সে বছরই এ স্কুলের রেকর্ড পাশ।

চন্দ্রনাথের কৃতিত্ব-গর্ব সামান্য চুপসে দেবার জন্য আমি বললাম, সাতজনই নিশ্চয়ই মেয়ে।

চন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ হেসে ফেলে বলল, ঠিক ধরেছ। তুমি কী করে বুঝলে? আমি মেয়েদেরই শুধু মন দিয়ে পড়াই এখনো।

দুর্জয় নন্দী একটা ছোট টুল হাতে নিয়ে ফিরে এলেন। এই ছোট্টখাট্টো মানুষটির ওপর গোটা স্কুলের দায়িত্ব। সত্যিই, কোনো ক্লাস থেকেই সেরকম গোলমাল শোনা যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথার পর চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করল, বিয়েটা করছেন তা হলে? আমরা নেমন্তন্ন খেয়েই ফিরব কলকাতায়।

দুর্জয় নন্দী বললেন, কী আর করব বলুন। এখানে যখন মাস্টারি নিয়ে আসি, তখনই জেলা বোর্ডের একজন বলেছিল, যাচ্ছো যাও, কিন্তু দেখো সদাই ঘোষের মেয়েকে ঠিক বিয়ে করতে হবে।

চন্দ্রনাথ আমার দিকে তাকিয়ে ব্যাখ্যা করার সুরে বলল এ পর্যন্ত আর একজন

হেড মাস্টারই সদাই জ্যাঠার এক মেয়েকে বিয়ে করেছেন। সে ভদ্রলোক পরে আর্মিতে চাকরি পেয়ে এখন পাঞ্জাবে থাকেন।

আমি বললাম, তোমাকেও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ওঁর আর এক মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য। তুমি তখন এখানকার হেড মাস্টার ছিলে না?

—আরে আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন গ্রামের ছেলে হিসেবে।

দুর্জয় নন্দী সচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি...মানে কোন মেয়েকে?

—সে মেয়ে এখন বিধবা।

—ওঁর মেয়েদের কুষ্ঠি নেই, আমার বাড়ির লোক আবার কুষ্ঠি দেখতে চায়...জাতের ব্যাপারটা মানতে রাজি হলেও কুষ্ঠি ছাড়া... এদিকে আর একটা ব্যাপার হয়েছে শুনেছেন তো?

—কী?

—সদাইবাবুর স্ত্রী একজন লোক মারফত খবর পাঠিয়েছেন আমি যেন ওদের ছোট মেয়েটাকে বিয়ে করতে রাজি হই। একি বখেরা বলুন দিকি মশাই?

—কেন, ছোট মেয়েটিকে আপনার পছন্দ নয়?

—পছন্দ অপছন্দের কী আছে। আমি মশাই একবার সংসার করেছি, আমার একটি ছেলে আছে, আমাকে তার কথা ভাবতে হবে। অতটুকু মেয়েকে বিয়ে করলে আমার চলবে কেন? আমি বরাবর ভেবে আসছি, উনি বুঝি বীণাপাণির কথা বলছেন। এখন শুনছি, তার নাকি অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক! কী বখেরা।

—শুনুন দুর্জয়বাবু, দুই বোনে মাত্র দু বছরের বয়েসের তফাত, বুদ্ধিতে ছোট মেয়েটি বড় মেয়েটির চেয়ে বেশি সেয়ানা। সুতরাং আপনার ছেলে মানুষ করাটা কোনো সমস্যা নয়। আপনার কি বড় মেয়েটিকেই বেশি পছন্দ!

—বললাম তো, আমার পছন্দ অপছন্দের কিছু নেই, ওঁর দুই মেয়েকেই তো আমি চিনি। আমার কাছে পড়েছে। আমার কথা হচ্ছে, বিয়ে যখন করতেই হবে, তখন সংসারের সুবিধের কথা চিন্তা করে।

—তা হলে ছোট মেয়েটিকেই বিয়ে করে ফেলুন। আমি বলছি, তাতেই আপনি বেশি লাভবান হবেন।

—আপনি আমার অসুবিধা বুঝছেন না। ঐ ছোট মেয়েটি, সতী, ইস্কুল ফাইনাল দেয়নি। আজকালকার দিনে একটা পাশ করে রাখা দরকার, বিশেষ করে ক্লাস টেন পর্যন্ত যখন পড়েইছে। তাহলে ধরুন, ওকে বিয়ের পর আমাকে পড়াতে হবে।

—তা পড়াবেন। আপনি পড়ালে তো পাশ করবেই, বিশেষ করে যখন নিজের বৌ।

আমার মনে হলো, দুর্জয় নন্দী যেন বলতে চাইছেন বিয়ের পর তিনি নিজের বৌকে এক বছর পড়ালে সেটা একটা প্রাইভেট টিউশানির মতনই হলো, কিন্তু সেজন্য তো তিনি মাইনে পাবেন না, সুতরাং সেটা একটা ক্ষতির ব্যাপার।

দুর্জয় নন্দী বললন, তা না হয় পড়ালুম। কিন্তু বিয়ের পর তো আমার ছেলেকে আমার কাছে এনেই রাখতে হবে। বউ যদি পড়াশুনোয় ব্যস্ত থাকে, তাহলে তাকে দেখবে কে? একটা লোক রাখতে হবে।

অর্থাৎ তাতেও অতিরিক্ত খরচ।

চন্দ্রনাথ বলল, আরে মশাই ওসব কথা ছাড়ুন। আসল ব্যাপারটা কী জানেন? ঐ সতী আপনার প্রেমে পড়ে গেছে। ও আপনাকে বিয়ে করার জন্য একেবারে পাগল! এমন ভালোবাসা আর অন্য কারুর কাছ থেকে পাবেন না। আমার বন্ধু নীলুকে জিজ্ঞেস করুন, ও সব জানে।

দুর্জয় নন্দী আমার দিকে তাকিয়ে কী যে বলেন ধরনের একটা হাসি দিলেন।

এত রকম হিসেব নিকেশের কথা শুনে আমি প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। এখানে প্রেম কথাটা উচ্চারণ করাও অসঙ্গত। বিয়ের নামে এখানে দর কষাকষি চলছে।

মুখে কিছু না বলে, 'প্রেম আবার কী জিনিস' এই ধরনের একটি হাসি দিলাম আমি দুর্জয় নন্দীর দিকে।

আমার মনে পড়ল, এই মেদিনীপুরেরই অন্য এক প্রান্তে আমি আর একটি বিয়ে দেখেছিলাম। কাঁকড়াঝোড়ের ঘন জঙ্গলে। পাত্রটি একজন পাথর-কোঁদা, মেঘ-কালো তরুণ, জাতিতে শবর। ওরা বলে সব্বর! সে একটি গাছের ওপর তরতর করে উঠে পাত্রীপক্ষকে জানায়, সেই বড় কুসুম গাছটা পর্যন্ত জঙ্গলটা আমার, নদীর খাতটা আমার, ঐ ন্যাড়া পাহাড় চূড়া পর্যন্ত আমার।

অবশ্য এসব কিছুই তার সম্পত্তি নয়। এই এলাকায় সে শিকার করতে পারে, জঙ্গলের ফলমূল ও মাটির তলার মেটে আলু বার করতে পারে। এই তার যোগ্যতার প্রমাণ।

দুর্জয় নন্দী আর একটা হাসি দিলেন, যার অর্থ, 'এর মধ্যে আবার প্রেমের কথা উঠল কেন? ইস্কুলের হেড মাস্টারের ঘরে বসে প্রেমের কথা, ছি ছি।'

আমিও আর একটি অন্যরকম হাসি দিলাম যার অর্থ 'বুঝলেন না, চন্দ্রনাথ ইয়ারকি করছে। গ্রামে-ট্রামে প্রেম বলে আবার কিছু আছে নাকি?''

চন্দ্রনাথ উঠে এসে হেড মাস্টারের পিঠ চাপড়ে বলল, আরে ভাই, সদাই জ্যাঠা এতই যখন করছেন, এমন সাজল্লতার বিয়ে দিচ্ছেন, তখন সতীর পড়ার খরচ কিংবা আপনার ছেলের দেখাশুনো করবার জন্য একজন লোক রাখার খরচ

তিনি দিতে পারবেন না? নিশ্চয়ই পারবেন। আর আপনাকেও বলি, বিয়ে যখন করছেন, তখন দেখে শুনে একটু বেশি সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করাই তো ভালো। বীণাপাণির চেয়ে সতী বেশি দেখতে ভালো না? বলুন? কী, বলুন?

চন্দ্রনাথের ব্যগ্রতার ফলেই যেন দুর্জয় নন্দী বললেন, তা বটে।

—তা হলে? আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতুম তা হলে আমি ঐ সতীকেই বিয়ে করতুম।

—বলছেন?

—হ্যাঁ বলছি।

—তা হলে আপনি বলছেন যখন।

চন্দ্রনাথ উৎফুল্ল হয়ে বলল, বাঃ, এই তো সব বেশ ঠিকঠাক মিটে গেল। তাহলে সেলিব্রেট করা যাক। নীলু, আমাদের দুজনকে সিগারেট খাইয়ে দাও।

আমিই যেন কন্যাকর্তা, এই ভঙ্গিতে আমি সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলাম, বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কনুইটা ছুঁয়ে।

ঢং ঢং করে ঘন্টা বেজে উঠল।

দুর্জয় নন্দী চঞ্চল হয়ে উঠতেই চন্দ্রনাথ আদেশের সুরে বললেন, দাঁড়ান মশাই, উঠছেন কোথায়?

যেন চন্দ্রনাথই এখনো এই স্কুলের হেড মাস্টার, দুর্জয় নন্দী উঠতে গিয়েও বসে পড়লেন।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করল, এখন আপনার কোন ক্লাস?

—ক্লাস টেন।

—ওঃ, ক্লাস টেন? আপনার বিয়ের মতন গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, এই উপলক্ষে ক্লাস টেনকে একদিন অনায়াসেই এক পীরিয়ড আগে ছুটি দেওয়া যায়। ওদের যথেষ্ট পড়াশুনো হয়েছে। যান, ছুটি দিয়ে আসুন। আর দয়ালকে বলুন না, যদি আমাদের চা খাওয়াতে পারে—

প্রাক্তন হেড মাস্টারের হুকুম তামিল করতে বেরিয়ে গেলেন বর্তমান হেড মাস্টার। দুর্জয় নন্দীর মুখে একটা তেলতেলে বিনয়ের ভাব ফুটে উঠেছে। যতই বিষয়ী লোক হোক বিয়ের কথাবার্তায় সবাই একটু বদলে যায়।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে অন্যান্য কথাবার্তার মধ্যে দুর্জয় নন্দী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলুন তো, বীণাপাণির সঙ্গে আমার বিয়েতেই বা বাধাটা কোথায়? কার আপত্তি?

চন্দ্রনাথ বলল, কারুর আপত্তি নেই, বীণাপাণির সঙ্গে ঐ গ্রামের পাত্রটির যে আগেই বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, সেই জন্য।

—ও

—কেন, বীণাপাণিকেই আপনার বেশি পছন্দ নাকি? তা হলে বলুন, সেই ব্যবস্থাই করি।

—না, না, সেসব কিছু নয়। আমার কাছে দুজনেই সমান। তবে কিনা সতীর সঙ্গে আমার বয়সের তফাতটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে।

—এমন কিছু তফাত নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়েসের একটু বেশি ব্যবধান থাকাই ভালো। এই দেখুন না আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার এগারো বছরের তফাত।

চন্দ্রনাথের এই কথাটা যে ডাহা গুল তা বলাই বাহুল্য। চন্দ্রনাথ অত্যন্ত দ্রুত এসব কথা বানিয়ে বলতে পারে।

চন্দ্রনাথ খানিকটা মুখ ঝুঁকিয়ে এনে আবার বলল, তা ছাড়া বীণাপাণি তো পালিয়ে যাচ্ছে না। সে আপনার বড় শ্যালিকা হচ্ছে—শ্যালিকাদের সঙ্গে তো আপনার রসের সম্পর্ক থাকবেই।

দুর্জয় নন্দী নাক দিয়ে হেসে শব্দ করলেন, হুঁ।

একটু বাদে আমরা উঠে পড়লুম। চন্দ্রনাথ বন্ধুভাবে দুর্জয় নন্দীর কাঁধে হাত দিয়ে বলল, আমি ঘটকালি করলাম। বিয়ের পর একদিন আপনিও আমাকে খাওয়াবেন কিন্তু। তাহলে সদাই জ্যাঠাকে খবরটা জানাতে পারি তো?

দুর্জয় নন্দী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

বাইরে বেরিয়ে এসে চন্দ্রনাথ বলল, ব্যাপারটা বেশ সহজেই মিটে গেল। এত সহজ হবে আমি ভাবিনি। দুর্জয় ছেলেটার কী দারুণ পাটোয়ারি বুদ্ধি, বিয়ের পর বউকে পড়াতে হবে বলে সে টাকাটাও শ্বশুরের কাছ থেকে আদায় করতে চায়।

আমি দুর্জয় নন্দীর পক্ষ সমর্থন করবার জন্য বললুম, হয়তো ও ঠিক ওরকম ভাবে ভাবেনি। এমনও তো হতে পারে যে বীণাপাণিকেই ওর বেশি পছন্দ। শেষকালে যেমনভাবে হঠাৎ একবার বীণাপাণির কথা জিজ্ঞেস করল—

চন্দ্রনাথ বলে উঠল, আবার প্রেম? ও ভাই, তোমাদের মতন লেখকদের নিয়ে আর পারা যায় না। তোমরা প্রেম ছাড়া আর কিছু দেখতে পাও না। ঐ সব প্রেম-ট্রেম আছে শুধু বুর্জোয়া আর পাতি বুর্জোয়া সমাজে। গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ ওসব কিছু বোঝে না।

বেশ লাগসই প্রগতিশীল কথা। আজকাল স্কুল-কলেজের শিক্ষক মহলে এই ধরনের কথা খুব চালু হয়েছে। আমাদের ছাত্র বয়েসে শুধু ছাত্ররাই ছিল প্রগতিশীল আর শিক্ষকরাই প্রতিক্রিয়াশীল। সেইসব ছাত্ররাই তো এখন শিক্ষক হয়েছে, তাই তাদের মুখে এখন প্রগতিশীল কথাবার্তা শোনা যায় এখনকার ছাত্রদের সঙ্গে গলা

মিলিয়ে। তবে, নতুন ছাত্ররা একধাপ এগিয়ে যখন বেশি প্রগতিশীল হয়, পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটাকেই বানচাল করে দিতে চায়, তখন আবার শিক্ষকরা বাপ বাপ করে ওঠেন।

প্রগতিশীলই হোক আর প্রতিক্রিয়াশীলই হোক, আমাদের দেশে এদের সবার মধ্যেই একটা ব্যাপারে খুব মিল আছে। মুখে যে-সব বড় বড় আদর্শের কথা বলা হবে, নিজের জীবনে তা অনুসরণ করার দরকার নেই। চন্দ্রনাথ প্রেম ব্যাপারটাকে কথার ঝোঁকে বুর্জোয়া আখ্যা দিল, সে নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে নিজের বিয়ের ব্যাপারটা ভুলে গেছে। হায় প্রেম, তোমার ওপর আজকাল সকলেরই বড্ড রাগ। আমি একা আর কতদিন তোমার ধ্বজা তুলে রাখব!

চন্দ্রনাথ বলল, এই দুর্জয় ছোকরার যদি বীণাপাণিকে তেমন পছন্দই হবে, তাহলে সে আমার দু-চারটে কথায় তো ভুলে গিয়ে সতীকেই বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল? এ কী রকম প্রেম ভাই? কোনো মহান লেখক এরকম প্রেমের কথা লিখেছেন?

আমি আর কিছু বললুম না।

চন্দ্রনাথ ফের বলল, ঐ দুর্জয়টা আগে খুব বারফাট্টাই মারত যে, ওরা এগারো ঘরের তিলি, সদাই জ্যাঠা সদগোপ বলে তার মেয়ে বিয়ে করবে না। যেন তিলিরা সদগোপের চেয়ে উঁচু। হুঁ! ওরা জানেই না যে শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা কিংবা শ্রীরাধিকার স্বামী ছিলেন সদগোপ। কোনো তিলির কথা রামায়ণ মহাভারতে আছে? ও আবার বুঝবে প্রেমের মর্ম।

দেখা যাচ্ছে, চন্দ্রনাথের যত রাগ শুধু প্রেমের উপর। আমি চুপ করেই রইলুম। চন্দ্রনাথকে আর মনে করিয়ে দিলুম না যে শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা কিংবা শ্রীরাধা বা তার স্বামীটামির ব্যাপারও রামায়ণ মহাভারতে নেই। চন্দ্রনাথকে এখন প্রগতিশীল কথাবার্তায় পেয়ে বসেছে, বলুক।

স্কুল কম্পাউণ্ড থেকে বেরুবার সময় আমি একটা বাবলা গাছ থেকে একটা কাঁটা ভেঙে এনেছিলুম। কাঁটাটা মাঝে মাঝে বাঁ হাতের তালুতে আলতো করে ফোটাতে লাগলুম—একটু একটু ব্যথার অনুভূতি বেশ মধুর লাগে।

হঠাৎ অন্যমনস্কতাবশত কাঁটাটা প্যাট করে ফুটে গেল হাতে। তার পরই প্রথমে ছোট্ট একটা রক্তবিন্দু। সেটা বড় হতে লাগল ক্রমশ। অকারণ রক্তপাত। অনেকে নিজের রক্ত জিভ দিয়ে চেটে নেয়। কিন্তু আমি একেবারেই রক্তপায়ী নই, এমনকি নিজের রক্তও মুখে ঠেকাতে আমার ঘেন্না করে।

চন্দ্রনাথ যত সহজে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলবে ভেবেছিল, তা হলো না। সদাইবাবু সব কথা শুনে দারুণ, উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এবং রাগের চোটে

তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে লাগলেন। তাঁকে না জানিয়ে পাত্রপাত্রী ওলোট পালোট? এ তিনি কিছুতেই সহ্য করবেন না। তার একটা কথার দাম নেই? তিনি বেঁচে থাকতেই এতদূর স্পর্ধা? না, তা অসম্ভব, তিনি যেমনভাবে ঠিক করেছেন, তেমনভাবেই তাঁর দুই মেয়ের বিয়ে হবে। তার একটু নড়চড় হলে তিনি তিন মাসের আগেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করবেন।

তৃতীয় উঠোনের কাঁঠাল গাছ কিংবা এঁচোড় গাছটির তলায় দাঁড়িয়ে সদাই জ্যাঠা বললেন, তুই শুনে রাখ চাঁদু, বিয়ের রাতে একটু কিছু অন্যথা হলেই আমি এই গাছে দড়ি টাঙিয়ে ঝুলব। আমার মুখের কথাই হলো হাতি কা দাঁত।

৮

আজ রাতে ইঁদুররা এলো না কেন?

ওদের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেছে। বস্তুত ওরা আসেনি বলে আমি বেশ ছটফট করতে লাগলুম। ঘুমের তো প্রশ্নই ওঠে না। ওরা এসে জানান দেবার পর আমি রোজ রাতে জানলার ওপর আলু সাজিয়ে দিই। ওরা কিচির মিচির শব্দে আমাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে ভোজনপর্ব শুরু করে।

বেশ কিছুক্ষণ জাগ্রত অবস্থায় কাটল। পায়ের দিকের জানলার আকাশে চাঁদ এসে উঁকি মেরেছে। তবু ইঁদুরের দেখা নেই, এ রকম তো একদিনও হয়নি।

হঠাৎ সন্দেহবশে টর্চটা জ্বেলে খাটের তলাটা দেখলাম। হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই। আলু নেই একটাও। গৃহস্বামী দিনের বেলা কোনো সময়ে আলুগুলো সব নিয়ে গেছেন। সে কথা আমি জানলাম এই মাত্র, কিন্তু ইঁদুররা নিশ্চয়ই আগে থেকে খবর রেখেছে। সুতরাং আজ ওরা গেছে অন্য কোনো বাড়িতে। অকৃতজ্ঞ কোথাকার।

সেই যে ঘুমটা চটে গেল, আর ঘুম আসার নামগন্ধ নেই।

কোথায় যেন খোল করতাল সহযোগে বাজনা চলছে, টুকরো টুকরো গানের আওয়াজও আসছে ভেসে। রোজই ঘুমের আগে শুনি।

চন্দ্রনাথের নিষেধ সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়লুম। হাতে টর্চ, তা ছাড়া আজ শুক্লা রজনী, পথঘাট পরিষ্কার দেখা যায়। অথবা, এমন আরও অনেক কিছু এই সময়ে দেখা যায়, যার আসলে কোনো অস্তিত্ব দিনের বেলার বাস্তবে নেই। যেমন মেজদার বাড়ির সামনের এই কালো পচা জলের দীঘিটির গাম্ভীর্য। আর কোনোদিন তো দিনের বেলা এই দীঘিটি সম্পর্কে একথা মনে হয়নি! অনেকেই ডোঙ্গা দিয়ে এই

দীঘি থেকে জল সেচ দেয় খেত জমিতে, দীঘিটি কোনো আপত্তি করে না। অথচ এখন মনে হচ্ছে, দীঘিটির জলে হাত দিলেই রেগে ছোবল মারবে।

বাজনা ও গানের শব্দ অনুসরণ করে এগোতে লাগলুম। শেষ পর্যন্ত যেখানে পৌঁছালুম, সেটা ক্যাওট পাড়া। চন্দ্রনাথ একদিন চিনিয়ে দিয়েছিল। এরাই রোজ রাত্রে গান গায়। সত্য সেলুকাস।

ক্যাওটরা চুবড়ি, ঝুড়িটুড়ি বানিয়ে বিক্রি করে, মাছ নেই যে-সব নদী বা পুকুরে সেখানে সারাদিন জাল ফেলে। ছেলেমেয়েরা গৃহস্থ পাড়ার বাড়িগুলোর আদাড় থেকে আলুর খোসা, পোকা ধরা বেগুন কুড়িয়ে আনে। এরা অস্পৃশ্য, এরা ঐসব বাড়ির ভিতরে ঢোকে না।

চাষের সময় এরা দিন মজুরির কাজ পায়। সরকার দৈনিক মজুরির রেট বেঁধে দিয়েছে আট টাকা দশ পয়সা, কিন্তু এরা চার টাকা এবং পেট চুক্তি খাদ্যেই রাজি হয়ে যায়। সবাই বলে এরা দুবেলা চার টাকা দশ পয়সার অনেক বেশি ভাত খেয়ে ফেলে। তাও বছরে কয়েক মাস মাত্র। বছরে সেই কয়েক মাস বেশি করে খেয়ে নিয়ে এরা কি সেই খাদ্য জমিয়ে রাখে শরীরে, তাই দিয়ে সারা বছর চালিয়ে দেয়?

এরা অস্পৃশ্য, কিন্তু এদেরই হাতে বোনা ধান ছড়িয়ে যায় গ্রামে গঞ্জে শহরে।

এখনো ধান বোনা শুরু হয়নি। চন্দ্রনাথ বলেছিল, এই সময়টাই ওদের সবচেয়ে কষ্টে যায়। দিনের পর দিন ভাত জিনিসটা চোখেই দেখে না। তবু কী ভাবে বেঁচেবর্তে থাকে? হয়তো, চন্দ্রনাথেরই ভাষায়, ম্যাজিকে।

এরা গ্রামের মূল জীবনের সঙ্গে যুক্ত নয়, এরা থাকে গ্রামের বাইরের দিকে, সেই জন্য এরা কবে কী খেল না খেল, তাই নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

ক্যাওট কথাটার মানে কী, তা আমি জানি না। এক ধরনের লোক আছে, যারা এই শব্দও উল্টে পাল্টে একটা সংস্কৃত মূল বার করে দিতে পারে। অস্পৃশ্যদেরও সংস্কৃত মূল!

ওদের পল্লীর একেবারে পাশে এসে পৌঁছে গেছি আমি। ভয় হচ্ছে, হঠাৎ না কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠে।

আলো জ্বালবার বিলাসিতা ওদের নেই। চাঁদের আলোতেই কারুর বাড়ির উঠোনে বসেছে গান বাজনার আসর। একজন চ্যাচাচ্ছে খুব জোরে, নেশা-টেশ করেছে নাকি? নেশার দ্রব্য কেনার পয়সা কোথায় পায়? অবশ্য সাঁওতাল পাড়া দেখেছি, হাঁড়িয়া খেয়ে তারা নেশাও করে আবার পেটও ভরায়। আট আনার ভাত খেলে কিছু হয় না, কিন্তু আট আনার হাঁড়িয়া খেলে যথেষ্ট পেট ভরে এবং বেশ টলটলে নেশা হয়। আমি নিজে খেয়ে দেখেছি। এরাও কি হাঁড়িয়া বানায়?

গানের কথাগুলো কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু গায়কের উৎসাহের একটুও অভাব নেই, চিৎকারে আকাশ খানখান করছে। বাকি গ্রামটা নিস্তব্ধ। ভদ্র গৃহস্থ বাঙালিরা রাত্রে এমন চেঁচিয়ে গান গায় না। যারা পেট ভরে ভাত খায়, তারা অল্প রাতেই ঘুমোয়। অথচ এরা গান গায় নাচে প্রত্যেকদিন। গান গেয়ে ভূত তাড়াবার কথা শুনেছিলাম, কিন্তু গান গেয়ে খিদেও তাড়ানো যায় নাকি?

হঠাৎ একটা হাসির হুল্লোড় শোনা গেল। কেউ বোধহয় নাচতে নাচতে পড়ে গেছে মনে হচ্ছে। এরা এত হাসছে, কিসের জোরে, ম্যাজিকে?

আমার খুব ইচ্ছে হলো, ভেতরে ঢুকে ওদের দলের মধ্যে বসে পড়ি। কিন্তু একটা ভয়ও আছে। এরা যদি আমায় অস্পৃশ্য মনে করে? যদি চোখ রাঙিয়ে বলে, তুমি ভদ্রলোক হয়ে বিনা হুকুমে কেন আমাদের বাড়িতে ঢুকেছ? যাও, বেরোও।

সাঁওতালদের সঙ্গে কী ভাবে ভাব জমাতে হয় তা আমি জানি, কিন্তু ক্যাওটদের সম্পর্কে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। কুকুরের মতন একটা কোনো প্রাণীর নড়াচড়ার শব্দ শুনেই আমি ধীর পায়ে হাঁটতে লাগলুম উল্টো দিকে। কুকুরে তাড়া করলে দৌড়তে নেই, বারবার জপতে লাগলুম এই কথাটা।

ওদের গান এখনো চলছে, কতক্ষণ চলে কে জানে—সাবা রাতই নাকি? কিছু দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে ফিকে আওয়াজ। স্নিগ্ধ বাতাস ও চাঁদের আলোর মায়াবী প্রভাবে আমার তখনই ফিরে গিয়ে শুতে ইচ্ছে করল না। গ্রামের রাস্তা দিয়ে গেলে কেউ চোর টোর ভাবতে পারে। মাঠ দিয়ে যাওয়াই ভালো। কেন জানি না, আমাব সাপের ভয়টা হঠাৎ একদম চলে গেছে। একটু আগে ঠিক করেছি, কাল বা পরশু এখান থেকে ফিরে যাব। ফেরবার আগের দিনই সাপের কামড়ে মৃত্যু, এটা বড় নাটকীয় ব্যাপার হয়ে যায়।

খানিকটা হেঁটে প্রথমে একটা আলের ধারে তাল গাছের তলায় বসলুম। পরের মুহূর্তেই মনে হলো, রাত্তিরবেলা তাল গাছ জিনিসটা ভালো না, এর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকাই উচিত। উঠে গিয়ে বেশ খানিকটা দূরে বসলুম আবার। এখান থেকে ক্যাওট পাড়ার গান আর শোনা যায় না।

রাত্রের পৃথিবীর মধ্যে একটা চিরকালীন ব্যাপার আছে। দিনের বেলা চোখে দেখা জগৎটাকে মানুষের ইতিহাস বারবার বদলে দিয়েছে। কিন্তু রাত্রিবেলা এইরকম ফাঁকা প্রান্তরের মাঝে মাঝে এক একটি পল্লী, সেখানকার মানুষ তো হাজার হাজার বছর ধরে এমনই ঘুমন্ত। একই রকম জ্যোৎস্না, একই রকম আকাশ। একই রকম হাওয়া।

টর্চটা জ্বেলে সেই টর্চের মাথা দিয়েই আমি অন্যমনস্কভাবে মাটিতে ঘষে

ঘষে নিজের নামটা লিখতে লাগলাম। টর্চ দিয়ে একই সঙ্গে দেখা ও লেখার কাজ চলে। একটু পরে বৃষ্টি পড়লেই নামটা মুছে যাবে, কিংবা কাল সকালে মিলিয়ে যাবে লোকের পায়ে পায়ে, তবু লোকে এরকমভাবে নাম লেখে। এই নরম সুন্দর শান্ত চিরকালীন রাত্রির আকাশের নীচের পৃথিবীতে আমার নিজের একটা চিহ্ন রেখে যেতে ইচ্ছে হয়।

তারপর, মনে হলো যেন কয়েক মূহূর্ত কেটেছে, আমি চোখ মেলেই দেখি ভোর হয়ে গেছে। আমি ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। কী কাণ্ড! আমি এই মাঠের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছি? টর্চটা এখনো জ্বলন্ত অবস্থায় পাশে পড়ে আছে। চাষীবা অনেক ভোরে মাঠে আসে, কেউ এ অবস্থায় আমায় দেখলে কী ভাবত? কখন ঘুমোলাম, টেরই পাইনি, এমন অদ্ভুত কাণ্ড আমার জীবনে খুব কমই ঘটেছে।

সারারাত হিমে ভিজে শরীরটা ভারী লাগছে। চন্দ্রনাথ টের পেলে খুব বকাবকি করবে। আমার ভালো মন্দ কিছু হলে ওরই যেন সব দায়িত্ব। চন্দ্রনাথ ঘুম থেকে ওঠবার আগেই বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়া দরকার।

মাঠের এক প্রান্তে দু-একজন লোককে এরই মধ্যে দেখা গেল। আমি যেন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলুম এই ভঙ্গিতে উদাস উদাস ভাব করে হাঁটতে লাগলুম। বিছানায় গিয়ে শুতেই আবার ঘুম এসে গেল।

দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙল চ্যাঁচামেচির শব্দে। মনে হলো আওয়াজটা যেন আসছে চন্দ্রনাথেরই বাড়ি থেকে। তার মধ্যে কয়েকটি স্ত্রীকণ্ঠও আছে। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, হ্যাঁ, তাই তো, চন্দ্রনাথের বাড়িতেই গোলমাল।

পাজামার ওপর পাঞ্জাবিটা চাপিয়ে নিচে নেমে সেদিকে এগিয়ে গেলাম হনহনিয়ে। না, গণ্ডগোলটা ঠিক চন্দ্রনাথের বাড়িতে নয়, তাদের প্রতিবেশীদের বাড়িতে। একজন কালো চেহারার ছেঁড়া ঝুলিবুলি শাড়িপরা বুড়িকে ঘিরে দাপাদাপি করছে তিনজন নারী-পুরুষ।

দাওয়ায় বসে চা খাচ্ছে চন্দ্রনাথ। আমায় দেখে সে বলল, একবার গিয়ে দেখে এলাম, তুমি অঘোরে ঘুমুচ্ছ। তোমার চাটা আমি খেয়ে নিয়েছি। দাঁড়াও, আবার চা করে দিচ্ছে।

আমি উঠোনে পা ঝুলিয়ে দাওয়ার একপ্রান্তে বসে পড়ে চোখের ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলাম, ও বাড়িতে কী চলছে?

চন্দ্রনাথ বলল, দামু পালিয়েছে।

আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। কাছাকাছি একটা গ্রামেই তো বাড়ি দামুর, সে আবার কোথায় পালাবে?

চন্দ্রনাথ অসীম বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে বলল, সকাল থেকে এদের

চেল্লাচেল্লিতে কান পাতা যায় না। সেই মোরগ ডাকা ভোর থেকে শুরু হয়েছে।

আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, দামু কিছু চুরি করে পালিয়েছে বুঝি?

—না-না, চুরি-ক্বুরি করেনি। তাহলে তো পুলিস কেস হতো। দামু বছর বাঁধা মুনিষ তো। সারা বছর সব কাজ করার কনট্রাকট কিন্তু কাল থেকে সে ডুব মেরেছে।

—জ্বরফর হতে পারে তো।

—দামু নিজের বাড়িতেও নেই। কাল থেকে ওদের গোরু নামানো হয়নি। ঐ যে বুড়িটা, ও দামুর মা, ওকে ধরে এনে ওরা দামুর বাপান্ত করছে। তবে একটা সুবিধে আছে, বুড়িটা কানে কিছু শুনতে পায় না, হাবার মতন সব কিছু দেখে যাচ্ছে।

আমি চোবা চোখে তাকিয়ে দেখলাম, দৃশ্যটি ঠিক তাই। তিন-চারজনের মিলিত বকুনি সত্ত্বেও বুড়িটা নির্বিকার। কিংবা সে ধরেই নিয়েছে যেন, শুধু বকুনি নয় দু-চার ঘা মারও তাকে খেতে হবে বোধহয়।

—ওরা দামুকে পুলিস দিয়ে ধরে আনতে পারে না?

—কী করে পুলিসকে জানাবে? দামুর সঙ্গে তো কোনো লিখিত কনট্রাকট নেই। এক বছরের মজুরির কোনো লিখিত কনট্রাকট হতেও পারে না। তবে ওরা পুরো টাকাটা আগেই দিয়ে দিয়েছে কিনা।

—পুরো টাকাটা আগে দিয়ে দিল কেন?

—এক সঙ্গে বছরের পুরো টাকা দিলে সস্তা হয়। দামু-টামুর মতন লোকেরাও সব টাকার জন্য কাকুতি-মিনতি করে, সেই টাকায় ওরা কোনো ধার শোধে। নইলে আর এমনি এমনি কেউ বছর বাঁধা মুনিষ হয়?

—পালিয়ে যাবে কোথায় ও?

—কে জানে।

চন্দ্রনাথ উঠে পড়ে বলল, না, এখানে আর বসা যাচ্ছে না। তারপর সে প্রতিবেশীদের উদ্দেশ্যে বিদ্রূপাত্মক সুরে চেঁচিয়ে উঠল, ধূর।

সারাদিন চন্দ্রনাথ খুব ব্যস্ত রইল। আমি শুয়ে শুয়ে বই পড়লাম। প্রচণ্ড রোদ, বাইরে ঘোরাঘুরি করবার উপায় নেই।

দুপুরে খেতে বসার সময় কিছু খবর পেলাম চন্দ্রনাথের কাছ থেকে। তখন প্রতিবেশীদের উঠোনের কোলাহল শান্ত। দামুকে পাওয়া যায়নি এখনো, তার সন্ধানে নানা দিকে লোক গেছে।

চন্দ্রনাথ বলল, সদাই জ্যাঠার বাড়িতে সব ব্যাপারটা এমন জট পাকিয়ে গেছে যে খোলাই শক্ত।

মল্লিকা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, বাব্বা, এমন কাণ্ড সাত জন্মে শুনিনি।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, বিয়ে ভণ্ডুল নাকি ?

চন্দ্রনাথ বলল, না, সদাই জ্যাঠার গোঁ যে তিনি নির্দিষ্ট তারিখে বিয়ে দেবেনই। কিন্তু কার সঙ্গে যে কার বিয়ে তার এখনো ঠিক নেই। তুমি তো দেখলে দুর্জয় নন্দীকে আমি রাজি করালুম সতীকে বিয়ে করতে। তখন সদাই জ্যাঠা বেঁকে বসলেন। তাঁর অসাক্ষাতে তাঁর মেয়েদের বিয়ে সম্পর্কে কোনো আলোচনাই গ্রাহ্য করবেন না তিনি। আজ বীণাপাণিকে আমরা অনেকে মিলে চেপে ধরলুম। ওকে বললুম, তুই আর ঝামেলা করিস নে। দুর্জয় নন্দী দোজবরে তো কী হয়েছে। ওরকম অনেকেই বিয়ে করে। তোর ছোট বোন সে বিয়ে করবে দোজবরকে ? তোর লজ্জা করে না ? ওদিকে অন্য গ্রামের পাত্রটিও বলছে, দুই জামাইয়ের মধ্যে সে যখন বয়েসে ছোট, তখন সে ছোট মেয়েটিকেই বিয়ে করতে চায়। আবার দুর্জয় নন্দী বলছে, বারবার বদলা-বদলি ? এ কী ব্যাপার। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো একটি মেয়ে খুঁতো। তা হলে সে বিয়ে করবেই না। আমি তাকে আবার গিয়ে শাসালুম, দেখুন মশাই, এখন যদি পিছিয়ে যান, বিয়ে না করেন তাহলে আপনার ঘাড়ে মাথা থাকবে না।

মল্লিকা বলল, বীণাপাণি তো অন্য গ্রামের পাত্রটিকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

চন্দ্রনাথ বলল, দুর্জয় নন্দীকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে বলো। ঐ ছেলেটিকে বিয়ে করতে ও রাজিই ছিল আগে থেকে।

মল্লিকা বলল, ও হ্যাঁ হ্যাঁ। সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

আমি বললুম, গুলোবে না।? এ যে দেখছি কমেডি অব এররসকেও হার মানায়। আমার তো মাথায় কিচ্ছুই ঢুকছে না।

চন্দ্রনাথ বলল, সদাই জ্যাঠা কিন্তু এদিকে মাংসের অর্ডার, সন্দেশের অর্ডার দিয়েই চলেছেন। আর ছ'দিন বাদে বিয়ে হবেই হবে। দরকার হলে তিনি রাস্তা থেকে লোক ধরে এনে মেয়ের বিয়ে দেবেন।

রাত্রে খেতে বসে আরও কিছু খবর দিল চন্দ্রনাথ।

তার প্রতিবেশীর বাড়িতে সন্ধে থেকে আবার গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। দামুর বুড়ি মাকেও বাড়িতে বসিয়ে রাখা হয়েছিল, কেউ তাকে খাবার-টাবার কিচ্ছু দেয়নি। বোবা বুড়িটি সেই একই জায়গায় ঠায় বসেছিল। এখন তার উদ্দেশে চলছে আরও তর্জন গর্জন।

চন্দ্রনাথের প্রতিবেশীরা গ্রামের মুরুব্বিদের সাহায্য চেয়েছিল, যাতে দামুকে

ধরে আনার ব্যাপারে তারা সাহায্য করে। মাত্র পাঁচ মাসও কাজ করেনি দামু, পুরো বছরের টাকা নিয়ে পালিয়েছে, এ শোক সহ্য করা যায় না। কিন্তু গ্রামের লোকও এই সামান্য ব্যাপারে আগ্রহী নয়। সবাই অন্য দুটি ব্যাপার নিয়ে মত্ত।

গোলোক নামের সেই ছেলেটির বাবার শ্রাদ্ধের ব্যাপারে পুরুষ-দফায় কেউ রাজি হয়নি, গ্রামসুদ্ধ লোককেই খাওয়ানো হবে। সে নেমন্তন্নটি পরশুদিন। তার চারদিন পরেই সদাই জ্যাঠার মেয়ের বিয়ে। তিনি এমন ধুমধাম করবেন যে সে রকম কেউ কখনো দু-দশখানা গ্রামের মধ্যে দেখেনি।

মল্লিকা জিজ্ঞেস করল, কার সঙ্গে কার বিয়ে হবে, পাকাপাকি হয়েছে কিছু ?

চন্দ্রনাথ বলল, দুর্জয় নন্দীকে অনেকটা নরম করে এনেছি। সে জন্য খানিকটা ব্ল্যাকমেল করতে হলো। ও যে এক সময় বীণাপাণিকে আদর-টাদর করেছিল সে ইঙ্গিত দিয়ে বললুম মশাই, এসব কথা একবার রটে গেলে আপনার চাকরি থাকবে না, আর কোথাও চাকরি পাবেন না। তাতেই অনেকটা কাবু!

মল্লিকা বলল, তোমার এত বেশি বেশি গবজ দেখাবার কী দরকার!

চন্দ্রনাথ বলল, ওদিকে অন্য গ্রামের পাত্রটি নাকি খবর পাঠিয়েছে তার মায়ের খুব শখ যে ছেলে সোনার বোতাম পরে বিয়ে করতে যাবে—

আমি বললুম, থাক-থাক. আর শুনতে চাই না। আমার মাথা গুলিয়ে যাবে—

এই গ্রামে পরপর দুটি নেমন্তন্ন। আমি থাকলে আমাকেও ঐ দুটো নেমন্তন্ন খেতে হবে। কিন্তু এরকম খাওয়া আমার একেবারেই পছন্দ নয়।

আমি খুব শান্ত ভাবে বললুম, চন্দ্রনাথ—আমি কাল সকালে চলে যাব।

ভেবেছিলুম, চন্দ্রনাথ ও মল্লিকা দুজনেই হৈ হৈ শব্দে প্রতিবাদ করবে। কিন্তু সে রকম কিছু হলো না। মল্লিকা আড়ষ্ট হয়ে গেল। চন্দ্রনাথ আমারই মতন শান্ত গলায় বলল, আর ভালো লাগছে না ?

আমি বললুম, খুবই ভালো লাগছিল। কিন্তু আমি ভেবেছিলুম, এই নিরাপদ গ্রামে কোনো ঘটনা ঘটে না। কিন্তু হঠাৎ এত বেশি ঘটনা ঘটতে লাগল যে কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠছি। তোমরা এই ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে যেতে পার, আমি তো পারি না! আমি বাইরের লোক।

—তা ঠিক।

—কাল সকালে কটায় বাস ?

—সে জন্য তোমার চিন্তা নেই!

পরদিন সকালে শিশির ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে আমরা রওনা দিলাম। একটু পরে উঠলাম আলপথে। কোথায় যেন আমার নাম লিখে রেখেছিলাম

জমিতে। নিশ্চয়ই তা এখন মুছে গেছে।

চন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার আর বিশেষ কথাবার্তা হলো না। রামজীবনপুরে পৌঁছেই দু-চারজন চেনা লোক পেয়ে গেল সে। তাদের সঙ্গে ঐ একই ব্যাপারে আলোচনা চলল। আমি একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালুম। একটু পরেই এসে গেল আমার বাস।

এত সকালের বাসেই দারুণ ভিড়। চন্দ্রনাথ তার প্রভাব খাটিয়ে আমার জায়গা করে দিল ড্রাইভারের পাশে। সাড়ম্বরে বিদায় নেবার তো কিছু নেই। কদিন বাদেই কলকাতায় ওর সঙ্গে আবার দেখা হবে। বাস ছেড়ে দিতে আমি শুধু হাত নাড়লুম।

সোজা খানিক দূর বাসটা যাবার পর বাঁদিকের মাঠের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার বুকটা ধক করে উঠল—একজন কালো, লম্বা মতন লোক খুব জোরে দৌড়োচ্ছে মাঠের ওপর দিয়ে। সে যেন প্রাণপণে দিগন্তের দিকে ছুটে যেতে চায়।

কে ঐ লোকটা? দামু নয় তো? আমার মনে হলো হ্যাঁ, দামুই ছুটছে। দাসত্ব থেকে অত্যাচার থেকে অবিচার থেকে দামু ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। তাকে কেউ ধরতে পারবে না। একদিন সে আবার ফিরে আসবে। সে একা নয়, তার মতন আরও অনেককে নিয়ে সে ফিরে আসবে, তারপর এই অনৈতিক ব্যবস্থাগুলো তারা ভেঙে, গুঁড়িয়ে চুরমার করে এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে।

বাসটা বেঁকে যেতেই আমি তাকে আর দেখতে পেলাম না।

হয়তো ওই লোকটা দামু নয়। অন্য কোনো লোক। অতি তুচ্ছ কোনো কারণে মাঠ দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে। তবু আমার ওকে দামু হিসেবে ভাবতেই ভালো লাগে। অনেকক্ষণ ধরে সেই কথাই ভাবতে থাকি।

একুশ বছর বয়েসে

অনুরাধা ও সিদ্ধার্থ দাস মুখোপাধ্যায়কে

—হ্যালো, মাসিমা বলছেন? মাসিমা, আমি পিয়া-বাবুজীর মাস্টারমশাই।

—হ্যাঁ, কী ব্যাপার? বলুন—

—মাসিমা, আমি আমাদের পাশের বাড়ি থেকে ফোন করছি, আমার হঠাৎ একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।

—অ্যাঁ তাই নাকি? কী হয়েছে? ওঃ, আজকাল চারদিকে যা হচ্ছে না। এত সব খারাপ খারাপ খবর শুনছি...কী হয়েছে আপনার?

—সে রকম কিছু না। মানে, আমার বইয়েব আলমারিটা হঠাৎ উল্টে পড়ে গিয়ে—

—মাথায় লেগেছে?

—না। মাথায় না। ঠিক সময় মাথাটা সরিয়ে নিয়েছিলাম, আমার পায়ের ওপর।

-উঃ! ভেঙে গেছে? কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার?

—না, এমনই, খুব ব্যথা।

—এক্স-রে করিয়েছেন? করাননি? আপনি কি পাগল? এই সব ব্যাপারে দু'একদিন নেগলেক্ট করলেই...কোন ডাক্তার।

—আমাদের পাড়ার ডাক্তার দেখিয়েছি।

—নর্থ ক্যালকাটায় ভালো ডাক্তার আছে? ইয়ে. না, আছে নিশ্চয়ই, শুনুন, আমার মাসতুতো ভাই ছোটকু খুব বড় ডাক্তার, ও যে পি জি'র ডাঃ এন সি চ্যাটার্জি, মেডিসিনের হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট...ওকে দেখাবেন? ছোটকুকে বলে দেব আপনার বাড়ি যেতে?

—না, না, মাসিমা, সেরকম কিছু ব্যাপার নয়, আমার ধারণা শুধু মচকে গেছে, তিন চারদিন রেস্ট নিলেই।

—একদম বাড়ি থেকে বেরুবেন না। কোন পা?

—ইয়ে...ডান পা।

—উফ, খুব লেগেছিল নিশ্চয়ই? শুনুন, ঐ ডান পায়ের ওপর কোনো রকম স্ট্রেইন যেন না পড়ে...আমার ছোটকাকার ছেলে বাবলু, এখন ফিনান্সের সেক্রেটারি, ও ছোটবেলায় ফুটবল খেলতে গিয়ে পা ঐ রকম ভেঙেছিল, তখন

ভালো করে চিকিৎসা করেনি, এতদিন পর সেখানে ব্যথা শুরু হয়েছে...আপনি প্লাস্টার করিয়েছেন?

—না মাসিমা, প্লাস্টার বোধহয় করতে হবে না, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রেখেছি... তাহলে তিন চারদিন তো যেতে পারছি না—

—তিন চারদিনে সারে কখনো? অন্তত সাতদিন কমপ্লিট রেস্ট, শুনুন, আমার কথা শুনুন, একদম নেগলেক্ট করবেন না, পরে ওর থেকে যে কী হয়...

—মাসিমা, পিয়াকে বলে দেবেন, ওকে হোম-ওয়ার্ক দিয়ে এসেছি, যেন করে রাখে, আমি যদি চার পাঁচদিন পরে যাই, তখন দেখব। আর বাবুজীকে বলবেন 'মেঘনাদ বধ' থেকে যেন আরও এক পাতা মুখস্থ করে—

—হ্যাঁ, ওরা পড়াশুনা করে একেবারে উল্টে দেবে! ঠিক আছে আপনি ভালো হয়ে আসুন তো, আর শুনুন, সাবধানে থাকবেন কিন্তু। একবার আমার মেজদা, ঐ যে, যিনি কর্নেল...

—হ্যাঁ, মাসিমা। আচ্ছা মাসিমা, নিশ্চয়ই, হ্যাঁ। না-না, তা করব কেন। হ্যাঁ,...হ্যাঁ...হ্যাঁ। আচ্ছা, মাসিমা,...এইবার রাখি?

আমাদের শ্যামবাজার পোস্ট অফিসে টেলিফোনের কোনো আলাদা জায়গা নেই। যে ভদ্রলোক টেলিগ্রাম নেন, তার পাশেই টেলিফোন। আগাম পয়সা দিলে তিনি নিজেই ডায়ালের নম্বর ঘুরিয়ে দেন।

সেই ভদ্রলোক গালে হাত দিয়ে এক মনে আমার কথা শুনছিলেন।

আমার পিছনে দাঁড়িয়ে একটি গোলাপী রঙের শাড়ি পরা মেয়ে। বি-এ ক্লাসের ছাত্রী বলে মনে হয়। ওপরের ঠোঁটে ফোটা ফোটা ঘাম জমে গোঁফ হয়ে আছে। নিশ্চয়ই কোনো প্রাণের বন্ধুকে ফোন করবে। তাই চোখের পাতায় অধৈর্য। বাকি মুখখানা সুগম্ভীর। এই বয়েসী মেয়েরা একলা পোস্ট অফিস, রেল স্টেশন কিংবা সিনেমা হলে এলে শুধু গম্ভীর নয়, মুখখানা কঠোর করে রাখে। যেন সামান্য একটু হাসাও পাপ। অথচ এই মেয়েটিই নিশ্চয়ই নিজের কলেজের কমনরুমে কথার ফুলঝুরি।

মেয়েটি আমার আপাদমস্তক দেখে, বিশেষত আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে এমন একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি হানল, যেন আমার মতন মিথ্যেবাদী সে ভূ-ভারতে দ্বিতীয় আর একটি দেখেনি! মেয়েরা যেন কম মিথ্যে কথা বলে!

কাউন্টারের বাবুটি বললেন, তিন মিনিটের বেশি হয়ে গেছে, দুটো কলের দাম দিন!

পকেট থেকে খুচরো পয়সা বার করে দিয়ে বললুম, ধন্যবাদ।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে উৎপল, আশু আর ভাস্কর। আমি কাছে যেতেই

ভাস্কর বলল, তুই একটা ইডিয়েট! পা ভেঙে গেছে, আর তুই সেই ভাঙা পা নিয়ে পাশের বাড়ি গিয়ে ফোন করলি কী করে?

উৎপল বলল, হাত ভাঙা উচিত ছিল!

আমি বললুম, হাত-ভাঙা চট করে সারে না। পায়ের ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যায় না, একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটলেই হয়।

ভাস্কর বলল, বইয়ের আলমারি? তুই আর কিছু খুজে পেলি না? একটা ভালো মতন গল্পও বলতে পারিস না?

আমি বললুম, ঐ ঠিক আছে! ঐ মাসিমা এত ভালো, যা শুনবেন, তাই বিশ্বাস করবেন!

অংশু বলল, চল তাহলে, টিকিট কেটে আনি।

কিন্তু আরও দুটো জায়গা বাকি আছে। মিত্তিরদের বাড়িটা আমাদের পাড়ার কাছে। ওখানে এই গল্প চলবে না।...ফোনে আমার পা ভাঙার কথা বললেই বোধহয় আমার ছাত্র আমার বাড়িতে দেখতে আসবে কিংবা লোক পাঠাবে। আর ভবানীপুরের বাড়িটাতে ফোন নেই।

যে-ছেলেটি মানি-অর্ডারের ফর্ম লেখে, তার কাছে গিয়ে বললুম, ভাই, এক টুকরো সাদা কাগজ হবে?

কাগজটা নিয়ে তাতে লিখলুম : শ্রদ্ধাস্পদেষু, আমার ঠাকুমা হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি আছেন বহরমপুরের কাকার বাড়িতে। আমার ঠাকুমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। বোধহয় আর বাঁচবেন না, আমাকে শেষ দেখা দেখতে চেয়েছেন, তাই আমি আজই বহরমপুর চলে যাচ্ছি। আশা করি তিন চারদিনের মধ্যেই ফিরতে পারব। বাবলুকে বলবেন, ইতিহাস আর ইংরেজি যেন ভালো করে রিভাইজ করে রাখে। আমি ফিরে এসে ঠিক মেক-আপ করে দেব। কোনো উপায় নেই বলে আমায় এমন হঠাৎ চলে যেতে হচ্ছে। ইতি, বিনীত, বাবলুর মাস্টারমশাই।

উৎপল প্রথমে চিঠিটা পড়ল। তারপর বলল, হ্যাঁ, ভালো হয়েছে লেখাটা, বেশ কনভিনসিং। তুই কত বড় পাষণ্ড রে, নিজের ঠাকুমাকে হঠাৎ মুমূর্ষু বানিয়ে ফেললি?

আমি বললুম, ধ্যাৎ! আমার ঠাকুমা কবে মরে গেছেন। তাকে আমি চোখেই দেখিনি। তাঁকে আবার মুমূর্ষু বানালে কোনো দোষ আছে?

ভাস্কর বলল, এবার ফিরে এসেও তোর ঠাকুমাকে মেরে ফেলিসনি। আবার বাঁচিয়ে তুলিস, পরে আবার কাজে লাগতে পারে।

উৎপল বলল, মেরে ফেললেই অশৌচ-ফশৌচের ব্যাপার দেখাতে হবে।

আশু একটু ভালো ছেলে ধরনের। সে এই সব ব্যাপার ঠিক পছন্দ করতে

পারছে না, চুপ করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে।

চিঠিটা ভাঁজ করে ভাস্করকে বললুম, তুই এটা মিত্তিরদের বাড়িতে দিয়ে আয়।

ভাস্কর বলল, মাথা খারাপ! আমি ও বাড়ির মধ্যে ঢুকতে পারব না! কুকুর আছে!

—তোকে ভেতরে ঢুকতে হবে না। গেটে দারোয়ানকে দিয়ে এলেই হবে।

ভাস্কর চিঠি দিতে গেল, আমরা ঢুকলুম মলয় গ্রীলে চা খেতে। ভবানীপুরের বাড়িটাতে আর কিছু করা যাবে না। ওখানে এমনিই ডুব মারতে হবে, না বলে কয়ে।

উৎপল সিগারেটের প্যাকেটটা বার করতেই আশু চাপা গলায় বলল, এই ধীরেশবাবু...।

সঙ্গে সঙ্গে প্যাকেটটা চলে গেল টেবিলের নিচে। এ পাড়ায় আমাদের নির্ভয়ে সিগারেট টানার উপায় নেই। কাছেই একটা স্কুলে আমরা পড়েছি। আমরা ছিলুম সেই ইস্কুলের দুর্দান্ত, ডানপিটে ব্যাচ, তাই সব মাস্টারমশাই এখনো মনে রেখেছেন আমাদের।

ধীরেশবাবু একেবারে পেছন দিকটায় টেবিলে বসে একা চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছেন। চোখাচোখি হলেই প্রণাম করতে হবে। ভাস্কর আসবার আগেই তাড়াতাড়ি চা শেষ করে উঠে পড়লুম আমরা।

ভাস্কর চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পড়বার জন্য আর্টিকলড ক্লার্ক হয়েছে। উৎপল এক ব্রিটিশ কোম্পানিতে অফিসার্স ট্রেনী হিসেবে ঢুকেছে, আর আশুদের নিজস্ব ব্যবসা আছে। একমাত্র আমিই বেকার। লোকের কাছে সে কথা স্বীকার করি না অবশ্য, অন্যদের বলি, আমি হায়ার ম্যাথমেটিকস নিয়ে রিসার্চ করছি। যদিও আই এস সি'র পর আর কোনোদিন আমি অঙ্কের মুখও দেখিনি। কিন্তু বেকারজীবনে টাকাপয়সার ব্যাপারটা ম্যানেজ করা হায়ার ম্যাথমেটিকস ছাড়া আর কী!

গোবিন্দবল্লভ পন্থ মারা যাবার জন্য আজ ছুটি, কাল শনিবার, পরশু রবিবার, সোমবার আবার মহরম। উৎপল-ভাস্কররা টানা চারদিন ছুটি পেতে পারে। সুতরাং এই চারদিন কলকাতায় থাকার কোনো মানে হয় না। মুশকিলটা শুধু আমাকে নিয়েই, টিউশানিতে নিজের ইচ্ছে মতন একটানা চারদিন ছুটি নেওয়া যায় না। এতে ক্যাজুয়ল লীভ আছে, আর্নড লীভ নেই।

বহরমপুর নয়, যাব বেরহামপুর। হাওড়া স্টেশনে এসে আমি বন্ধুদের মাঝখানে লুকিয়ে লুকিয়ে হাঁটতে লাগলুম। আমার মুখে একটা চোর চোর ভাব। চেনাশুনো কেউ আমাকে দেখে ফেললেই মুশকিল!

ট্রেনে ওঠার পর একেবারে নিশ্চিন্ত।

থার্ড ক্লাস কামরাটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলুম, সব্বাই ভিন্ন গ্রহের অধিবাসী। এবার চালাও পানসি বেলঘরিয়া!

বেহ্‌রামপুর থেকে বাস। গোপালপুর অন্‌-সী-তে, উৎপলদের অফিসের ম্যানেজারের চেনা এক ভদ্রমহিলার একটি কটেজ আছে, তিনি সেটা ভাড়া দেন।

এই আমার দ্বিতীয় সমুদ্র দর্শন। খুব ছেলেবেলায় একবার পুরীতে গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু ভালো মনে নেই। কিংবা স্মৃতিতে সেই সমুদ্র বড্ড বেশি অলীক হয়ে আছে। পুরীর সমুদ্রে কি পাঁচতলা বাড়ির সমান ঢেউ ওঠে? স্বর্গপুরীর ঠিক ডানদিকে কি একটা কালো পাথরের আকাশ-ফোঁড়া দুর্গ আছে? অথবা মেঘ ছিল সে রকম! জগন্নাথ মন্দিরের চূড়া থেকে কি জাঙ্গিয়া পরা তরুণী মেমসাহেবরা সমুদ্রে লাফ দেয়? আর একবার পুরী গিয়ে মিলিয়ে দেখতে হবে।

বাস থেকে নেমে আমরা সোজা চলে এলুম সমুদ্রের দিকে। মালপত্র তো বিশেষ কিছু নেই। শুধু একটা করে কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগ। গোপালপুরের সমুদ্রকে প্রথম দেখেই বুকটা ধক্‌ করে উঠল। কলকাতায় বসে তো সপ্তাহে একবার-দুবার সমুদ্র দেখিই! হলিউডের সিনেমায়। কিন্তু সে দেখার সঙ্গে এ দেখার কোনো তুলনাই চলে না। এত বিরাটের সামনাসামনি এসে পড়লে মনটা হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে যায়।

দুপুর তিনটে। অথচ বেলাভূমিতে আর একটাও লোক নেই। এদিক ওদিক যেদিক চাই একেবারে ধু-ধু, এত সুন্দর একটা সমুদ্র পড়ে আছে, অথচ কেউ তা দেখতে আসেনি? শুধু কলকাতা থেকে এসেছি আমরা চারজন? সমুদ্রের বুকে, বেশ দূরে, মোচার খোলার মতন কয়েকটি নৌকা। আমার পূর্বপুরুষ একদিন ঐরকম একটা নৌকায় চড়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল।

তখুনি স্নান করার সিদ্ধান্ত হয়। জলের কাছে এসে যারা শুধু জলের রূপ দেখে, আমরা তাদের দলে নই। আমরা শারীরিক প্রেমে বিশ্বাসী। জলকে আলিঙ্গন না করলে ঠিক ভালোবাসাবাসি জমে না। বিশেষত আমি গত বছরই সাঁতার শিখেছি, জলে নামায় আমার বেশি উৎসাহ।

জামা-প্যান্ট খুলে, শুধু আণ্ডারওয়্যার পরে আমরা নেমে গেলুম হৈহৈ করে। ছোট ছোট ঢেউ, অনেক দূর পর্যন্ত যাওয়া যায়।

ভাস্কর বলল, এদিকে যদি সোজা সাঁতার কেটে যাই, তা হলে কোথায় পৌঁছোবো বল্‌ তো?

আশু বলল, অস্ট্রেলিয়া।

—চল্‌, তাহলে অস্ট্রেলিয়া চলে যাওয়া যাক্‌।

আমি বললুম, আর একটু গেলেই তো উত্তর মেরু।

উৎপল বলল, আচ্ছা দক্ষিণ মেরু সম্বন্ধে অনেক গল্প পড়েছি, তাই না? ...কিন্তু উত্তর মেরু সম্পর্কে সে রকম কোনো গল্প শুনি না কেন?

—উত্তর মেরু আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে।

—যেতে হবে, একদিন যেতে হবে।

—উই আর দা মিউজিক মেকার্স, উই আর দা ড্রিমার্স অব ড্রিম্‌স...

কটেজটির মালিক—মহিলাটি একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দেখে আমি একটু দমে গেলুম। এই রে, সর্বক্ষণ ইংরেজি বলতে হবে।

ভদ্রমহিলা যথেষ্ট বুড়ি, ছোট্টখাট্টো চেহারা, মাথাব চুল ধপধপে সাদা। চোখের মণি নীল, এমনই নরম সরম চেহারা যে দেখলে মানুষ বলে মনে হয় না, যেন একটা কাচকড়াব পুতুল। একটা গোলাপ ফুল ছাপা গাউন পরে আছেন।

ভাস্করকে আমাদের দলের নেতা বানিয়ে দিলুম। অকুতোভয়ে এমন গড় গড় করে ভুল ইংরিজি আর কেউ বলতে পারে না আমাদের মধ্যে। ইংরেজি বলার সময় ভাস্করের উপরের ঠোঁটটা ফুলে ওঠে। ওটা সাহেবি কায়দা।

চাবখানা ঘর, মাঝখানে ছোট্ট একটি লাউঞ্জ, সামনে বাগান। বেশ সুন্দর বাড়িটা। প্রত্যেক ঘরে দু'জনেব বেশি থাকবার নিয়ম নেই। কিন্তু আমরা চারজনই থাকতে চাই এক ঘরে। ভদ্রমহিলা কিছুতেই রাজি নন, বারবার মাথা নেড়ে বলছেন, না-না, তোমাদের অসুবিধে হবে, কেন কষ্ট করে থাকবে, ঘর তো ফাঁকা রয়েছে...। কিন্তু আলাদা আলাদাই যদি থাকব, তা হলে আমরা এক সঙ্গে বেড়াতে এসেছি কেন? তা হলে তো যে-যার নিজের বাড়িতে থাকলেই পারতুম! তা ছাড়া, দুটো ঘরে থাকলে ডবল চার্জ দিতে হবে না?

এমন উদ্দাম গ্রীষ্মে বোধহয় কেউ বেড়াতে আসে না। বেশির ভাগ বাড়িই ফাঁকা। আমাদের কটেজটিতে আর একটি মাত্র ভদ্রলোক ছিলেন, মাঝবয়েসী, লাউঞ্জে বসে সামনের নিচু টেবিলে তিনি তাস বিছিয়ে পেসেন্স খেলছিলেন। ভিজে চুল নিয়ে আমাদের চারজনকে ঢুকতে দেখে তিনি একবার অবাক ভাবে তাকিয়ে ছিলেন শুধু।

এক ঘণ্টা বাদেই ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গেল। ওঁর নাম জ্ঞানব্রত রায়চৌধুরী। অফিসের কাজে উড়িষ্যায় এসেছিলেন, দু'একদিন সমুদ্রের ধারে কাটিয়ে যাচ্ছেন। বেশ মিষ্টি ব্যবহার ভদ্রলোকের। আমাদের আপনি আপনি সম্বোধন করে সম্মান দিলেন খুব।

সন্ধে সাতটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ল যে উনি থাকেন সাদার্ন এভিনিউতে, তাঁর বাড়ি থেকে লেক এক মিনিটের রাস্তা, তাঁর দাদার এক ছেলে রোইং করে স্কুলে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। সেই দাদার বাড়ি নিউ আলিপুর।

সাঁতারের প্রসঙ্গ উঠেছিল, তার থেকে রোয়িং, আশু বলেছিল, ও লেকে একবার রোয়িং কমপিটিশানে নেমেছিল, তারপরই ভদ্রলোক জানালেন ঐ খবর।

আমি চট করে লাউঞ্জ থেকে উঠে নিজেদের ঘরে চলে এলুম। ভদ্রলোক আমার মুখ যত কম দেখেন, ততই মঙ্গল। সর্বনাশের মাথায় বাড়ি। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়। এই জ্ঞানব্রতবাবু তো পিয়া-বাবুজীর সাক্ষাৎ কাকা! ওদের সবার নাম ব্রত দিয়ে, শুভব্রত প্রিয়ব্রত পূণ্যব্রত...। যে রোয়িং চ্যাম্পিয়ন ভাইপোটির কথা উনি বলছেন, সেই তো আমার ছাত্র বাবুজী!

বাঃ, বাইরে আসবার পুরো আনন্দটাই মাটি!

বাইরে ভাস্কররা চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে, আমি বিছানায় শুয়ে খুলে ফেললুম শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস। বাইরে অন্ধকারে লুটোপুটি খাচ্ছে নোনা বাতাস।

—এই নীলু ওঠ। শুয়ে আছিস যে এখন? এই বাঙালটাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

আমি উঠে বসে উৎপলকে তড়পে বললুম, তোরাই তো বসে বসে একটা বুড়ো লোকের সঙ্গে গ্যাজাচ্ছিস! সমুদ্রের ধারে এলুম কি ঘরে বসে থাকার জন্য?

—দাঁড়া, খাওয়া দাওয়ার পর রাত্তিরে যাব। আজ ভিণ্ডালু হচ্ছে।

—ভিণ্ডালু কি জিনিস?

—তা জানি না। মিসেস পীবডি বললেন, আজ রাত্রের মেনুতে ভিণ্ডালু আছে। তাই শুনে ঐ জ্ঞানব্রতবাবু বললেন, গুড! এদের খুব ভালো লাগবে।

—বুঝেছি। ভিণ্ডালু মানে ভিণ্ডি আর আলুর ঘাঁট। এরা ঢ্যাঁড়সকে ভিণ্ডি বলে।

—তোর মাথা? তা হলে কি ভদ্রলোক গুড বলতেন?

খাওয়ার টেবিলে আবার ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলোই। এখানে সব কিছুই সাহেবী মতে। সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে ডিনার। গেস্টদের এক টেবিলে বসে খেতে হয়। আমি সর্বক্ষণ মুখ গোঁজ করে রইলুম। আমি অসামাজিক, লাজুক, লোকের সঙ্গে মিশতে পারি না, এই রকম একটা ভাব।

ভিণ্ডালু আসলে শর্ষে বাটা দিয়ে রান্না করা মাংস, খেতে ভালোই, তবে এমন কিছু আহা মরি না।

খেয়ে উঠেই ওরা জমে গেল তাস খেলায়। জ্ঞানব্রতবাবুর তাসের নেশা। উৎপলের দারুণ উৎসাহ। প্রেমের ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তি যেমন অবাঞ্ছিত, ব্রীজ খেলায় তেমনি পঞ্চম ব্যক্তি। এবার আর আমি বিছানায় না গিয়ে, কারুকে কিছু না বলে চলে এলুম বাইরে। রাস্তা চেনার ব্যাপারে কোনো সমস্যা নেই—ডানদিকেই সমুদ্র।

এমন নির্জন দেশ আমি আগে কোথাও দেখিনি। বাড়ি আছে আলো জ্বলছে, কিন্তু পথে একটাও মানুষ নেই, কোথাও কোনো শব্দ নেই শুধু মাঝে মাঝে হাওয়ার শন্‌শন্‌। সমুদ্রের ধারেও কেউ নেই। তবে এই সৌন্দর্যের সম্ভার কার জন্য?

জলের একেবারে কাছে বালির ওপর বসবার পর পঙ্কজ মল্লিকের গাওয়া গানের একটি লাইন আমার মনে পড়তে লাগল বারবার। ...আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হতো যে মিছে...। আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হতো যে মিছে...। এ লাইনের মানেটা আমার কাছে এখন বদলে গেছে। এই যে সমুদ্র এখানে একলা শুয়ে আছে তার গলায় জড়ানো এত অসংখ্য আলোর মালা, এ যদি এই সময় এসে আমি না দেখতুম, তাহলে তো এই সব আয়োজনই ব্যর্থ হয়ে যেত!

সত্যিই আলোর মালা। কোনো সিনেমাতেও তো সমুদ্রের এই রূপ দেখি নি। একি শুধু গোপালপুরেই দেখা যায়? সমুদ্র একেবারে নিপাট অন্ধকার, আর ঢেউগুলির চূড়ায় জ্বলজ্বল করছে আলো। জানতুম ফসফরাসের জন্য কখনো কখনো এমন হয়। জানা আর দেখা একেবারে আলাদা। যতদূর চোখ যায় সমস্ত ঢেউ-ই এমন উজ্জ্বল। উৎপল-ভাস্কররা দেখল না, মরুক গে ওরা তাস খেলে! সমুদ্রনগরীতে এসেছে ঘরে বসে তাস খেলবার জন্য।

একটু একটু ভিজে বালি, তার ওপর আঙুল দিয়ে দাগ কাটা যায়। লেখা যায় নাম। ভীষণ মনে পড়ছে রানীর কথা। যে-কোনো সুন্দর জিনিস দেখলেই আমার ইচ্ছে করে কারুকে তার ভাগ দিই। যে-কোনো ভালো বই পড়লেই মনে হয়, রানী এটা পড়বে না তা কি হতে পারে? বেহালার একটা বাগানবাড়িতে গত বছর কাঁচা আম মাখা খেয়ে কী ভালো লেগেছিল, কী সুন্দর অন্যরকম গন্ধ, আমি একটা কাঁচা আম লুকিয়ে পকেটে নিয়ে গিয়েছিলুম রানীর জন্য। পরদিন সন্ধ্যেবেলা রানীর ঘরে ঢুকে হঠাৎ পকেট থেকে সেই কাঁচা আমটা বের করে দেওয়ায় রানী অবাক চোখে হেসে আকুল! শুধু শুধু একটা কাঁচা আম কি কেউ কারুর জন্য নিয়ে যায়? বছরের এই সময়টায় প্রত্যেক বাড়িতেই তো বাজার থেকে কাঁচা আম আসে টক রান্নার জন্য। আমার বুকে একটা ছোট্ট কিল মেরে রানী বলেছিল, কী ছেলেমানুষ!

রানী বুঝতে পারেনি ঐ আমটা নয়, ওকে আমি দিতে চেয়েছিলাম সেই আলাদা গন্ধটা।

এই নিঃসঙ্গ সমুদ্র, এই অন্ধকার জড়ানো হাওয়া, এই যে অসংখ্য ঢেউয়ের মাথার হীরাকুচি এসব আমি তোমায় উপহার দিলাম, রানী!

তুমি এখনো নিশ্চয়ই পড়ার ঘরে। পাচ্ছো ও থ্রি-র গন্ধ? কলকাতার বাতাসে

খাঁটি ও টু-ই নেই। তাই তোমায় পাঠিয়ে দিলুম এই ও থ্রি!

বেশ খানিকক্ষণ বসে থাকবার পর হঠাৎ কী খেয়াল হলো, এগিয়ে গেলুম জলের দিকে। প্যান্টের পায়ের কাছটা ভিজে গেল। তা যাক, আমার ইচ্ছে হলো ঢেউয়ের ঐ আলো ধরতে। কিন্তু ফসফরাস ধরা যায় না। হাতে নিলেই মিলিয়ে যায়, থাকে শুধু জল।

কী সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে।

প্রচেতঃ।...

দূর থেকে একটা গান ভেসে এলো, খুব জোরে বলেই একটু বেসুরো...এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না...।

উৎপল গাইছে। আর আশু ডাকছে, নী...লু! এই নী-লু!

উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। খুঁজুক না কিছুক্ষণ।

তারপরই অন্ধকার চিরে গেল টর্চের আলোয়। ভাস্কর টর্চ এনেছে। প্রথমেই টর্চ ফেলল সমুদ্রে, তার আলো চলে গেল উত্তর মেরু পর্যন্ত।

এবার ছুটছে ওরা তিনজন। ভাস্কর ঝড়ের মতন আমার পিঠে এসে পড়ল।

আশু বলল, ফ্যানটাসটিক!

ভাস্কর বলল, চ, চ, চ, জলে নামি! জলে নামি!

উৎপল বলল, এই রাত্তিরে। যদি হাঙর-টাঙর আসে।

—ভ্যাট। প্যান্ট-জামা খোল। আণ্ডারওয়্যার জাঙ্গিয়া-ফাঙ্গিয়া সব খুলে ফ্যাল! এখানে দেখবার কেউ নেই।

ভাস্কর আর একটুও ধৈর্য ধরতে পারছে না। মুহূর্তে ও নিজের সব কিছু খুলে ফেলল।

তারপর পাঁচ হাজার, সাত হাজার কিংবা চোদ্দ হাজার বছর আগে মানুষ যে-পোশাকে জলে নামতো সেই ভাবে আমরা দৌড়ে সমুদ্রের মধ্যে চলে গিয়ে শুরু করে দিলুম দাপাদাপি—।

—এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না...।

২

নীচতলায় কেউ থাকে না, এখানে অফিস ঘর, বাইরের লোকদের বসবার ঘর এবং গুদাম। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায়। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ মনে হচ্ছে কেন? দরজা-টরজা সব খোলা, চোর এসে তো চুরি করে নিয়ে যেতে পারে সর্বস্ব!

—রঘু, রঘু!

বয়েসের জন্য একটু কুঁজো হয়ে যাওয়া রঘু বেরিয়ে এলো খাবার ঘর থেকে। এই পরিবারেই নাকি সে কাজ করছে গত পঁয়তিরিশ বছর।

—আসুন মাস্টারবাবু, ঘর খোলা আছে, বসুন!

—বাড়িতে কেউ নেই?

—দিদিমণি তো ছিল। কোথায় গেল আবার! বাবু আর মা বেরিয়েছেন।

টানা বারান্দাটা পেরিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে একটা ছোট বারান্দা, তার পাশে পড়বার ঘর। একদম আলাদা। দু'পাশে দুটি বইয়ের আলমারি, টেবিলও দুটি, চেয়ার তিনটি। পিঠোপিঠি দুই ভাই-বোন একজনের টেবিলে অন্য জনের কোনো বই দৈবাৎ থাকলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়! লোরেটো আর সেন্ট জেভিয়ার্স।

বারান্দাটা আমি পার হয়ে গেলুম নকল ভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ঘরে ঢুকে বসলুম পিয়ার টেবিলে। বাবুজীর পক্ষে এখন বাড়িতে না থাকাই স্বাভাবিক। দিনের আলো সম্পূর্ণ মিলিয়ে না গেলে সে খেলার মাঠ পরিত্যাগ করে না।

—এ কি, আপনি এখন এসেছেন?

শাড়ি পরেছে পিয়া, হালকা নীল রঙের। সদ্য স্নান করা মুখ। চিবুকে দু'এক ফোটা জল লেগে আছে। মাত্র মাস ছয়েক ধরে মাঝে মাঝে শাড়ি পরতে শুরু করেছে পিয়া। তার বয়েস সতেরো, উত্তর কলকাতার মেয়েরা এর অনেক আগে থেকেই শাড়ি পরে। পিয়া স্কুল ছেড়ে কলেজে আসবার পর ওর মা একদিন বলেছিলেন, তুই কি আর কোনোদিন শাড়ি পরা শিখবিই না?

—রঘুদা, মাস্টারমশাই এসেছেন, তুমি আমায় ডাকোনি? মাস্টারমশাইকে চা-ও দাওনি?

—না-না, আমি এইমাত্র এলুম।

পিয়া নিজের চেয়ারে বসল। তারপর ভুরু তুলে দারুণ নির্বিষ্ট ভাব করে বলল, হ্যাঁ, মাস্টারমশাই, তিন চারদিন ধরে ভেবে রেখেছি, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, বই-টই খোলার আগে সেই কথাটা বলে নি?

আমি মনে একটু শঙ্কিত হলুম। আজ আবার কী প্রশ্ন রে বাবা!

গত মাসে পিয়া আমাকে একটা প্রশ্ন করে একেবারে পিলে চমকে দিয়েছিল! সেদিনও বাবুজী ছিল না তখন।

পিয়ার মুখে সব রকম ভাবের ছবি খুব স্পষ্ট ফুটে ওঠে। রাগ, অভিমান, দুঃখ, বিস্ময়ের জন্য তার সরল মুখখানি যেন সব সময় আয়না হয়ে আছে। কোনো কিছু সে লুকোতে জানে না। এই সব মেয়েরা সুখী হয়।

মাসখানেক আগে ইতিহাস পড়ার মাঝখানে আমায় হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে পিয়া

ওর মুখখানা দারুণ সীরিয়াস করে, কত্থক নাচের শিল্পীদের মতন ভুরু দুটো ওপরে তুলে বলেছিল, মাস্টারমশাই, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব? কারুকে বলবেন না বলুন—

—কী ব্যাপার?

—আগে বলুন, কারুকে বলবেন না?

—আচ্ছা বলব না।

—প্রমিস?

—প্রমিস করতে হবে? কী এমন ব্যাপার?

—না। আগে বলুন, প্রমিস? কিছুতেই কারুকে কোনো দিন বলবেন না?

—বেশ, প্রমিস করলুম।

- আচ্ছা, মাস্টারমশাই ব্রাহ্মরা কি হিন্দু?

আমি আকাশ থেকে পড়েছিলুম। এটা একটা গোপন কথা। ভুরু কচকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি। পিয়া?

—কেন?

—হঠাৎ এই প্রশ্ন?

—না আপনি আগে বলুন।

আমি তখন দ্রুত চিন্তা করছিলুম। আসলে ব্রাহ্মদের ব্যাপারটা আমি নিজেই ভালো জানি না। রবীন্দ্রনাথরা ব্রাহ্ম ছিলেন একালে আমাদের চেনাশুনা, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে তো কেউ ব্রাহ্ম নেই, তা হলে কি ঐ ধর্মটা উঠে গেছে? কর্নওয়ালিস স্ট্রিট দিয়ে আসবার সময় দেখতে পাই একটা বাড়ির গায়ে লেখা আছে 'ব্রাহ্ম সমাজ', কখনো সেই বাড়িটাতে ঢুকিনি ।

—আপনি বলবেন না তা হলে?

—এটা কি একটা প্রশ্ন হলো? ব্রাহ্মরা তো বলতে গেলে হিন্দু ধর্মেরই একটা শাখা .যেমন ধরো বৈষ্ণব, শাক্ত।

—ওরা সরস্বতী পুজো করে?

—ওঃ হো, না, না, না, ওরা কোনো ঠাকুর দেবতার পুজো করে না। ওরা মূর্তি পুজো মানে না। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করে।

—ব্রাহ্ম বড় না ব্রাহ্মণ বড়?

এসব যদি ইতিহাস কিংবা সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে কৌতূহল হতো, তা হলে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু গোপন কথা হবে কেন?

—কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়।

—আপনি ঠিক জানেন?

—একি, তুমি আমায় জেরা করছ কেন, পিয়া?

—না, ঠিক করে বলুন! ব্রাহ্ম বড়, না ব্রাহ্মণ বড়?

—বলছি তো, কেউ কারুর চেয়ে বড় নয়।

—আচ্ছা ঠিক আছে। এবার রোমান হিস্ট্রি...

এই রকম হঠাৎ উদ্ভট প্রশ্ন জাগে পিয়ার মাথায়। আজ আবার কী জেগেছে, কে জানে!

—আচ্ছা মাস্টারমশাই, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, কিন্তু কারুকে কোনো দিন বলতে পারবেন না...।

—বুঝেছি, আবার প্রমিস করতে হবে?

—হ্যাঁ!

—করলুম।

—আচ্ছা, ভগবান বলে কেউ আছেন, না নেই?

আবার আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম। এটাও গোপন কথা?

—আচ্ছা পিয়া, তোমার কী ব্যাপার বলো তো? এসব দারুণ দারুণ সিক্রেট জিনিস তুমি কি করে জেনে ফেলো?

—না। ঠাট্টা নয়, আপনি বলুন, ভগবান আছেন না নেই?

—তিন চারদিন ধরে তুমি এটা ভাবছ?

—হ্যাঁ।

পিয়ার মুখখানা সেই রকম সীরিয়াস, ভুরু দুটি তোলা। পিয়ার ধারণা, পৃথিবীতে কেউ মিথ্যা কথা বলে না। সেইজন্য, আমি যা বলবো তা-ই ও বিশ্বাস করবে। অর্থাৎ আমার একটা মুখের কথায় ভগবানের অস্তিত্ব নির্ভর করছে।

সদ্য শেষ করা কলেজ জীবনটা স্টুডেন্ট ফেডারেশানের পাণ্ডাগিরি করে কাটিয়েছি, এখনো কফি হাউসে মার্কসবাদ নিয়ে গলা ফাটাই, আমার কাছে ভগবানের কথা! কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের কাছে একটু ডিপ্লোম্যাটিক হতে হয়।

—কারুর কাছে ভগবান আছেন, কারুর কাছে নেই।

—না। আপনি ঠিক করে বলুন?

—ঐ তো বললুম। দ্যাখো—রাশিয়া, চীনের লোকেরা আজকাল ভগবান মানে না, আমাদের দেশেও অনেকে মানে না, আবার অনেকে তো মানেও—সুতরাং যে মানে তার কাছে ভগবান আছেন, যে মানে না, তার কাছে নেই।

—তা হলে, যারা ভগবান মানে, তাদের কি উচিত ঘৃণা করা, যারা ভগবান মানে না তাদের?

—উচিত না, মোটেই ঘৃণা করা উচিত না।

—ঠিক বলেছেন। এবার পড়াশুনো হোক।

ছাত্রছাত্রীরা মাস্টারমশাইয়ের কাছে এসব প্রশ্ন তো করতেই পারে। কিন্তু পিয়ার কাছে যে কেন এগুলো এত গোপন কথা সেটাই কিছুতে বুঝতে পারি না।

পিয়াকে সবে মাত্র পড়াতে শুরু করেছি, অমনি বাবুজী এসে হাজির। পিয়ার চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোট। জামাটা একেবারে ঘামে ভিজে গেছে, হাতে ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট, মুখখানা ঝকঝকে। চমৎকার শরীরের গড়ন বাবুজীর। মাত্র পাঁচ বছর আগে আমি ঐ বয়েসে ছিলুম। কিন্তু এ বাড়িতে ঢুকলেই আমার নিজেকে কেমন যেন বুড়োটে মনে হয়। মাস্টারমশাই তো।

বাবুজী কথা বলে খুব জোরে জোরে। পরপর দুটো পুরো বাংলা সেন্টেন্স সে শেষ করতে পারে না।

—মাস্শাই, পালে বাঘ পড়েছে! ঐ মেঘনাদ বধ কাব্য হ্যাজ বিন ইনক্লুডেড ইন আওয়ার কোর্স। আমাদের ক্লাস টিচার বললেন, ইউ হ্যাভ টু রীড ষষ্ঠ সর্গ ফর দা কামিং টেস্ট।

—তাই নাকি? বাঃ, তোমার তো খানিকটা পড়াই আছে।

—আচ্ছা, মাসশাই, ঐ লোকটা দ্যাট মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হোয়াই ওয়জ হি বর্ন, ক্যান য়ু টেল মী? সামবডি ওকে মেরে ফেলতে পারেনি ইন হিজ চাইল্ডহুড?

—হাঃ হাঃ হাঃ।

—সাচ্ছা জন্মেছিস না হয়ে বেশ করেছিস, হোয়াট বিজনেস হি হ্যাড টু রাইট দ্যাট হরিড কাব্য? ইউ টেল মী!

—হাঃ হাঃ হাঃ।

—আপনি হাসছেন? না, আপনি বলুন, ফ্র্যাংকলি, এ মনস্ট্রসিটি কোনো সেইন মানুষের হাত দিয়ে লেখা সম্ভব? ফাস্ট টু টরচার আস দা ইনোসেন্ট স্টুডেন্টস! ইফ আই উড্ মীট দ্যাট বাগার।

পিয়া ধমক দিল, এই বাবুজী, কী হচ্ছে!

বাবুজী সঙ্গে সঙ্গে হেসে বলল, আই অ্যাম সরি, মাস্শাই। আচ্ছা বলুন তো, টেস্টে যদি ওটা থেকে লিখতে হয় তা হলে আমি...।

মাইকেল মধুসূদন বেঁচে থাকলে তাঁর রচনার এই সমালোচনা শুনে মূর্ছা যেতেন কিনা জানি না। সাধে কি আর বার্নার্ড শ উইল করে গেছেন যে তাঁর কোনো বই যাতে কখনো স্কুল-কলেজের পাঠ্য না হয়।

আইডিয়াটা প্রথমে এসেছিল পিয়া-বাবুজীর মায়ের মাথায়। ছেলেমেয়ে দু'জনেই বাংলা জানে না, পিয়া তবু বাংলায় কথা বলতে পারে, বাবুজী তাও পারে

না, বাংলায় বই পড়ার তো প্রশ্নই নেই। কিন্তু সিনিয়র কেম্ব্রিজে বাংলা ওদের সেকেণ্ড ল্যাঙ্গোয়েজ হলেও পাস তো করতেই হবে। সেজন্যই তিনি হঠাৎ দুম করে একদিন বললেন, মাস্টারমশাই, ওদের আপনি মেঘনাদ বধ কাব্যটা পড়ান তো! নইলে একদমই বাংলা শিখবে না!

যারা বাংলায় শুদ্ধ করে কথা বলতেই জানে না, তাদের জন্য প্রথমেই মেঘনাদ বধ কাব্য?

পিয়া একদিন আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা মাস্টারমশাই, সাঁড়াশি মানে কী?

আমি সত্যিই চমকে উঠেছিলাম। বাঙালির মেয়ে, সাঁড়াশি কাকে বলে তাই জানবে না? তা ছাড়া সাড়াশির আর কোনো প্রতিশব্দ নেই? কী করেই বা বোঝাবো?

—কোনোদিন রান্নাঘরে ঢোকোনি বুঝি? দেখোনি, গরম সসপ্যান বা ডেকচি যেটা দিয়ে ধরে তোলে...সাড়াশি চেনো না, ছি!

সামান্য একটু বকলেই পিয়ার মুখখানা ম্লান হয়ে যায়। সে বলেছিল, আপনি এই কথা বললেন, মাস্টারমশাই? জানেন, আমাদের ক্লাসের পারমিতা ঝঞ্ঝা মানে জানে না? কিন্তু আমি জানি, ঝঞ্ঝা মানে ঝড়। রবীন্দ্র সঙ্গীত আছে, ঝনঝনঝঞ্ঝার ঝংকারে...।

পাশ থেকে বাবুজী বলেছিল, আমিও ঝড় মানে জানি। ঝড় মানে স্টর্ম, ব্লিজার্ড, টাইফুন, সাইক্লোন, হ্যারিকেন...।

বাবুজী যে-সব ইংরেজি অ্যাডভেঞ্চার গল্পের বইগুলো পড়ে, তাতে ঝড়ের ইংরিজি প্রতিশব্দ অনেক থাকে।

এদের পড়াতে হবে মেঘনাদ বধ কাব্য। পরদিনই মাসিমা একখানা মাইকেল রচনা সংগ্রহ কিনে এনে বলেছিলেন, এই নিন, আজ থেকেই শুরু করে দিন।

এই সর্বনাশা পরামর্শ ওঁকে কে দিয়েছিল কে জানে! আসলে আমিও মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলুম। আমি নিজেই কি ছাই মেঘনাদ বধ কাব্য কখনো পড়েছি নাকি পুরোটা? বিদঘুটে সব শব্দ আছে ওর মধ্যে, ইরম্মদ, বীতিহোত্র, মহোরগ দ্বিরদ-রদ...এইসব কথার মানে জিজ্ঞেস করলেই হয়েছে আর কি। মাস্টার হয়েছি বলেই কি সবজান্তা হতে হবে।

অবশ্য সেরকম কিছু বিপদ ঘটেনি। বাবুজী প্রথম তিন লাইন অতি কষ্টে পড়েই বইটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, আই ভ্যালু মাই প্রেশাস্ টীথ, মাসশাই, এগুলো পড়ে আমি ভাঙতে চাই না। সরি, মা যাই বলুক, ইমপসীবল ফর মী। আর পিয়া যত্ন করে আট দশ লাইন পড়ে খুব করুণ মুখ করে বলেছিল, আমি

যে কিছুই বুঝতে পারছি না। মাস্টারমশাই? হিব্রু না ল্যাটিন...

এরপর থেকে অন্যসব পড়াগুলো শেষ হলে আমিও রোজ ওদের দু'তিন পাতা ঐ বই থেকে পড়ে শোনাই। সরল করে মানেটা বুঝিয়ে দিই। গল্পটা শুনতে ওরা পছন্দই করে কিন্তু এতে ওদের কতটা বাংলা শেখা হচ্ছে কে জানে।

বাবুজী হাত-মুখ ধুয়ে, পোশাক পাল্টে এসে পড়তে বসল। ছেলেটির স্মৃতিশক্তি সাংঘাতিক, কিন্তু বড্ড ছটফটে আর অমনোযোগী। এই বয়েসেই ওর একটা আত্মবিশ্বাস জন্মে গেছে, নিজের মতামত জোর দিয়ে বলতে পারে। সেই তুলনায় পিয়া অনেক নরম, শান্ত।

একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম, ওরা দু'জনের কেউ-ই একবারও আমার পা ভাঙার বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞেস করল না। আমি যে চারদিন আসিনি, কেন যে আসিনি তা ওরা জানে না? মিছেই আমি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পার হয়ে এলুম বারান্দাটা।

এদের মা-বাবা ফিরে আসবার আগেই যদি উঠে পড়তে পারি। মাসিমা এসে জিজ্ঞেস করবেনই, পা-টা দেখতে চাইবেন। সারা পৃথিবীতে ওর চেনাশুনো যত লোক আছে সকলের স্বাস্থ্য বিষয়ে উনি চিন্তিত।

—আচ্ছা, মাসশাই মনে করুন, আপনি ওয়ার্ল্ড টীমের ম্যানেজার, আপনাকে বেস্ট ইলেভন ক্রিকেটার সিলেক্ট করতে বলা হয়েছে।

—ওয়ার্ল্ড টীম কার এগেইনস্টে?

—এগেইনস্ট ইংল্যাণ্ড, অফ কোর্স।

আমি খেলা বিষয়ে পাগল নই, সাধারণ একটু আধটু খবর রাখি এই মাত্র। বাবুজীর মুখস্থ বিশ্বের সব খেলোয়াড়ের নাম। অঙ্ক কষার এক ফাঁকে সে রোজ একবার করে খেলার প্রসঙ্গ তুলবেই। তবে আমি কায়দাটা এখন শিখে গেছি, দু'একটা কথা বলে খুঁচিয়ে দিলেই বাবুজী তারপর নিজেই সব কিছু বলবে।

—যারা এখন খেলছে, তাদের নিয়ে টীম তো?

—না-না, অল টাইম গ্রেট।

—তাহলে প্রথমেই ক্যাপটেন ঠিক করতে হয়।

—হ্যাঁ, বলুন।

—সোবার্স।

—সোবার্স?

—নিশ্চয়ই।

—আপনি ব্র্যাডম্যানের কথা ভুলে যাচ্ছেন, মাসশাই? দিস ইজ প্রিপস্টারাস।

—আমার ব্র্যাডম্যানের চেয়ে সোবার্সকেই বেশি পছন্দ।

—হি ইজ মিডিওকার, মাসশাই, হি ইজ মিডিওকার।

—মোটেই না, যেমন ব্যাটিং তেমনি বোলিং, আর খেলার মধ্যে কোনো টেনশান নেই, খুব সহজভাবে এসে রান তুলবে।

—য়ু আর ফরগেটিং ডব্লু সি গ্রেস।

—না-না, মনে আছে। তবু আমি চাই সোবার্সকে। নেভার লেটস ইউ ডাউন, পটাপট ক্যাচ ধরবে। বোলিং করতে এসেও।

পিয়া অনুযোগের গলায় বলল, না মাস্টারমশাই। সোবার্স নয়, নীল হার্ভে। কী সুন্দর ওকে দেখতে।

কোথায় ব্র্যাডম্যান-গ্রেস-সোবার্স আর কোথায় নীল হার্ভে। পিয়ার কাছে সৌন্দর্যই শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা।

বাবুজী বকুনি দিয়ে বলল, তুই থাম তো দিদি। হোয়াট ডু য়ু নো অ্যাবাউট ক্রিকেট। নীল হার্ভে হেঃ।

পিয়া তার দীঘল চক্ষু দুটি ছোট ভাইয়ের ওপর স্থাপন করে বলল, বাবুজী তুমি আমার সঙ্গে ওরকম মুখ ঝামটা দিয়ে কথা বলবে না। বিহেভ ইয়োরসেলফ!

বাবুজী তাতে একটুও না দমে গিয়ে বলল, হাঃ। বিহেভ ইয়োরসেলফ। আমি কী বলেছি? আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইয়াং গার্লস লাইক য়ু অ্যাণ্ড লেইডিজ লাইক মা টু মেডল ইন ক্রিকেট। দে স্পয়েল দা হোল অ্যাটমসফিয়ার। তাই না মাসশাই?

এই বয়েসেই বাবুজী পাক্কা মেল শভিনিস্ট। সে মেয়েদের জগৎ আর ছেলেদের জগৎটা আলাদা রাখতে চায়। এখনো। প্রেমে পড়ার বয়েস হয়নি তো।

পিয়া বলল, ফের ওরকম ভাবে কথা বলছ? আমি মাকে বলে দেবো কিন্তু।

—মাকে বলে দেব। আ রিয়েল সিসি।

এইবার আমাকে বাধা দিতে হয়। হাত উঁচু করে বলি, এই আর না, আর না। খেলার কথা থাক, এবার পড়াশুনো।

আমার মূল কাজ ওদের মাঝখানে দু'ঘন্টা বসে থাকা। যাতে ওরা বইতে মন দেয়। সর্বক্ষণ ঝগড়া না করে। একটু মন দিলে পড়াশুনোর ব্যাপারটা ওরা নিজেরাই ঠিকঠাক করে নিতে পারে।

দেয়াল ঘড়িতে টং করে সাড়ে আটটা বাজতেই উঠে পড়লুম। এখনো মাসিমা এসে পড়েননি। বাড়ি থেকে বেরিয়েই ঝড়ের বেগে চলে এলুম পেট্রোল পাম্পের সামনে। বাড়ি ফিরতে এখনো এক ঘন্টা লাগবে। নিউ আলিপুর থেকে বাসে এসপ্লানেড, সেখান থেকে ট্রাম। আমার ট্রামের মান্থলি টিকিট আছে।

বাস আসবার আগেই বৃষ্টি এসে গেল হুড়মুড়িয়ে।

পিয়া বাবুজীর মায়ের নাম সুনেত্রা। এমন সুন্দরী আমি এ পর্যন্ত আর

একজনও দেখিনি। পুরুষদের মাথার চুল কোঁকড়া হলে আমার বিচ্ছিরি লাগে, কিন্তু মেয়েদের চুল অল্প ঢেউ খেলানো হলে খুব সুন্দর দেখায়। ওর ঠোঁট আর চিবুকের কাছটা ঠিক বতিচেল্লির আঁকা একটা ছবির মতন হুবহু। অত বড় বড় দুটি ছেলেমেয়ে ওঁর, কিন্তু ওঁকে দেখলে কিছুতেই ছাব্বিশ-সাতাশের বেশি মনে হয় না। বন্ধুবান্ধবরা যখনই কেউ কোনো সুন্দরী মেয়ের প্রসঙ্গ তোলে, তক্ষুনি আমি মনে মনে ভাবি, আমার ছাত্রছাত্রীর মা সুনেত্রা দেবীর চেয়েও সুন্দর? হতেই পারে না।

বাইরে নিশ্চয়ই ওকে অন্যরকম দেখায়, কিন্তু বাড়ির মধ্যে উনি খুবই মা-মা ধরনের। সর্বক্ষণ ছেলেমেয়েদের জন্য উদ্বিগ্ন। সুন্দরী রমণীসুলভ লাস্যের বদলে ওঁর চরিত্রে স্নেহের ভাবটাই প্রবল। আমাকেও উনি মনে করেন যেন বাচ্চা ছেলে। আরেঃ, একুশ বছর বয়েস হয়ে গেছে। এতদিনে বিয়ে করলে পাঁচটা ছেলেমেয়ের বাবা হয়ে যেতুম।

এই রকম এক রাত্রে খুব বৃষ্টি, সুনেত্রা দেবী আমাকে জোর করে একটা ছাতা দেবেনই। আমি কিছুতেই নেব না। কিন্তু উনিও ছাড়বেন না। কলেজ থেকে বেরিয়ে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধরে প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে এক কোমর জল ভেঙে কলেজ স্ট্রীট থেকে শ্যামবাজার গেছি, এই তো সেদিন। পরশু দিনও আশু ভাস্করদের সঙ্গে দেশবন্ধু পার্কে আড্ডা দিতে দিতে খুব ভিজলুম। আর এখান থেকে পেট্রোল পাম্পের বাস স্টপ পর্যন্ত বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ে চলে যেতে পারব না?

সুনেত্রা দেবী জোর করে তবু একটা ছাতা আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন, আর সেই রাত্রেই আমি হারিয়ে ফেললুম ছাতাটা। বাস থেকে নেমে ট্রামে উঠেছি, ওয়েলিংটনের কাছে এসে মনে পড়ল, আরে ছাতাটা কোথায় গেল? ফেলে এসেছি বাসে। অভ্যেস নেই তো। আর কি সেই বাস পাওয়া যায়?

লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবার মতন অবস্থা। পরের ছাতা কেউ হারায়? ওরা যদি ভাবেন, আমি ইচ্ছে করে ছাতাটা ফেরত দিচ্ছি না। একটা নতুন ছাতা কিনে দেবারও উপায় নেই। ঠিক ধরে ফেলবেন। আর জানি তো সুনেত্রা দেবীর স্বভাব। বকাবকি করবেন খুব। আর ঐ রকম ছাতা পাবই বা কোথায়। বাঁটের ওপর দিকটা হলদেটে-সাদা। প্লাস্টিক না হাতির দাঁত তাই বা কে জানে?

তখন ঠিক করেছিলুম আর যাবই না ও বাড়িতে। সে মাসের পনেরো দিন পড়িয়েছি, সে মাইনেও নিতে যাব না, কিন্তু সেটাও সম্ভবপর ছিল না, আমার এক কলেজের বন্ধুর মাসিমা হন ঐ সুনেত্রা দেবী, সেই বন্ধুটিই আমায় যোগাড় করে দিয়েছে এই টিউশানি। সেই সূত্রে আমিও ওঁকে মাসিমা বলি। আমি হঠাৎ ডুব মারলে উনি নিশ্চয়ই আমার সেই বন্ধুটিকে পাঠাতেন আমাদের বাড়িতে।

আবার গেলুম বটে কিন্তু লজ্জায় ছাতাটার কথা বলতেই পারলুম না। উনিও জিজ্ঞেস করলেন না কিছু। তারপর এক মাস কেটে যেতে আমার আড়ষ্ট ভাবটাও অনেকটা কেটে গেল, ওঁরা নিশ্চয়ই ছাতার কথাটা ভুলে গেছেন। ওঁরা এত বড়লোক কী একটা সামান্য ছাতার কথা মনে রাখবেন?

আবার একদিন ঐ রকম বৃষ্টি নামতেই সুনেত্রা দেবী আর একটি ছাতা এনে আমায় বলেছিলেন, এই নিন, একদম ভিজবেন না, এখন সময়টা ভালো নয়।

আমার মুখটা যে ব্লটিং পেপারের মতো হয়ে গিয়েছিল, সেই মুহূর্তেই তা আমি আয়না না দেখেও বলতে পারি।

শুকনো গলায় আমতা আমতা করে বলেছিলুম, মাসিমা ইয়ে আপনি আমায় আগে যে ছাতাটা দিয়েছিলেন সেটা আমি হারিয়ে ফেলেছি—

এক লক্ষ টাকা দামের একটা হাসি হাসলেন সুনেত্রা দেবী। সেই হাসিতে দুষ্টুমি আর প্রশ্রয় মেলানো।

—সে আমি জানি, সে ছাতা আপনি সেই দিনই হারিয়ে ফেলেছেন।

—আপনি জানেন? তবু আপনি আমায় আজ আবার ছাতা দিচ্ছেন?

—ওমা, আমরা ছাতা হারাই না? আমার ছোটভাই মন্টু, যে এখন শিকাগো ইউনিভার্সিটিতে আছে, সে তো মাসে দুটো করে ছাতা হারাত।

—আমি শুধু শুধু কবার আপনাদের ছাতা হারাব?

—দেখি কবার হারাতে পারেন? আমরা বিনা পয়সায় অনেক ছাতা পাই।

—যাঃ!

—হ্যাঁ, সত্যি! মহেন্দ্র দত্তর বাড়ির এক ছেলে আপনার মেসোমশাইয়ের যে খুব বন্ধু। প্রত্যেক মাসে অনেকগুলো ছাতা পাঠিয়ে দেয় আমাদের।

আবার সেই রকম হাসি। জানি, উনি শেষের কথাটা সম্পূর্ণ বানিয়ে বললেন, আবার জোর করে একটা ছাতা গুঁজে দিলেন আমার হাতে।

সে ছাতাটা আমি হারাইনি অবশ্য, খুলিওনি একবারও, একখানা তরোয়ালের মতন সব সময় শক্ত করে ধরেছিলাম হাতে। আজ উনি থাকলে নিশ্চয়ই আবার ছাতা গছাতেন।

একটা বাস এসে পড়তেই আমি গাড়িবারান্দার তলা থেকে দৌড়ে এসে উঠে পড়লুম।

বাসটা বেশ ফাঁকা। জানলার ধারে সীট পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। বৃষ্টির ছাট এলেও আমি জানলা বন্ধ করা পছন্দ করি না।

আরাম করে বসতে না বসতেই কণ্ডাকটর এসে বলল, টিকিট।

অন্যমনস্কভাবে পকেট থেকে আধুলিটা বার করে দিলুম।

কণ্ডাকটর সেটি ভালো করে পরীক্ষা করে বলল, এই যে ভাই, আমরা মল্লিক বাজারের জিনিস নিই না।

মল্লিক বাজার? আমি চমকে উঠে তাকালুম। তার মানে কী?

কণ্ডাকটর বলল, আমায় কী রাতকানা পেয়েছেন যে শীসের জিনিস চিনতে পারব না?

আধুলিটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলুম। তাই তো, রংটা যেন কেমন কেমন। হাতে ঘষে দেখলুম, দাগ পড়ে যাচ্ছে। যাঃ।

এ পকেট ও পকেট খোঁজার ভান করলুম। যদিও নিজের কোষাগারের হিসেব আমি আগেই জানি। ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে রাত্রে সোজা বাড়ি ফিরব, আট আনা পয়সাই তো যথেষ্ট। তাছাড়া আমি কি লাট সাহেবের নাতি যে প্রয়োজনের বেশি টাকা পয়সা আমার পকেটে ঝনঝন করবে।

—ইয়ে, আমার কাছে যে আর কোনো খুচরো পয়সা নেই।

—খুচরো নেই? আর বুঝি সবই একশো টাকার নোট?

কণ্ডাকটরটির বিদ্রূপের সব আমার গায়ে বিঁধে গেল। তাতে আমি উত্তেজিত হয়ে আর একটা বোকার মতন কাজ করে ফেললম। পকেট থেকে মাদুলিটা বার করে বললম, বিশ্বাস করুন, আমার কাছে ট্রামের মান্থলি আছে।

—ও। ভুল করে ট্রাম ভেবে বাসে উঠে পড়েছেন? ভেবেছেন, এটা হাওড়ার মতন এক বাঁগওয়ালা ট্রাম? হে হে হে।

বেশ জোরে ছুটছিল বাসটা। হঠাৎ করে ঘণ্টা বাজিয়ে দড়িটা ধরে রেখে কণ্ডাকটর আমার দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। অর্থাৎ আমাকে এই মুহূর্তে নেমে যেতে হবে।

বাসের অন্য যাত্রীরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে আমায়। ওরা কি ভাবছে, আমি চোর কিংবা পকেটমার? বে পাড়ার লোফার?

দু পাশে বন্দুকের নলের মাঝখান দিয়ে গ্যাবি কুপার যে-রকম কাজুয়ালি হেঁটে যায়, ঠিক সেইরকম দু পকেটে হাত দিয়ে আমি এগোলুম দরজার দিকে। শুধু শেষ মুহূর্তে পেছন ফিরে গুড়ম গুড়ুমটা বাকি রইল। আর একদিন হবে।

নেমে পড়লুম আলতোভাবে।

এ যে মাত্র দীপ্তি সিনেমা। এসপ্লানেড অনেক দূর। বৃষ্টি থামবার কোনো লক্ষণ নেই। বেশি রাত করবার কোনো মানে হয় না। পরের বাসটি আসতেই উঠে পড়লুম বিনা দ্বিধায়।

এই বাসটিতে বসবার সুযোগটুকু পেলাম না পর্যন্ত। ঠিক যে-কটা সীট, সেই কটা লোক বসে আছে, একমাত্র আমাকেই শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কণ্ডাকটর

একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন, ঘুম ঘুম চোখ, টিকিটের ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ আছে বলে তো মনে হয় না। আমি যথাসম্ভব দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

ঠিক পরের স্টপেই একজন লোক নামল একেবারে দরজার পাশের সীটটা থেকে। আর কেউ উঠল না। অর্থাৎ ঐ খানে আমাকে বসতে হয়। সীট খালি থাকলেও দাঁড়িয়ে থাকা বিসদৃশ দেখায়। কিন্তু ঐ জায়গাটা যে একেবারে বাঘের মুখে।

বসতেই হলো। এবার নিজে থেকেই ভালোমানুষ সেজে বললুম, দেখুন, আমার কাছে একটা আধুলি আছে দেখুন তো এটায় কোনো গোলমাল আছে নাকি? কেউ গছিয়ে দিয়েছে—

আধুলিটা হাতে নেওয়া মাত্র কণ্ডাকটরবাবুটি বললেন, এঃ আপনাকে তো খুব ঠকিয়ে দিয়েছে। একদম ভূষিমাল।

—খুব মুশকিল হলো—

—নিন, এটা চালানো অসম্ভব।

—কিন্তু আমার কাছে যে আর পয়সা নেই—ভুলে মানিব্যাগ বাড়িতে ফেলে এসেছি।

—কিন্তু স্টেট বাস তো আমার বাপের সম্পত্তি নয়।

—ঠিক আছে, নেমে যাচ্ছি!

এবার বৃষ্টি বাঁচিয়ে একটা গাড়ি-বারান্দার নিচে দাঁড়ালুম। আমার ভাগ্যেই কি বারবার এই রকম হয়। রাত্তিরবেলা বাড়ি ফেরার সময় এই রকম ঝামেলা কারুর ভালো লাগে? এই আধুলিটা তো আমি বাড়িতে বানাইনি, আমায় এটা কেউ গছিয়ে দিয়েছে, আমার কাছে তো এটার দাম আট আনাই।

এটা কে দিয়েছে আমি জানি। গতকাল কফি হাউস থেকে নামবার সময় এক টাকার নোট ভাঙিয়ে ইসমাইলের কাছ থেকে একটা ক্যাপস্টান কিনেছিলুম। সেই খুচরোতেই চলছে। কাল ধরতে হবে ইসমাইলকে। কিন্তু এখন?

এখন আমি ইচ্ছে করলে বাস বদলে বদলে এসপ্লানেডে চলে যেতে পারি। মারবে তো না, বড় জোর বাস থেকে নামিয়ে দেবে। কিন্তু আচমকা আমার খুব অভিমান হয়ে গেল। গলার কাছে বাষ্প। কেন রাত সাড়ে নটায় বৃষ্টির মধ্যে বাড়ি থেকে এত দূরে আমার পকেটে শুধু একটা বাজে আধুলি? কেন কেন কেন? আমায় যারা চেনে, যে-সব বাড়িতে আমি যাই, তারা কি কেউ কল্পনা করতে পারবে যে ভাড়া দিতে পারি না বলে বাস থেকে আমাকে নামিয়ে দেয়?

গোঁয়ারের মতন হাঁটতে লাগলুম মাঝ রাস্তা দিয়ে। জামা-প্যান্ট এরই মধ্যে

ভিজে জ্যাবজেবে হয়ে গেছে। সাউথের চেয়ে নর্থ ক্যালকাটায় বেশি জল জমে। হয়তো গিয়ে দেখব ওদিকে এত জল জমেছে যে এসপ্লানেড থেকে আর ট্রাম চলছে না। আমি মনে মনে বললুম, তাই হোক, যত ইচ্ছে জল জমুক। ট্রাম বন্ধ হয়ে যাক্ আমি হেঁটেই যাব। সব রাস্তা। দরকার হলে আমি সারা রাত হাঁটতে পারি।

৩

আমার সপ্তাহের প্রতিটি দিন সময় ভাগ করা।

সকালে পাড়ার কাছেই একটা টিউশানি আর সন্ধেবেলা নিউ আলিপুরে। আর সপ্তাহে তিন দিন একটি কলেজের ছাত্রকে পড়াতে হয় ভবানীপুরে রাত সাড়ে আটটার পর। দুটো টিউশানির টাকা মায়ের হাত তুলে দিই, ভবানীপুরের টিউশানির কথাটা বাড়িতে চেপে গেছি, ওটা আমার হাতখরচ।

আমার দুপুরবেলা একদম ফাঁকা।

অথচ দুপুরবেলায় রানীর সঙ্গে দেখা করার কোনো উপায় নেই। ভরদুপুরে কি কেউ কারুর বাড়িতে যায়? যদিও রানী এখন প্রত্যেক দুপুরে বাড়িতে থাকে, দেড় মাস বাদেই ওর বিএসসি পরীক্ষা।

মাঝখানে ভেবেছিলুম, রোজ দুপুরে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়াশুনো করে পণ্ডিত হব। কয়েকদিন পর আর মন টিকল না। ক্ষুধার্তের কাছে যেমন গোলাপ ফুলের কোনো মূল্য নেই, সেইরকম বেকারেরও ভালো লাগে না প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস কিংবা আধুনিক সমাজতত্ত্ব। ন্যাশনাল লাইব্রেরির চুপচাপ আবহাওয়াটা আমার বেশ পছন্দ, কিন্তু শুধু সেখানে গিয়ে বসে থাকার জন্য তো রোজ বাস ভাড়া খরচ করা যায় না।

বাবা প্রায়ই শ্লেষের সঙ্গে বলেন, কতবার বলেছিলুম, আর্টস পড়িস না। সায়েন্স নে! তখন তো শোনা হলো না আমার কথা!

বাবার ধারণা, সায়েন্স পড়লেই আমি এতদিনে চাকরি পেয়ে যেতুম! তাও তো পুরোপুরি আর্টস নিতে দেননি বাবা, বি এ-তে তাঁর ইচ্ছে মতন অনার্স নিলুম ইকনমিক্স। কিছুদিন পরেই দেখলুম, ওরে বাবা ইক্নমিক্সেও যে অঙ্ক আছে। শুধু তাই নয়, ছুঁচোলো ধরনের আঙ্কিক মাথা না হলে ইকনমিক্স ভালো করে বোঝাই যায় না। সুতরাং রেজাল্ট বিশেষ সুবিধের হলো না।

সবাই যদি বিজ্ঞান কিংবা ইকনমিক্সই নেবে, তাহলে ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন

এসব পড়বে কারা? এসব আস্তে আস্তে মুছে যাবে পৃথিবী থেকে? নাকি এখন থেকে শুধু আগমার্কা থার্ড ডিভিশান পাওয়া ছেলে মেয়েরাই পড়বে ঐ সব সাবজেকট? হায় সক্রেটিস, হায় টয়েনবী, হায় শেকসপীয়ার!

আমার বন্ধুরা প্রায় সবাই দুপুরে বিভিন্ন অফিসে আবদ্ধ হয়ে গেছে। কফি হাউসেও এখন এসে গেছে অন্য নতুন ব্যাচ। তবু মাঝে মাঝে যেতে হয় কফি হাউসেই। নইলে কি মাসি-পিসিদের মতন দুপুরে বাড়িতে পড়ে পড়ে ঘুমোব?

ইচ্ছে করেই অনেকটা পথ ঘুরে রানীদের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যাই কফি হাউসের দিকে। রানীদের বাড়ির ডান দিকের একতলায় ঘরের একটা জানলা খোলা। জানি ঐ ঘরে বসে বসে পড়ছে রানী। খোলা চুল পিঠের ওপরে ছড়ানো, দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো টেবিল, রানীও বসে দেয়ালের দিকে মুখ করে, মাঝে মাঝে আঁচল দিয়ে মুখ মোছা ওব স্বভাব।

রানীদের বাড়ির সদর দরজা বন্ধ। ও বাড়িতে অনেক লোক, এখন দরজায় ধাক্কা দিলেই অন্য কেউ না কেউ শুনে ফেলবে? সকাল বা সন্ধেবেলা আমি অনায়াসে ঐ বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়াতে পারি। রানীর দাদা সুরঞ্জন আমার বন্ধু, দূর থেকে লক্ষ্য রাখতে হয়, সুরঞ্জন কোনোদিন সকাল বা সন্ধেবেলা বাড়ি থেকে বেরোয়। তার একটু পরেই গিয়ে আমি নিরীহ মুখ করে বলতে পারি, সুরঞ্জন আছে? নেই? ইস, ওর সঙ্গে যে আমার খুব দরকার ছিল। আচ্ছা ওর ছোটবোনকে একবার ডেকে দাও তো, একটা কথা বলে দিতে হবে সুরঞ্জনকে।

এক একদিন দুপুরে খুব ইচ্ছে করে একতলার ঘরটার ডান দিকের জানলার পাশে দাঁড়িয়ে রানীকে শুধু একবার দেখে আসি। কথাটা ভাবলেই ঢিপঢিপ করে বুকের মধ্যে। আমি জানলার কাছে গিয়ে ডাকব রানী! ও চমকে পেছন ফিরে তাকাবে...। না, তা হয় না, ওপর থেকে কেউ দেখে ফেলতে পারে! দ্রুত পা চালিয়ে চলে যাই।

কফি হাউসে চেনা একজনও নেই যে আমায় কফি খাওয়াতে পারে। অন্যান্য টেবিলে সেকেণ্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারের বাচ্চা ছেলেমেয়েরা টেবিল ফাটাচ্ছে, ঠিক যেমন দু-তিন বছর আগে আমরা আসর জমাতুম।

ইসমাইল আধুলিটা ফেরত নিতে রাজি হলো না কিছুতেই। আজ আমার সঙ্গে দলবল কেউ নেই তো, একা দেখেছে তাই পাত্তা দিচ্ছে না। অতএব ধারেই দুটো সিগারেট নিতে হলো। তারপর পুরোনো বইয়ের দোকানগুলোতে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি। বেশিক্ষণ ধরে কোনো বই পড়লে তাড়া দেয়। তবে পাতিরামের স্টলের লোকেরা আমায় চেনে। ওখানে দাঁড়িয়ে অন্য পত্রপত্রিকার ধারাবাহিক উপন্যাস আমি পড়ে নিতে পারি।

একটা পুরোনো বইয়ের দোকানে একটা বই খুব পছন্দ হয়ে গেল কিন্তু মেরে দেবার উপায় নেই, এদের চোখ খুব কড়া। আমার পাশে দাঁড়িয়ে একটা ছেলে হ্যাবল্ড ল্যাস্কির গ্রামার অফ পলিটিকস বইটা কিনল। বারো টাকা দিয়ে। বাঃ, বেশ ভালো দাম উঠেছে তো। আমার বাড়িতে একখানা গ্রামার অফ পলিটিকস পড়ে আছে, কালই এনে ঝেড়ে দিতে হবে।

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে একজন প্রৌঢ় বেশ দামি সুট পরা, কিন্তু মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে, কাশলেন দুবার, শরীর বেশ খারাপ মনে হয়। কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে লোকটির চেহারায় বেশ একটা আভিজাত্যের ছাপ আছে।

লোকটি তাকালেন আমার দিকে...আমার দৃষ্টির সঙ্গে মিলে গেল...ঠিক যেন চুম্বকের মতন একটা দৃষ্টির সেতু...

প্রৌঢ় লোকটি হাতছানি দিয়ে ডাকলেন আমাকে। আমি কিছু না বুঝে যেতেই বললেন, খুব বেশি সময় নেই সংক্ষেপে সেরে নিতে হবে...বেশি প্রশ্ন করো না...তুমি এক্ষুনি আমার সঙ্গে যেতে পারবে এক জায়গায়।

আমি অবাক। উনি আমার নাম জানেন না, তুমি বলে কথা বলছেন, আবার যেতে বলছেন ওঁর সঙ্গে...কে উনি?

—মানে...আপনাকে তো আমি...

—বললুম না বেশি সময় নেই...যেতে পারবে কি না বলো।

—কোথায়?

—সেটা তো গেলেই বুঝতে পারবে...তুমি যদি রাজি না থাকো—

—হ্যাঁ যেতে পারি, আমার হাতে তো কোনো কাজ নেই।

—ঐ যে আমার গাড়ি এসে গেছে।

একটা কালো রঙের রোভার এসে থামল আমাদের ঠিক সামনে। একেবারে ঝকঝকে তকতকে। সামনে খাকি পোশাক ও সাদা টুপি পরা শ্যোফার। সে দ্রুত নেমে এসে সসম্ভ্রমে পেছনের দরজা খুলে দাঁড়াল।

প্রৌঢ় আমাকে বললেন, তুমি ওঠো আগে—।

গাড়ি চলতে শুরু করতেই তিনি কোটের ভেতরের পকেট থেকে বার করলেন একটা সোনার সিগারেট কেস। সেটা খুলে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, খাও?

সিগারেটগুলো বোধহয় ফাইভ ফিফটি ফাইভ। লোভ হচ্ছিল, কিন্তু এরকম বয়স্ক লোকের সামনে কোনোদিন সিগারেট খাইনি। ঘাড় বেঁকিয়ে বললুম, না।

—বাঃ! অভ্যেস করোনি যখন, তখন আর ধরো না! বাজে জিনিস।

নিজে একটি সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, অমন আড়ষ্ট হয় আছ কেন? ঠিক করে বসো। তোমার নাম কী?

নাম বললুম।

—চাকরি করো কিছু?

—আজ্ঞে, এখনো পাইনি।

—বাড়ির বড় ছেলে?

—না। ছোটো।

—ঠিক আছে শোনো, ওঃ...

হঠাৎ ভদ্রলোক দারুণ কাশতে লাগলেন, চেপে ধরলেন বুকটা, যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

আমি খুব অসহায় বোধ করলুম। শ্যোফার একবার শুধু মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, বাড়ি ফিরে যাব সার?

প্রৌঢ় লোকটি একটা হাত নেড়ে না বোঝালেন। তারপর কাশি একটু কমলে পেছনে হেলান দিয়ে শুয়ে রইলেন চোখ বুজে।

গাড়ি শ্যামবাজার ছাড়িয়ে ছুটতে লাগল বি টি রোড ধরে। কোথায় যাচ্ছি। কেন যাচ্ছি কিছুই বোঝবার উপায় নেই। একটা সিগারেট টানবার জন্য মনটা উসখুস করছে।

চোখ বোজা অবস্থাতেই ভদ্রলোক আমায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাবা মা তোমায় কী নামে ডাকেন?

—নীল।

—আমিও যদি সেই নামে তোমায় ডাকি, তোমার আপত্তি আছে?

—না-না, আপত্তি করব কেন?

—আমার কোটের ডান পকেটে হাত দিয়ে দেখো তো, একটা ওষুধের ফাইল আছে কি না—

এরকম অবস্থায় কোনোদিন পড়িনি। একজন অচেনা লোক বলছেন তাঁর পকেটে হাত দিতে। কিন্তু ভদ্রলোক অসুস্থ যখন...

ঝুঁকে ওঁর কোটের ডান পকেটে হাত দিয়ে সত্যিই একটা ওষুধের ফাইল পেলাম।

—ওর থেকে একটা ট্যাবলেট আমার মুখে দিয়ে দাও তো!

—ইয়ে...জলটল কিছু লাগবে না?

—না, শুধু ট্যাবলেটটা দিলেই হবে। তারপর ফাইলটা আবার পকেটে রেখে দাও।

তাই দিলুম। ভদ্রলোক এবার যেন ঘুমিয়ে পড়লেন। চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আমার কোনো গত্যন্তর নেই।

অনেকক্ষণ বাদে গাড়িটা এসে থামল একটা লোহার গেটের সামনে। দুজন নেপালী দারোয়ান সেখানে বসে ছিল, তারা গেটটা খুলে দিয়ে কপালে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। গাড়িটা ঢুকে এলো ভেতরে।

অনেকখানি বড় কম্পাউণ্ডের মধ্যে এক দিকে একটা কারখানার মতন শেড, আর একদিকে একটা দোতলা বাড়ি, সবই একেবারে নতুন। ছোট ছোট নারকোল গাছ লাগানো হয়েছে কম্পাউণ্ডের দেওয়ালের ধার ঘেঁষে।

শ্যোফার গাড়ির দরজা খুলে দিতেই ভদ্রলোক চোখ মেলে বললেন, এসে গেছি? এসো নীলু—। তুমি এখনো আমার নাম জানো না। আমার নাম পি এন রয়, তুমি আমার নাম শুনেছ আগে?

আমি ইতস্তত করতে লাগলুম। ইনি খুব বিখ্যাত লোক? আমার আগেই নাম জানা উচিত? কিন্তু আগে কখনো শুনেছি বলে তো মনে পড়ে না—

—তুমি ছেলেমানুষ, হয়তো নাও জানতে পার। অনেকে জানে। অনেকে আমায় শুধু স্যার পি এন বলে ডাকে।

—আপনি এখন সুস্থ বোধ করছেন একটু?

—হ্যাঁ, একটু, ও ঠিক আছে চলো—

আস্তে আস্তে তিনি এগিয়ে গেলেন কারখানার শেডটার দিকে। সেখানেও একজন দারোয়ান রয়েছে, পি এন ইঙ্গিত করতেই সে দরজার তালা খুলে দিল।

ভেতরে সার সার মেশিনপত্র সাজানো। সবই একেবারে ঝকঝকে নতুন। দেয়ালে এবং আসবাবপত্রে নতুন রঙের গন্ধ।

একটা বড় মেশিনের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, এই আমার স্বপ্ন। আমার কবিতা। এই সব মেশিনের ডিজাইন আমি নিজে করেছি, ভারতবর্ষে প্রথম। এক পয়সা ফরেন এক্সচেঞ্জ খরচ হয়নি। আগামী মাসের পয়লা তারিখ থেকে এই ফ্যাকটরি চালু হবার কথা...।

আমার দিকে তাকিয়ে তিনি অদ্ভুত ফ্যাকাসে ভাবে হাসলেন। আমার চোখের দিকে সোজা চেয়ে আছেন, পলক পড়ছে না।

—হ্যাঁ চালু হবার কথা ছিল...সমস্ত টেকনিশিয়ান আর ওয়ার্কারদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়ে গেছে...আর আজ আমি ডাক্তারের কাছ থেকে বায়োপসি রিপোর্ট পেলুম। আমার লাং-ক্যানসার হয়েছে, আমার আয়ু আর বড় জোর ছ মাস। তাও যদি চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকি...

এমন নাটকীয় ট্র্যাজিক ঘটনা শুনে আমার স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া

আর উপায় কী? স্যার পি এন সোনার কেস থেকে আর একটা সিগারেট বার করলেন। লাং-ক্যানসার, তাও উনি সিগারেট খাচ্ছেন?

যেন আমার মনের কথাটাই বুঝতে পেরে উনি বললেন, এখন আর কিছু যায় আসে না, সিগারেট খাই বা না খাই। এদেশের সবচেয়ে বড় স্পেশালিস্ট আমার মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দিয়েছে। যদি আমি আর ছ মাসের বেশি না বাঁচি, তা হলে এত সব গড়লুম কেন? কে চালাবে? আমার তো আর কেউ নেই!

এবার আমার মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ উঁকি মারল। সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের গতি হয়ে গেল দ্বিগুণ! আমি স্বপ্ন দেখছি না তো? গোপনে নিজের গালে একটা চিমটি কাটলুম। না, স্বপ্ন নয় তো, বেশ ব্যথা লাগছে।

—শোনো নীলু, কাল থেকেই নার্সিং হোমে যেতে হবে আমাকে। তোমাকে ভার নিতে হবে এই কারখানার।

—আমি?

—হ্যাঁ, তুমি এটা চালাবে। পারবে না?

—আমি...মানে আমি তো কারখানা সম্বন্ধে কিছু বুঝি না, আমার সায়েন্সের তেমন জ্ঞান নেই।

—সে তো টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার থাকবেই, তার জন্য কোনো চিন্তা নেই...আমি চাই ডাইনামিক পার্সোনালিটি আছে এমন একজন মানুষ, ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়েই খুঁজছিলুম সেইরকম একজনকে যে নিতে পারবে আমার জায়গা। তোমাকে দেখেই চমকে উঠেছি...তোমার মুখে আছে সেই ছাপ, তুমি পারবে, আমি জানি তুমি ঠিক পারবে...

এই সময় কেউ আমার গায়ে একটা ফুল ছুঁড়ে মারলেও বোধ হয় আমি মূর্ছা যেতাম। এ সব কি সত্যিই আমি শুনছি! নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছি না। এত বড় একটা কারখানা, নতুন, এর পরিচালক হবো আমি!

—শোনো, আমি কালই কাগজপত্রে লেখাপড়া করে দিতে চাই, তুমি আপাতত হবে এর একান্ন পার্সেন্টের মালিক, যতদিন আমি বেঁচে আছি...তারপর...সে ব্যবস্থা আমি পরে করে যাব।

—না না, স্যার পি এন, শুনুন।

—ঐ যে নতুন দোতলা বাড়িটা, ঐখানে তুমি থাকবে। বাড়ির পেছনে বাগান আর সুইমিং পুল আছে, যে-গাড়িটা চেপে এলে সেটাই তুমি রেখে দিও তোমার ব্যবহারের জন্য।

—স্যার পি এন, আপনি ভুল লোককে বেছেছেন। আমি এ কাজের অযোগ্য।

—না নীলু, তোমার কোনো আপত্তি আমি শুনব না! তোমাকে দেখেই আমি

বুঝেছি তুমি পারবে। তা ছাড়া আর একটা কথা বলব, তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে। আমার ছেলে...আমার এক মাত্র ছেলে আমার ওপর রাগ করে চলে যায়, আজ থেকে এগারো বছর আগে। সারা দেশ তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। কোনো চেষ্টার বাকি রাখিনি। পয়সা খরচ করেছি জলের মতন...সে বোধহয় আর বেঁচে নেই...! তোমায় দেখে চমকে উঠেছিলাম কেন জানো, অবিকল তোমার মতন মুখের আদল ছিল তার, একেবারে যেন যমজ। আরও আশ্চর্য দেখো তার নামও ছিল নীলাঞ্জন। না, না নীলু তুমি কিছুতেই আপত্তি করতে পারবে না! এই মুমূর্ষু বৃদ্ধের অনুরোধ তুমি রাখবে না? বলো? এই কারখানা আমার এতদিনকার স্বপ্ন, সব নষ্ট হয়ে যাবে? নীলু, তোমাকে এটা চালাতেই হবে...আমার কাছে এসো, আমার গা ছুয়ে শপথ করো যে...

টং করে একটা শব্দ হলো। বাস স্টপের প্রৌঢ় লোকটি কোটের পকেট থেকে কিছু খুচরো পয়সা বার করে গুনছিলেন, তার মধ্য থেকে একটা সিকি মাটিতে পড়ে গড়িয়ে এলো আমার দিকে।

আমি একই সঙ্গে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললুম ও মুচকি হাসলুম। তারপর সিকিটা কুড়িয়ে তুলে দিলুম প্রৌঢ়টির হাতে, তিনি শুকনো গলায় বললেন, ধন্যবাদ। তারপর হাত তুলে ডাকলেন এই রিকসো, রিকসো।

একটা রিকশা এসে দাঁড়াতেই তিনি উঠে পড়ে বললেন, চলো মানিকতলা। অনেকক্ষণ বাস-ট্রাম আসছে না বলেই বোধহয় তিনি গুনছিলেন রিকশা ভাড়া।

এর পর ইসমাইলের কাছ থেকে একটা সিগারেট ধার না করলে চলে না। এক কাপ কফিও খেতে হবে যে-কোনো উপায়ে। আবার ফিরে চললুম কফি হাউসের দিকে।

৪

যখন নিজে ছাত্র ছিলুম তখন সকালে ঘুম ভাঙতে চাইত না কিছুতেই। বাবা দু-তিনবার তাড়া দিয়ে যেতেন। এখন ঠিক সাড়ে ছটায় ঘুম ভেঙে যায়। কোনোরকমে চোখ মুখ ধুয়েই ধাঁ করে চলে যাই বাজার করতে। ঐ ভারটা আমার ওপর। ওটা করতে আমার ভালোই লাগে, কিছু খুচরো রোজগার হয়। ফিরে এসে এক কাপ চা খেয়েই আবার বেরুনো। সকালের প্রথম টিউশানি।

উত্তর কলকাতায় গত শতাব্দীর যে কয়েকটি বনেদি বাড়ি এখনো টিকে আছে তার মধ্যে একটি। রাস্তার দিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে সবটা ঘেরা, মাঝখানে লোহার

গেট। গেটের পাশেই দারোয়ানের ঘর। ভেতরে অযত্নে ফেলে রাখা বিরাট বাগান, তার শেষ দিকটায় অর্কিড হাউস, পাম ও দেবদারু গাছের সারি। এখানে এলে মনেই হয় না এটা কলকাতা শহরের মধ্যে। যে শহরে দশ বাই বারো সাইজের ঘরে এক পরিবারের পাঁচ ছজন মানুষ গাদাগাদি করে থাকে। এদের এই বাগানে রয়েছে দু-তিনটি জলের ফোয়ারা, কোনোটা দিয়েই এখন জল বেরোয় না এবং এখানে ওখানে ছড়ানো পাঁচ ছটি শ্বেতপাথরের নগ্ন নারীমূর্তি। স্কুল জীবনে এই বাড়িটার পাশ দিয়ে যাবার সময় লোহার গেটের ফাঁক দিয়ে ঐ মূর্তিগুলি এক ঝলক দেখে আমরা শরীব গরম করে নিতুম।

বাড়িটি বোধহয় তিনমহলা। বিভিন্ন শরিকের আলাদা আলাদা অংশ। গেট দিয়ে ঢুকে অনেকখানি যেতে হয় আমায়। একটা চাঁপা গাছে সারা বছরই ফুল ফোটে। সেটার তলায় দাঁড়িয়ে বুক ভরে একবার গন্ধ নিই। তারপর এগিয়ে যাই দরজার দিকে।

প্রত্যেকদিনই অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করতে হয়। ভেতরে উঁকি মারলে দেখা যায় বারান্দার পর বারান্দা, উঠোনের পর উঠোন, যেন এক গোলকধাঁধা। বেশি দূর যাবার এক্তিয়ার নেই আমার। প্রথম বারান্দাটায় এসে আমি ডাকি বাবলু, বাবলু!

আমার এ ডাক আমার ছাত্র শুনতে পাবে না। সে থাকে অনেক দূরে। কিন্তু সেই ডাক শুনে কোনো একজন ভৃত্য আসে। সে দু-তিনখানা উঠোন পেরিয়ে গিয়ে হাঁক দেয়। খো-কা-বা-বু! তোমার ম্যাস্টার এ-য়ে-চে!

দু-তিনবার এই রকম ডাকের পর ওপর থেকে উত্তর আসে, যা-ই! বসতে বলো।

এ বাড়িতে যে কত ঘর অব্যবহৃত পড়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই মনে হয়। গত শতাব্দীতে জাঁক দেখাবার জন্য এই সব বড় বড় বাড়ি তৈরি হতো, এখন প্রত্যেকদিন এই গোটা বাড়ি ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার রাখাই বিরাট খরচের ব্যাপার।

একটা বড় হলঘরের পাশে একটি ছোট্ট ছিমছাম ঘরে আমায় বসতে দেওয়া হয়। ছাত্রটির নিজস্ব পড়বার ঘর ওপরে, কিন্তু অতখানি অন্দরমহলে বাইরের লোকের যাওয়ার নিয়ম নেই।

এই ঘরটির ঠিক সামনেই রয়েছে চমৎকার একটি ভাস্কর্য। কোনো বিলিতি শিল্পীর কাজ। একটি অনিন্দ্যকান্তি কুমারী কন্যার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে মিনতি করছে পাদ্রির পোশাক পরা একজন প্রৌঢ়। মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। শ্বেতপাথরের এই শিল্পের মধ্যে যে কোন্ কাহিনী লুকিয়ে রয়েছে তা আমি জানি না। ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমি প্রত্যেকদিন ঐ মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকি আর এক-একদিন এক-রকম গল্প ভাবি।

এই সব বাড়ির ছেলেমেয়েরা খুব অল্প বয়েস থেকেই নানা রকম পশ্চিমী ভাস্কর্য ও ছবি দেখে বলে ছবি বা পাথরের নগ্ন নারী সম্পর্কে খুব একটা শিহরন নেই। কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো এখনো মধ্য-ভিক্টোরিয়ো যুগে পড়ে আছে। আমাদের মতন বাড়ির গুরুজনেরা এরকম একটি মূর্তি সাজিয়ে রাখার কথা কল্পনাই করতে পারেন না। অথচ কী সুন্দর!

এক সময় আমি এ বাড়িতে পড়াতে আসতুম সন্ধেবেলা। সে সময় এ বারান্দাটা অন্ধকার থাকে। আমাকেই এসে আলো জ্বালতে হতো পড়ার ঘরের। এক নির্জন সন্ধ্যায় মনে হয়েছিল গোটা নিচ তলাটাতেই কেউ নেই। আমি পড়ার ঘর পর্যন্ত এসে, তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে চট করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিলুম এই মূর্তিটার সামনে। যেন পাদ্রিটিকে সরিয়ে দিয়ে আমি নিজেই সেই নগ্ন কুমারীর কাছে প্রার্থনা করছি। পাদ্রিটি কোনো বাধা দিল না। আমি সেই সরলা, স্বর্গ কন্যার মতন শ্বেতপাথরের বালাটির ওষ্ঠ চুম্বন করলুম, সেই আমার প্রথম চুম্বনের অভিজ্ঞতা।

আমার ছাত্রটির খুব হাসিখুশি, ফুটফুটে চেহারা। সাহেবদের মতন গায়ের রং। খুব ছোট বয়েস থেকে ওকে পড়াচ্ছি বলে ও আমায একটুও ভয় পায় না। মাত্র এগারো বছর বয়েস, ছোট্টখাট্টো জমিদাব সেজে হেলতে দুলতে ঘরে ঢুকেই বলে মাসমোশাই, আপনি চারদিন আসেননি কেন?

—বাঃ, তোমার বাবাকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলুম?

—ওসব আমি জানি না। আপনি আসেননি কেন আগে বলুন।

—আমার কাজ ছিল।

—ওসব কাজ ফাজের কথা আমি শুনব না। আপনাকে রোজ আসতে হবে। না হলে আমি আর পড়ব না কিন্তু, এই বলে দিচ্ছি।

পাক্কা জমিদারের রক্ত একেই বলে। আমার দিকে রাগী চোখে তাকিয়ে থাকে বাবলু। আমি হাসতে হাসতে বললুম, আচ্ছা আচ্ছা আজ অনেকখানি বলব।

নিছক পড়ার আগ্রহেই বাবলু রোজ আমার দর্শন চায় না। প্রত্যেক দিন পড়ানো শেষ করার পর ওকে একটা গল্প বলতে হয়। অত গল্প কোথায় পাব আমি? তাই এখন শুরু করেছি ধারাবাহিক উপন্যাস, সম্রাট আলেকজাণ্ডার সেই উপন্যাসের নায়ক। ইতিহাসে লিখতে ভুলে গেছে এমন সব রোমহর্ষক অভিযানের কাহিনী আমি আলেকজাণ্ডারের নামে চালিয়ে দিই, প্রত্যেকদিন একটা করে যুদ্ধ না থাকলে বাবলুর পছন্দ হয় না। আলেকজাণ্ডারকে দিয়ে আমি এক ড্রাগনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়েছি পর্যন্ত।

এক এক দিন আচমকা আমাকে গল্প পাল্টাতে হয়। গল্প শুরু করার মুহূর্তেই

বাবলু বলে, একটু দাঁড়ান মাস্‌মোশাই, আমি আসছি, তারপর ছুটে বেরিয়ে যায়। একটু পরে ফিরে বলে, দিদিও গল্প শুনবে।

বাবলুর দিদির নাম মালবিকা, আপন দিদি নয়, একজন কাকার মেয়ে। তেরো-চোদ্দ বছর বয়েস হবে। এই মালবিকাকেও আমি এক সময় পড়িয়েছিলুম কিছুদিনের জন্য। তারপর মালবিকা ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে বিলেত চলে যায়। বছর চারেক সেখানে কাটিয়ে সদ্য ফিরেছে। মালবিকার খুব সূক্ষ্ম ধরনের চেহারা। ভুরু দুটি যেন চীনা শিল্পীর টান, খুব পাতলা ঠোঁট, তার মুখখানি এবং গায়ের রং যেন স্বচ্ছ। ভারি আশ্চর্য মেয়ে মালবিকা, এই বয়সেই বেশ গম্ভীর। আর এতদিন বিলেত থেকে এলো তবু একটিও ইংরিজি শব্দ উচ্চারণ করে না। যখন তখন প্রবাসের গল্প শুরু করে না। কখনো কোনো ঘটনার উল্লেখ যদি বা করে, বিলেতে বলে না, বলে ওদেশে কিংবা সাহেবদের দেশে।

মালবিকার সামনে আজগুবি গল্প বলতে আমার সাহস হয় না, বিলেতের স্কুলে চার বছর পড়েছে, নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানে। সুতরাং আমাকে সত্যিকারের ইতিহাসের কোনো অধ্যায়ের কথা ভাবতে হয়।

বাবলু যেমন চঞ্চল, মালবিকা তেমনি নম্র আর শান্ত। এক মন দিয়ে শোনে, গল্পের করুণ জায়গায় ওর চোখ ছলছল করে। কিন্তু মালবিকার মাথাতেও দুষ্টু বুদ্ধি কম নেই।

গল্প শেষ করে আমি যখন উঠছি, তখন মালবিকা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা মাস্টোমশাই একটা জিনিস বলুন তো? একদিন খুব ঝড় বৃষ্টির রাতে আফ্রিকার একটা জিরাফ তার বন্ধু একটা হাতিকে কানে কানে কী বলেছিল?

আমি চোখ কুঁচকে রইলুম। এ আবার কী ধাঁধা!

বাবলু হাততালি দিয়ে বলল, আমি জানি! আমি জানি!

মালবিকা বলল, এই তুই চুপ কর। মাস্টোমশাই, আপনি বলুন।

—কোন ঝড় বৃষ্টির রাতে?

—সে মনে করুন যে-কোনো একদিন খুব ঝড় বৃষ্টি...জিরাফটা কী বলেছিল হাতিকে?

—আমি তা কী করে জানব? তুমিই বা জানবে কী করে?

—হ্যাঁ, আমি জানি। কিছুই বলেনি! কারণ জিরাফরা মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ করতেই পারে না। সব জিরাফই বোবা।

বাবলু হো-হো করে হেসে একেবারে গড়াগড়ি যায় আর কি! মাস্টারমশাইয়ের চেয়ে তার দিদি যে কোনো বিষয়ে বেশি জানে, এতেই সে খুব আমোদ পেয়েছে।

মালবিকা কিন্তু অত জোরে হাসে না। ঠোঁটে পাতলা হাসি এঁকে আমার দিকে

চেয়ে থাকে। প্রত্যেকবার এরকম সব নতুন নতুন ধাঁধা ও বার করতেও পারে মাথা থেকে!

—যে গল্পটা একটু আগে বললেন সেটা যে-বইতে আছে সে বইটা আমার চাই। কাল এনে দেবেন।

আমার প্রতি এই হুকুম জানিয়ে মহারানীর ভঙ্গিতে মালবিকা বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

যে-হলঘরটির পাশের বারান্দা দিয়ে আমায় হেঁটে আসতে হয়, সেই হলঘরটিতে আমি মাত্র একদিন ঢোকার সুযোগ পেয়েছি। সেখানে অন্তত পঁচিশ তিরিশটি সোফা-কৌচ সাজানো। সবগুলোতেই ঢাকনা দেওয়া। কতদিন সেইসব ঢাকনা খোলা হয়নি কে জানে! দেয়ালে অন্তত তিরিশ বত্রিশটা ঘড়ি, তার মধ্যে কোনোটাতে কোকিল ডাকে ; কোনোটায় এক কামার প্রতি মিনিটে একবার করে হাতুড়ির ঘা মারে, কোনোটায় গীর্জার ঘন্টার মতন আওয়াজ হয়। দেয়ালের ওপরের দিকে আছে সব বিলিতি অয়েল পেইন্টিং, বেশির ভাগই নগ্ন নারী এবং কিছু কিছু ইওরোপীয় নিসর্গ। কয়েকটি ছবির বিষয়বস্তু যেন আমি চিনতে পেরেছিলুম। একটা তো নিশ্চয়ই রাজা কফেটুয়া আর সেই লাল চুলের ভিখারিণী কন্যা।

সেই হলঘরে সকাল সাড়ে আটটায় প্রতিদিন এসে বসেন এক বৃদ্ধ। মাথায় টাক কিন্তু নাকের নিচে বিরাট পাকানো গোঁফ! কোনোদিন তাঁকে গেঞ্জি শার্ট বা পাঞ্জাবি পরতে দেখিনি, তাঁর গায়ে থাকে সিল্কের বেনিয়ান, যার বোতাম বুকের বাঁ পাশে। এই বৃদ্ধ যেন ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসেছেন। ইনি বাবলু-মালবিকার দাদু।

ইনি এই হলঘরে বসা মাত্র একজন ভৃত্য একটি রুপোর গড়গড়া রেখে যায় ওঁর পাশে। উনি নলটা তুলে চোখ বুজে টানেন। খানিকবাদেই হাজির হয় একজন সিঁড়িঙ্গে চেহারার লোক, সে বসে মেঝেতে কার্পেটের ওপর ঐ বৃদ্ধের পায়ের কাছে। এই সিঁড়িঙ্গে চেহারার লোকটির মাথায় টিকি, গায়ে চাদর জড়ানো। সেখানে বসেই লোকটি কী যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করে। প্রথম বুঝতে পারিনি লোকটা কী পড়ে।

আমি যে ঘরে বসে পড়াই সেখানকার একটা জানলা দিয়ে ঐ হলঘরটার খানিকটা অংশ দেখতে পাওয়া যায়। কয়েকবার উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখে ব্যাপারটা বুঝেছি। ঐ সুঁটকো লোকটি একজন মাইনে করা পাঠক। প্রথমে সে বাংলা খবরের কাগজের বিশেষ বিশেষ খবরগুলো বাড়ির মালিককে পড়ে শোনায়। তারপর পাঠ করে গীতার কিছু অংশ।

বাবলু-মালবিকার দাদু চোখ বুজে তামাক টানতে টানতে শুনে যান, মাঝে মাঝে দুটি একটি মন্তব্য করেন, তাঁর গলার আওয়াজ গমগমে, পরিষ্কার শুনতে পাই পড়ার ঘর থেকে।

এক একদিন তিনি আচমকা হুংকার দিয়ে ওঠেন, চামড়া খুলে নেব। গায়ে নুন ছিটিয়ে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াব! ব্যাটা বেল্লিক!

আমি থ! এসব কাকে বলা হচ্ছে, ঐ বেচারি আমসত্ত্ব মার্কা বামুন পাঠকটিকে? কী অন্যায় করেছে সে?

বাবলু পড়া থামিয়ে হেসে বলে, দাদু খেপেচে!

আমার অনুমতি না নিয়েই ছুটে বেরিয়ে যায় সে। তখন ওদিকে চলতে থাকে সেই হুংকার আর দাপাদাপি। জানলা দিয়ে উঁকি মারতেও আমার সাহস হয় না।

বাবলু ফিরে এলে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করি, কী হয়েছিল?

—ঘড়ি বেঁকে গেছে।

—তার মানে?

—প্রসন্ন ঘড়িতে চাবি দেয়, কিচ্ছু পারে না।

প্রসন্ন এ বাড়ির গোমস্তার ছেলে। তার ওপরে ভার নির্দিষ্ট দিনে ঐ ঘড়িগুলো চাবি দেওয়া। সেই দেয়ালের কোনো ঘড়ি সে এক চুল বাঁকিয়ে ফেললেই ঐ বৃদ্ধ চোখ বোজা অবস্থাতেও কোনো অলৌকিক উপায়ে তা টের পেয়ে যান।

এ রকম তর্জন-গর্জন প্রায়ই শুনতে পাই। নিয়মিত গীতা-পাঠ শুনেও ঐ বৃদ্ধের মনে কোনো প্রশান্তি আসেনি বোঝা যায়।

একদিনই মাত্র আমার সঙ্গে সেই বৃদ্ধের কথা হয়েছিল। আমি পড়িয়ে ফিরছি মাথা নিচু করে, তিনি সেই রকম বাজখাই গলায় হাক দিলেন, এই যে ওহে মাস্টার শোনো—।

আমায় যে ডাকছেন প্রথমটায় বুঝতেই পারিনি। তখনও চোখ বুজে আছেন, হাতে গড়গড়ার নল।

—তুমিই তো খোকার মাস্টার? এদিকে এসো। তুমি কটা পাস দিয়েচো?

কিছু বুঝতে পারলুম না। কটা পাস দিয়েছি মানে?

—চুপ মেরে ডাঁড়িয়ে আচো কেন? কথা কানে যায়নি।

—আজ্ঞে?

—বলি, বি এ পাস হয়েচে?

—ও হ্যাঁ, আজ্ঞে হ্যাঁ!

—তবে ঠিক আচে। যাও। আমি শুনলুম খোকাকে কে একজন অল্পবয়িসী মাস্টার পড়াচ্ছে, অন্তত বি এ পাস যদি না হয়—

বাড়িতে ফিরে বাবার কাছে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলুম পুরনো লোকেরা এখনো বি এ পাসকে তিনটে পাস মনে করেন। আমরা বলি পাস করা, ওঁরা বলেন পাস দেওয়া!

—মাসমোশাই, মঘুবাঈ এসেছেন, আপনি যাবেন তো?

—মঘুবাঈ? কে মঘুবাঈ?

—মঘুবাঈ কুরদিকার, পাথরেঘাটায় আমার মামার বাড়িতে আসছেন!

—ও হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাব!

—কা'ল সন্ধেবেলা। আপনি নিজে যেতে পারবেন? বাবা বলেছেন, আমাদের গাড়িতেও আপনি যেতে পারেন।

—না, আমি নিজেই যাব।

এগারো বছরের ছেলে বাবলু মঘুবাঈ কুরদিকার নামে বিখ্যাত মার্গ সঙ্গীত-গায়িকার নাম জানে, তাঁর গান শুনতে যায়। পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঘোষদের সঙ্গে বাবলুদের আত্মীয়তা আছে, সে বাড়িতে সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকারা আসেন। আমি এর আগেও দু-একবার গেছি। টিকিট-ফিকিটের ব্যাপার নেই, শুধু নির্বাচিত নিমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে গান করেন গুলাম আলী কিংবা হীরাবাঈ কিংবা কেশববাঈ। সেখানে যেতে গেলে আমাকে ধুতি পরতে হয়, প্রথমবার প্যান্ট পরে কী লজ্জাতেই পড়েছিলুম। অন্য সবাই পরেছেন কুচোনো ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, কাধে চাদর। আসর বসে একতলার ঠাকুরদালানে, সেখানে একজনও মহিলা নেই. তারা সবাই দোতলায় চিকের আড়ালে। যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর এক পাতা ছবি। একমাত্র আমিই প্যান্ট শার্ট পরা বলে সবাই আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল, যেন আমি একটা চাকর-বাকর।

বাবলুকে নিয়ে আমাকে একবার দারা সিং-এর কুস্তিও দেখতে যেতে হয়েছিল। বাবলুর বাবা অনুরোধ করেছিলেন। রোববার সন্ধেবেলা দেশবন্ধু পার্কে আমার বন্ধুবান্ধবদের বিরাট আড্ডা। সেখানে না গিয়ে আমায় দেখতে হলো ময়দানের তাঁবুর মধ্যে বসে পুরুষমানুষদের শরীরের চটকাচটকি। কুস্তি ব্যাপারটা আমার কাছে বীভৎস আর অশ্লীল লাগে।

অন্য কারুর সঙ্গে না পাঠিয়ে আমাকেই যে যেতে হয় বাবলুর সঙ্গে তার বিশেষ একটা কারণ আছে। কুস্তি তো আর একলা দারা সিং লড়ে না, তার সঙ্গে আছে রনধাওয়া, বিষেণকুমার, কিং কং, মুখোশ পরা ফ্যানটম, সুপারম্যান ইত্যাদি। দেখতে দেখতে বাবলুর মনে যত রকম প্রশ্ন জাগবে, তার উত্তর তো মাস্টারমশাইকেই দিতে হবে। এটাও শিক্ষার অঙ্গ। সেইজন্য নানান খবরের কাগজ পড়ে আমাকে ঐসব কুস্তিগীরদের জীবনী জেনে রাখতে হয়।

এইভাবে বাবলুকে নিয়ে আমি সার্কাস দেখতে এমন কি হর্টিকালচারাল গার্ডেন, বোটানিক্যাল গার্ডেনও গেছি। কারণ ঐ একই।

অ্যারিস্টোক্র্যাসির এই একটা দিক আমার চোখে পড়ে। ছেলেবেলা থেকেই গান বাজনা থেকে শুরু করে সব দিকে আগ্রহ তৈরি করে দেবার চেষ্টা। এগারো বছর বয়েসেই বাবলুর গলায় ফুটে ওঠে আত্মবিশ্বাসের সুর।

বাবলুকে দেখে আমার এক এক সময় মনে পড়ে সুশীলের কথা। সুশীল আমার প্রথম ছাত্র।

তখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি। বাবার ঘাড়ে হলো বিরাট কার্বাঙ্কল, মায়েরও কী যেন একটা কঠিন অসুখ। বাবা আর মা দুজনেই শয্যাশায়ী, মাসের পর মাস। আমাদের বাড়িতে তখন কোনো রাঁধুনী ছিল না, দাদা আর আমি পালা করে রাঁধতুম। সেই ক্লাস নাইনেই আমার বেগুন ভাজা রান্নার খুব সুনাম হয়েছিল। বেগুন ভাজা মোটেই সহজ নয়, কড়াইতে তেল ফুটবার সময় ওপরের সব ফেনা মিলিয়ে গেলে তারপর বেগুন ছাড়তে হয়।

অসুখে ভুগে ভুগে বাবা খুব রোগা হয়ে গিয়েছিলেন, কিছু লিখতে গেলে হাত কাঁপে, সেই অবস্থাতেই একটা বেয়ারার চেক লিখে আমায় পাঠিয়েছিলেন ব্যাঙ্কে। আমাকে চেকটা ফেরত দিয়ে দিল ব্যাঙ্কের লোকেরা। সই মিলেছিল, কিন্তু একশো টাকার চেক, বাবার অ্যাকাউন্টে আছে মাত্র একানব্বই টাকা। সে কথা বাড়ি ফিরে দাদাকে জানালুম। দাদা বাথরুমে বসে থুপ থুপ করে জামাকাপড় কাচছিল, ঘাড় ফিরিয়ে বলল, আজ থেকে মাছ খাওয়া একদম বন্ধ। আমি এ মাস থেকে দুটো টিউশানি নিয়েছি, সব ম্যানেজ হয়ে যাবে। উনুন ধরে গেছে, তুই চট করে ভাতটা চাপিয়ে দে তো।

সেই দিনই ভেবেছিলুম আমাকেও কিছু রোজগার করতে হবে। দারোয়ানের কাছ থেকে গঁদ চেয়ে নিয়ে স্কুলের বাইরে দেয়ালে আর রাস্তার কয়েকটা জায়গায় সেঁটে দিলুম আমার নিজের হাতে-লেখা বিজ্ঞাপন। ছাত্র পড়াইতে চাই। ক্লাস ওয়ান হইতে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত ছাত্রদের উত্তমরূপে পড়াইব। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। এক সপ্তাহ অপেক্ষা করেই একটা সুযোগ পেয়ে গেলুম।

শ্রী উত্তরা সিনেমার পেছন দিকের বস্তিতে সুশীলদের বাড়ি। সুশীলের বাবা হাতিবাগান বাজারের সামনের ফুটপাথে বসে গেঞ্জি, রুমাল, মোজা বিক্রি করেন। তিনিই দেখা করেছিলেন আমার সঙ্গে। আমার এত কম বয়েস তিনি আশা করেন নি, প্রথমে নিরাশ হলেও চাকরিটা দিয়ে দিলেন আমার পদবী শুনে। ব্রাহ্মণ বলে কথা। কে বলে কলি যুগে ব্রহ্মতেজ নেই!

মাইনে কুড়ি টাকা। দু বেলা পড়াতে হবে এক ঘন্টা করে। সুশীলের বাবা

আমার সামনে হাত-জোড় করে বলেছিলেন, দেখুন মাস্টারবাবু, আমি ফেরিওয়ালা, আমার জীবনটা তো এইভাবেই কাটবে। ছেলের জন্য যত পয়সা খরচা করতে হয় রাজি আছি আমি। তবু যাতে ছেলেটা লেখাপড়া শিখে একটা চাকরি-বাকরি পেয়ে ভদ্রলোক হয়! আপনাদের মতন ভদ্দরলোকের বাড়ির ছেলেরা গড়গড়িয়ে সব পরীক্ষায় পাস করে যায়, আমাদের বাড়ির ছেলেরা পারে না কেন? আমিও তো ওকে বই খাতাপত্তর যখন যা দরকার সব কিনে দি!

ছেলেটির নাম সুশীল, কিন্তু সে নিজে এবং সবাই বলে সুসিল! প্রথম দিন থেকেই আমি এটা শোধরাবার চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু ওদের জিভের আড়ই অন্যরকম। আশ্চর্য ব্যাপার, কলকাতার এক ধরনের লোকের জীবন থেকে তালব্য শ একদম বাদ! এই অক্ষরটাকে কেন যে তারা পছন্দ করে না কে জানে! দন্তের স-এর উচ্চারণও ইংরিজি এস-এর মতন।

সুশীলের বয়স বারো, পড়ে ক্লাস ফাইভে, যদিও পড়া উচিত ছিল ক্লাস টু-তে। ছোট হাতের ইংরিজি অক্ষরই লিখতে পারে না ভালো করে, আট নয়ের নামতা মুখস্থ নেই। নেতাজী কে ছিলেন জানে না, ১৫ই আগস্ট কেন ছুটি থাকে তাও জানে না। বস্তির মধ্যে প্রায়ই এমন গোলমাল হয় যে পড়ানো খুব মুশকিল। সুশীলের টিউশানি করতে গিয়ে আমার নিজস্ব একটা লাভ হয়েছে। ওখান থেকে আমি কয়েকটা চমৎকার অশ্লীল গালাগাল শিখেছি।

সন্ধেবেলা হ্যারিকেনের আলোয় পড়তে বসেই সুশীল ঘুমে ঢোলে। নকল ঘুম নয়। সত্যিই সাতটার পর সে আর চোখ মেলে থাকতে পারে না। আর কোনো বারো বছরের ছেলের এমন ঘুম আমি দেখিনি। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি সুশীলের, আগের দিন আমি একটা কবিতা ওকে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছি, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বই না দেখে বলতে পেরেছে, পর দিন সেটা আবার ভুলে গেছে সম্পূর্ণ। আমি দু-একটা লাইন মনে করিয়ে দিলেও বলতে পারে না।

সারাদিন খেটেখুটে রাত্রে বাড়ি ফিরে সুশীলের বাবা আমায় প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন, কী মাস্টারবাবু কী রকম দেখছেন? পারবে? কেলাস ফাইভে দুবার ফেল করেছে, এবার পাস করবে তো? দেখুন বই-খাতা সব কিনে দিয়েছি, মাস্টাব রেখেছি, আমি ওর মাকে বলে দিয়েছি, আধপেটা খেয়ে থাকব তবু ছেলের পড়াশুনোয় যাতে কোনো ক্ষতি না হয়...। মাস্টারবাবু, আপনার পড়ানো হয়ে গেলে আমার একটা উবগার করবেন? যদি আমার হিসেবটা একটু লিখে দেন—।

রোজই সুশীলের বাবার কেনাবেচার হিসেব আমি লিখে দিতাম একটা খেরো খাতায়। বিভিন্ন সাইজের গেঞ্জির গ্রোসের কোনটার কত দাম তা আমার তখন মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

ঠিক নভেম্বর মাসে আমি সুশীলের টিউশানিটা ছেড়ে দিই। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা যায় কিন্তু সুশীলকে পাস করানো অসম্ভব। কিংবা স্কুল থেকে ওকে এবার অ্যালাউ করে দেবে, যে-ভাবে ক্লাস টু থেকে ও ফাইভে উঠেছে, সেইভাবেই সিক্সে উঠবে।

সুশীলের বাবা খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। আমি কাঁচুমাচুভাবে বলেছিলুম, দেখুন আমার বাবা খুব আপত্তি করছেন, আমার নিজের পড়াশুনোর যদি ক্ষতি হয়...শেষে যদি আমি নিজেই ফেল করে যাই—

—ও আপনি ঠিক পাস করবেন, আমি জানি।

—আমার তো এবার ক্লাস টেন হবে, ফাইন্যাল ইয়ার বেশি পড়া শুনোর চাপ।

—আপনার জীবনের উন্নতি হোক, ভালো হোক! আমাদের মতন গরিব ঘরের ছেলের কি লেখাপড়া হয়?

—ও নিজে চেষ্টা করলে ঠিকই পারবে।

ধুৎ! ধুৎ! এ বস্তির একটা ছেলেও লেখাপড়া করে না, যদি বা কেউ ইস্কুলে যায় বড় জোর ঐ কেলাস ফাইভ পর্যন্ত...

ক্লাস নাইনে আমাদের বাংলা র‍্যাপিড রিডারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটা জীবনী ছিল। সুশীলের বাবাকে শুনিয়ে দিলুম সেটা। কত দারিদ্র্যের মধ্যে, কত অসুবিধে, বাড়িতে বসে পড়াশুনোর জায়গাই ছিল না, তবু তিনি বিদ্যাসাগর হয়েছেন।

—এই যেনার কথা বললেন তিনি কী জাত?

—বিদ্যাসাগর? ওঁর পদবী বোধহয় ভট্টাচার্য কিংবা বন্দ্যোপাধ্যায়...ঠিক মনে পড়ছে না।

—ঐ তো. বামুন! তা তো হবেই। বামুনের রক্তের মধ্যে লেখাপড়া থাকে, ওদের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা হয়? তবু আপনার সঙ্গে রোজ দুটো কথা বলে ছেলেটার একটু অন্তত উবগার তো হচ্ছিল...।

সেই সুশীলকে এখনো দেখতে পাই আমি। ঢ্যাঙা, চোয়াড়ে চেহারা হয়েছে, হাতে লোহার বালা পরে, শ্রী-উত্তরা সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করা ওর পেশা! আমায় দেখলে খাতির করে, জিভ কেটে বলে, না-না, আপনার ঠেঙ্গে বেশি পয়সা লেবো না মাস্টার মোসাই!

সুরঞ্জনের সঙ্গে রূপবাণী সিনেমার সামনে হঠাৎ দেখা। অর্থাৎ সুরঞ্জন ভাবলো হঠাৎ আমরা মুখোমুখি এসে পড়লুম, আসলে সুরঞ্জনকে আমি পাশের রেলওয়ের সিটি বুকিং অফিসে ঢুকতে দেখে আমিও রূপবাণীর ছবিগুলো দেখছিলুম।

—চল নীলু, মধুপুর যাবি আমাদের সঙ্গে?

—তোরা যাচ্ছিস? কবে?

—এই তো খুকুর পরীক্ষাটা শেষ হয়ে যাচ্ছে একুশ তারিখ, আমরা তেইশ তারিখেই বেরিয়ে পড়ব। ওখান থেকে ঘুরে আসব শিমুলতলা, ঝাঝা...যাবি তো বল্ এক্ষুনি তোর টিকিটটা কেটে নিই।

রানীর ডাক নাম খুকু। যদি ওদের সঙ্গে মধুপুর যাই তা হলে সব সময় রানীর সঙ্গে দেখা হবে। এরকম সুযোগের কথা ভাবা যায়? সকাল-দুপুর-সন্ধে, যখন ইচ্ছে রানীকে দেখব, রানী আমার সঙ্গে কথা বলবে...।

কিন্তু আমার মনের মধ্যে কেউ যেন বলে দিতে লাগল, এটা হয় না। এভাবে যেতে নেই, এতে রানীর চোখে তুমি ছোট হয়ে যাবে নীলু। সুরঞ্জন তোমার ট্রেনের ভাড়া দেবে, ওখানে যতদিন থাকবে তোমাকে পয়সা খরচ করতে দেবে না, তাতে কি তোমার সম্মান থাকবে? তা ছাড়া ইচ্ছে করলেই বা তুমি পয়সা খরচ করবে কী করে? নীলু, মাসের শেষে তোমার পকেটে কি দশটা টাকাও থাকে? রানীর সেনাপতি-মার্কা চেহারার কাকাটা তোমায় পছন্দ করেন না, তিনি ভাববেন এই হ্যাংলা ছেলেটা আবার কেন আমাদের সঙ্গে এলো?

সুরঞ্জন বেশ লম্বা, স্কুলে পড়ার সময় সব রকম স্পোর্টসে প্রাইজ পেত, চমৎকার শিস দিয়ে গান করতে পারে, মাথার লম্বা লম্বা চুলের মধ্যে বারবার আঙুল চালানো ওর বাতিক।

—না রে, ঐ সময় আমার একটা চাকরির ইন্টারভিউ আছে।

—চাকরির ইন্টারভিউ? কোন অফিসে?

—একটা বিলিতি অফিসে, অফিসার ট্রেইনিং।

—কোন্ অফিসে বল্ না।

—জি কে ডব্লু।

—আরে ওখানে তো আমার সেজ্ জামাইবাবু আছেন খুব বড় পোস্টে। তাঁকে বলে দেব। কবে ডেট? তুই সব আমায় লিখে দে, সিরিয়াসলি সেজ্ জামাইবাবুকে ধরলে তোর চাকরিটা হয়ে যেতে পারে—

দুর ছাই। রাস্তার উল্টোদিকের একটা ল্যাম্পপোস্টে জি কে ডব্লু কোম্পানির একটা হোর্ডিং দেখে ঐ নামটা বলে দিয়েছি। আমি কি চাকরির জন্য দরখাস্ত করি

নাকি? পাচ ছশো ছেলের ভিড়ে মিশে ইণ্টারভিউ দিতে যাব আমি? প্রতিভাবান লোকেরা কখনো চাকরি করে না।

—ঠিক আছে, তোকে লিখে দেব এখন। দেরি আছে তো এখনো। তুই কোথায় যাচ্ছিস এখন?

—বাড়ি। তুই আসবি? চল না আড্ডা মারা যাবে। আজ আমার ছুটি। আর তুই তো বেকার।

সুরঞ্জন ঠিকই জানে যে ওর ছোট বোনের প্রতি আমার দুর্বলতা আছে। কিন্তু তাতে ও কোনো বাধারও সৃষ্টি করে না, আবার উৎসাহও দেয় না। কিছু না বোঝার ভান করে থাকে। এই জন্যই সুরঞ্জনকে এত ভালো লাগে আমার। অত্যন্ত পরিষ্কার ছেলে।

আমার অন্যান্য কয়েকজন বন্ধুকে দেখেছি যে-মেয়ের সঙ্গে তাদের ভাব, সেই মেয়েদের বাড়িতে ওরা চলে যায়, নাম ধরে ডাকে কিংবা টেলিফোন করে। কোনো দ্বিধা-সঙ্কোচ নেই। অথচ আমার যে কেন এত লজ্জা, আমি নিজেই বুঝি না। শুধু রানীর সঙ্গেই দেখা করবার জন্য আমি কিছুতেই যেতে পারি না ওদের বাড়িতে। সব সময় একটা কিছু ছুতো দরকার হয়। দু-একবার টেলিফোন করে দেখেছি, প্রত্যেকবারই অন্য কেউ ধরে আর আমি সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিই। রানী আমাকে বলে তুমি কি আমায় একটা টেলিফোনও করতে পার না? কিন্তু আমি যে কিছুতেই অন্য কারুকে বলতে পারি না যে, রানীকে একটু ডেকে দিন।

সুরঞ্জনের বাড়ি গোয়াবাগানে। পুরনো আমলের বাড়ি, সামনে দুটো বেশ বড় রক, সেখানে পাড়ার বখাটে ছেলেরা খুব যাচ্ছেতাই রকমের গুলতানি শুরু করেছিল বলে এখন রেলিং দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। এ পাড়ায় নানান গোলমাল হয়, রাত্তিরের দিকে প্রায়ই ছুরি-বোমা চলে। এরই মধ্যে এই বাড়িটির প্রতিটি লোক কী করে এমন ভদ্র, সুন্দর থাকতে পারে সেটাই আশ্চর্য।

অবশ্য সুরঞ্জনের কাকাকে পাড়ার গুণ্ডা মাস্তানরাও যে-কোনো কারণেই হোক ভয় পায়। এ বাড়ির ওপর সেইজন্যই কখনো হামলা হয়নি।

বেলা বারোটা বাজে, এখনো কি রানী পড়ছে? সেটাই সম্ভব, কেন না পড়ার ঘরে না গিয়ে সুরঞ্জন আমাকে নিয়ে এলো বাঁ দিকের বৈঠকখানায়।

—তুই একটু বোস নীলু, আমি চট করে একবার ওপর থেকে ঘুরে আসছি। চা খাবি তো?

—হ্যাঁ।

সুরঞ্জন বেরিয়ে গিয়ে সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠতেই আমি তাড়াতাড়ি দরজার পাশে এসে চেঁচিয়ে বললুম, আগে এক গেলাস জল পাঠিয়ে দিতে বলিস, সুরঞ্জন!

জল তেষ্টা একটুও পায়নি, এটা শুধু আমার গলার আওয়াজটা শুনিয়ে দেবার জন্য। ঐদিকের পড়বার ঘর থেকে ঠিক শোনা যাবে। রানী বুঝতে পারবে যে আমি এসেছি।

তারপর টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে প্রতীক্ষা। আমার সারা শরীরে যেন জ্বর। প্রত্যেকটি মুহূর্ত অনন্ত কালের মতন লম্বা। বুকের মধ্যে যেন কেটল ড্রাম বাজছে। রানী আসছে না। কেন আসছে না? রানী শুনতে পায়নি? ওপর তলা থেকেও তো আমার গলার আওয়াজ শুনতে পাওয়ার কথা। রানী কি পড়বার ঘরের দরজা বন্ধ করে আছে?

রানীর দাদার বন্ধু হিসেবে আমি কি নিজেই একবার দেখে আসতে পারি না রানীকে? সাধারণ ভাবে জিজ্ঞেস করতে পারি না, পরীক্ষা তো কাল থেকে শুরু কেমন পড়াশুনো হলো? এটা তো খুব স্বাভাবিক। তবু আমার পা ওঠে না।

রানী এলো না। তার আগেই ফিরে এলো সুরঞ্জন, ওর হাতে জলের গেলাস। আমার যে অন্যরকম তেষ্টা সেটা তো ওকে বোঝানো যাবে না। ঢক ঢক করে শেষ করতে হলো পুরো গেলাসের জলটা।

—শোন নীলু, তোকে একটা জিনিস লিখে দিতে হবে।

—কী?

—আমি বাহাত্তর ঘণ্টা অবিরাম সাইকেল চালানোর একটা কম্পিটিশান ডাকছি। পোস্টার আর হ্যাণ্ডবিল করতে হবে, তুই বেশ ভাষা দিয়ে লিখে দিবি।

—কবে হবে?

—মধুপুর থেকে ফিরে আসি, তারপর ইন্টারভিউটা দিয়ে তুই চলে আয় না মধুপুর।

—হবে না, উপায় নেই। আমার পর পর দুটো ইন্টারভিউ আছে।

—জি কে ডব্লুটা তোর ঠিকই হয়ে যাবে দেখিস। কালই সেজ জামাইবাবুকে টেলিফোন করব। আর একটা কথা, তুই এসেছিস, খুব ভালো হয়েছে। আমরা বাড়িতে একটা লাইব্রেরি খুলব ঠিক করেছি।

—লাইব্রেরি?

—হ্যাঁ, আমাদের পাশের ঘরটা খালি আছে। ওখানে একটা লাইব্রেরি হবে না? আমাদের বাড়িতে দু-তিনশো বই আছে, আর তুই যদি হেলপ করিস।

—নিশ্চয়ই করব। আমি অনেক বই জোগাড় করে দেব।

—এটা খুকুর প্ল্যান। দাঁড়া, খুকুকে ডাকি। খুকু! খুকু!

কেটল ড্রামের বদলে এবার বিগ ড্রাম বাজছে আমার বুকে। সুরঞ্জন কি ঐ দুম দুম আওয়াজ শুনতে পেয়ে যাবে?

রানীর এই অগোছালো রূপটিই দেখতে আমার ভালো লাগে সবচেয়ে বেশি। চুল আঁচড়ায়নি, মুখখানা ঘামে তেল চকচকে, শাড়িটা আগোছালো, থুতনিতে একটু কালির দাগ, হাতে একটা কলম।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঝাঝালো গলায় রানী বলল, কী, আমায় ডাকছ কেন?

—শোন, নীলু এসেছে, লাইব্রেরি খোলার প্ল্যানটা তাহলে ঠিক করে নিই এখন...

একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল রানী। ভুরু দুটো কুঁকড়ে বলল, কাল আমার পরীক্ষা, এখন আমি ঐসব কথা নিয়ে সময় নষ্ট করব? অদ্ভুত তোমার বুদ্ধি!

রানী পেছন ফিরতেই সুরঞ্জন বলল, একটু দাঁড়া না, কত পডবি? একটানা অতক্ষণ পড়লে মাথার ঠিক থাকে না। জানিস নীলু, কাল সারা রাত জেগে পড়েছে, একটুও ঘুমোয়নি—আমরাও তো বাবা পরীক্ষা দিয়েছি...

—আমার এখন সময় নেই!

শালিক পাখিরা উড়ে যাবার আগে যেমন একটা শব্দ করে যায়, সেইরকমভাবে ঐ কথাটা বলে রানী অদৃশ্য হয়ে গেল।

রানী একবারও আমার চোখের দিকে তাকায়নি। যেন আমায় চেনেই না।

সুরঞ্জন বলল, বাবা বলেছেন, যদি আমরা লাইব্রেরি খুলি, তাহলে মাসে একশো টাকা চাঁদা দেবেন। আমরা আরও কয়েকজনের কাছ থেকে এরকম ডোনেশান জোগাড় করতে পারি...।

—তা চেষ্টা করা যায়।

—এ পাডায় ভালো লাইব্রেরি নেই। পাড়ার ছোঁড়াগুলোকে যদি বই পড়ার অভ্যেস ধরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ওরা বোমাটোমা বোধহয় কম ছুঁড়বে।

—কেউ আবার লাইব্রেরিতেই বোমা না মারে?

—এ বাড়িতে হামলা করার সাহস কারুর নেই। আশু-উৎপল-ভাস্করকে বললে ওরা ওদের বাড়ির বইপত্তর দেবে না আমাদের লাইব্রেরিতে?

—তা দেবে নিশ্চয়ই!

—একজন ভালো লাইব্রেরিয়ান দরকার, যে প্রত্যেকদিন ঠিক সময় খুলবে, ঠিক সময় বন্ধ করবে, মেম্বারদের ঠিক মতন ট্যাকল করতে পারবে...এই ভারটা কিন্তু তোকেই নিতে হবে, বুঝলি! তুই এখন বেকার, তোর হাতে সময় আছে।

—না, ভাই, ওটা আমার দ্বারা হবে না। বেকার বলেই আমি বেশি ব্যস্ত।

—যাঃ! যে-কদিন চাকরি না পাস, সেই কদিন অন্তত তুই চালিয়ে দিবি।

—ইমপসিবল। আমি অন্যান্য হেলপ করতে পারি, কিন্তু রোজ রোজ আসা আমার দ্বারা হবে না।

সুরঞ্জন জানে না যে আমি রোজ সন্ধেবেলা টিউশানি করি। যদি তা নাও করতুম, তবু রাজি হতুম না আমি। লাইব্রেরি খোলার জন্য এ বাড়িতে আমি প্রত্যেকদিন এলে নিশ্চয়ই রানীর সঙ্গেও প্রত্যেকদিন দেখা হবে। আমি তা চাই না। সত্যিই চাই না।

চা এলো একটু পরেই। আরও খানিকক্ষণ গেঁজিয়ে আমি উঠে পড়লুম। দরজার কাছ পর্যন্ত এসে হঠাৎ মনে পড়ে গেল কথাটা।

—সুরঞ্জন, তোর কাছে আমার 'পিকচার অফ ডোরিয়ান গ্রে' বইটা আছে না!

—তুই ফেরত নিসনি?

—নাঃ। কবে নিলুম!

—তবে ওটা থাক, তুই ওটা আমাদের লাইব্রেরিতে ডোনেট করে দে?

—আচ্ছা দোব, লাইব্রেরি খুলুক, তখন দোব। ওটা একজন পড়তে চেয়েছে।

—কে?

—ইয়ে...আমার এক বন্ধুর মা।

—এখন খুঁজে পাব কি না...আচ্ছা বোস একটু, আমি ওপর থেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি...

ওপরে গিয়ে সুরঞ্জনের বইটা খুঁজে আনতে অন্তত তিন চার মিনিট তো সময় লাগবেই। এর মধ্যে আমি একবার চট করে পড়বার ঘরে গিয়ে রানীর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারি না?

নিশ্চয়ই পারি। তবু আমার পা যেন পেরেক দিয়ে আঁটা। টেবিলের ওপর থেকে বাসি খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে অকারণে অমূল্য সময় নষ্ট করতে লাগলুম।

রানীর কাল পরীক্ষা, ভীষণ ব্যস্ত, আমি এসময় ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলে নিশ্চয়ই বিরক্ত হবে।

এ সময় আমি পিঁপড়ের পায়ের আওয়াজও শুনতে পেতুম, তাই দরজার কাছে একটা শব্দ হতেই আবার ঘুরে দাঁড়ালুম।

রানী!

এখনো তার মুখে সেই রাগের ভাব। একেবারে আমার সামনে এসে হাত থেকে খবরের কাগজটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিয়ে বলল, কাল আমার পরীক্ষা, তুমি এর মধ্যে একদিনও আমার সঙ্গে দেখা করতে আসোনি কেন?

—এই তো এলুম!

—বাজে কথা। দাদা তোমাকে জোর করে ধরে এনেছে।

—জোর করতে হবে কেন? আমার বুঝি এখানে আসার জন্য সব সময় মন ছটফট করে না?

—ওসব বাজে কথা। তুমি নিজে একলা আসতে পার না? তারপর এসেও এই ঘরে বসে রইলে? একবার আমার কাছে যেতে পারনি? এই রকম করলে পড়াশুনোয় মন বসে? আমি ফেল করলে তুমি খুব খুশি হবে তো?

—তুমি সারা রাত জেগে পড়ছ কেন?

একথার উত্তর না দিয়ে রানী ওর ডান হাতটা বাড়িয়ে বলল, দাও।

আমার কাছে তো তৈরিই থাকে, সেটা এমন কিছু ব্যাপার নয়, কিন্তু এরপর রানী যে কাজটা করল, সেটা একেবারেই অবিশ্বাস্য!

আমি আমার পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে দিতেই রানী সেটা বাঁ হাতের তালুতে লুকিয়ে ফেলল ম্যাজিসিয়ানের মতন, তারপর আমার দিকে পেছন ফিরে ওর ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বার করে আনল ভাঁজ করা ওর চিঠি!

—এই নাও!

—এ কি...তুমি...এখন পড়াশুনোয় এত চাপ...তবু তুমি...

—কাল শেষ রাতে লিখেছি...পড়তে পড়তে মাথা ঝিমঝিম করছিল, তখন তোমার কথা খুব মনে পড়ল...তুমি নিশ্চয়ই ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমুচ্ছিলে তখন।

—রানী, শোনো—

এক সেকেণ্ডেরও একশো ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে ঘটে গেল ব্যাপারটা। রানীর কাঁধে হাত রাখতেই ও ঘুরে গেল, ঠিক আমার ঠোঁটের সামনে ওর ঠোঁট, আমি রানীকে বুকের ওপর টেনে এনে ওর ঠোঁটে দিলুম গরম আদর।

—এই, না-না, সব খোলা।

ততক্ষণে আমি ছিটকে দূরে সরে গেছি। চোখ তুলে তাকাতে পারছি না। এক মুহূর্ত আগেও আমি এই কথাটা ভাবিনি, যেন অন্য কেউ আমায় ঠেলে দিয়েছে। আমি লজ্জায় রানীর ঘরে দেখা করতে যেতে পারি না, আর এখানে জানলা-দরজা সব খোলা, যে-কোনো মুহূর্তে কেউ এসে পড়তে পারে...।

রানীর সারা মুখখানি আরক্ত। এত তেজি মেয়ে, কিন্তু এখন আর কথা বলতে পারছে না।

একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, তুমি একটা গুণ্ডা, ডাকাত, অসভ্য...

—প্লিজ, রাগ করো না, প্লিজ...

—এরকম করলে আমার পড়াশুনো সব গুলিয়ে যাবে না?

—আমি চলে যাচ্ছি। তোমার কোথায় সিট পড়েছে?

—দ্বারভাঙ্গা বিলডিংস-এ, কিন্তু তুমি সেখানে যাবে না বলে দিচ্ছি।

—কেন?

—সেখানে অনেকে থাকবে।

—বাঃ আমি এমনি বেড়াতে বেড়াতে ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারি না?

—না, অসুবিধে আছে।

—ও, সুবীর যাবে বুঝি?

—আবার ঐ কথা? তুমি পরীক্ষার আগে আমার মাথাটা খারাপ করে দিতে চাও?

—না, রানী, তুমি পড়ো, আমি চলে যাচ্ছি, তোমায় ফার্স্ট ক্লাস পেতেই হবে।

চুলোয় যাক ডোরিয়ান গ্রের ছবি! বইটা না নিয়েই আমি বেরিয়ে পড়লুম। এক্ষুনি বাড়ি ফেরার কোনো মানে হয় না। অনেকবাব ভাঁজ করা রানীর ছোট্ট চিঠিটা আমার হাতে। পড়বার ব্যস্ততা নেই, যেমনভাবে রাজা-বাদশারা গোলাপের গন্ধ শুঁকতেন, সেইভাবে আমি মাঝে মাঝে শুঁকতে লাগলুম চিঠিটা। ওতে রানীর বুকের ঘ্রাণ আছে।

আজ আর স্নানও করব না। আমার সারা দেহে লেগে আছে রানীর শরীরের স্পর্শ, তা কি ধুয়ে ফেলা যায়?

আমার বা রানীর চিঠির কথা ভারতীয় ডাক বিভাগ কিছুই জানে না। ওরা বুঝি ভাবে, ওদের সাহায্য ছাড়া মানুষকে চিঠি লিখতে পারবে না? হুঁঃ!

অবশ্য, প্রত্যেকদিনই বাড়ি ফিরে দরজার চিঠির বাক্সটা একবার খোলা আমার অভ্যেস। রানীর চিঠির জন্য নয়, অন্য কোনো একটা বিশেষ চিঠির জন্য আমার প্রতীক্ষা। আমার নামে তেমন চিঠিপত্র আসে না, কেই-বা লিখবে, কিন্তু একদিন একখানা চওড়া নীল খামে একটি অলৌকিক চিঠি আসবে আমার নামে, সব কিছু বদলে দেবে।

দুদিন বাদে রাত দশটায় বাড়ি ফিরে দেখি, ডাক বাক্সে সত্যিই আমার নামে একটা চিঠি খুব গম্ভীরভাবে শুয়ে আছে। যেন আমার এত দেরি করে ফেরার জন্য সে খুব বিরক্ত।

নীল খাম নয়, খাকি, লম্বা খাম, বেশ ভারী। বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। এই কি সেই? 'দুয়ার ভেঙে এসেছে মোর দুঃখ রাতের রাজা!'

ফিরতে দেরি হলে একতলার ঘরে আমার ভাত ঢাকা দেওয়া থাকে। কারুকে ডাকতে হয় না। ঘরের দরজা বন্ধ করে আমি খুব সাবধানে চিঠিখানা খুলতে লাগলুম...

...সাদা ধপধপে বণ্ড কাগজের প্যাডে টাইপ করা চিঠি। দু পাতা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিন চারবার পড়লুম চিঠিখানা। এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না! তাহলে এতদিন যে চাকরির জন্য হ্যাংলামি করিনি, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখাইনি, চেনাশুনো হোমরাচোমরা লোকদের ধরাধরি করিনি, তা সার্থক হলো? জীবনে এই তো চেয়েছিলুম!

চিঠিখানা লিখেছে এক অস্ট্রেলিয়ান জাহাজ কোম্পানি। তারা জানিয়েছে যে মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মল্লিকের (ডঃ সুহৃদ মল্লিক আমার বড় মামার বিশেষ বন্ধু, ছেলেবেলায় আমার মামার বাড়িতে অনেকবার দেখেছি, আমায় খুব ভালোবাসতেন, এখন অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন) সুপারিশ অনুযায়ী তারা আমাকে এই চিঠি লিখছে। নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড নামে একটা দ্বীপে ঐ জাহাজ কোম্পানির একজন রেসিডেন্ট ম্যানেজারের পদ খালি আছে। দ্বীপটি অতি নির্জন, কিছু আদিবাসী আছে সেখানে। সেখানে অত্যন্ত দামি পশম পাওয়া যায় বলে মাসে একদিন জাহাজ যায়। কোম্পানির রেসিডেন্ট ম্যানেজারের জন্য একটা টিলার ওপর একটি সুদৃশ্য কাঠের বাড়ি এবং সব রকম সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু একটি কথা কোম্পানি আগেই জানিয়ে দিতে চায়। এর আগে যারাই ওখানে পোস্টিং নিয়ে গেছে, কেউই এক মাসের বেশি থাকতে পারেনি কোনো অনির্দিষ্ট কারণে। ঐ দ্বীপের আদিবাসীরা অতি শান্ত ধরনের, তাদের ব্যবহার বন্ধুত্বপূর্ণ। কিন্তু যেসব শ্বেতাঙ্গ ওখানে থাকতে যায়, তারাই স্বপ্ন দেখে ভয় পায়। স্বপ্নই বলতে হবে, কারণ তাদের কারুরই কোনো শারীরিক ক্ষতি হয়নি, কিন্তু প্রতি রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখার পর তারা আর থাকতে পারে না। এইরকম ভাবে আটজন ফিরে এসেছে।

কোম্পানি অনেক অনুসন্ধান করে দেখেছে যে, সেখানে ভয় পাবার মতন কোনো কারণই ঘটে না। ডাক্তারি পরীক্ষাতেও কিছু পাওয়া যায়নি। তবে, কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে এক ধরনের মশার কামড়ে এরকম দুঃস্বপ্ন-রোগ হতে পারে। নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডে কিছু সাদা রঙের মশার সন্ধান পাওয়া গেছে, তবে সে মশার কামড়ও তেমন ক্ষতিকারক নয়, কারণ শরীরে তার প্রতিক্রিয়া বেশিক্ষণ থাকে না।

এই ঘটনা রটে যাওয়ার ফলে সেখানে অস্ট্রেলিয়া থেকে আর কেউ যেতে চাইছে না অথচ সেখানে কোম্পানির ওয়্যার হাউস আছে, তা এমনি এমনি ফেলে রাখা যায় না। অধিবাসীদের কাছ থেকেও মালপত্র কেনা-বেচার ক্ষতি হচ্ছে, সেইজন্য কোম্পানি অবিলম্বে একজনকে পাঠাতে চায়। ডঃ মল্লিক কলকাতায় আপনার নাম সুপারিশ করেছেন। ডঃ মল্লিক এই কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেকটরসের অন্যতম। তিনি আপনাকে আলাদা ব্যক্তিগত চিঠি পাঠাচ্ছেন। সব

জেনে শুনে এই কাজ নিতে যদি আপনি রাজি থাকেন, তবে অবিলম্বে আপনার সম্মতি টেলিগ্রামযোগে জানান। আপনাকে বিমানে মেলবোর্নে নিয়ে আসা হবে। বর্তমানে আপনাকে দেওয়া হবে মাসে পাঁচশো পাউণ্ড, এক বছর পর টিকে থাকলে এই বেতন দ্বিগুণ হয়ে যাবে। বছরে দুবার কোম্পানির খরচে আপনি দেশে বেড়াতে আসতে পারবেন।

পুনশ্চ: নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের আদিবাসীদের মধ্যে কিছু লোক পিজিন ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। আপনার পক্ষে সেই ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক। অবশ্য, এক মাসের মধ্যেই এই ভাষা শিখে নেওয়া যেতে পারে।

চিঠিটা পড়ে আমি নিথর হয়ে বসে রইলুম। আমি কিছু চাইব না। কেউ নিজে থেকেই আমায় ডাকবে, এই ছিল আমার প্রতিজ্ঞা। সেই ডাক এসেছে। নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড। সাদা রঙের কাঠের বাড়ি। টিলার ওপরে একটা সাদা রঙের বাড়ি আমি কতবার স্বপ্নে দেখেছি। স্বপ্ন দেখে ভয় পাওয়া? হাঃ হাঃ হাঃ হা, সাহেবরা কত ছেলেমানুষ হয়! বাঘ-ভাল্লুক নয়, শেষ পর্যন্ত আমি মশাকে ভয় পাব? তাও সাদা রঙের মশা? হাঃ হাঃ হাঃ।

পাঁচশো পাউণ্ড মানে কত টাকা?

যাই হোক না কেন, সেখানে তো আমার প্রায় কোনো খরচই থাকবে না! দ্বীপে তো সিনেমা হল নেই। কারুকে কিচ্ছু না জানিয়ে চলে যাব। বাড়িতেও কিছু বলে যাব না, সবাই ভাববে আমি অদৃশ্য হয়ে গেছি। বেকার জীবনের জ্বালা সইতে না পেরে চলে গেছি হিমালয়ে, কিংবা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছি : ফিরবো ঠিক এক বছর বাদে, রিটার্ন অব দা প্রডিগ্যাল সান! রানীর কাছে গিয়ে বলব, আমি একটা দ্বীপের মুকুটহীন রাজা, তুমি যাবে আমার সঙ্গে সেখানে? তোমার নাম রানী, পৃথিবীতে আর কোনো দেশ খালি নেই, একমাত্র নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে, চলো, তুমি সেখানকার সত্যিকারের রানী হবে।

আমি আদিবাসীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদেরই মতন পরে থাকব শুধু গাছের পাতা সেলাই করা পোশাক, মাথায় পালকের মুকুট। সমুদ্রের ধারে সবাই মিলে হাঁটু গেড়ে বসে করব আকাশের সূর্যের পূজা। আমি তাদের শেখাব রবীন্দ্র সঙ্গীত, 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজো...'।

মাসে একবার শুধু জাহাজ আসবে, সেই জাহাজ চলে গেলে আমার আর কাজ থাকবে না। আমি বেরিয়ে পড়ব নৌকো নিয়ে, একলা নয়, আরও দু-একজন আদিবাসী সঙ্গে থাকবে, হয়তো আমরা পেয়ে যাব নতুন কোনো দ্বীপ। ওদিকে অনেক ছোটখাট প্রবাল দ্বীপ আছে না? সেরকম একটা কোনো দ্বীপে আমি প্রথম

মানুষ হিসেবে পা দিয়ে তুলে দেব আমার নিজস্ব পতাকা। তার নাম হবে রানী দ্বীপ।

সুহৃদমামা—কী করে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব? এতদিন পরেও আমার নামটাই আপনার মনে পড়েছে? আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি কোনো স্বপ্ন দেখেই ভয় পাই না। স্বপ্ন দেখে দেখেই তো আমার সারাটা দিন কেটে যায়। কোনো স্বপ্নই আমার কাছে দুঃস্বপ্ন নয়। সাদা মশা? কখনো জন্মে শুনিনি! তবে শুনেছি, অস্ট্রেলিয়াতে সাদা রঙের কাক আছে।

নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড! নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড! ঠিক এই দ্বীপটাই আমার দরকার ছিল।

টেবিলের ওপর চিঠিটা খোলা পড়ে আছে। অতি সংক্ষিপ্ত তিন লাইনের চিঠি। রেডিও-র সাহিত্য বাসরের জন্য আমি একটা গল্প পাঠিয়েছিলুম, তারা সেটি ফেরত পাঠিয়েছে অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করে।

টেবিলের ওপর চাপা দেওয়া ভাত কনকনে ঠাণ্ডা!

৬

কফি হাউসে রাজনীতি নিয়ে ফাটাফাটি হচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে। আমরা কলেজ জীবনে ছাত্র ফেডারেশনের পাণ্ডাগিরি করেছি, এখনো সেই গন্ধ যায়নি, কেউ নেহরু-নীতির প্রশংসা করলেই আমাদের গা জ্বালা করে।

প্রত্যেকদিন না গেলেও এখনো প্রতি শনিবার দুপুরে কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসে আমাদের তুমুল আড্ডা হয়। তিনখানা টেবিল জুড়ে পনেরো-ষোলো জন, আমাদের কাছ থেকে পয়সা চাইতে ভয় পায় বেয়ারারা। এই কফি হাউস যেবার হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, আমরাই প্রবল গান গেয়ে এটাকে বাঁচিয়ে রাখার শপথ নিয়েছিলুম না?

পাঁচটার সময় ভাস্করের নেতৃত্বে নিচে নেমে এলো সবাই। মেট্রোয় পল নিউম্যান এসেছে, 'গরম টিনের চালে বেড়াল' এই নামে ছবি, সঙ্গে ব্রিজিৎ বার্দো, এটা না দেখলে জীবন ব্যর্থ। হৈ-হৈ করে উঠে পড়লুম সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে। জানি, এখন ওপরের ভাঙা হাটে বসে আমাদের প্রতিপক্ষ অরুণ কী বলছে। ঠোঁট উল্টে বিদ্রূপ করে পাশের কারুকে শোনাচ্ছে, এই তো সব প্রগতিশীল! কফি হাউসে বসে বড় বড় কথা বলে টেবিল ফাটাবে, তারপরই ছুটবে মার্কিনী হলিউড-মার্কা ছবি দেখবার জন্য! বেচারা অরুণ! চীনের কোনো সিনেমা এদেশে আসে না বলে ওর কোনো সিনেমাই দেখা হয় না।

মেট্রোর পাশের গলিতে দশ আনার লাইন। এখানে একজন যা পেঁয়াজি আর আলুর বড়া ভাজে, তার তুলনা নেই। ইন্দ্রনাথের ভাষায়, ওয়ার্ল্ড ফেমাস তেলেভাজা! আমার সবচেয়ে ভালো লাগে ডালবড়াটা। কে দাম দেবে ঠিক নেই, খেয়ে তো চললুম যার যা খুশি। একেবারে মাসের গোড়া, উৎপল-ভাস্করদের পকেটে বেশি টাকা থাকবেই। তারপর পেতলের কলসি থেকে ভাঁড়ের চা। আমি একটা সিগারেট ধরাতে না ধরাতেই পারিজাত সেটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিল। খুব লম্বা বলে ওর এই একটা সুবিধে।

পল নিউম্যানের সঙ্গে ব্রিজিৎ বার্দো নয়, এলিজাবেথ টেলার। তবে তো একেবারে মার কাটারি!

রুদ্রেন্দু বলল, জীবনে যদি কখনো বিয়ে করি, তা হলে এই লিজ টেলারকে। অবশ্য এ জন্য লিজকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে, আমি এখনো চাকরিতে পার্মানেন্ট হইনি।

ভানু একটা হোর্ডিং দেখিয়ে বলল, মাইরি, পরের বইটা দেখেছিস? বার্ট ল্যাঙ্কাস্টার, ওটা তো দেখতেই হবে।

নিচের দিকে যেখানে নায়ক-নায়িকাদের নাম লেখা থাকে, হোর্ডিং-এর সেই অংশটায় দু হাত চাপা দিয়ে পারিজাত বলল, বার্ট ল্যাঙ্কাস্টারের পাশে হিরোইন কে বল তো?

ভানু বলল, শুধু নাম চাপা দিচ্ছিস কেন, মুখটায় দে, শুধু বুক দেখে বলে দেব! সোফিয়া লোরেন!

সবাই মিলে আমরা ভানুর পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে ওকে একেবারে মাটিতে শুইয়ে দিলুম।

কাউন্টারের একেবারে কাছাকাছি এসে আমি বেরিয়ে এলুম লাইন থেকে।

—কী হলো?

—আমার জায়গাটা রাখ, আমি সিগারেট কিনে আনছি।

সিগারেটের দোকান বাঁ দিকে, আমি হাঁটা দিলুম ডান দিকে। বেশ দ্রুত বেগে।

এই নীলু কোথায় যাচ্ছিস?

আমি পেছন না ফিরে একটা হাত তুলে বললুম, যত লোক আছে, সকলের টিকিট হবে না, তার আগেই ফুরিয়ে যাবে। তাই আমি আমার জায়গাটা ছেড়ে দিলুম।

—অঢেল টিকিট আছে।

—এই, নীলুটা কেটে পড়ছে।

—এই নীলু, নীলু—

—নীলু শোন, শোন, টাকা আছে আমার কাছে।

ওরা আর কেউ ছুটে এসেও ধরতে পারবে না আমাকে। জোরে পা চালিয়ে আমি মিশে গেলুম চৌরঙ্গির ভিড়ের মধ্যে।

টিকিটের দামের জন্যে নয়, আমার টিউশানি আছে না? কাল যেতে পারিনি বৃষ্টির জন্য, আজ শুকনো দিনে আর কাট মারা চলে না। সামনেই পিয়া-বাবুজীর মিড টার্ম পরীক্ষা, এখন আর দায়িত্বজ্ঞানহীন হওয়া আমায় মানায় না। আগে এ কথাটা বললে বন্ধুরা আমায় জোর করে ধরে রাখত নির্ঘাত।

বিদায় পল নিউম্যান, লিজ টেলার! অন্য কোনো সময় আবার দেখা হবে।

একটু একটু মন খারাপ লাগছে ঠিকই। শুধু সিনেমার জন্য নয়, আড্ডার টানটা ছিঁড়ে যেতেই বেশি কষ্ট হয়। তবু, বেশ একটা আত্মত্যাগের ভাব এনে মন-খারাপটাকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলুম।

হাতে সময় আছে, এখন একটু ফুচকা খাওয়া যাক। মন ভালো না থাকলে ফুচকার মতন ওষুধ আর নেই। ফুচকাওয়ালাকে বললুম, খুব ঠেসে ঝাল দাও তো? দেখি তোমার শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো কত আছে। আমায় যদি কাদাতে পার তো বুঝব তোমার হিম্মৎ!

আট আনার ফুচকা খেয়ে শরীর মন বেশ চাঙ্গা হলো। এখনো ভালো করে অন্ধকার নামেনি। ময়দানের মধ্য দিয়ে কোনাকুনি হেঁটে গেলে চিড়িয়াখানার কাছ থেকে বাস ধরা যেতে পারে। রেসকোর্সের দিকের আকাশটা অদ্ভুত রকমের লাল। ক্যাজুরিনা এভিনিউয়ের কাছে কোথা থেকে ছুটে এলো বিনা পয়সার দুর্দান্ত মোহময় হাওয়া, আমার প্রাণ জুড়িয়ে দিল একেবারে। আধো-আলো আধো-ছায়ায় ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালকেও অপূর্ব দেখাচ্ছে। আমাদের এই কলকাতা শহরটা কত সুন্দর, কোথায় লাগে প্যারিস-লণ্ডন! এরকম কৃষ্ণচূড়া গাছ আর কোথায় আছে।

রেলিং-এ একলা দাঁড়িয়ে একটা লোক উদাস মুখে আকাশ দেখছে। ওর দিকে তাকিয়েই আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। বিষম চেনা মনে হচ্ছে লোকটিকে। কোথায় দেখেছি? আমার চেয়ে অন্তত বছর দশেক বড়, লোকটি এই রকম শেষ বিকেলে ময়দানে একলা দাঁড়িয়ে আছে কেন? ওর কি কোনো বন্ধু নেই? কোথাও যাবার জায়গা নেই?

লোকটি মুখ নিচু করতেই আমি আরও চমকে উঠলুম। ঠিক যে আমার মতন মুখ! এমন আশ্চর্য মিল মানুষে মানুষে হয়? আমার দাদার সঙ্গে আমার মুখের তেমন মিল নেই, কিন্তু যে-কেউ এই লোকটিকে দেখে বলবে আমরা দুই সহোদর।

আমার সব সময়ই সন্দেহ, এই পৃথিবীতে ঠিক আমার মতন চেহারার একটা

মানুষ আছে। সে আমার চেয়ে অনেক ভালো ভাবে বেঁচে যাচ্ছে। এই কি সেই লোক? কিন্তু ও আমার চেয়ে বয়েসে বড়! লোকটি যাতে আমায় দেখতে না পায় তাই আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলুম।

দোতলার দরজা খুলতেই রঘু খবর দিল, দিদিমণি-খোকাবাবুরা তো এইমাত্র বেরিয়ে গেল।

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, যাঃ!

তাহলে আমি মেট্রো সিনেমায় লাইন ছেড়ে চলে এলুম কেন শেষ মুহূর্তে? কেন বন্ধুদের ছেড়ে...

—কে, মাস্টারমশাই?

সুনেত্রাদেবী বেরিয়ে এলেন শোওয়ার ঘর ছেড়ে। ওঁকে দেখলে মনে হয়, ওঁর কোনো শৈশব ছিল না, কোনোদিন উনি এলোমেলো কিংবা সাদামাটা পোশাকে থাকেননি। ঐরকম সুন্দর, সুসজ্জিত বেশে যৌবন বয়েসে ওঁকে স্বর্গ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে পৃথিবীতে।

—ও মা, দেখেছ, ওদের কাণ্ড! আপনি যে আজ আসবেন, ওরা জানত? ওরা দুজনেই জোর দিয়ে বলল, আজ মাস্টারমশাই আসবেন না।

আমি লজ্জিতভাবে আমতা আমতা করে বললুম, না মানে, বৃষ্টির জন্য কাল আসতে পারিনি।

—সেইজন্যই বোধহয় ভেবেছে, আজ আসবেন না। আমিও কিছু বললুম না। পিয়ার এক বন্ধুর জন্মদিন, ও প্রত্যেকবার যায়। আর বাবুজীও বলল, লেক ক্লাবে কী একটা ফাংশান আছে।

—ঠিক আছে, আমি কাল আসব।

—কাল তো রবিবার। কাল কি ওরা পড়তে চাইবে? আপনি সোমবারই আসবেন। এ কি, যাচ্ছেন কেন, বসুন।

সুনেত্রাদেবীকে আমি প্রথম প্রথম বেশ কয়েকবার বলেছি, আমাকে আপনি বলবেন না, তুমি বলবেন। উনি শোনেননি। অথচ ওঁর প্রতিটি কথার মধ্যে চমৎকার স্নেহ।

—পায়ের ব্যথাটা একদম সেরে গেছে?

সামনাসামনি মিথ্যে কথা বলতে আমার খুবই লজ্জা করে। তাছাড়া সুনেত্রাদেবীর ব্যবহারে এমন সারল্য আছে যে ওকে ঠকাতে ইচ্ছে করে না। একবার ভাবলুম সত্যি কথাটাই বলে ফেলি! সেটাও ঠিক মুখে এলো না।

—হ্যাঁ অনেকটা।

—একদম অযত্ন করবেন না, পা বলে কথা। বসুন, আমি আজ পুডিং

বানিয়েছি, একটু চেখে দেখবেন। ছেলেমেয়ে দুটো তো খেলোই না।

—আমার কিন্তু আজ একদম খিদে নেই।

—পুডিং বুঝি কেউ খিদের জন্য খায়?

এমন স্বাভাবিকভাবে উনি কথাটা বললেন যে এর যেন কোনো প্রতিবাদই চলে না। অথচ কী বাজে একটা শৈশব আমার কেটেছে, সব সময় পেটের মধ্যে একটা খাই খাই ভাব। শুধু খিদের জন্যই খায় না, এমন শখের খাদ্য আছে পৃথিবীতে। আবার খিদে আছে, কোনো খাদ্য নেই, এমন মানুষও পৃথিবীতে আছে ঢের!

পিয়ার বাবার সঙ্গে আমার খুবই কম দেখা হয়েছে। উনি অত্যন্ত কর্মব্যস্ত মানুষ, বাড়ি ফেরেন অনেক রাত করে। ছেলেমেয়েরা নেই বলে এতবড় ফ্ল্যাটটা একেবারে ঠাণ্ডা। শুধু শোওয়ার ঘরে কোনো রেকর্ড প্লেয়ারে একটা বাজনা বাজছে। বিটোফেনের নাইনথ সিমফোনি? ঐ একটাই নাম আমি জানি।

খাবার ঘরের টেবিলে আমাকে পুডিং দিয়ে সুনেত্রাদেবী উল্টো দিকে বসলেন। যতবার উনি বাঁ দিকে মুখটা ফেরাচ্ছেন, আমি চমকে চমকে উঠছি। আগে কোনোদিন লক্ষ্য করিনি, একটা বিশেষ অ্যাঙ্গেল থেকে ওঁকে ঠিক রানীর মতন দেখায়। হুবহু মিল! নাকি আমি বিশ্বময় সকলকেই রানীর মতন দেখেছি?

হঠাৎ ইচ্ছে হলো আমি উঠে গিয়ে সুনেত্রাদেবীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ওঁর পায়ের পাতাদুটি চেপে ধরি। সেখানে ফেলি দু ফোঁটা চোখের জল, আমার কৃতজ্ঞতার উপহার। বন্ধুদের ছেড়ে এসে আমার যে মন খারাপ লাগছিল, তা হঠাৎ একেবারে চলে গেছে। এই যে একটু দূরে বাজছে সুদূর বিলিতি বাজনা, টেবিলের উল্টোদিকে বসে সুনেত্রাদেবী আমার দিকে হাসিমুখে চেয়ে আছেন, আমি চামচে দিয়ে একটু একটু করে পুডিং মুখে তুলছি, সব মিলিয়ে এই ঘটনা বা দৃশ্যটি যেন আমাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে।

সত্যি সত্যি তো আর উঠে গিয়ে ওঁর পায়ের পাতা ছোঁয়া যায় না, তাই আমি মাথা নিচু করে কল্পনায় চকিতে ব্যাপারটা সেরে নিলুম।

আমি এত ফাঁকি দিই, প্রায়ই কামাই করি, তবু আমার সঙ্গে এত সুন্দর ব্যবহার করেন কেন সুনেত্রাদেবী? ওঁর হৃদয় সুন্দর বলেই মুখখানি এত সুন্দর।

—আপনি কবিতা লেখেন?

আমার সারা শরীরে একটা চমক লাগল। ঠিক যেন জ্যান্ত বিদ্যুতের তারের ছোঁয়া লেগেছে।

—আমি? না তো?

—বুদ্ধমামা যে বলল।

—বুদ্ধমামা? তিনি কে?

—বুদ্ধদেব বসু, আপনি নাম শোনেননি? উনি তো আমাদের মামা হন।

—হ্যাঁ, বুদ্ধদেব বসুর নাম কে না শুনেছে! কিন্তু আমার নাম জানবেন কী করে উনি?

—পিয়া গিয়েছিল ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। ও তো কলকল করে অনেক কথা বলে, কী যেন সব বলেছিল আপনার সম্পর্কে তখন বুদ্ধমামা বললেন, ওই ছেলেটি তো আমার কাগজে দু একটা কবিতা লিখেছে! আপনি লেখেননি?

—না মানে, সে অতি সামান্য...

—তাই শুনে পিয়ার বাবা কী বলেছে জানেন? ও বলল, ওরে বাবা মাস্টারমশাই কবিতা লেখেন? কবিরা তো খায় না, দায় না, শরীরের কোনো যত্ন নেয় না, সমাজ-সংসার গ্রাহ্য করে না, অল্প বয়সে মারা যায়। তোমরা একটু যত্ন-টত্ন করো ছেলেটিকে। সেদিন পা ভেঙেছে, কোনোদিন মাথা ফাটাবে।

চক্রধরপুর থেকে মাইল পনেরো দূরে পাহাড়ের ওপর আমরা একবার একটা ঝর্না আবিষ্কার করেছিলুম, সুনেত্রাদেবী ঠিক সেই ঝর্নার শব্দের মতন হাসতে লাগলেন।

আমিও হাসি চাপতে পারলুম না। পিয়া-বাবুজীর বাবা কোনোদিন এক লাইন কবিতা পড়েছেন কি না সন্দেহ। কবিদের সম্পর্কে এরকম অদ্ভুত ধারণা হলো কী করে কে জানে!

—নিন, আপনি আর একটু পুডিং নিন!

—আপনি কি সত্যি ভেবেছেন নাকি যে আমি সারাদিন না খেয়ে থাকি?

আবার সেইরকম হাসি। হাসতে হাসতেই আর খানিকটা পুডিং জোর করে তুলে দিলেন আমার প্লেটে। তারপর বললেন, আমি জীবনে কোনোদিন কোনো কবিকে দেখিনি। এই প্রথম আপনাকে দেখলুম।

—বাঃ, বুদ্ধদেব বসুকেই তো...

—ওঃ হো! তা তো ঠিক। তবে ওকে আমাদের মামা হিসেবে চিনি তো। সেই জন্য কখনো মনে হয়নি।

—আমি অতি সামান্য, মানে কখনো সখনো দু-একটা...

—কী করে কবিতা লেখেন? এমনি এমনি মাথাতে আসে?

এ প্রশ্নের আর উত্তর দিতে হলো না আমাকে। ঝনঝন করে পাশের ঘরে টেলিফোন বাজল, সুনেত্রাদেবী উঠে গেলেন।

পুডিংটা সত্যি চমৎকার লাগল, চেটেপুটে শেষ করে আমি চুপ করে বসে রইলুম। এই পরিবারটি সম্পর্কে একটা নতুন ধারণা জন্মে গেল আজ। বুদ্ধদেব বসুর মতন লেখক এদের আত্মীয়? আমার ধারণা ছিল বুদ্ধদেব বসু, মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন লেখকরা কারুর মামা কাকা জ্যাঠা পিসে হন না। ওঁরা স্বয়ম্ভু।

বুদ্ধদেব বসুর পত্রিকাতে তো কত লোকই কবিতা লেখে, উনি প্রত্যেকের নাম জানেন? আমায় কোনোদিন দেখেননি, তবু আমায় মনে রেখেছেন? আশ্চর্য ব্যাপার! আমার মাত্র দুটো লেখা ছাপা হয়েছে ওঁর পত্রিকায়।

সুনেত্রাদেবী টেলিফোনে অনেকক্ষণ কথা বলছেন। আমার এবার ওঠা উচিত। কিন্তু না বলে কি চলে যাওয়া যায়? একটুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলুম। টেলিফোনের সময় এখান থেকে চেঁচিয়েও কিছু বলা উচিত নয়। এক গেলাস জল পেলে ভালো হতো। মুখটা মিষ্টি হয়ে গেছে। উঁকিঝুঁকি মেরে রঘুকে দেখতে পেলুম না।

টেলিফোন শেষ করে সুনেত্রাদেবী এসে দাঁড়ালেন দরজার কাছে। এত হাস্যোজ্জ্বল ছিল মুখখানা, এখন হঠাৎ ম্লান হয়ে গেছে, টেলিফোনে কেউ দুঃখ দিয়েছে ওঁকে? কেন? কে সেই পাষণ্ড?

—আমি এবার যাই!

মুখে কিছু না বলে উনি ঘাড় নাড়লেন, আমার মনে হলো, আমি চলে গেলেই উনি কাঁদবেন। পৃথিবীটা কেন এত নিষ্ঠুর হয়? এই চমৎকার সন্ধ্যায় সুনেত্রাদেবীর মনে কষ্ট না দিলে কি কারুর চলত না? জল চাওয়া হলো না, আমি নেমে গেলুম সিঁড়ি দিয়ে।

একটু বাদেই কিন্তু সুনেত্রাদেবীর ম্লান মুখখানা ভুলে গেলুম আমি। আমার মনটা ফুরফুরে হয়ে আছে! বুদ্ধদেব বসু আমার নাম মনে রেখেছেন! চেনা নেই, শোনা নেই, উত্তর কলকাতা থেকে ডাকে কবিতা পাঠাই...

জল না খেলে চলবে না। কোনো দোকানে ঢুকে এক গেলাস জল চাইব? শুনেছি, জল চাইলে এ দেশে কেউ না বলে না। যদি আমাকেই প্রথম কেউ প্রত্যাখ্যান করে। দরকার কী, রাস্তায় তো টিউবওয়েল আছেই, করপোরেশন করে রেখেছে জলের ব্যবস্থা।

এক হাতে পাম্প করে অন্য হাতে জল খেতে খুব অসুবিধে, তবু কাজ চালিয়ে নিলুম কোনো রকমে। জামার ডান হাতাটা ভিজে গেল। একটু আগে একটি সুদৃশ্য সাজানো গোছানো ফ্ল্যাটে এক সুন্দরী রমণী আমাকে অতি চমৎকার পুডিং নিজে পরিবেশন করে খাওয়ালেন, তারপর জল খেতে হলো রাস্তার কলে। জীবন-যাপনের এই সবই মজা। বুদ্ধদেব বসু আমার নাম মনে রেখেছেন!

আজ ভবানীপুরে যাবার দিন। ডান হাতের তালু চুলকোচ্ছে কেন? তা হলে আজ নিশ্চয়ই ওরা মাইনে দেবে। আর কোনো কুসংস্কারে আমার ঠিক বিশ্বাস নেই, তবে এই তালু চুলকোলে টাকা পয়সার ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে খুব ইচ্ছা করে। ভবানীপুরের দত্ত বাড়িতে ওরা যে মাইনে দেয় না তা নয়, কিন্তু কবে যে

দেবে তার ঠিক নেই। কোনো কোনো মাসে কুড়ি তারিখও হয়ে যায়। ওটা যে আমার ব্যক্তিগত হাতখরচের টাকা।

মাইনে না পাওয়ার অভিজ্ঞতাও আমার আছে। কিছুদিন পড়িয়েছিলুম এক অতি বিখ্যাত বাড়িতে, সে পরিবারের একজনের লর্ড উপাধি আছে পর্যন্ত, পরপর তিন মাস মাইনেই দিল না। দারুণ বড়লোক তো, তাই এসব ছোটখাটো ব্যাপার তাঁদের মনেই থাকে না। মুখ ফুটে চাইবার ক্ষমতাই আমার নেই। দুর ছাই বলে ছেড়ে দিলুম পড়ানো, তবু তাঁরা ভ্রূক্ষেপও করলেন না, একটা মাস্টার এলো কি এলো না, তাতে ওঁদের কিছু যায় আসে না।

চোদ্দ বছর বয়েস থেকে এর মধ্যেই এত টিউশানি করেছি আমি যে এই বিষয়ে একটি এনসাইক্লোপিডিয়া লিখতে পারি। মদনমোহনতলায় এক জায়গায় পড়িয়েছিলুম কয়েক মাস, সেখানে ছাত্রের দিদি মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বলতেন, একি দুজনেই যে চুপচাপ দেখছি, তা হলে পড়া হচ্ছে কী করে? অ্যা? একদিন পড়িয়ে চলে যাচ্ছি, সদর দরজা পেরিয়ে পা দিয়েছি রাস্তায়, ছাত্রটি ছুটে এসে আমায় আবার ধরল। দিদি ডাকছেন। অবাক হয়ে ফিরে যেতেই দিদিটি বললেন, মাস্টারমশাই, আপনার দু ঘণ্টা পড়াবার কথা, আপনি এক ঘণ্টা পঁয়তিরিশ মিনিটেই চলে যাচ্ছেন যে? কাল গিয়েছেন এক ঘণ্টা বিয়াল্লিশ মিনিটে, আমি লক্ষ্য করেছি এমনভাবে পড়ালে ও ছেলের ভবিষ্যতে কিছু হবে? টাকাগুলো তো ঠিক গুনতে হচ্ছে—

তারপর ভয়ে আর এক বছর আমি মদনমোহনতলার ধার কাছ দিয়ে হাঁটিনি।

ডান হাতের তালু চুলকোবার ফল আজ হাতে হাতেই পেলুম।

ভবানীপুরের ছাত্রটি পড়ে ফার্স্ট ইয়ারে, একেবারে নিপাট ভালো মানুষ ছেলে। নামটিও সুশান্ত। কলেজে পড়া ছেলে এমন লাজুক হয় কদাচিৎ, পড়াশুনোতেও মোটামুটি ভালো। একে পড়ানোতেও আমার কোনো কষ্ট নেই। যা হোম ওয়ার্ক দেব সব করে রাখবে, বই খাতাপত্র নিখুঁত গুছোনো, ওর তিনদিনের পড়া একদিনে পড়ানো যায়।

এদের খুব বড় সংসার। সুশান্তর বাবা কী কাজ করেন তা আমি জানি না, কোনো এক ধরনের ব্যবসাই হবে বোধহয়, কলকাতায় থাকেন না প্রায়ই। সুশান্ত এত কম কথা বলে কিন্তু বাড়ির মধ্যে খুব চেঁচামেচি লেগেই থাকে সবসময়। টুকরো টুকরো কথা শুনে বুঝতে পারি, এই পরিবারে মাঝে মাঝে খুব টাকার টানাটানি হয়, আবার মাঝে মাঝে খুবই সচ্ছল অবস্থা। কোনো কোনো মাসে আমি চায়ের সঙ্গে দুখানা বিস্কুট পাই, কোনো কোনো মাসে শুধু চা। একদিন রাত আটটায় সুশান্তর বাবা একজোড়া বড় ইলিশ নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন সেদিন

আমিও দু পিস ইলিশ মাছ ভাজা খেয়েছিলুম।

সুশান্তর বাবা দুলালবাবু বেশ হাসিখুশি লোক। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে গল্প করতে আসেন। এমন সব অদ্ভুত প্রশ্ন করেন, যার কোনো মাথামুণ্ডু নেই! হঠাৎ একদিন জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলুন তো, এই যে এত টাকাপয়সা খরচা করে ভাকরা-নাঙ্গাল তৈরি হলো, তাতে আমাদের মানে আমাদের এই বাঙালিদের কী লাভ হলো? যেন এর উত্তর আমার জানবার কথা!

কিংবা হয়তো বললেন, আচ্ছা, আপনি বলুন, এই যে দলে দলে রিফিউজি আসছে এখনো, এদের সব কটাকে ধরে ধরে আন্দামানে চালান করে দেওয়া উচিত না? বলুন?

প্রশ্নটা করেই এমন ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে থাকেন, যেন আমারই মতামতের ওপর নির্ভর করছে সবকিছু। আমি হ্যাঁ বললেই সব রিফিউজি জাহাজ-ভর্তি হয়ে চালান হয়ে যাবে।

—এই বাঙালগুলোর জন্য কলকাতা শহরটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল না? কী ছিল আগে। এখন দেখুন শিয়ালদা স্টেশন, একটা আঁস্তাকুড়...

এ বাড়িতে আমি খুব সাবধানে থাকি, কোনো কথায় চন্দ্রবিন্দু বাদ দিই না। এমনকি হাসপাতালকেও বলি হাঁসপাতাল।

সুশান্তকে পড়ানো শেষ হয়ে গেছে, দুলালবাবু ঘরে ঢুকে বললেন, কী খবর মাস্টারমশাই, কদিন আসেননি শুনলুম, জ্বর-টর হয়নি তো?

—না, তা নয়।

—দেশের হাল চাল কেমন বুঝছেন? এই যে সরষের তেলের দর একবার বাড়তে শুরু করল, আর নামবে কোনোদিন? আপনি বলুন?

—হেঁ, হেঁ, মানে।

—পাকিস্তান আবার আমাদের অ্যাটাক করবে। আমি বলছি করবে। কী, আপনি বলুন করবে কি না?

—হেঃ হেঃ হেঃ।

—দিল্লিতে বসে আছে যতগুলো সব নিনকমপুফ...ও আই অ্যাম স্যরি...আচ্ছা, আপনিই বলুন, এই যে মাছের দামও বাড়ছে, সোনার দামও বাড়ছে আর কোনো কানট্রিতে এমন হয়?

এবার আমার ইকনমিকস পড়া বিদ্যে মাথার মধ্যে গজগজিয়ে ওঠে। আমি বিজ্ঞের মতন বলি, সোনার দাম বাড়লে তো অটোমেটিক্যালি সব জিনিসের দাম বাড়বেই। আসলে, সোনার দাম তো এরকম বাড়ে না, সোনার ইন্টারন্যাশনাল প্রাইস আছে, যে-কোনো দেশে সোনার দাম বাড়া মানে সেই দেশের মানি ভ্যালু

কমে যাওয়া। মানির পারচেজিং পাওয়ার...

—ওঃ, আপনার মাইনেটা দেওয়া হয়নি।

—ঠিক আছে পরের দিন এসে।

—না, না, আজই দিচ্ছি। এই খোকা কাগজ-পেন্সিল দে তো।

সুশান্ত এই সময় ঘর ছেড়ে উঠে চলে গেল। অন্যান্য মাসে সুশান্তর মা-ই খামে করে টাকাটা দেন, দুলালবাবু এই প্রথম। কাগজ-পেন্সিল কেন?

—আপনি এ মাসে তিনদিন আসেননি শুনলুম—বারো দিনের মধ্যে তিনদিন, তার মানে ওয়ান ফোর্থ ওয়ার্কিং ডেইজ, তাই না?

আমি হ্যাঁ। বলে কি লোকটা? কুলি-মজুরের রোজ হিসেব করছে কেন?

—মাসে পঁচাত্তর টাকা হলে তার ওয়ান ফোর্থ...এই ধরুন চার উনিশং ছিয়াত্তর, তাহলে উনিশ বাদ যাবে...সেভেন্টি ফাইভ থেকে উনিশ বাদ গেলে...ছয়...হাতে রইল এক ছাপান্ন ফিফটি সিক্স, তাই না? কি মাস্টারমোশাই হিসেবটা ঠিক আছে?

আমি স্তব্ধ।

পকেট থেকে কয়েকটা দশ টাকার নোট বার করে উনি বললেন, খুচরো...আপনার কাছে চারটে টাকা আছে?

—না, থাক না বাকিটা।

—আরে না, না, থাকবে কেন? আমি নিয়ে আসছি ভেতর থেকে। এই শিবু, শিবু, তোর মায়ের কাছ থেকে চারটে টাকা নিয়ায় তো।

—একবার সুশান্তকেও ডাকবেন?

আমার চোখ ফেটে জল আসছিল। রেগে উঠবার কথা, তার বদলে কেন যেন দারুণ অভিমান হয়। আমি দুলালবাবুর দিকে তাকাতে পারি না।

সুশান্ত এলে আমি বললুম, তুমি তো নিজেই খুব ভালো লেখাপড়া করো, আমার সাহায্য ছাড়াই রেজাল্টও নিশ্চয়ই ভালো করবে, আমি কাল থেকে আর আসবো না।

দুলালবাবু রীতিমতন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সে কি মোশাই, আপনি কাল থেকে আর আসবেন না?

—না, মানে।

—কেন!

—আমি একটা চাকরি পাচ্ছি, কলকাতার বাইরে চলে যেতে হবে।

—চাকরি পাচ্ছেন? ভেরি গুড! ভেরি গুড! কোথায় পেলেন?

—জি কে ডব্লু!

সুশান্ত নিচু হয়ে আমায় প্রণাম করতে যেতেই আমি ওকে ধরে ফেললুম। দাঁতে দাঁত চেপে থাকতে হলো আমাকে কান্না সামলাবার জন্য। এরা বোঝে না কেন যে ছাত্রদের ছেড়ে যেতে হলে অনেক সময় মাস্টারদেরও কষ্ট হয়? সুশান্ত ছেলেটিকে আমি সত্যি খুব ভালোবাসতুম!

প্রকৃতির নিয়মই এই যা দেয় তার চেয়ে বেশি ফিরিয়ে নেয়। আজ সুনেত্রাদেবীর সঙ্গে কিছুক্ষণ থেকে যে সুন্দর সন্ধেটি পেয়েছিলুম, তারপর রাত্রে এই ভবানীপুরের বাড়িতে এরকম উল্টো ঘটনা আজই না ঘটলে কি চলতো না?

না, তবু আজ আমি বেশিই পেয়েছি। রাত্রের তুলনায় সন্ধেটি অনেক ভালো। কবিরা না খেয়ে থাকে, তাড়াতাড়ি মরে যায়, হাঃ হাঃ! বুদ্ধদেব বসু আমার নাম জানেন?

গ্রীস আর রোমের দেবদেবীদের কাহিনীর একটা বই খুঁজছিলাম কলেজ স্ট্রীটের রেলিং-এ। ঠিক যে-সময় যেটির দরকার, সেটাই পাওয়া যাবে না। নতুন বই হয়তো পাওয়া যেতে পারে, পকেটে পয়সাও আছে, কিন্তু নতুন কিনলে চলবে না। ব্যাপারটা হচ্ছে কি, কালকে বাবলুকে পড়ার পরে গল্প শোনাতে যেতেই মালবিকা এসে উপস্থিত। তখন আমায় গল্প বদলাতে হলো। কেন যে তখন মনে এলো দফনে আর নারসিসাসের কাহিনী। সেটা বলার পরই মালবিকা বলল, এই বইটা আপনার বাড়িতে আছে? আমিও তক্ষুনি উত্তর দিয়েছিলুম, হ্যাঁ। ব্যস, অমনি মালবিকার হুকুম ঐ বইটা তার চাই। এখন নতুন বই কিনে নিয়ে গেলেই ঠিক ধরে ফেলবে। ঐটুকু মেয়ে, কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি।

কাল মালবিকা আমায় খুব নাস্তানাবুদ করেছে। এক একটা প্রশ্ন করে আর বাবলু হেসে লুটোয়।

—মাস্টারমশাই, আপনি মোনালিজা ছবিটার নাম শুনেছেন?

—মোনালিজা না মোনালিসা?

—ঐ যাই হোক। ওদেশে বলে মোনালিজা। নাম শুনেছেন তো। আচ্ছা বলুন তো, ছবিটা কে প্রথম কিনেছিল?

—কে কিনেছিল? কে কিনেছিল? মোনালিজা, মোনালিসা নাঃ, আমি তো যতদূর জানি, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ছবিটা এঁকেছিলেন এক বিবাহিতা মহিলাকে দেখে...তারপর ছবিটা সেই মহিলার কাছেই ছিল!

—মোটেই না! কে কিনেছিল বলুন মাস্টারমশাই?

—তা কী করে জানব?

—ওমা, আপনি জানেন না? যে ভদ্রমহিলাকে দেখে আঁকা হয়েছে ঐ ছবিটা, সেই ভদ্রমহিলার স্বামী ঐ ছবিটা একদম পছন্দ করেননি। ওটার জন্য দামও দিতে চাননি। তারপর ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস ওটা কিনে নেন, বাথরুম সাজাবার জন্য!

বাবলু অমনি হাততালি দিয়ে বলে উঠেছিল, বাথরুম সাজাবার জন্য, বাথরুম সাজাবার জন্য, হি-হি-হি-হি! হাসতে হাসতে একেবারে গড়িয়ে পড়ে আর কি।

আমি বলেছিলুম, ও, তাই বুঝি। তারপর চেয়ার ছেড়ে যেই উঠে দাঁড়াতে গেছি, অমনি আর একটা প্রশ্ন।

—মাস্টারমশাই, বলুন তো, একটা পাথরের মূর্তি কত বড় হতে পারে?

—যত বড় ইচ্ছে তত বড় হতে পারে।

—না। ধরুন, কোনো মেয়ের মূর্তি, এরকম সবচেয়ে বড় মূর্তি কোথায় আছে?

—জানি, এটা জানি। স্ট্যাচু অব লিবার্টি—এটা আমেরিকায় নিউ ইয়র্ক না কোথায় যেন আছে।

—মোটেই না। তলোয়ার হাতে একটা মেয়ের মূর্তি, তার নাম মাদারল্যাণ্ড, সেটা আছে রাশিয়ার ভলগোগার্ড শহরে। পা থেকে তলোয়ারের ডগা পর্যন্ত দুশো সত্তর ফুট—

—মালবিকা, তুমি এতসব জানলে কী করে? বিলেতে গিয়ে বুঝি শিখেছ?

—বিলেতের লোকও মোটেই এসব জানে না!

বাবলু হাততালি দিয়ে দিয়ে বলে উঠল, দিদি মাস্টারমশাইয়ের চেয়ে অনেক বেশি জানে!

ভাইবোনে এমন হাসছিল যে পাশের হলঘর থেকে ওদের দাদু ধমক দিয়ে উঠলেন, এই অত গোলমাল কিসের? পড়াশুনো না কাতুকুতু হচ্ছে, অ্যাঁ?

ঐটুকু মেয়ে মালবিকা, অমন ফুটফুটে সুন্দর চেহারা, কিন্তু আমাকে বোকা বানানোতেই ওর সবচেয়ে বেশি আনন্দ।

জেনারেল নলেজ না বাড়ালে টিউশানি করতে গিয়ে মান-সম্মান রক্ষা করা খুব কঠিন। যেসব খবর আমি জানি না, তা ঐটুকু ছেলেমেয়েরা জানতে পারে কী করে? বাথরুম সাজাবার জন্য মোনালিসা ছবিটা কিনেছিলেন ফ্রান্সের সম্রাট? এটা সত্যি কথা? মালবিকা অবশ্য মিথ্যে কথা বলার মতন মেয়ে নয়। আর একদিন আমি বাইবেলের ডেভিড আর দৈত্য গোলিয়াথের গল্পটা বলতে গিয়েছিলুম। প্রথমেই মালবিকা আমায় সংশোধন করে দিয়েছিল গোলিয়াথ না মাস্টারমশাই, গোলায়াথ। ইংরিজি ইস্কুলে পড়ে সঠিক উচ্চারণটা মালবিকার পক্ষে জানা সম্ভব, কিন্তু ও কী করে বলল, ঐ গোলায়াথের উচ্চতা ঠিক ছ ফিট দশ ইঞ্চি?

খুঁজতে খুঁজতে একটা বই পেয়ে চমকে উঠলুম। গিনেস বুক অব রেকর্ডস। এই বইয়ের অস্তিত্বের কথাই আমার জানা ছিল না। কোনোদিন নাম শুনিনি! অথচ এই তো সেই আশ্চর্য বই। প্রথম পাতাতেই রয়েছে দীর্ঘতম মানুষের কথা। তাহলে এই বই দেখেই মুখস্থ করে মালবিকা আমায় ঠকায়। গ্রীস-রোমের উপকথা না খুঁজে সেই বইটাই কিনে ফেললুম দরাদরি করে। মালবিকাকে বললেই হবে, আমার সেই বইটা হারিয়ে গেছে!

পুরো বইটা মুখস্থ করার পর সবাই দেখবে, প্রাইভেট টিউটর হিসেবে আমার কত প্রতাপ! পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রথম কবিতার বইটি ছাপা হয় কোথায়? কোরিয়াতে ১১৬০ সালে। শেক্সপীয়রের মোট কটা নিজের হাতের সই এখনো টিকে আছে? মাত্র ছটা। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট স্বাধীন দেশ কোনটা? ভ্যাটিকান সিটি।

এরপর দুদিন বন্ধুবান্ধবদের কান ঝালাপালা করে দিলুম একেবারে। কথায় কথায় জ্ঞানের প্রশ্ন। কেউ উত্তর দিতে পারে না। তারপর ভাস্কররা সিদ্ধান্ত নিল যে ফের আমি ওরকম কোনো প্রশ্ন করলেই আমার মাথায় সবাই মিলে গাঁট্টা মারবে।

মাঝরাত্রে জেগে উঠে মনে হয়, আচ্ছা, মানুষ সবচেয়ে কত বড় স্বপ্ন দেখতে পারে, তাও কি ঐ বইটাতে আছে? কৌতূহলটা এমনই তীব্র হয়ে ওঠে যে আলো জ্বেলে বইটার পাতা ওল্টাই। তাও তো আছে দেখছি, শিকাগোর বিল কারস্কাডন নামে একটা লোক দু ঘন্টা তেরো মিনিট ধরে একটা স্বপ্ন দেখেছিল, সেটাই রেকর্ড। মাত্র দু ঘন্টা তেরো মিনিট? ওরা জানে না।

ভবানীপুরের টিউশানিটা ছেড়ে দিয়ে মনটা খচখচ করছিল। সামনের মাস থেকে আমার হাতখরচ চলবে কী করে? মা-র কাছ থেকে এমনিতেই পাঁচ দশ টাকা নিতে হয়।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল নিখিলদার কথা। অনেকদিন দেখা হয়নি। দুপুরে কোনো কাজ নেই, শিয়ালদা পর্যন্ত ট্রামে গিয়ে বাকিটা হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলুম বেলেঘাটায়।

দরজা খুলে নিখিলদা বললেন, নীলু, তুই চিনতে পারলি আমার বাড়ি? সেই তো একবার মাত্র এসেছিলি। আয়, ভেতরে আয়। সুদীপা, কে এসেছে দেখো!

একখানা মাত্র ঘর নিখিলদার। ওপরে টিনের চাল। পেছন দিকে একটা খোলা বারান্দা, সেখানে উনুন পেতে রান্না। সুদীপাদি এই বেলা আড়াইটের সময়ও রান্না করছেন। গরমে, আগুনের আঁচে, সুদীপাদির ঘামে ভেজা মুখখানা চকচক করছে। ঠিক যেন গর্জন তেল মাখানো দেবী প্রতিমার মুখ। পরে আছেন একটা দামি

বেনারসী শাড়ি, বোধহয় কোনো আটপৌরে শাড়িই নেই সুদীপাদির। বিরাট বড়লোকের মেয়ে, আমাদের প্রথম কলেজ জীবনে উনি ছিলেন নামকরা ছাত্রনেত্রী। নিখিলদার কোনো চালচুলো নেই, তবু পাগলের মতন নিখিলদার প্রেমে পড়ে গেলেন সুদীপাদি।

রান্না মানে শুধু খিচুড়ি। তারই মধ্যে আলু সেদ্ধ, বেগুন সেদ্ধ, ডিম সেদ্ধ। হাঁড়িটা শুদ্ধ ঘরের মধ্যে এনে সুদীপাদি বললেন, তুমিও আমাদের সঙ্গে বসে যাও নীলু!

—আমি এইমাত্র খেয়ে এসেছি, সুদীপাদি।

—তাতে কী হয়েছে, আবার খাও।

—পারব না একদম, পারব না, পেট একেবারে ভর্তি।

—অমন পেট ভর্তি করে বাড়িতে খাও কেন? কি রকম খিচুড়ি রাঁধলুম একটু টেস্ট করবে না?

অগত্যা একটা প্লেট নিয়ে বসতেই হলো ওদের সঙ্গে। সত্যি অপূর্ব স্বাদ খিচুড়ির। না না করেও খেয়ে ফেললুম অনেকটা। নিখিলদা কাঁচা লঙ্কা খেতে পারেন বটে, কচ কচ করে এক একটা কাঁচা লঙ্কা কাঁমড়াচ্ছেন যেন টিয়া পাখি।

আচমকা নিখিলদা জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে নীলু পৃথিবীটা এই রকমই থাকবে? সবাই পাস-টাস করে চাকরি-বাকরিতে ঢুকবে, বিয়ে করে সংসারী হবে, তারপর ছেলেপুলের জন্ম দেবে আর চোর-জোচ্চোর বদমাশরা আপন মনে রাজত্ব চালিয়ে যাবে?

আমি প্রথমে একটু লজ্জিত বোধ করলুম। একদিন নিখিলদাকে আমিই জিজ্ঞেস করেছিলুম পৃথিবীটা কি এই রকমই থাকবে? আপনারা এত যে বক্তৃতা দিচ্ছেন, মিছিল আর স্লোগান...তাতে কোনো কিছু কি বদলাবে?

পরক্ষণেই মনে হলো নিখিলদাই বা কী করছেন? তিনিও তো বিয়ে করে সুন্দরী বউয়ের সঙ্গে বসে আরাম করে খিচুড়ি খাচ্ছেন। জীবনটা যেন একটা পিকনিক। সারাটা জীবন যদি এইভাবেই কেটে যায় তো মন্দ কী!

—নিখিলদা, সেই কথাটাই তো আবার জানতে এলুম আপনার কাছে।

সুদীপাদি বললেন, তুমি ঠিক দিনে এসেছ, নীলু। কালই আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

—কোথায়?

—আমি মেদিনীপুরে আর নিখিল যাচ্ছে বাঁকুড়ায়।

—দুজনে দু জায়গায়? চাকরি?

—নাঃ, চাকরি নয়।! তুমি বুঝি চাকরি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পার না?

নিখিলদা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় চাকরি করছো, নীলু?

—বাবার হোটেলে।

—অ্যাঁ? ও বুঝেছি। এখনো কোথাও চাকরি পাওনি তাহলে?

—আপনারা দুজনে মেদিনীপুর আর বাঁকুড়ায় চলে যাচ্ছেন কেন?

—পৃথিবীটা যদি বদলাতে নাও পারি, তবু দেখা যাক অন্তত কয়েকটা গ্রামকে বদলানো যায় কি না!

—আপনারা গ্রামে গিয়ে থাকবেন?

—তাই তো ঠিক করেছি। আমাদের পার্টি থেকে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় শ্রমিকদের মধ্যে অনেক দিন থেকেই কাজ শুরু হয়েছে, কিন্তু গ্রামের চাষীদের কাছে আমরা পৌঁছোতেই পারিনি। চাষীরা জানেই না এদেশের কাছ থেকে তারা কতটুকু পেতে পারে।

—নিখিলদা, আমায় নিয়ে যাবেন?

—তুমি যাবে?

—হ্যাঁ।

—তুমি মাটির ঘরে থাকতে পারবে? যে-গ্রামে আমি যাচ্ছি, সেখানে দু-তিনবার আমি ঘুরে এসেছি, একটা পাকা বাড়ি নেই, স্কুল নেই।

—তা হোক। আমি ঠিক থাকতে পারব।

—বড় বড় সাপ, তোমার সাপের ভয় নেই?

—না, নিখিলদা।

—কিন্তু আমরা যে কালকেই রওনা হচ্ছি।

—আমি রেডি, আমার তো কোনো বন্ধন নেই!

—বাড়ির জন্য মন কেমন করবে না?

—নিখিলদা, আপনি কি আমায় ছেলেমানুষ পেয়েছেন?

সুদীপাদি বললেন, নীলু বরং আমার গ্রামে চলুক। ওকে খুব করে খাটাব।

আমি মুগ্ধভাবে সুদীপাদির দিকে তাকালুম। ষোলো বছর বয়েসে যেদিন সুদীপাদিকে প্রথম দেখি, সেদিনই দারুণভাবে ওঁর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলুম। সুদীপাদি আমার চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড়, এমন রূপসী ও তেজস্বিনী নারী আমি আর একজনও দেখিনি। আমরা থার্ড ইয়ারে পড়ার সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যেদিন টিয়ার গ্যাস আর গুলি চললো, সেদিন দেখেছিলুম বটে সুদীপাদির সাহস। টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়া অগ্রাহ্য করে সুদীপাদি ছুটে গিয়ে এক পুলিস অফিসারের গালে মেরেছিলেন টেনে এক থাপ্পড়!

সেই প্রেম এখনো যায়নি, এখনো আমি সুদীপাদির ক্রীতদাস। সুদীপাদি যদি

অনুগ্রহ করে একবার আমাকে আলিঙ্গন দিতে রাজি হন, তাহলে তার বিনিময়ে আমি হাসতে হাসতে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি।

—না, সুদীপাদি, আমি আপনার সঙ্গে যাব না।

—কেন?

—আমি নিখিলদার সঙ্গে গিয়ে প্রথম কিছুদিন কাজ শিখে নেব, তারপর আমি নিজেই একা অন্য কোনো গ্রামে গিয়ে কাজ করব!

—নিখিল কাজ শেখাতে পারে, আর আমি তোমায় কাজ শেখাতে পারব না?

—আমি মানে...আমি মেয়েদের কাছ থেকে কিছু শিখতে পারি না—

সুদীপাদি রেগে উঠে বললেন, কী, তুমি মনে করো ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা...।

নিখিলদা হো-হো করে হাসতে লাগলেন আর সুদীপাদি আমায় মারতে এলেন চড়। আমি কুঁকড়ে সরে গিয়ে কৃত্রিম ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম, মারবেন না, মারবেন না, আপনার ঐ পুলিস-ঘায়েল-করা চড় খেলে আমি মরেই যাব একেবারে।

তারপর বললুম, একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, নিখিলদা। আপনারা দুজনেই এক গ্রামে যাচ্ছেন না কেন?

—দুজনে এক সঙ্গে যদি যাই, এক সঙ্গে থাকি, তার মানেই তো সেখানে আবার একটা সংসার পাতাব ব্যাপার। তখন আমাদের ব্যক্তিগত সমস্যাই অনেক সময় বড় হয়ে উঠবে।

সুদীপাদি বললেন, আমি আর কোনোদিন সংসার করতে চাই না।

—নীলু, তুমি সত্যিই যেতে চাও।

—নিশ্চয়ই।

—তা হলে পৌঁটলা-পুঁটলি বেঁধে চলে এসো কাল সকালে।

—আমি একেবারে তৈরি, যদি বলেন তো এই মুহূর্তে চলে যেতে পারি...

...নিখিলদার ঘরের দরজা খোলা, থপথপ করে হামাগুড়ি দিচ্ছে একটা বাচ্চা। ঘরের মেঝেতে এক রাশ মুড়ি ছড়ানো, বাচ্চাটা তাই খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। নিখিলদার নাম ধরে ডাকতে অন্য একটা লোক বেরিয়ে এলো! নিখিলদা এখানে থাকেন না?

সেই লোকটি নিখিলদার পিসতুতো দাদা হন। তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা জানতে পারলুম। নিখিলদা মাস চারেক ধরে জেলে। সুদীপাদি কী একটা স্কলারশিপ পেয়ে রিসার্চ করতে গেছেন চেকোস্লোভাকিয়ায়। তারপরই নিখিলদা বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের স্ট্রাইকে মারামারির মধ্যে জড়িয়ে পড়ে গ্রেফতার হন। কবে ছাড়া পাবেন ঠিক নেই।

কেন সব জিনিস এমনভাবে ভেঙে যায়?

—তুমি ভাই নিখিলকে খুঁজছ কেন? খুব কি কোনো দরকার ছিল?

কী বলব আমি নিখিলদার পিসতুতো দাদাকে? নিখিলদার ওপর যে আমার সবকিছু নির্ভর করছিল। সুদীপাদি বিদেশে? চেকোশ্লোভাকিয়ার গ্রাম বদলাতে গেছেন!

—এই রোদ্দুরে হেঁটে এসেছ, তুমি ভাই ভেতরে এসে একটু বসবে?

ঘরের ভেতরটা একবার উঁকি মেরে দেখলুম। একটা ছেঁড়া মাদুরের ওপর খুব রোগা একজন মহিলা চোখে চশমা পরে কী যেন সেলাই করছেন। তাঁর পাশে অনেকগুলো ছেঁড়া জামা-কাপড়। সব কিছুর মধ্যে একটা নোংরা নোংরা ভাব। সুদীপাদি বোধহয় কোনো দিন এ বাড়িতে থাকেননি। কে জানে, শেষ পর্যন্ত নিখিলদার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিল কি না!

নিখিলদার বাড়ি ছেড়ে হাটতে হাঁটতে চলে এলুম রাস্তার মোড়ে। তা হলে আমার গ্রামে যাওয়া হলো না? মনে মনে সব যে ঠিকঠাক করে ফেলেছিলুম! এর পর সারা দিনটাই ব্যর্থ মনে হয়।

গিনেস বুক অব রেকর্ডসে অনেক ভুল লেখে!

৭

একটু দেরি হলো আমার আসতে, পিয়া-বাবুজী দুজনেই খুব লক্ষ্মী ছেলে মেয়ের মতন পড়তে বসে গেছে। আমার চেয়ারটিতে বসে আছে অন্য একটি মেয়ে।

আমি ঘরে ঢুকতেই পিয়া বলল, এই বাবুজী আর একটা চেয়ার নিয়ায় না, প্লিজ।

বাবুজী সঙ্গে সঙ্গে বলল, সরি, আই অ্যাম বিজি, তুমি নিজে নিয়ে এসো—

অন্য মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আই মাস্ট পুশ অফ নাও।

পিয়া বলল, না, না, পারমিতা, তুই একটু বোস না।

একটু আগে আমি বন্ধুদের সঙ্গে দারুণ আড্ডা দিয়ে এসেছি। তখন আমার চেহারা ছিল অন্য রকম। এ বাড়িতে পা দিলেই আমি বদলে যাই, এখন আমি মাস্টার, মুখে ঈষৎ গাম্ভীর্য মাখানো, আবার নিছক গোমড়ামুখো যাতে না মনে করে সেই জন্য ঠোঁটে খুব সামান্য হাসির ছায়া ইংরেজিতে যাকে বলে গোস্ট অব দা স্মাইল!

পিয়া বলল, মাস্টারমশাই, এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, এই আমার বন্ধু পারমিতা। এর কথা কতবার বলেছি আপনাকে—

মেয়েটি আমার দিকে পুরোপুরি না ফিরে হাত তুলে বলল, নমস্কার।

তারপরই বলল, আমি এবার যাই, মা উইল বি ওয়েটিং ফর মী।

—তুই আর একটু বোস।

—য়ু নো ভেরি ওয়েল, আমার ফিরতে একটু দেরি হলে মা কীরকম অ্যাংকসাস হয়ে যান—

পিয়া এগিয়ে দিতে গেল মেয়েটিকে। আমি বাবুজীকে পড়াতে শুরু করলুম, বাবুজী এমনিতে ছটফটে, কিন্তু যেটুকু সময় পড়ে, তখন গভীর মনোযোগ দেয়। বাবুজী ঠিকই করে রেখেছে, ও এঞ্জিনিয়ার হবে।

একটু বাদে পিয়া এসে এক গাল হাসি মুখ করে বলল, মাস্টারমশাই, আপনাকে পারমিতার খুব পছন্দ হয়েছে।

আমি হা! আমাকে পছন্দ হয়েছে মানে? কয়েক পলক মাত্র দেখেছি মেয়েটিকে। একটিও কথা বিনিময় হয়নি।

পিয়ার ভাষাই এই রকম।

আমি ভুরু তুলে ওর দিকে তাকিয়ে রইলুম।

পিয়া বলল, হ্যাঁ, সত্যি ওর পছন্দ হয়েছে আপনাকে। বলল, হি ডাজ ন'ট লুক লাইক আ টিপিক্যাল টিউটর।

—বেশ বুঝলুম। আমাকে ওর পছন্দ হয়েছে। তাতে কী হবে?

—আপনি ওকে পড়াবেন কাল থেকে।

—আমি পড়াবো? কেন!

—বাঃ, আপনি পড়াবেন না? আমার বন্ধুকে আপনি পড়াবেন না?

—বাঃ আমার সময় থাকলে তবে তো—

—আপনি পড়াবেন না? আমি ওকে কথা দিলাম।

পিয়ার স্বভাবই এই যে ও নিজে মনে মনে যা ঠিক করে, তার কোনো প্রতিবাদ পছন্দ করে না। ওর সরল আন্তরিকতা দিয়ে ও পৃথিবীর সবাইকে নিজের মতন মনে করে। আমি উৎসাহ না দেখাতে ওর চোখ ছলছল করে উঠল।

—কী ব্যাপার, আমি কিছুই জানি না—

—বাংলা কমপালসারি হয়ে গেছে, সেকেণ্ড ল্যাঙ্গোয়েজ নিতেই হবে, ও বাংলা ভালো জানে না।

বাবুজী পাশ থেকে মন্তব্য করল, ভালো জানে না মানে? বুঝলেন মাসশাই, ওর তুলনায় আই অ্যাম আ বেঙ্গলি স্কলার! শী ডাজ নট ইভন

নো হাউ টু রাইট অ আ ক খ!

পিয়া বলল, ইউ শাট আপ।

ফরাসী কায়দায় কাঁধ শ্রাগ করল বাবুজী।

পিয়া আবার বলল, শুনুন মাস্টারমশাই, পারমিতা বাংলা জানে...কিন্তু লেখার অভ্যেস তো নেই...পরীক্ষা যখন দিতেই হবে তাই আমি ওকে বলেছি আমার মাস্টারমশাই তোকে এই কয়েক মাস পড়িয়ে দিলেই তুই পাস করে যাবি—

বাবুজী বলল, মাসশাই, ডোনট টেক দ্যাট রিস্ক।

আবার পিয়া বলল, ইউ শাট আপ। আবার বাবুজীর কাঁধ শ্রাগ।

পিয়া আমাকে বলল, এখন মাস্টারমশাই, আপনি যদি ওকে পড়াতে না চান তাহলে আমি...আত্মহত্যা করব। আমার কথার কী দাম থাকবে?

—সেই জন্য বুঝি ঐ মেয়েটি আমাকে দেখে পছন্দ করতে এসেছিল?

এবার আবার পিয়ার মুখে হাসি ছড়িয়ে গেল। চুপি চুপি গোপন কথার ভঙ্গিতে বলল, পারমিতার ধারণা কি জানেন, প্রাইভেট টিউটর মানেই বুড়ো নিকেলের চশমা পরা, চোখে পিচুটি, নস্যি নেয়—হি-হি-হি-হি।

বাবুজী বলল, শী ডিজার্ভস আ টিউটর লাইক দ্যাট।

—ইউ শাট আপ! আপনি ওকে পড়াবেন না মাস্টারমশাই?

—দেখি, যদি সময় করা যায়।

—মা আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

—এখন তুমি পড়ায় মন দাও তো, অনেক গল্প হয়েছে...

বাবুজী আগে শেষ করে উঠে গেল। পিয়া তারপরেও কিছুক্ষণ আমার ডিকটেশানে একটা প্রশ্নের উত্তর লিখছিল, হঠাৎ লেখা থামিয়ে আবার চোখ মুখে গোপন কথা বলার ভঙ্গি করল।

—মাস্টারমশাই, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? কারুকে বলবেন না বলুন?

—বুঝেছি, প্রমিস করতে হবে তো? করলুম!

—আপনি গল্প লেখেন?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাভ নেই আর। পিয়ার গোপন কথাগুলো এরকমই অদ্ভুত হয় বটে?

—না তো! কে বলল তোমাকে?

—হ্যাঁ লেখেন, মা বলেছে।

ছিল কবিতা, হয়ে গেল গল্প। প্রতিবাদ করেও কোনো ফল হবে না।

—শুনুন মাস্টারমশাই আপনি এর পরের যে গল্পটা লিখবেন, তার হীরোর

নামটা আমি ঠিক করে রেখেছি। আপনাকে নিতেই হবে সেই নামটা। খুব সুন্দর, মিষ্টি একটা গল্প লিখবেন। হীরোর নাম দেবেন অভিজিৎ।

—বেশ দেব। তার চেহারা কী রকম হবে?

—খুব হ্যাণ্ডসাম! এক্সট্রা অর্ডিনারি! তা বলে বিচ্ছিরি ফর্সা আর কোঁকড়া চুল বানাবেন না যেন। গায়ের রং ফর্সা আর কালোর মাঝামাঝি।

—স্বাস্থ্য খুব ভালো? লম্বা?

—হ্যাঁ, স্বাস্থ্য খুব ভালো, কিন্তু ঐ যে এক্সারসাইজ করা গায়ে কেঁচোর মতন মাসল, সেইরকম চেহারা আমার খুব খারাপ লাগে। আপনার হীরো হবে লম্বা ল্যাংকি ধরনের, চোখদুটো খুব গম্ভীর, আর হাসে যখন-তখন, চমৎকার গলার আওয়াজ, সিগারেট খায় না...

এবার সব ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। পিয়ার মুখখানি স্বপ্ন মাখা। অভিজিৎ ওর স্বপ্নের রাজকুমার।

—এই অভিজিৎরা ব্রাহ্ম, তাই না?

—অ্যাঁ? আপনি কী করে জানলেন?

এমন অবাক বোধহয় পিয়া জীবনে আর কখনো হয়নি। চোখ দুটি টলটল করছে।

—ওদের বাড়িতে সবাই খুব ভগবানকে বিশ্বাস করে!

— আপনি কী করে জানলেন? না-না, অভিজিৎ নামে কেউ নেই, আপনাকে বানিয়ে লিখতে বলেছি।

আমার মনে পড়ল পিয়ার বাবা একদিন বলেছিলেন, ভগবান আছেন কি নেই তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমি নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি...।

—ঠিক আছে, তা হলে ঐ অভিজিৎকে নিয়ে লিখব একটা গল্প, আর সেই গল্পের হিরোইনের নাম হবে পিয়া।

—না-না, আমি মোটেই সে কথা বলিনি, খবর্দার লিখবেন না মাস্টারমশাই, ভালো হবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি, তাহলে আমি আত্মহত্যা করব—

হাসতে হাসতে আমি উঠে দাড়ালুম।

সুনেত্রাদেবী এসে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার? কী হয়েছে?

—কিচ্ছু না। এমনি আমি পিয়াকে একটু রাগাচ্ছিলুম।

—শুনুন মাস্টারমশাই, পারমিতার মা টেলিফোন করেছিলেন, খুব করে অনুরোধ করছেন যদি আপনি পারমিতাকেও একটু পড়িয়ে দেন সপ্তাহে দু-তিনদিন... ওদের বাড়িতে যাকে-তাকে পাঠানো যায় না, সে আপনি গেলেই বুঝবেন...।

ভবানীপুরের টিউশানিটা ছাড়বার পর আমার তো আর একটা দরকারই ছিল, সুতরাং আপত্তি করব কেন!

বেরুবার সময় দোতলার সিঁড়ির মুখে এক ভদ্রলোককে দেখে আমি থমকে গেলুম। সেই জ্ঞানব্রত রায়চৌধুরী, গোপালপুরে এঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এবার সব ফাঁস হয়ে যাবে। এবার আর উপায় নেই। গোপালপুরে যাবার কথা আমি এ বাড়িতে ঘুণাক্ষরেও জানাইনি। তখন আমার পা ভেঙে বিছানায় শুয়ে থাকার কথা।

জ্ঞানব্রতবাবু আমার দিকে কয়েক পলক তাকালেন শুধু, তারপর কোনো কথা না বলে পাশ কাটিয়ে চলে এলেন ভেতরে। আমি তরতর করে নেমে গেলুম সিঁড়ি দিয়ে, তারপর এক দৌড়ে রাস্তায়।

জ্ঞানব্রতবাবু আমায় চিনতে পারেননি? মাত্র একমাস আগে দেখা, আমার মনে আছে, অথচ ওঁর মনে নেই? কিংবা উনি অতিশয় ভদ্রলোক। আমার মুখে চোখে আড়ষ্ট ভাব কিংবা ভয়ের চিহ্ন দেখেই সব ব্যাপারটা বুঝে গেছেন! কে জানে!

পরদিন গেলুম পারমিতার বাড়ি। ঠিকানা খুঁজে পাবার কোনো অসুবিধেই নেই, মিডলটন রো-তে একেবারে সাহেব পাড়ায় ফ্ল্যাট। এখনো এদিকে কিছু কিছু খাঁটি সাহেব আছে।

প্রথম অভ্যর্থনাটিই চমকপ্রদ।

বেল বাজাবার পর দরজাটা একটুখানি ফাঁক হলো। ভেতরে চেন বাঁধা। একজন মাঝবয়সী বিধবা মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি পরিচয় দিতেই তিনি পুরোপুরি দরজাটা খুলে বললেন, ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেতরে আসুন।

ঘরের মধ্যে পা দেওয়ামাত্রই একটা বাঘ লাফিয়ে পড়ল আমার ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমি যাকে বলে কুপোকাৎ!

হ্যাঁ, প্রথমে বাঘ বলেই মনে হয়েছিল। তবে সেটাকে ঠিক কুকুরও বলা যায় না। সাক্ষাৎ নেকড়ের বংশধর। তার গর্জনেই আমার অজ্ঞান হয়ে যাবার কথা, তার ওপর আবার বুকে থাবা তুলেছে।

বিধবা মহিলাটি, নো—ও-ও! কাম হিয়ার, বলতেই কুকুরটি আমায় ছেড়ে চলে গেল। কামড়ায়নি অবশ্য, কিন্তু আমার বুকের মধ্যে যা যাচ্ছেতাই ব্যাপার হচ্ছে, তাতে আর কথা বলার শক্তি নেই। তক্ষুনি ঠিক করে ফেলেছি এ বাড়িতে আমি কিছুতেই পড়াব না।

মহিলাটির পরনের ধপধপে সাদা শাড়ি, গায়ে কোনো অলঙ্কার নেই, তবু চেহারায় খুব আভিজাত্যের ছাপ। গায়ের রং দুধে-আলতায় মেশানো। এরকম

চেহারার মহিলাকে যেন সাহেব পাড়ার ফ্ল্যাটে ঠিক মানায় না।

—আপনি বসুন বসুন। ইস, আপনার লাগেনি তো? আমারই দোষ, আমি আগে ডগিকে কিছু বলে দিইনি।

—ওকে বাঁধবেন না?

—না-না, ওকে বাঁধতে হয় না, জীবনে কোনোদিনই ও বাঁধা থাকেনি। আপনি বুঝি খুব কুকুরে ভয় পান?

বাঘের মতন কুকুর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, এখানে ভয় পাওয়া-না-পাওয়ার প্রশ্ন আসে কী করে?

—ডগি কিন্তু এমনিতে খুব শান্ত।

এসব কথাও আমি আগে অনেকবার শুনেছি। কুকুরের মালিক কখনো নিজের কুকুরের দোষ দেখতে পায় না। এদিকে কুকুরটা এখনো ওর পায়ের কাছে বসে আমার দিকে কুটিল চোখে চেয়ে আছে।

ভদ্রমহিলা এবার কুকুরটার দিকে ফিরে চোস্ত ইংরেজিতে খানিকক্ষণ ধরে বোঝালেন যে আমি শত্রু নই, এখন থেকে আমি প্রায়ই আসব, ও যেন আমার সঙ্গে লক্ষ্মী ছেলের মতন ব্যবহার করে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, দেখবেন, এরপর থেকে ও আর আপনাকে কোনোদিন কিছু বলবে না। আপনার মনে হবে এমন শান্ত কুকুর আপনি কখনো দেখেননি। ওর গায়ে হাত দিন!

—না-না, তার দরকার নেই।

—দিন না! একবার দিয়ে দেখুন!

—না-না, হাত দিতে হবে না, মানে আমি বুঝতে পেরেছি।

—একবার হাত দিন নইলে ও ভাববে আপনি এখনো ভয় পাচ্ছেন—

আমি রাজি হলেও আমার হাত যে বিদ্রোহ করছে। হাত উঠতেই চাইছে না। সত্যি কথা বলতে কি নিজের আঙুলগুলোর ওপব আমার একটু একটু মায়া আছে, কুকুরটা যদি কচাৎ করে কয়েকটা আঙুল কেটে নেয়...!

ভদ্রমহিলার পীড়াপীড়িতে আমাকে কুকুরটার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেই হলো। কুকুরটি এবার অগ্রাহ্য করে উঠে চলে গেল দরজার কাছে।

ভদ্রমহিলা বললেন, সবসময় ও ঐখানে বসে থাকে। আমাদের বাড়িতে কোনো পুরুষমানুষ নেই তো, তা ওই আমাদের বডি গার্ড। আপনি কী খাবেন, চা না শরবত? একটু শরবত বানিয়ে দি? রোদ্দুরের মধ্য দিয়ে এসেছেন...।

ক্রমশ জানতে পারলুম, এই ভদ্রমহিলার স্বামী কোনো এক বিশাল চাকরি

করতেন, হঠাৎ মারা গেছেন। পুত্রসন্তান নেই, তিন মেয়েকে নিয়ে তিনি এখানে থাকেন আর ঐ কুকুর। ওরা বেশির ভাগ সময়ই কাটিয়েছেন বাংলার বাইরে, মেয়ে তিনটিই বরাবর কনভেন্টে পড়েছে, তাই বাংলা শেখার সুযোগ পায়নি। এ বাড়িতে একটাও বাংলা বই নেই।

ভদ্রমহিলা নিজে খুব ভালো বাংলা বলেন, খুব সুন্দর স্নেহপূর্ণ মা মা ব্যবহার। কথায় কথায় উনি জানালেন যে ওঁর শ্বশুর ছিলেন সংস্কৃতে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। তারপর হেসে বললেন, আমার বাবাও খুব ভালো সংস্কৃত জানতেন, আমার নাম কী জানেন? অপালা? অনেকে এই নামের মানেই বুঝতে পারে না।

মেয়েরা বাড়িতে স্কার্ট পরে। বড় মেয়েটি এবার ইংলিশে এম-এ পরীক্ষা দেবে, পারমিতা মেজো, আর ছোট মেয়েটি দূরে একটা সোফায় শুয়ে একমনে একটা বই পড়ছে। তিনটি মেয়ে যেন তিন বয়েসী তিনটি মেম।

—এই যাঃ! আমিই শুধু গল্প করে যাচ্ছি আপনার সঙ্গে, পারমিতা পড়বে না? চলুন, আপনাকে পড়বার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি...তবে আমার সঙ্গেও মাঝে মাঝে আপনাকে গল্প করতে হবে কিন্তু...।

বড় একটি হলঘরের দুদিকে দুরকম সোফা সেটি সাজানো। একপাশে একটি মস্ত বড় গান-বাজনার যন্ত্র, তার কাছে ছড়ানো রয়েছে রাশি রাশি বিলিতি রেকর্ড। হলঘরের শেষ প্রান্তে একটি পিয়ানো, তার পাশে জানালা দিয়ে উঁকি মারছে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের ডাল।

পাশে একটা ছোট ঘরে পড়বার ব্যবস্থা। খুব ছিমছাম পাতলা চেয়ার টেবল।

পারমিতা মেয়েটি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং তেজি। মুখে একটু রাগ রাগ ভাব। এই বয়সেই সে ইংরেজি সাহিত্যের অনেক বই পড়ে ফেলেছে, তার নিজস্ব মতামত গড়ে উঠেছে, অথচ তাকে জোর করে এখন এলিমেন্টারি বাংলা শিখতে হবে, এটা সে কিছুতেই পছন্দ করতে পারছে না। আমারও মনে হলো, সত্যিই তো কী অন্যায়! বাঙালি হলেই যে সকলকে বাংলা পড়তে হবে, এর কী মানে আছে? পৃথিবীটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। সব মানুষের যোগাযোগের জন্য দরকার একটি ভাষা, সে ভাষা ইংরেজি ছাড়া আর কী হতে পারে? আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে এ পৃথিবীর সব পুরুষমানুষই প্যান্ট শার্ট পরবে, আর বর্ধিষ্ণু চাষীরাও ইংরেজি বলবে।

বাংলা ভাষায় কেন হ্রস্বই দীর্ঘঈ আর হ্রস্ব উ দীর্ঘ ঊ-র মতন বিচ্ছিরি কমপ্লিকেশানস আছে, তা নিয়ে পারমিতা প্রথমেই খুব অভিযোগ জানালো আমার

কাছে। যেন আমিই এ জন্য দায়ী! আমি খুব সঙ্কুচিতভাবে বললুম, একবার কষ্ট করে শিখে গেলে তারপর আর খুব শক্ত লাগে না—

—বাট এক্সপ্লেইন টু মী, হোয়াই দিজ আর নেসেসারি?

—এক একটা ভাষার এক একরকম গড়ন—যেমন ফ্রেঞ্চ ভাষার বানান প্রথম প্রথম খুব শক্ত লাগে শুনেছি।

দরজার কাছে কেউ যেন জোরে জোরে কথা বলছে, পারমিতা এক্সকিউজ মী ফর আ মিনিট বলে উঠে চলে গেল। কোনো হকার বা ফেরিওয়ালা হবে বোধহয়। এরকমভাবে দু-তিনবার উঠতে হলো পারমিতাকে। একবার ওর ছোটবোন নিয়ে এলো চেক বই, পারমিতা সই করে দিল তার এক পাতায়। বুঝতে পারা যায়, পারমিতাই এই পরিবারের সবদিক সামলায়। এইটুকু মেয়ের ওপর এত দায়িত্ব!

অনেক চেষ্টা করে শেষদিকে একবার মাত্র হাসাতে পারলুম পারমিতাকে। খাবার জল আর জলখাবারের পার্থক্য বুঝিয়ে। তখন বুঝতে পারলুম, যতই গম্ভীর আর রাগী রাগী ভাব করুক, মেয়েটি আসলে সরল আর হাসলে ওকে ভারী সুন্দর দেখায়।

পড়াবার শেষদিকে শুনতে পাচ্ছিলুম পিয়ানোর আওয়াজ। কে বাজাচ্ছে জানি না, খুবই যেন করুণ সুর। শুনতে শুনতে মনটা আনমনা হয়ে যায়। যাবার সময় ঐ হলঘরটার মধ্য দিয়েই যেতে হবে, দেখলুম পিয়ানো বাজাচ্ছেন অপালাদেবী। অবিকল বাঙালি ঘরের মধ্যবয়সী বিধবা, তাঁর হাতে কী চমৎকার পিয়ানোর ঝঙ্কার। কোনো কথা না বলে তিনি আমার দিকে একবার চোখ তুলে তাকালেন।

মনে হলো, তাঁর দু' চোখে জল। উনি বাজাতে বাজাতে কাঁদছেন? কেন? কিন্তু সত্যি সত্যি আমি জলের রেখাই তো দেখেছি ওঁর চোখের নিচে। কারুকে একা নিঃসব্দে কাঁদতে দেখলে সবারই বুক মুচড়ে ওঠে।

এক একটা নতুন টিউশানির বাড়িতে আসি, আর নতুন নতুন মানুষ দেখি। সবাই আলাদা। প্রত্যেকটি বাড়িরই কোনো না কোনো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেকটি সংসারই এক একটা উপন্যাসের মতন। অন্যরকম চরিত্র, অন্যরকম কাহিনী। এ পর্যন্ত আমার কম তো দেখা হলো না!

৮

কথা নেই, বার্তা নেই হঠাৎ এক একদিন মনে হয় আত্মহত্যা করলে কেমন হয়? বেশ টুপ্‌স করে মরে যাব, কেউ জানতেও পারবে না। মৃত্যুর ওপারে একটা দেশ আছে, অচেনা রহস্যময়, সেখানে শুরু হবে নতুন জীবন। সেখানে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই, টাকাপয়সা নেই, আর সেইজন্যই সেখানে মানুষের প্রতি মানুষের বঞ্চনার কিংবা শোষণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

অবশ্য, মৃত্যুর ওপারের দেশটির চেয়েও বেশি আগ্রহ থেকে যায় এই ফেলে যাওয়া জীবনটি সম্পর্কে। আমি মরে গেলেও কেউ কি আমায় মনে রাখবে? মা-বাবা দুঃখ পাবেন, সে তো জানা কথাই, তা ছাড়া আর কারুর মনে কি একটুও জায়গা থাকবে আমার জন্য? খুব দেখতে ইচ্ছে করে। মৃত্যুর পর কায়াহীন অদৃশ্য হয়ে ফিরে আসব বন্ধুদের পাশে, নিঃশব্দে দাঁড়াব, আর রানীর কাছে, নিরালা ঘরে রানীর একেবারে সামনে, ও জানতেও পারবে না, আমি উৎকর্ণ হয়ে থাকব, বুঝতে পারব ওর দীর্ঘশ্বাসের ভাষা...যদি দীর্ঘশ্বাস ফেলে! আর যদি দেখি, আমি একেবারে মুছে গেছি? মুছে যাবারই মতন, মানুষ তো আমি, কী করেছি এই একুশ বছরের জীবনে যে অন্যরা মনে রাখবে?

আরও কম বয়েসে খুব ইচ্ছে হতো বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে। কোথায় যাব ঠিক নেই, যে কোনো নিরুদ্দেশে। তখন অন্য কোনো চিন্তা ছিল না, পাহাড় বা অরণ্য বা সমুদ্রের ধারে আমার কাল্পনিক কুটিরে আমার বাড়ি থেকে পালানো জীবনের পরম সুখের ছবি দেখতুম। কলেজ-জীবন শেষ করার পর কঠোর বাস্তবকে চিনতে শিখেছি। বাড়ি ছেড়ে বিনা উদ্দেশে চলে গেলে যেখানেই যাব, সেখানে কোনো না কোনো উপায়ে টাকাপয়সা রোজগার করতে হবে। নইলে এ পৃথিবী টিকতে দেবে না। শুধু বনের ফলমূল খেয়ে বেচে থাকার মতন বন আর অবশিষ্ট নেই কোথাও। কেন নেই? মানুষ আর স্বাধীন নয় কেন?

শৈশব বয়েস পার হবার পর যেদিন প্রথম আমরা টাকাপয়সার হিসেবটা বুঝতে শিখি সেইদিন থেকেই স্বর্গের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

দুপুরবেলা কিছুতেই বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না। গোটা পাড়া জুড়ে এখন মেয়েমহল, আমিই যেন একমাত্র পুরুষ। এই চিন্তাটার জন্যই দুপুরবেলা বিছানাটাও আমার কাছে মনে হয় শরশয্যা। একটা চাকরির ইন্টারভিউয়ের নাম করে মায়ের কাছ থেকে দুটো টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

যাওয়ার সময় উৎসুকভাবে নাড়াচাড়া করে গেলুম লেটার বক্সটা। আমার নামে কোনো চিঠি আসার সম্ভাবনা নেই। বাবা মাঝে মাঝে বলেন আজকের কাগজ

দেখেছিস? একটা ভালো পোস্টের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছে। অ্যাপ্লাই করে দে না!

আমি তক্ষুনি রাজি হয়ে যাই। অনেক সময় দরখাস্ত লেখার ভান করি, পুরনো টাইপ রাইটারটা নিয়ে খটাখট করি পর্যন্ত তবু আজ অবধি একটাও দরখাস্ত ডাকে দিইনি। এদেশে লক্ষ লক্ষ বেকার ছেলে কোনোক্রমে একটা চাকরি পাবার জন্য হন্যে হয়ে আছে, তাদের দলে যোগ দেবার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। কলকাতা শহরে আমিই একমাত্র বেকার এবং গরিব বাড়ির ছেলে, যে কোনো চাকরি চায় না, শুধু এই অহঙ্কারটুকুই আমার মনকে চাঙ্গা রাখে।

যে সব বন্ধুবান্ধবরা চাকরি পেয়েছে, তাদের অফিসে দুপুরবেলা দেখা করাটা ভালো দেখায় না। প্রথম প্রথম কয়েকবার গিয়েছিলাম। কিন্তু বন্ধুদের অন্যান্য সহকর্মীদেব তাকানো দেখে মনে হয়, তারা ভাবছে, এই বেকার ছেলেটা রোজ দুপুরে বন্ধুকে জক দিয়ে টিফিন খেতে আসে।

তবু কোথাও তো যেতে হবে! একা একা সিনেমায় যাওয়া যায় না। একা কফি হাউসে গিয়ে বসলে অনা টেবিলেব ছেলেমেয়েরা, এমনকি বেয়ারারাও মনে করবে, এই রে—এ ছেলেটাকে সবাই ত্যাগ করেছে নিশ্চয়ই। অন্যদিন দেখেছি, চোদ্দ পনেরো জনের সঙ্গে মিলে গলা ফাটায় আজ সে মক্কেল একা ভিজে বেড়ালটি হয়ে বসে আছে কেন?

তিন চারমাস উৎপলের অফিসে যাইনি, আজ যাওয়া যেতে পারে একবার। একজন কারুকে সঙ্গে পেলে গ্লানি কেটে যায়, তখন দুজনে মিলে অন্যদের অফিস-টফিসে হানা দেওয়া খুবই সহজ।

উৎপলের চেয়ার খালি, ওর পাশের টেবিলে বসে পরমেশ নামে একজন, তার সঙ্গেও আমার মুখ চেনা। আমাকে দেখেই পরমেশ বলল, উৎপলবাবু তো রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গেছেন, কখন ফিরবেন বলা যায় না। আপনি আপনার বন্ধুর গুড নিউজ শোনেননি?

—গুড নিউজ?

—হ্যাঁ। কোম্পানি তো উৎপলবাবুকে বিলেত পাঠাচ্ছে?

—তাই নাকি? বাঃ।

—অবশ্য উনি চিঠিটা কালই পেয়েছেন, যেতে হবে খুব শিগগিরই...সেইজন্য পাসপোর্ট, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনেক ঝামেলা।

—দারুণ ব্যাপার! উৎপল আমাদের আগে কিছুই জানায়নি!

—ঐ যে বললুম, কালকেই পাকা চিঠি পেয়েছেন।

আমার আপত্তি সত্ত্বেও পরমেশবাবু আমায় চা না খাইয়ে ছাড়লেন না।

আমার ইচ্ছে করছিল, এক্ষুনি উৎপলকে খুঁজে বার করে দুজনে মিলে খুব আনন্দ করি। আমাদেব বন্ধুদের একজন বিলেত যাচ্ছে, এ তো আমাদের সকলেব মিলে যাওয়াব মতনই। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্কের নাম শুনলেই ভয় হয়। ওখানে কে খুঁজতে যাবে উৎপলকে!

আশু ভাস্কররা কি এ খবর জানে? ওদের জানানোও কি আমার কর্তব্য নয়? কিংবা, এমনও হতে পাবে, ওদের প্রত্যেকের অফিসেই ফোন আছে, সেই সূত্রে ওদের জানাজানি হয়ে গেছে। দু-দিন আমার সঙ্গে দেখা হয়নি বলে আমি ছন্নছাড়া।

মিশন রো থেকে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলুম কলেজ স্ট্রীটে। আর কোথাও যাবার জায়গা না থাকলে এখানেই আসতে হয ঘুরে-ফিরে। এটাই আমাব নিজস্ব জায়গা, এখানকার প্রতিটি গাছ আমায চেনে। কফি হাউসে না গিয়ে চলে গেলুম ইন্দ্রনাথের বইয়ের দোকানে। ইন্দ্রনাথও নেই, বেবিয়েছে, ঠিক নেই কখন ফিববে। এক একদিন হয় এবকম যাকে যাকে খোঁজ কবা হবে, তাদেব কারুকেই পাওয়া যাবে না। সকালবেলা একজন অপমান কবলে তাবপর সারাদিন ধবেই কেউ না কেউ অপমান কবে যাবে।

রাস্তায় নেমে এলুম আবাব। এবাব?

একটি সিগারেট কিনে সন্তর্পণে ধবালুম। শেষ টান পর্যন্ত মৌজ বজায বাখতে হবে।

সামনেব মঙ্গলবাব আমি বাইশ বছবে পা দিচ্ছি। পরের বছরটাও কি এরকম ভাবেই কাটবে? তার পবের বছর? নাঃ, তা হতেই পারে না। হঠাৎ একটা কিছু ঘটে যাবে। বৃষ্টি নামবার অনেক আগেই যেমন পিঁপড়েরা টের পেয়ে যায়, সেইবকমই আমি যেন সাবা শরীর দিয়ে অনুভব কবছি একটা বিরাট কিছু ঘটবে, একটা বিরাট কিছু।

উৎপল বিলেত যাচ্ছে, আব আমি! সারা পৃথিবীটা আমার দু পায়ের ছোঁয়া পাবে না, তা কি হয? রাশিয়ার ভলগোগার্ড শহরে যে বিশাল নারী-মূর্তিটি, সে কি অপেক্ষা করে নেই আমার এক ঝলক দৃষ্টির জন্য? প্যারিসে নেপোলিয়নেব সমাধি? রাইন নদীর দু পাশের অরণ্য? যাব যাব, ঠিকই যাব, এত ব্যস্ততার কী আছে?...

—আজ কী বার? শুক্রবার না? আজ রানীর অফ ডে, কাল শেষ পরীক্ষা। রবিবারই ওরা চলে যাবে মধুপুরে। এর মধ্যে রানীর সঙ্গে আর দেখা হবে না? একথা মনে আসামাত্র ছুটে গিয়ে উঠে পড়লুম চলন্ত ট্রামে।

প্রায় তিনটে বাজে। এখন ওদের বাড়িতে গিয়ে সুরঞ্জনকে ডাকা যায় না।

রানী নির্ঘাত পড়ার ঘরে আছে। ওদের বাড়ির সদর দরজা খোলা থাকে না। দরজায় বেল দিয়েই অন্য কেউ খুলবে, কিংবা ওপরে বারান্দা থেকে কেউ উঁকি মারবে। আমাকে দেখেই বলে দেবে, সুরঞ্জন বাড়ি নেই! আমি যদি বলি সুরঞ্জন নয়, আমি রানীর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি তা হলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?...

...তবু আমি দরজার কাছে যাই না। পড়ার ঘরের ডান দিকের জানলাটা খোলা, তার পাশে একটা সরু গলি, সেখানে গিয়ে আমি জানলার শিক ধরে দাঁড়ালুম। যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই, দেয়ালের দিকে মুখ করে পড়ছে রানী। গভীর মনোযোগের সময় ও একটু একটু দোলে, পিঠের ওপর এলোচুল, অগোছালো শাড়ি, টেবিলের ওপর এক গাদা বইখাতা ছড়ানো। শেষ পরীক্ষার আগের দিন রানী যেন জীবন-মরণ পণ করে পড়ছে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখতেই আমার ভালো লাগল। কোনো মানুষ যখন একা তন্ময় হয়ে থাকে, তখন তার আর একরকম রূপ খুলে যায়। আমি দেখলুম রানী এক পায়ের পাতা ঘষছে অন্য পায়ে, বাঁ হাতের তালুতে চিবুক, ডান হাতে একটা খোলা কলম, রানীর পিঠটা যে এত চওড়া তা তো আগে কখনো লক্ষ্য করিনি। কোমরটা অত সরু...এই মেয়েটি কি আমার?

—রানী।

—কে?

প্রথমে চমকে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েই রানীর দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল, সেখানে আর কোনো বিস্ময়ের ছাপ নেই। চেয়ে রইলো তো চেয়েই রইলো। আমারও পলক পড়ছে না। যেন আমরা স্ট্যাচু স্ট্যাচু খেলা খেলছি। কয়েক লক্ষ বছর পার হয়ে গেল এর মধ্যে। মধ্য এশিয়ার তৃণভূমিতে একজন মানুষ আর একজন মানুষীর দিকে এইভাবে প্রথম চেয়েছিল।

—তোমাকে একটু ডিসটার্ব করতে এলুম।

রানী চেয়ারের পিঠের দিকে ফিরে বসলো। তারপর আস্তে আস্তে, প্রতিটি শব্দে জোর দিয়ে বলল, তুমি যদি আজ না আসতে তাহলে জীবনে কোনোদিন আর তোমার সঙ্গে কথা বলতুম না।

—আমি যে আসবো, তাতে তোমার কোনো সন্দেহ ছিল নাকি?

—এর মধ্যে কেন একদিনও আসনি? জান তোমার জন্য আমার ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রির পেপারটা খারাপ হয়ে গেছে?

—আমার জন্য?

—নিশ্চয়! তোমার জন্যই তো। ঐ একটা বাজে ছেলের জন্য ভেবে ভেবে

শুধু শুধু আমার সময় নষ্ট, যদিও তার কিছুই আসে যায় না।

—তা তো বটেই! আমি কারুর জন্য ভাবি না! কারুর জন্য আমার মন কেমন করে না।

—তোমার কত বন্ধুবান্ধব, সর্বক্ষণ আড্ডা, তুমি তো বেশ মজাতেই আছো!

—তোমরা এই রবিবারই মধুপুর যাচ্ছ তো?

—হ্যাঁ।

—তোমরা কোন বাড়িতে উঠবে? ধরো যদি আমি হঠাৎ মধুপুরে হাজির হয়ে যাই? এমনিই রাস্তায় হাটতে হাটতে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে।

—সে সাহস তোমার হবে না আমি জানি। তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? বাড়ির ভেতরে এসো।

—কে দরজা খুলবে?

—আমি।

—তারপর আমি তোমার ঘরে গিয়ে বসবো, কেউ যদি দেখে ফেলে কী ভাববে? তোমার পরীক্ষার সময় দুপুরবেলা আমি তোমার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে তোমার সময় নষ্ট করছি।

—কে কী ভাববে এই চিন্তাতেই তোমার সবটা সময় কেটে যায়, তাই না?

—তোমার কাকা কী রকম ভাবে যেন তাকান, আমার খুব লজ্জা করে।

—আমার কাকা কোনোদিন কারুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন না। আসবে কি না বলো।

—না, থাক আজ থাক।

—তবে থাকো ঐখানে দাঁড়িয়ে।

—রানী, একবারটি উঠে আমার কাছে এসো।

—কেন?

—এমনিই!

—মোটেই না। তুমি বড্ড অসভ্য। সেদিন তুমি কী করলে বলো তো? ইস!

—না, ওসব কিছু করব না। একবার শুধু কাছে এসো।

—কেন কাছে গেলে কী হবে?

—শুধু তোমাকে একটু ছুঁয়ে দেব। শোনো শোনো, এমনি এমনি নয়, ছুঁয়ে দিলে কী হবে জানো তো, আমার ইচ্ছে শক্তিটা তোমার শরীরে চলে যাবে, দুজনের ইচ্ছে শক্তি মিলিয়ে তোমার রেজাল্ট অনেক ভালো হবে।

রানী কুলকুল করে হেসে ফেলল।

—তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? ফ্রয়েড লিখেছেন এরকম হয়।

—ফ্রয়েড লিখেছেন না ছাই লিখেছেন! গুল চালাবার আর জায়গা পাওনি?

—পরীক্ষা করে দেখো অন্তত। একবার পরীক্ষা করতে দোষ কী?

—ওরকম রাস্তার ধারের জানলায় গিয়ে কথা বলতে আমার ভালো লাগে না। বলছি না ভেতরে এসো!

—তুমি যদি সায়েন্সের বদলে আর্টস পড়তে তাহলে তোমাকে আমি বেশ পড়াতে পারতুম পরীক্ষার আগে।

—তোমার কাছে পড়তে আমার বয়েই যেত।

—একবারটি কাছে আসবে না?

যেন খুব অনিচ্ছাসত্ত্বে রানী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর জানলাটা থেকে দু' ফুট দূর পর্যন্ত এসে ডান হাতটা বাড়িয়ে বলল, এই যে, দাও, ছুঁয়ে দাও!

রানীর হাতটা আলতোভাবে ছুঁয়ে আমি জপ করার ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলুম। তারপরই একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে ওকে নিয়ে এলুম একেবারে জানলার গরাদের ওপর। অন্য হাত দিয়ে ওর কোমর বেষ্টন করে আমি ওর ঘ্রাণ নিতে লাগলুম পাগলের মতন।

কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র, তার মধ্যেই রানী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। আমি তো নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছি না, রানীর সারা মুখে লালচে আভা।

—এই জন্যই তোমাকে একদম বিশ্বাস করি না, অসভ্য কোথাকার, ইস তুমি এমন...

—প্লিজ রানী, কিছু মনে করো না, হঠাৎ কী রকম যেন মাথাটা খারাপ হয়ে গেল—

—তোমার তো সবসময়ই মাথা খারাপ।

—কিন্তু আমি আমার ইচ্ছে শক্তি তোমার শরীরে পাঠিয়ে দিয়েছি ঠিকই। তোমার এখন একটু অন্যরকম লাগছে না?

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে রানী আমার দিকে এমন অদ্ভুত চোখে তাকাল, যার আমি কোনো মানেই বুঝতে পারলুম না।

আসলে আমার চিন্তাশক্তিটাও অন্য দিকে প্রবল হয়ে উঠেছে। একটা স্ফুলিঙ্গ থেকেই দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। রানীকে একবার ছোঁয়ার পর আবার সমস্ত ইচ্ছা শক্তি চাইছে সর্বাঙ্গ দিয়ে ওকে আবার ছুঁতে। রানী কতবার চিঠিতে লিখেছে, আমি তোমার, তাহলে ঐ ঠোঁট ঐ বুক, চাঁদের মতন নাভি কেন আমি ছুঁতে পারব না?

—রানী, আর একবার কাছে এসো, প্লিজ।

—এবার কিন্তু তোমায় মারব বলে দিচ্ছি।

—আমি ভিক্ষে চাইছি।

—আমি ভিক্ষে দিই না।

—এই যে জানলার শিক, এ ঠিক জেলখানার গরাদ মনে হচ্ছে না? যেন আমরা জেলের দুটো খুপরিতে বন্দী, কেউ কারুর কাছে আসতে পারব না।

—আমি কেন বন্দী হবো? আমি ইচ্ছে করলেই এ ঘর থেকে বেরুতে পারি। তুমিই শুধু আসতে পার না।

—এখন আসব? দরজা খুলে দাও।

—না, থাক। আজ আর আসতে হবে না। এসে তুমি আবার অসভ্যতা করবে তো? কাল আমার পরীক্ষা, সব কিছু গুলিয়ে দিতেই তোমার আনন্দ।

—রানী, আজ এখনো আমার কাছে চাইলে না যে!

নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে রানী হাত বাড়িয়ে বলল, দাও!

আমার কাছে তো সব সময়ই থাকে, পকেট থেকে বার করে দিলুম রানীর জন্য চিঠি। সেটা একটু খুলে দেখে নিয়ে রানী বলল, তুমি বুঝি ভেবেছ, আমার নেই?

ফিরে গিয়ে টেবিলের দেরাজ খুলে একটা খাতার পৃষ্ঠা ছিঁড়ে রানী সেটা অনেকগুলো ভাঁজ করে ছুঁড়ে দিল আমার দিকে। সেটা ঠিক সময় লুফে না নিলে রাস্তায় পড়ে যেত।

—এরকমভাবে চিঠি দিলে আমি নিই না!

—কী রকমভাবে দিতে হবে মহারাজকে?

—হাতে হাতে।

—ইস্। তোমাকে আবার আমি বিশ্বাস করি আর কি।

—কথায় বলে তুমি ভিখিরিকে পয়সা ছুঁড়ে দেবার মতন...আমি কক্ষনো এভাবে নিতে চাই না।

—বললুম যে, আমি কখনো ভিক্ষে দিই না। তুমি নিজের অধিকারে আমার ঘরে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে চাইতে পারনি? চিঠি নিতে না চাও, ফেরত দাও!

—রানী, শোনো...

আর কোনো কথা বলা হলো না। একটা শব্দ হতেই আমি পেছন ফিরে তাকালুম।

গলিটার মুখে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে চারটে ছেলে। কোমরে হাত। দেখলেই বোঝা যায় এরা কী ধরনের। যে ছেলেটি একটু বয়েসে বড়ো তার ঠোঁটে ডগলাসি

গোঁফ, সে চোখটা বেঁকিয়ে গান ধরলো, যমুনা কি—তীর! আর একজন বলল, পৃথিবী আমারে চায়, রেখো না বেঁধে আমার একটা হাত ধরে বললে, কোথায় মেরে যা না, আঁখিয়া মিলানা মিলানা...

বিদ্যুতের মতন চিন্তা তরঙ্গ বয়ে গেল আমার মাথায়। এদের সঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে একটাও কথা বলা বিপজ্জনক। এরা চ্যাঁচামেচি শুরু করবেই। রানী শুধু শুনতে পেলেও ক্ষতি ছিল না, ওপরের বারান্দা থেকে ওদের বাড়ির কেউ উঁকি মারবে। তা হলেই কেলেঙ্কারির একশেষ।

সুরঞ্জন কিংবা ওর কাকাকে পাড়ার এই সব ছেলেরা ভয় পায়। আমাকেও মুখ চেনে নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি ঐ বাড়ির মধ্যে ঢুকিনি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি জানলার ধারে, সেই সুযোগটা নিয়েছে। কতক্ষণ ধরে ওরা আমাদের কথা শুনছে কে জানে আমি একেবারে খেয়ালই করি নি।

তক্ষুনি কোনো কথা না বলে আমি হনহন করে হাঁটতে লাগলুম উল্টো দিকে। ছেলেগুলো ধেয়ে এসে একজন প্রথমে আমার একটা হাত ধরে বললে, কোথায় যাচ্ছ, চাঁদু?

এক ঝটকায় তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমি ছুটলাম। ওরা আমাকে ধরে ফেলবেই জানি। ওদের কাছ থেকে নিস্তার নেই তবু রানীদের বাড়ি থেকে যত দূরে চলে যাওয়া যায়। কোনো রকমে সার্কুলার রোডে পৌঁছে গেলে অনেক লোকজনের মধ্যে ওরা বিশেষ কিছু করতে পারবে না।

সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীটের মাঝামাঝি ওরা ঘিরে ফেলল আমায়।

একজন প্রথমেই আমার বাঁ হাতটা মুচড়ে নিয়ে গেল পিঠের দিকে। এ ছেলেটির খাঁটি গুণ্ডার মতন চেহারা। এর সঙ্গে গায়ের জোরে পারব না।

আমার ডান হাতের মুঠোয় রানীর চিঠি, লুকোবার সুযোগ পাইনি।

—বেপাড়ায় এসে র‍্যালা হচ্ছে অ্যাঁ?

—দুপুরবেলায় একেবারে বৃন্দাবন! হেভি লদকালদকি!

—আমাদের পাড়ায় ওরকম একটা বনেদি বাড়ি, সে বাড়ির মেয়েছেলের সঙ্গে কোথাকার একটা ফালতু।

—এ মালটাকে আগেও কয়েকবার ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি না?

—একেবারে বোবা মেরে গেলে কেন, চাঁদু?

এদের সঙ্গে একটা কথাও বলে লাভ নেই বলে চোয়াল শক্ত করে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। তা ছাড়া, একটু মেজাজ দেখালেই এরা চারজনে মিলে আমার ওপর গায়ের জোর ফলাবে। তার চেয়ে ওরা যত ইচ্ছে বকে যাক।

—নাকে খৎ দেওয়া, যাতে আর কোনোদিন এ পাড়ায় ঢ্যামনামি করতে না আসে।

—হারামির বাচ্চাটা একেবারে মিটমিটে শয়তান, মুখখানা দ্যাখ, মুখখানা দ্যাখ—

—চিঠি, ওর হাতে চিঠিটা আছে।

—দেখি! ভালো চাও তো চিঠিখানা দাও! কাবলিদাকে দেখাবো।

সিদ্ধান্ত নিতে আমার এক মুহূর্তও সময় লাগল না। চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলার উপায় নেই, পকেটে রাখলে কেড়ে নেবে, ছুঁড়ে ফেলে দিলেও তুলে নেবে।

ওরা কিছু বুঝবার আগেই আমি চিঠিখানা মুখে পুরে দিয়ে চিবোতে শুরু করে দিলুম।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা চারজনে মিলে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপরে। লাথি, ঘুষি চড়। প্রতিরোধ করার উপায় নেই, দু হাত দিয়ে আড়াল করে রইলুম মুখটা, যাতে চোখে আঘাত না লাগে। একটুক্ষণের মধ্যেই পড়ে গেলুম মাটিতে।

—এই, আর ঝাড় দিসনি, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে! মেরে ফেলবি নাকি।

অন্য একটা গলার আওয়াজ। তাকিয়ে দেখলুম বাঁ হাতে লোহার বালা পরা অন্য একটা বলশালী ছেলে। একে চিনি আমি, এর নাম সুবীর। ভদ্র পরিবারের বখা ছোকরা। এই সুবীর গত বছরেই রানীর সঙ্গে ভাব করার খুব চেষ্টা করেছিল, দু-একদিন বাড়িতেও গেছে, তারপর সুরঞ্জন বারণ করে দিয়েছে তার বোনের সঙ্গে মেলামেশা করতে। তারপর সুবীরকে দু-এক মাস আগে দেখেছি। সন্ধের পর বাংলা মদ খেয়ে রঙমহল থিয়েটারের সামনে হল্লা করতে।

সুবীর আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর উদারভাবে বলল, যাও খোকা, বাড়ি যাও। অতই যদি রস চাগিয়ে ওঠে, তা হলে নিজের পাড়ায় ভালো যন্তর নেই? বেপাড়ায় কেন?

অন্য ছেলেদের দিকে হাত তুলে বলল, চল চল, যথেষ্ট হাতের সুখ করেছিস—।

আমার শরীরের ক্ষততে যেন নুনের ছিটে লাগছে। সুবীরকে কে বলেছিল আটকাতে? ওরা মারত ওদের যত খুশি, সুবীরের তাতে কী? ঐ সুবীরকে একদিন আমি দেখে নেব।

বুক পকেটটা টেনে ছিড়ে দিয়েছে, নাক দিয়ে পড়ছে রক্ত, ডান কানের পেছন দিকটায় ছুঁচ বেঁধানোর মতন ব্যথা, সারা গায়ে ধুলো। উঠে দাঁড়িয়ে যথা সম্ভব ধুলো ঝেড়ে হাঁটতে লাগলুম সার্কুলার রোডের দিকে। মুখ থেকে থুঃ করে

কাগজের মণ্ডটা ফেলে দিয়ে, রুমাল দিয়ে মুছতে লাগলুম মুখের রক্ত।

রাগ নয়, দুঃখ নয়, অভিমান নয় মনটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। পাড়ার মাস্তান মাত্রই কাপুরুষ হয়। ওদের একা লড়াই করার সাহস নেই। ওদের যে কেউ যদি আমার সঙ্গে একা লড়তে আসত, তা হলে হারজিতের ব্যাপারে কিছু বলার থাকে না। ওরা শিয়াল-কুকুরের মতন এক সঙ্গে দল বেঁধে অন্য একজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি আবার একলাই আসব রানীদের বাড়িতে, সেদিন ঐ ছেলেগুলোকে অনুতাপ করতে হবে।

সার্কুলার রোডের মোড়ে এসে একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। বাড়ি গিয়ে জামাটা পাল্টাতে হবে। তার জন্য এখুনি কোনো ব্যস্ততা নেই, অনেক সময় আছে।

রাস্তার উল্টোদিকের ফুটপাথে ওটা কী? একটা ময়ূরই তো, ময়ূরকণ্ঠী গলা, বিরাট লম্বা পুচ্ছ, রাজেন্দ্রাণীর ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে পা ফেলছে। এপাশ ওপাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মানুষ, কেউ দেখছে না একটা ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে ফুটপাথে?

আমার একটা ময়ূরের পালক দরকার। ময়ূরের গা থেকে কি পালক তুলে নেওয়া যায়। কিংবা যদি আপনিই খসে পড়ে...আমি রাস্তা পেরুবার জন্য পা বাড়াতেই যেন ময়ূরটা টের পেয়ে গেল আমার মনের কথা। একবার এদিকে তাকিয়েই তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে দু'বার ডেকে উঠল ক্যাঁও! ক্যাঁও! তারপরই উড়াল নিল, নতুন শেখা কোনো সাঁতারুর মতন ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে গিয়ে বসলো সাহিত্য পরিষৎ ভবনের ছাদে। আর কেউ ময়রটাকে দেখল না, শুধু আমি একা দেখলুম?

রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে আমি একটা ময়ূরকে দেখেছি, এ বাড়ির ছাদ থেকে অন্য বাড়িতে উড়ে যেতে। রাস্তার ছেলেরা ভিড় করে সেটাকে দেখে। সেটা শোভাবাজার রাজবাড়ির ময়ূর, মাঝে মাঝে বাইরে বেরিয়ে আসে। সেই ময়ূরটাই কি এত দূর চলে এসেছে। কিংবা কলকাতার আকাশে আরও স্বাধীন ময়ূর আছে? সে যাই হোক, এখানে কেউ ময়ূরটাকে গ্রাহ্যই করল না।

যেখানে ময়ূরটা ছিল, সেখানে একটি লোক দূর থেকে হেঁটে আসতে আসতে থমকে দাঁড়াল। সাদা প্যান্ট আব সাদা হাফ শার্ট পরা, মাথার বড় বড় চুল এলোমেলো, কিছু যেন মনে করার চেষ্টা করছে লোকটি। খুব চেনা চেনা লাগছে, কোথায় যেন দেখেছি একে? তিরিশ একত্রিশ বছর বয়েস...ও, এই তো কয়েকদিন আগে দেখেছিলাম, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের বাইরে একটা রেলিং-এ ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। একে ঠিক আমার মতন দেখতে।

শরীরটা শিরশির করে উঠল। আমার মতন দেখতে একজন মানুষ... এই দুপুরবেলা ও এখানে কী করছে? লোকটা কি একা একা সারা শহর ঘুরে বেড়ায়?

লোকটি এদিকে তাকাল...আমাকেই খুঁজছে নাকি? আমি চট করে মুখটা ফিরিয়ে নিলুম। আমি ওকে দেখা দিতে চাই না, বিশেষত এই অবস্থায়...ওর পরিষ্কার জামা-প্যান্ট...আমার বুক পকেট নেই।

পর পর দুটি ট্রাম দু'দিক দিয়ে চলে যাবার পর দেখলুম, সেই লোকটি আর নেই সেখানে, কিছুটা দূরে দেখতে পাচ্ছি ওর পিঠ। যেদিক দিয়ে এসেছিল, সেই দিকেই ফিরে যাচ্ছে।

...ঠিক সামনের বাস স্টপেই একটা বাস থেকে নামলেন নিখিলদা। আমার আগে উনিই দেখতে পেলেন আমায়।

—আরে, নীলু, তোকেই তো খুঁজছি! তুই এর মধ্যে একদিন আমার বাড়িতে গিয়েছিলি?

—নিখিলদা? আপনি জেল থেকে ছাড়া পেলেন কবে?

—এই তো পরশু! তুই এখানে একলা দাঁড়িয়ে আছিস যে?

—এমনিই। বোধহয় আপনার সঙ্গে দেখা হবে বলেই।

নিখিলদা একবার সাবধানে এদিক ওদিক তাকালেন। আমার মাথার চুল এলোমেলো, জামা ছেঁড়া, মুখে রক্তের অস্পষ্ট দাগ, এসব উনি লক্ষ্যই করলেন না।

—এখানে ঠিক কথা বলা যাবে না। তুই আমার সঙ্গে একবার যেতে পারবি? এক্ষুনি?

—হ্যাঁ। কোথায়?

—আমি এদিকে এসেছিলাম পরেশনাথের মন্দিরের কাছে একজনের সঙ্গে দেখা করবার জন্য—থাক, সেখানে আর যাব না এখন, তুই চল আমার সঙ্গে।

একটা চলন্ত ট্যাক্সি হাত তুলে থামিয়ে নিখিলদা বললেন, ওঠ।

কোনো দ্বিধা না করে আমি উঠে পড়লুম নিখিলদার সঙ্গে ট্যাক্সিতে। সন্ধেবেলা যদি টিউশানি না যাওয়া হয়, যাব না! নিখিলদাকেই আমার সবচেয়ে বেশি দরকার।

ট্যাক্সিতে উঠে নিখিলদা একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, তুই ধরেছিস নাকি? তা হলে খেতে পারিস আমার সামনে, লজ্জার কিছু নেই—

সত্যিই এসময় একটা সিগারেট আমার খুবই দরকার। নিখিলদার প্যাকেট থেকেই একটা নিয়ে ধরালুম। নিখিলদাকে আগে কখনো সিগারেট খেতে দেখিনি

আমি। বোধহয় জেলে গিয়ে এই অভ্যাসটি হয়েছে। জেলে তো সময় কাটানোই বিরাট সমস্যা।

—নিখিলদা, সুদীপাদি কি...

—হ্যাঁ, সুদীপা চেকোস্লোভাকিয়া গেছে, তিন বছরের আগে ফিরবে না।

—নিখিলদা, আপনি হঠাৎ জেলে...

নিখিলদা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারায় বললেন, চুপ। ট্যাক্সির ড্রাইভার আর তার পাশে একজন সঙ্গী বসে আছে। ওদের শুনিয়ে নিখিলদা কিছু আলোচনা করতে চান না।

ট্যাক্সিটা দক্ষিণেশ্বরে আসবার পর একটা চায়ের দোকানের সামনে নিখিলদা সেটা থামাতে বললেন। পকেট থেকে এক গোছা টাকা বার করে মিটিয়ে দিলেন ভাড়া। তারপর বললেন, সামনে এই যে বাগানবাড়িটা দেখছিস, এর গেট দিয়ে না ঢুকে বাঁ পাশের পাঁচিলের ধার দিয়ে হেঁটে যা। পাঁচিলটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবি।

নিখিলদা হাঁটতে লাগলেন উল্টোদিকে।

ওর নির্দেশ মতন সেই পাঁচিলটার শেষ প্রান্তে গিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম চুপ করে। বাড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে, তার পেছনে অনেকখানি বিস্তৃত ফাঁকা জমি।

—এই নীলু, নীলু, এদিকে আয়!

তাকিয়ে দেখলুম, বাড়িটার দোতলার একটা ঘরের জানলা থেকে নিখিলদা হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। বাড়িটা অনেক কালের পুরনো। পেছন দিকে মেথরদের যাওয়ার সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলুম দোতলায়। রীতিমতন ভাঙাচুরো অবস্থা বাড়িটার, অনেক জায়গার দেয়ালের প্লাস্টার খসে পড়েছে, ছাদেরও কিছুটা অংশ ফাঁকা, বড় বড় বট-অশ্বত্থ গাছ গজিয়ে আছে এখানে ওখানে। এর মধ্যে সাপ-খোপ থাকাও বিচিত্র কিছু নয়।

নিখিলদা যে-ঘরটায় রয়েছেন, সেখানে একটা মাদুর ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই। পাশে আর একটা দরজা-খোলা ঘর। বোঝা যায় সেটা বাথরুম।

মাদুরে বসলুম নিখিলদার সঙ্গে। এই পরিবেশ দেখে আমার শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছে। এবার তা হলে নিখিলদা সত্যিই কিছু বড় ব্যাপার করতে চলেছেন।

নিখিলদা বললেন, নীলু, তুই সেই বলেছিলি না পৃথিবীটা বদলাবার কথা? মনে আছে? এবার আমরা সেই কাজে নেমে পড়েছি। আর শুধু বক্তৃতা কিংবা

ধর্মঘট নয়। কিন্তু তোকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি তো?

—নিশ্চয়ই নিখিলদা...

—আমরা যে দল গড়েছি তার মধ্যে যদি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে, তার আমরা জিভ কেটে নিই। এর মধ্যেই একজনের জিভ কেটে নেওয়া হয়েছে।

—আমায় যা খুশি শাস্তি দেবেন, কিন্তু কোনোদিন তার দরকার হবে না। আমি হয়তো কাজে ভুল করতে পারি, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করব না কোনোদিন।

—তোর মতন ছেলেই আমাদের দরকার। আমরা সারা দেশে বিপ্লব ছড়িয়ে দিতে চাই...সশস্ত্র বিপ্লব, এ জন্য তোকে আমাকে সবাইকে হাতিয়ার ধরতে হবে...যতদিন না কাজ শেষ হয়, ততদিন বাড়ির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখা চলবে না। তুই পারবি?

—নিশ্চয়ই!

—বোস, আমাদের দলের অনেকেই আসবে খানিক পরে। তোব সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। কয়েকজনকে তুই চিনিস। আর কয়েকজনকে দেখে তুই অবাক হয়ে যাবি।

—আমরা কি কলকাতার কাছাকাছি থাকব?

—না-না, বললুম না, ছড়িয়ে পড়তে হবে সারা দেশে। তোকে আমি পাঠাব পাহাড়ি এলাকায়—

—আমি এক্ষুনি যেতে রাজি আছি।

—জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে, তৈরি থাকতে হবে যে মৃত্যু আসতে পারে যে-কোনো সময়...শাসকশ্রেণীর পুলিশ বা মিলিটারির হাতে আমরা কেউ কোনোদিন ধরা দেব না...সেই জন্যই জীবনের ওপর কোনো মায়া থাকলে...

—আমার জীবনের কী দাম আছে নিখিলদা? তবু যদি পৃথিবীটা বদলাবার জন্য কিছুটা কাজ অন্তত করে যেতে পারি...

—পৃথিবীর কথা যাক, আপাতত আমরা নিজেদের দেশটার কথা ভাবছি।

—সুদীপাদি এই সময় বিদেশে চলে গেলেন?

—নীলু, সুদীপা সম্পর্কে আর একটা কথাও তুই জিজ্ঞেস করতে পারবি না আমায়। মনে থাকবে?

—আচ্ছা নিখিলদা—

হঠাৎ উঠে পাশের বাথরুমটায় চলে গেলেন নিখিলদা। সিস্টার্নের ঢাকনাটা সরিয়ে তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কী যেন একটা বার করে আনলেন। আবার ফিরে

এসে হাতটা মেলে বললেন, এ জিনিস কখনো হাতে নিয়ে দেখেছিস?

একটা রিভলবার!

আমি মন্ত্রচালিতের মতন রিভলবারটা তুলে নিলাম নিজের হাতে। নিখিলদা জানলাটার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, সাবধান, দেখিস ওটা লোড করা আছে কিন্তু —এদিকে আয়, তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি—

নিখিলদা শিখিয়ে দিলেন কী ভাবে রিভলবার চালাতে হয়। তারপর বললেন, ঐ তালগাছের মাথা টিপ করে গুলি চালা তো, দেখি, পারিস কিনা?

—শব্দ হবে যে, লোকেরা শুনতে পাবে?

—দূরে একটা কারখানার দড়াম দড়াম আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিস না? ঐ জন্যই কেউ লক্ষ্য করবে না, এই তো এই জায়গাটার সুবিধে। নে, চোখ বুজে দেখে নে।

উত্তেজনায় আমার শরীর কাঁপছে। কোনোদিন রিভলবার ছুঁয়ে দেখিনি। মনে মনে অবশ্য অনেকবার চালিয়েছি ডিসুম ডিসুম করে। সেই ছেলেবেলা থেকে। তালগাছের মাথাটার দিকে আমার স্থির দৃষ্টি।

নিখিলদা আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, তোকে বললুম না। দু-একজনকে দেখে তুই চমকে যাবি? তোর বন্ধু সুরঞ্জন, তার বোন রানী আমাদের গোপন দলে যোগ দিয়েছে।

—অ্যাঁ?

এমনই চমকে গিয়েছিলুম যে রিভলবারের নলটা ঘুরে চলে এসেছিল আমার বুকের দিকে। নিখিলদা ধরে ফেলে বললেন, কী করছিস, মরবি নাকি! সেসব কথা তোকে পরে বলব। এখন চালা তো গুলি, ঐ দিকে, ঐ যে তালগাছের মাথাটা—

আমি আবার রিভলবারটা শক্ত করে ধরে টিপ ঠিক করলুম। তারপর ট্রিগার টেপার আগের মুহূর্তে বললুম, কিন্তু ঐ গাছটার ডগায় যে একটা বড় পাখি বসে আছে...পাখি তো নয়, একটা ময়ূর!

নিখিলদা বললেন, ময়ূর? কই? দুর পাগল, ওটা তো একটা শকুন!

কিন্তু আমি যে স্পষ্ট দেখছি ময়ূর। এ কি সেই সার্কুলার রোডের ময়ূরটা, এত দূরে উড়ে এসেছে? ও কি চায়?

—কই, মার!

—নিখিলদা, একটা ময়ূরকে মারব শুধু শুধু?

—বলছি না, ময়ূর নয়, শকুন! মনে কর, ঐ শকুনটাই শ্রেণীশত্রু, দেখি কেমন মারতে পারিস—

গুড়ুম!...

একটা লরির টায়ার ফেটেছে। শব্দ একই রকম।

আমি দাঁড়িয়ে আছি রানীর পড়বার ঘরের ডান দিকের জানলার বাইরের গলিতে। রানী ঘরে নেই। টেবিলে বই-পত্র ছড়ানো, একটা কলম খোলা। একটু পরেই রানী আসবে নিশ্চয়ই!

রাস্তা একেবারে ফাঁকা, আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই মনে হয়। পড়ার ঘরটা রানীর প্রতীক্ষায় কাঁপছে, আমার মতন। রানী আসবে, একটু বাদেই এসে পড়বে।

এখন দুপুর তিনটে, শুক্রবার। সামনের মঙ্গলবার আমি বাইশ বছর বয়েসে পা দেব। তখন এসব কিছুই বদলে যাবে। বদলে যেতে বাধ্য।

পাঁচরকম ভূমিকায়

সাধনা মুখোপাধ্যায় ও পবিত্র মুখোপাধ্যায়কে

দারোয়ান আমাকে চেনে। যদিও নমস্কার জানাবার কিংবা সামান্য হাসি মুখ দেখাবারও যোগ্য মনে করে না। মৃত কাৎলা মাছের মতন চোখ করে শুধু চেয়ে থাকে। আমার ধারণা, যদুলালের চোখে ছানি পড়েছে। বয়েসে সত্তর-পঁচাত্তর তো হবেই। রোগা হয়ে গেছে খুব, শুধু ঝোলা-গোঁফ ও ছেঁড়া খাঁকি জামাটায় ওর দারোয়ানত্বের সামান্য প্রমাণ টিকে আছে।

চেহারা নষ্ট হয়ে গেলেও বেশ একটা ব্যক্তিত্ব আছে যদুলালের। সেইজন্য খানিকটা কৈফিয়তের সুরে আমি বললুম, বড়া মাইজী হামকো বোলায়া—।

যদুলাল অবহেলার সঙ্গে ডান হাতের পাঞ্জাটা নেড়ে বলল, যায়েন! যায়েন!

তারপর টুলে বসে বসে আবার সে ঝিমুতে লাগল।

লোহার গেটটা প্রায় থাকা না থাকার সমান, তবু আছে। লোহার রডগুলোর ওপর দিকটায় যে বর্শা বর্শা করা ছিল, তার একটাও আস্ত নেই।

গেটের দু'পাশে যে খানিকটা ফাঁকা জায়গা ছিল এককালে, এখানে সেখানে দুটি দোকান ঘর। সেই দোকানের মালিকরা যখন তখন ভেতরে ঢুকে আসে, দারোয়ানদের বাথরুম ব্যবহার করে।

অর্ধচন্দ্রের আকারে চওড়া চার ধাপ শ্বেত পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের ঢাকা বারান্দায়। এই সিঁড়ির দু'পাশে বেশ বড় সিংহ। দু'জনেই অন্ধ, আর একটাও দাঁত নেই। আমার বেশ মনে আছে, ছেলেবেলায় আমি ঐ সিংহ দুটির চকচকে কাঁচের গুলির মতন চোখ দেখেছি।

এই ঢাকা বারান্দাটায় এক সময় গোল করে সাজানো থাকত নানা রকমের ফুলের টব। এখন একটাও নেই। এখন অন্তত জনা তিরিশেক মজুর শ্রেণীর লোক এখানে রাত্তিরে এসে শোয়। বিনা পয়সায় নয় অবশ্য। প্রত্যেকের কাছ থেকে যদুলাল মাসিক আট টাকা হিসেবে ভাড়া নেয়।

বারান্দায় দু' দিকে দুটো বৈঠকখানা ছিল; একটিতে টেবিল চেয়ার, অন্যটিতে তাকিয়া-ফরাস। এখন দুটি ঘরই ভাড়া দেওয়া হয়েছে রেশান অফিসকে।

মাঝখানে অন্দর মহলে ঢোকার দরজা, সেটি এখন হাট করে খোলা। ভেতরে আর একটি লম্বা বারান্দা, পাশে উঠোন। এই উঠোনের পাশেও দু'-তিনটে ঘর, আগে বোধহয় এমনি পড়ে থাকত, এখন ঝি-চাকরেরা থাকে। এখানেও কিছু

গোপন ভাড়ার বন্দোবস্ত আছে বলে মনে হয়।

উঠোনের শেষে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। এ সিঁড়িও শ্বেত পাথরের। তবে যেখানে যেখানে আগেকার মার্বেল-চৌকো উঠে গেছে, সেখানে সেখানে এখন লাল রঙের সিমেন্ট করা। সেই সব জায়গাগুলোকে ঠিক দগদগে ক্ষতের মতন দেখায়। দেয়ালে নীল রঙের ডিসটেম্পার, অনেক দিন থেকেই তা এখানে সেখানে ফুলে উঠে ঝুরঝুর করে খসে পড়ছে।

দোতলায় উঠবার মুখে একটা লোহার গেট। এ বাঁড়িতে সম্ভবত এখন এটাই সবচেয়ে মজবুত জিনিস। এবং নতুন। আমি ছেলেবেলায় সিঁড়ির মাথায় এরকম লোহার গেট দেখিনি। গেটটি মিশমিশে কালো রঙ-কবা, দেখলেই বেশ সম্ভ্রম জাগে। তাতে একটা বড় পেতলের তালা লাগানো।

ওপরের বারান্দায় সাদা-কালো পাথরের চৌখুপ্পি কাটা। এরও কয়েকটি ভাঙা, কিন্তু লাল সিমেন্ট দিয়ে মেরামত করা হয়নি, ভাঙা জায়গাগুলোয় ধুলো জমে জমে শক্ত হয়ে আছে।

সিঁড়ির এই লোহার গেটের কাছে দাঁড়ালেই একটা অন্যরকম গন্ধ নাকে আসে। মনে হয় যেন পুরোনো ঘিয়ের গন্ধ, কেমন যেন মুখ ফিরিয়ে নেবার মতন, আবার একটু বাদেই সয়ে যায়।

বারান্দাটায় কেউ নেই, তাই আমি লোহার গেট ধরে ঝাঁকালুম। কারুর নাম ধরে ডেকে কোনো লাভ নেই। এ বাড়ির মানুষেরা কখনো নিজের হাতে গেট খোলে না। একদম কাছাকাছি কেউ বসে থাকলেও গ্রাহ্যই করবে না। যে সব কাজের ভার ঝি-চাকরদের ওপর, তা এরা করবে কেন? এ বাড়ির কেউ কোনোদিন বোধহয় নিজের হাতে এক গেলাস জলও গড়িয়ে খায়নি। হয়তো একমাত্র সরোজদা ছাড়া।

খানিকক্ষণ ঝাঁকাঝাঁকি করবার পর একজন ঘোমটা-দেওয়া দাসী এলো। একটু পাশ ফিরে বেঁকে দাঁড়িয়ে ঘোমটায় এক হাত ছুঁইয়ে ফ্যাস্‌ফেসে গলায় সে জিজ্ঞেস করল, কে?

দাসী তো দূরের কথা, আজকাল কোনো ঘোমটা-দেওয়া মহিলাই চোখে পড়ে না। রাত্তিরের দিকে অন্ধকারের মধ্যে দেখলে হয়তো আমি ভয়ই পেয়ে যেতুম, নেহাৎ এখন সকাল সাড়ে দশটা।

—বড়মা আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন।

—কি নাম বলব?

—বলো গিয়ে নীলুবাবু। আমার নাম শুনলেই উনি বুঝবেন।

দাসী ফিরে চলে গেল, আর আসেই না।

দোতলাটা অদ্ভুত নিস্তব্ধ। এ বাড়িতে শিশুর কলকাকলি নেই। শেষ সন্তান জন্মেছে তেরো বছর আগে, আমার মনে আছে। দারুণ ধুমধাম হয়েছিল সেই উপলক্ষে। সেই তুলনায় সরোজদার বিয়েতে কিছুই ঘটা হয়নি। পাপুন আর দিদিরা বোধহয় স্কুল কলেজে চলে গেছে এর মধ্যে।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার দুটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

এ বাড়িতে আমাব অনেক বাল্যস্মৃতি জমে আছে। এই কালোসাদা চৌখুপ্পিকাটা বারান্দায় কত দিন এসে খেলা করেছি, দেয়ালগুলির কি মনে আছে সেই কথা? প্রথম দীর্ঘশ্বাসটি সেই জন্য।

দ্বিতীয় দীর্ঘশ্বাসটি অরুণের কথা ভেবে। অরুণোদয়কান্তি দেব, আমাদের স্কুলের প্রতি বছরের ফার্স্ট বয়, এ বাড়ির সবচেয়ে আদরের সন্তান, আমার বন্ধু। অরুণেব জন্যই তো আমি এ বাড়িতে আসতুম। ছুটির দিনে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত আমার কেটে যেত এ বাড়িতে।

একবার যখন তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গিয়ে আমার মাথা ফেটে যায়......।

দাসীটি ফিরে এসে তালা খুলে দিয়ে সেই রকম ফ্যাসফেসে গলায় বলল, আসুন আমার সঙ্গে।

বড় মা'র ঘর আমায় চেনাতে হবে না, আমি খুব ভালোই জানি। মাঝখানে প্রায় আট বছর আসিনি বটে, তার মধ্যে এ বাড়ির আর যা কিছুরই বদল হোক, বড়মার মতন মানুষরা নিজস্ব জায়গা বদলান না।

ছেলেবেলা খেকেই দেখেছি, এ বাড়ির দোতলা ও তিনতলাটা বলতে গেলে পুরোপুরি মহিলা মহল। বিভিন্ন ঘরে থাকেন অন্তত আট-ন'জন মহিলা। তাঁদের কার সঙ্গে কার যে কী সম্পর্ক, তা বুঝে ওঠা দুষ্কর।

অনেকদিন না এলেও আমি এ বাড়ির মোটামুটি খবর রাখি। ভেতরে না ঢুকলেও বাইরে থেকে যাওয়া-আসার পথে দেখি তো প্রায়ই। যতদূর জানি, এখন এতবড় বাড়িটিতে পুরুষ মাত্র দু'জন। তাঁদের মধ্যে একজন আবার ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। তিনি হলেন এ বাড়ির ছোটবাবু। যৌবনকাল থেকেই তিনি বদ্ধ উন্মাদ। আমি প্রথম দিন থেকেই তাঁকে ঐ রকম দেখেছি। তিনতলার একেবারে কোণের ঘরে তাকে আটকে রাখা হয়। এক সময় তিনি জলদগম্ভীর স্বরে দারুণ হাঁকাহাঁকি করতেন, ইদানীং নাকি একেবারে চুপচাপ থাকেন। সম্ভবত মৃত্যুর আর বেশি দেরি নেই।

আর মেজকর্তা অর্থাৎ অরুণের মেজকা-কে পাড়ার লোক ঝুঁকোবাবু বলে ডাকে। শিরদাঁড়ার কী একটা ব্যাধির জন্য তিনি সোজা হয় দাঁড়াতে পারেন না।

অবশ্য ঐ রকম শরীর নিয়েই তিনি তুরতুর তুরতুর করে ঘুরে বেড়ান। এবং শহর ও মফস্বলের বিভিন্ন আদালতে তাঁদের সম্পত্তি নিয়ে নানা মামলা চালান। কিন্তু যে মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তাকে কেউ মান্য করে না কিংবা ভয়ও পায় না।

আমাদের ইস্কুল জীবনের খেলাধুলোর দুষ্টুমির সময় মাঝে মাঝে ঝুঁকোবাবু ধমক দিয়ে বলতেন, অ্যাই ছেলেরা, কী হচ্ছে, অ্যাঁ? তা শুনে ভয় পাবার বদলে আমরা খিলখিল করে হাসতুম।

অরুণের বাবা, অর্থাৎ এ বাড়ির বড়বাবুকে আমি মাত্র কয়েক বছরই দেখেছি। চেহারা ও ব্যক্তিত্বে এই বনেদি বাড়ির শেষ প্রতিভু ছিলেন তিনি। সরোজদা কিংবা অরুণ কেউ-ই সেরকম রূপবান নয়। বড়বাবু কথা বলতেন কম, কিন্তু মুখখানা গোমড়া ছিল না, বরং চোখ দুটো ছিল সহাস্য। কাশ্মীরীদের মতন গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, মেদবর্জিত শরীর। অরুণ তাঁর এগারোটি সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ, সুতরাং বড়বাবুকে আমি যখন দেখেছি, তখনই তাঁর যথেষ্ট বয়েস। সারা দিনে তিনি একবারও বেরুতেন না বাড়ি থেকে, যেন দিনের আলো তাঁর সহ্য হতো না, ঘরে বসে বসে বই পড়তেন ও গান বাজনা শুনতেন রেকর্ডে। পরবর্তীকালে আমি তাঁর বই ও রেকর্ড সংগ্রহ ঘাঁটাঘাঁটি করে বুঝেছিলুম, সাহিত্য ও সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর রুচি ছিল খুবই উচ্চাঙ্গের ও সূক্ষ্ম।

প্রতিদিনই সন্ধের পর তিনি একবার বেরুতেন বাড়ি থেকে। কোথায় যেতেন জানি না। একদিন সন্ধেবেলা আমরা একতলার উঠোনে খেলতে খেলতে দেখলুম, তিনি ধীর, সংযত পদক্ষেপে নামছেন সিঁড়ি দিয়ে। পরদিন সকালবেলা শুনলুম, তিনি মারা গেছেন। অত্যন্ত চমৎকার মৃত্যু। অন্যান্য রাতের মতন সেদিনও তিনি রাত সাড়ে এগারোটায় ফিরেছিলেন। খাওয়াদাওয়ার পর বিছানায় শোবার পরই ডান হাত দিয়ে বুকটা চেপে ধরে বলেছিলেন, বড়বৌ, আমি চললুম। ছেলেমেয়েদের দেখো।

পরের দিন সকালে আমি বড়মা'র মুখখানা একবারই অল্পক্ষণের জন্য দেখতে পেয়েছিলুম। সারা বাড়ি জুড়ে সবাই কাঁদছে বড়বাবুর জন্য, এমনকি দাস-দাসী, পাড়া-প্রতিবেশী পর্যন্ত, একমাত্র বড়মাই নীরব। তার মুখে যেন শোকের বদলে ক্রোধের গনগনে আভা।......

...দাসী এসে বড়মার দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজাটা ভেজানো। দাসী তাতে ঠক ঠক্ করতেই বড়মা বললেন, কে?

দরজা ঠেলে খুলে ফেলার পরও বড়মা আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কে গা তুমি?

আমি বললাম, বড়মা, আমি নীলু। আপনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন.......

বড়মা এবার বললেন, ও, আয়, ভেতরে আয়।

তারপর দাসীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি এবারে যাও তো বাছা। এই ছেলের জন্য চা-মিষ্টির ব্যবস্থা করো গে।

আমি ঘরে ঢুকে বড়মাকে প্রণাম করবার পর তিনি বললেন, দোরটা বন্ধ করে দে তো, নীলু! ওরকম নবকার্তিকেব ধারা গোফ রেখেছিস, তাই তোকে প্রথমটায় চিনতে পাবিনি।

আমি একটু হেসে বললুম, কেমন আছ বড়-মা?

বড়মা আমার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে বললেন, আমি কখনো খারাপ থাকি না! তুই তো বেশ ডাগরটি হয়েছিস দেখছি!

আমাব মনে হলো, আজ আমার আগমন উপলক্ষে বড়মা একটু বিশেষ সাজগোজ করেছেন। খাট ছেড়ে বসেছেন একটা ইজি চেয়ারে। এই ইজি চেয়ারটার হেলান দেবার জায়গাটায় এক সময় লাল মখমলে মোড়া ছিল, এখন অবশ্য তা ছিঁড়ে ঝুলি ঝুলি। তবে কাঠটা মেহগনি। বড়মা পরে আছেন একটা কালোপাড় গরদের শাড়ি। বড়মার গায়ের রঙ সদ্য-জ্বাল-দেওয়া দুধের সরের মতন।

বড়মাকে যতবারই দেখেছি, ততবারই রানী ভিক্টোরিয়ার কথা মনে পড়েছে। ওই রকমই মোটাসোটা গড়ন, মুখে একটু পুরুষালি ভাব। উদাসীন স্বামীর জন্য অল্প বয়েস থেকে তাঁকেই এই সংসার ও বিষয়-সম্পত্তির জটিলতা সামলাতে হয়েছে। সেই রকম দার্ঢ্যও আছে তাঁর চরিত্রে।

তিন দিকের দেওয়ালে তিনটি বিলিতি তৈলচিত্র। তার মধ্যে মাঝেরটি বিরাট। কোনো একটি পুকুরের জলে ও ঘাটে, দাঁড়িয়ে ও বসে-থাকা পাচ জন স্নানরতা রমণী, পোশাকের কোনো ব্যাপার নেই। অনেক দিন পর্যন্ত এই ছবির দিকে সরাসরি চোখ মেলে তাকাতে আমার লজ্জা করত। আমরা ছেলেবেলায় ভাবতুম, এই সব ছবি খুব দামি। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে খবর থাকে যে পল গগ্যাঁ, ভ্যান গঘ বা তুলুজ লোত্রেকের কোনো একটি ছবিই নিলামে লাখ লাখ টাকায় বিক্রি হয়। এই ছবিগুলোও সে রকম সম্পদ। সরোজদা অবশ্য আমাদের পরে একদিন বলেছিলেন, ও ছবিগুলো রুবেন্‌সের মামুলি কপি। মেয়েরা সেইজন্যে ওইরকম মোটা মোটা।

বড়মা বললেন, অনেকদিন তোর দেখা নেই কেন রে, বাঁদর? বউ বুঝি আঁচল দিয়ে বেঁধে রাখে?

আমি বললুম, শুধু আঁচল বেঁধে রাখে? নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে! অন্য

কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই রেগে যায়। এই যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, তাও তো লুকিয়ে!

বড়মা এক গাল হাসলেন। এখনও সব দাঁত আছে। মাথার চুলও তেমন বেশি পাকে নি। গায়ের চমড়া কোঁচকায়নি। অথচ বড়মা'র বয়েস অন্তত সত্তর তো হবেই। সব শুদ্ধু এগারোটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, তার মধ্যে চার জন বাঁচেনি, জীবনে শোক-তাপ বড় কম পাননি, তবু বড়মার চেহারা ও জীবনে বেশ তাজা ও টসটসে ভাব আছে। অসাধারণ বুদ্ধিমতী তিনি, কারুর মুখের দিকে তাকিয়েই তার পেটের কথা বুঝতে পারেন।

—তার মানে এখনো বিয়ে করিসনি, এই তো? কেন করিসনি, কেউ মেয়ে দেয় না? তোর মা-টা কী রে? আমার অরুণ থাকলে কবে তার বিয়ে দিয়ে দিতুম, এতদিনে নাতিপুতি হয়ে যেত।

এ বাড়িতে এখনো বাল্য-বিবাহ চালু আছে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় ষোলো-সতেরোতে, ছেলেদের কুড়ি-একুশে। একমাত্র সরোজদা সব ব্যাপারেই ব্যতিক্রম, তিনি বিয়ে করেছেন তিরিশ বছর বয়েসে। অরুণ মারা যায় উনিশ বছরে, সেই সময়েই তার বিয়ের কথা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

—তোকে আমি কেন ডেকেছি, বল তো?

—আমায় বকুনি দেবার জন্য।

—কেন, বকুনি খাবার মতন কী করেছিস?

—এই যে এতদিন আসিনি তোমার কাছে। সত্যি আমি অন্যায় করেছি, বড়মা।

—তা কী হয়েছে, বাঘে খায় না টক ঝাল, বামুন খায় না প্যাজবসুন। তোর কি এখন এই বুড়ির কাছে এসে বসে থাকবার বয়েস!

অরুণের মৃত্যুর পর প্রায় এক বছর আমি নিয়মিত এ বাড়িতে আসতুম। বড়মার চোখে আমি আর অরুণ প্রায় সমান ছিলুম। ত্রিবেণীতে পিকনিক করতে গিয়ে অরুণ জলে ডুবে যায়। ওঃ, কি অন্যায় অপচয়। অরুণের মরে যাওয়া একেবারেই উচিত হয়নি। অরুণই একমাত্র পারত এই পরিবারটিকে রক্ষা করতে।

বড়মার খবর পাঠানোর প্রণালীটিও বিচিত্র। গত পরশুদিন আমাদের বাড়ির ধোপা আমাকে একটি নতুন ধুতি উপহার দিল। তারপর বলল, আপনাকে একবার সিংহীবাগানের বড়মা যেতে বলেছেন। এই দু'-এক দিনের মধ্যেই।

আমি বললুম, ধুতি পাঠিয়েছো কেন, বড়মা? আমি কি আজকাল ধুতি পরি?

বড়মা সংক্ষেপে বললেন, জন্মদিনের দিন পরবি।

তার একটি হাত ছিল শাড়ির ভাঁজের মধ্যে। সেই হাতটি এবার বার করলেন,

তাতে একটি ছোট ভেলভেটের থলি। সেটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এতে ক'টা আছে গুনে দ্যাখ।

থলির ফাঁস খুলে টাকাগুলো বার করলুম। প্রথমে টাকাই ভেবেছিলুম, আসলে সেগুলো সোনার গিনি। মোট পনেরোটা।

বড়মা বললেন, ওর থেকে একটা তোর। তুই নিবি।

আমি বললুম, দিলেই হলো নাকি। আমি অমনি নিয়ে নিলুম আর কি! অত সোজা নয়।

—ওটা তোকে দিচ্ছি নাকি, বাঁদর। ওটা তোর বউয়ের জন্য। ততদিন আমি বাঁচি কি না বাঁচি। না না, ভুল বললুম, বেঁচে থাকব ঠিকই, আমার কুষ্ঠিতে আছে আমার সাতাশি বছর আয়ু।

—তা হলে আমার বউ যখন আসবে, তাকে তুমি নিজের হাতেই দিও!

—চুপ কর। মুখে মুখে কথা বলবিনি। যা বলছি, শোন। ওর একখানা তুই রাখবি, বাকিগুলো আমার জন্য তুই বিক্রিকিরি করে দিবি।

—আমি? গিনি বিক্রি করব?

—কেন, পারবি না? বড় হয়েছিস, সাব্যস্ত হয়েছিস, এই কাজটুকু পারবি না?

—কেন, ছোটকা.......

—ঐ ঝুকো? ওটা তো এক নম্বরের ফেরেব্বাজ। এ বাড়িতে কারুকে বিশ্বাস নেই, বুঝলি নীলু। সব শালা চোর। জিতেন স্যাকরা মারা গ্যাছে, তার একটা চ্যাংড়া ছেলে আসে এখন, মহা ধড়িবাজ। আমাকে নয়-ছয় বুঝিয়ে যায়, ভাবে আমরা সেকেলে মুখ্যু মানুষ, যা বোঝাবে তাই বুঝব। সরকার মশাই তার ভাগ্নেটাকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে গ্যাছে, সে ব্যাটাও চোর, ঝি-চাকরগুলোও হয়েছে রাম চোর। যা পারছে ছেঁড়াছেড়ি করে নিচ্ছে, বুঝলি না? সব ব্যাটা নিমকহারাম!

—তা বলে এই পুরোনো মোহরগুলো বিক্রি করে দেবে?

—সবই তো গ্যাছে, আর আছেটা কী? রেখেই বা কি হবে? কার ভোগে লাগবে? আগে আমার এই একতাড়া গিনি আর মোহর ছেল...শোভাবাজারের বাড়িটা নিয়ে যখন সুপ্রিমকোর্টে কেস হলো, তখন ব্যারিস্টারকে প্রত্যেকদিন একুশখানা করে গিনি দিয়িছি। তারপর যেবারে নীলার বিয়ে হলো.....।

সাতটি জীবিত সন্তানের মধ্যে সরোজদাই এখন একমাত্র ছেলে। সেই সরোজদাও অনেকদিন দেশছাড়া। এক সময় এঁদের পাঁচ-ছ'টি বাড়ি, উত্তর কলকাতার একটি বেশ বড় বাজারের অর্ধেক মালিকানা, চা-বাগানের শেয়ার আরো

কী সব ছিল। অনেকদিন থেকেই সেই সব সম্পত্তি একটার পর একটা বিক্রি করে সংসার চলছে। এক-একটি মেয়ের বিয়ে মানেই এক একটি করে বাড়ি। কানাঘুষোয় শুনেছি, ঝুঁকোবাবু এ বাড়ির ফার্নিচারও বিক্রি করতে শুরু করেছেন।

সরোজদা বাইরে থেকে কিছু টাকা পাঠান নিশ্চয়ই, কিন্তু সে টাকা এত বড় সংসারের আগুনে এক মুঠো ঘাস ছাড়া আর কি।

বড়মা গিনি বিক্রি করবেন, সেটা আর আশ্চর্য কিছু না। কিন্তু আমাকে সেই দায়িত্ব নিতে হবে? এতগুলো গিনি নিয়ে আমি স্যাকরার দোকানে যাব, আমায় যদি চোর মনে করে? আমার তো চেহারা দেখেই বোঝা যাবে, আমি গিনিওয়ালা বাড়ির ছেলে নয়।

—তোকে আর একটা কাজ করতে হবে, নীলু। খবর্দার, কারুক্কে কিছু বলাবিনি কিন্তু। তোর আবার যা মুখ আলগা।

—যাচ্চলে। বড়মা, তুমি কবে দেখলে যে আমার মুখ আলগা?

—আরে জানি, জানি! তোর বয়িসী ছেলেদের পেটে কোনো কথা থাকে না। হেদোর রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে কোনো ছুড়ির সঙ্গে গল্প করতে করতে কোনোদিন বলে দিবি, জানো, বড়মা বলছিল—

আমি হো হো করে হেসে উঠলুম।

বড়মা বোধহয় গত পনেরো বছরের মধ্যে একবারও বাড়ি থেকে বার হননি। শুনেছি, এক সময় ওঁর গঙ্গাস্নান আর থিয়েটার দেখার শখ ছিল। এখন তাও নেই। তাছাড়া কেই বা নিয়ে যাবে। ঘোড়ার গাড়ি থেকে মটোর গাড়ির আমলের মানুষ বড়মা। কোনো দিন ট্রাম, বাস বা ট্যাক্সিতে চড়েননি। বড়কর্তার আমলেও এ বাড়িতে দু'খানা গাড়ি ছিল। শেষ গাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবার পর বড়মার বাড়ি থেকে বেরুনোও বন্ধ। বড়মার মেজ মেয়ে সরস্বতীদির ছেলের মুখে-ভাতের সময় বড়মাকে নিয়ে যাবার জন্য সবাই ঝুলোঝুলি করেছিল। বড়মা বলেছিলেন, ওরে বাপ রে বাপ, সেই টালিগঞ্জ! সে তো পাড়াগা। কিছুতেই বড়মাকে নিয়ে যাওয়া যায়নি।

হেদোর কাছে রেলিং ধরে ছেলেমেয়েদের গল্প করার যুগ কবে পার হয়ে গেছে। বড়মা হয়তো কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে কোনোদিন গাড়িতে যেতে যেতে সেরকম একটা দৃশ্য দেখেছিলেন।

বড়মা কিন্তু আমার হাসিকে গ্রাহ্য করলেন না। চোখ পাকিয়ে বললেন, কারুক্কে বলবি না, কথা দে।

—হ্যাঁ, দিলুম।

—আমার কাছে এগিয়ে আয়, চুপি চুপি বলব। আচ্ছা, আগে দোরটা খুলে

দ্যাখ তো ওখানে কেউ আড়ি পেতে শুনছে কি না।

আমি আবার আপত্তি করতে যাচ্ছিলুম, বড়মা আমায় বাধা দিয়ে বললেন, বিশ্বাস নেই, বাছা, এ বাড়িতে আর একজনকেও আমি বিশ্বাস করি না।

সুতরাং আমাকে উঠে গিয়ে একবার দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখে আসতে হলো। তারপর দরজায় লাগালুম ছিটকিনি।

তারপর বড়মার পায়ের কাছে গিয়ে বসবার পর বড়মা আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, তোকে একটু বৌমার ওপর নজর রাখতে হবে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় যায়, তুই আমায় সে খোঁজ এনে দিবি। তুই ওর পেছু-পেছু সব জায়গায় যাবি, বুঝলি! তোর খরচা যা লাগে আমি দোবো।

—তুমি কী বলছ, বড়মা?

—ঠিকই বলছি। এ বাড়ির বৌ ধেই ধেই করে সারা রাজ্য ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার আর মুখে কালি পড়তে কিছু বাকি রইল না!

—দীপ্তি বৌদি তো একটা ইস্কুলে পড়ান।

—তুই চুপ মার! সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ইস্কুল? সে ইস্কুলে কারা পড়ে? আর, তুই যে বড় ফটফট করছিস, তুই বল তো এ বাড়ির বৌ হয়ে কেনই বা সে ইস্কুলে পড়াবে? আমি কি মরে গেছি? বৌ-মানুষের একটু হায়া নেই গা!

এই সময় দরজায় ঠক ঠক শব্দ হতেই দারুণ চমকে উঠলেন বড়মা। বড় বড় করে বললেন, দ্যাখ তো, দ্যাখ তো কে?

দরজা খুলেই দেখতে পেলুম দীপ্তি বৌদিকে।

সদ্য স্নান করে বাইরে বেরুবার জন্য সাজগোজ করেছেন দীপ্তি বৌদি। পাতলা পলকা চেহারা, বয়েস বোধহয় তিরিশের কিছু বেশি। দীপ্তি বৌদি কথা বলেন খুব শান্ত আর মিষ্টি গলায়। কিন্তু সবাই জানে, দীপ্তি বৌদি একটি আগুনের ঢেলা।

সরল বিস্ময়ে দীপ্তি বৌদি জিজ্ঞেস করলেন, দরজা বন্ধ করে কী হচ্ছে?

বড়মা বললেন, এই নীলেটার সঙ্গে আমি একটু সুখ-দুখের গল্প করছিলুম। তুমি বেরুচ্ছ বৌমা?

আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলুম, বড়মার কঠোর হুকুম-হুকুম গলার আওয়াজ বদলে গিয়ে একেবারে নরম হয়ে গেছে। হঠাৎ কোনো অপরাধ করতে গিয়ে ধরা-পড়ে-যাওয়া ভাব মুখে। আমার চোখে চোখ রেখে কী একটা ইসারাও করলেন, আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না।

দীপ্তি বৌদি ঘরের মধ্যে এসে জিজ্ঞেস করলেন, মা, আপনি ওষুধ খেয়েছেন?

বড়মা বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খেয়েছি।

দীপ্তি বৌদি সারা ঘরে চোখ বুলিয়ে বললেন, কই, ওষুধের শিশি কই? জলের গেলাস কই?

বড়মা বললেন, সাতবার চেয়ে চেয়েও তো এক গেলাস জল পাই না। এই ঝি-মাগীগুলো যা হয়েছে, সব যেন এক একখানা লাটগিন্নি।

—বাঃ, আপনি আমায় ডাকলেও তো পারতেন।

—কেন, তোমায় ডাকব কেন? বাড়ির বৌ এসে জল গড়িয়ে দেবে, আর দাসী-বাঁদীগুলো হাঁ করে দেখবে?

—তাতে কী হয়েছে? বাড়ির বউ একটু শাশুড়ির সেবা করবে না? আপনি আপনার শাশুড়িকে কখনো জল গড়িয়ে এনে দেননি?

বড়মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমার শাশুড়ি! সে কি মানুষ ছিল গা? মানুষ নয়, সে ছিল একটা আস্তো রাক্ষুসী। চমকো না, চমকো না। যা বলছি, ঠিকই বলছি। যতদিন বেঁচে ছিলেন, আমার হাড়-মাস চিবিয়ে খেয়েছেন। তোমরা তো আর সেকালের শাশুড়িদের দ্যাখোনি।

দীপ্তি বৌদি ফিক করে হেসে বললেন, ভাগ্যিস সেকালে জন্মাইনি। একালের শাশুড়িরা অনেক ভালো। আমি জল নিয়ে আসছি আপনার জন্যে।

দীপ্তি বৌদি বেরিয়ে যেতেই বড়মা আমার দিকে চোখ পাকিয়ে আগেকার গলায় বললেন, হাবা ছেলে, গিনির থলেটা পকেটে পুরতে পারিসনি? ও মেয়ে দেখে ফেললেই হয়েছেল আর কি।

তাবপর ষড়যন্ত্রের মতন সুরে বললেন, ঐ দেখলি তো, ধিঙ্গি বৌ এই সাত সকালে ছিষ্টি ঘুরে বেড়াতে চলল। ছ্যা, ছ্যা।

—তা আপনি বারণ করলেই তো পারেন।

—কথা শোনো ছেলের। আমি বারণ করব। সেই ভাগ্য করেই বৌ এনিছি কি না! যেদিন আমি.....

দীপ্তি বৌদি আবার ঘরে ঢুকতেই বড়মা বাকি কথাটা গিলে ফেললেন।

দেরাজ থেকে দুটি ওষুধের শিশি বার করে দুটি ট্যাবলেট নিয়ে এসে দীপ্তি বৌদি বললেন, মা, আপনি আজকাল বড্ড ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছেন। একবার বললেন, ওষুধ খাওয়া হয়ে গেছে। আবার বললেন, ওরা জল দেয়নি। কিন্তু মানদা আমায় বলল, ও জল নিয়ে এসেছিল, আপনি ধমকে বলেছেন, ওষুধ খাবো না, যা!

—ঐ কথা বলল? আজকাল সব কটা হয়েছে মিথথুকের মিথথুক! এই দ্যাখো না, নীলুর জন্য চা-মিষ্টি দিতে বললুম সেই কখন, তা এখনো দিল?

—হ্যাঁ করুন। আমি নিজের হাতে না খাওয়ালে ওষুধ খাবেন না। সে আমি বুঝেছি। ব্লাড প্রেসার কার, আপনার না আমার?

লক্ষ্মী মেয়ের মতন বড়মা ওষুধ খেয়ে নিলেন। সেই অবস্থাতেই আমার দিকে চোখ দিয়ে ইসারা করলেন কী যেন!

ওষুধ খাওয়ানো হয়ে গেলে দীপ্তি বৌদি বললেন, আমি এবারে তাহলে যাই মা। আমার ফিরতে একটু দেরি হতে পারে।

বড়মা বললেন, হ্যাঁ, এসো।

দীপ্তি বৌদি চলে যেতেই দাসী এলো আমার খাবার নিয়ে। ফুলকাটা কাঁসার রেকাবিতে চারখানা রাজভোগ। মিত্তির বাড়ির বরাবরের রেওয়াজ অতিথিদের রাজভোগ দেওয়া। তবে ছেলেবেলায় দেখতুম রাজভোগের সাইজ ছিল প্রায় টেনিস বলের মতন। আর এখন যেন চড়ুই পাখির ডিম।

বড়মা বললেন, ওসব ইস্কুল টিস্কুল বাজে কথা। কাল ছিল ষষ্ঠিপুজো। কালও তো বেরুলো। ষষ্ঠিপুজোর দিন ইস্কুল খোলা থাকে?

—আজকাল ষষ্ঠিপুজো টুজোয় স্কুল ছুটি থাকে না।

—চুপ মার তো। যা বলছি, শোন! কাল ঠিক এই সময়টায় তুই গ্যাস লাইটের পেছনে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি।

—গ্যাস লাইট?

—হাঁদার মতন তাকিয়ে রয়েছিস কেন? রাস্তায় গ্যাস লাইট থাকে না।

এই জন্যই বড়মা-র কথা আমার শুনতে ভালো লাগে। রাস্তায় গ্যাস লাইটের কথা বইতে পড়েছি, কখনো চোখেই দেখিনি। সন্ধেবেলা একজন লোক মই ঘাড়ে করে এসে রাস্তার আলো জ্বেলে দিত, আর সকালে এসে আবার নেভাত। সে তো মান্ধাতার আমলের ব্যাপার।

আমাকে হাসতে দেখে বড়মা চোখ পাকিয়ে বললেন, হাসছিস যে? মন দিয়ে শোন কথাটা! তুই সারাদিন ওর পেছু পেছু ঘুরে দেখবি, ও কোথায় যায়, কার সঙ্গে মেশে, বুঝলি না। দেবেদের বাড়ির বউ, ধিঙ্গির মতন ঘুরে বেড়ায়, পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে...

—বড়মা, তুমি তো বৌদিকে জিজ্ঞেস করলেই পার। বৌদি নিশ্চয়ই তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলবেন না।

—চুপ!

বুঝলুম, আমাকে ধমক দিলেও বৌদিকে এসব কথা জিজ্ঞেস করার সাহস নেই বড়মার।

বড়মা তাঁর অনেক দিনের পুরোনো হাত আমার মুখে বুলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস

করলেন, তুই আমার জন্য এটুকু করবি না, নীলু?

আমি বললুম, নিশ্চয়ই বড়মা।

২

গোয়েন্দার ভূমিকায় বেশ রোমাঞ্চই বোধ করতে লাগলুম। আমি ডিটেকটিভ বইয়ের পোকা, তা ছাড়া এর আগে মনে মনে অনেককেই অনুসরণ করেছি। অনুসরণকারীকে সব সময় একটা এলেবেলে ভাব করে থাকতে হয়, যাতে তার দিকে কারুর নজর না পড়ে। মাঝে মাঝে মুখটা আড়াল করতে হয় বলে একটা খবরের কাগজ নিয়েছি।

শুধু একটা কথাই ভাবছিলুম চায়ের দোকানে বসে বসে। ইংরিজি গোয়েন্দা গল্পে থাকে যে সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি ট্যাক্সি নিলে গোয়েন্দাটিও ঝাঁ করে একটা ট্যাক্সি ধরে ড্রাইভারকে বলে, ঐ গাড়িটাকে ফলো করো। কিন্তু কলকাতা শহরে পরপর দুটো ট্যাক্সি পাওয়া একেবারে অসম্ভব ব্যাপার।

দীপ্তি বৌদি ট্যাক্সি ধরলে কী করব?

এই চায়ের দোকান থেকে ও বাড়ির গেটটা দেখা যায়। যদুলালকেও দেখতে পাচ্ছি, মরা মাছের মতন চোখ করে বসে আছে টুলে। কাল দীপ্তিবৌদি সাড়ে দশটা আন্দাজ বেরিয়েছিলেন বাড়ি থেকে। আজ এখন পৌনে এগারোটা বাজে, তবু দীপ্তিবৌদির দেখা নেই । এত দেরি করে কী কেউ ইস্কুলে পড়াতে যায়?

দু'কাপ চা খাওয়া হয়েছে এর মধ্যে, খবরের কাগজটা প্রায় মুখস্থ, এখন বিজ্ঞাপনগুলো পড়ছি।

তৃতীয় কাপ চা নিয়ে সবে এক চুমুক দিয়েছি, এমন সময় দীপ্তিবৌদিকে বেরুতে দেখে চমকে উঠলুম। তক্ষুনি ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে পয়সা দিতে গেলুম দরজার কাছে মালিকের টেবিলে।

দোকানের মালিক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী হলো, চা খেলেন না?

লজ্জা পেয়ে গেলুম। এমন ব্যস্তসমস্ত ভাব দেখানো আমার উচিত হয়নি। দীপ্তিবৌদির এই দোকান পর্যন্ত পৌঁছোতে দেরি আছে, তার মধ্যে চা-টা খেয়ে নেওয়া যেত। তা ছাড়া দীপ্তিবৌদির আগে আগে তো আমার হাঁটার কথা নয়। অনুসরণকারীরা পেছনে থাকে।

দোকানদারকে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে বেরিয়ে পড়লুম। দীপ্তিবৌদি

যাচ্ছেন অন্য ফুটপাথ দিয়ে, আমি এদিকে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাবার ছলে অনেকটা সময় নিলুম। দীপ্তিবৌদি এদিক ওদিক তাকান না, সোজা সামনের দিকে মুখ।

দীপ্তিবৌদি পরে আছেন একটা পাতিলেবু-হলদে রঙের শাড়ি, কাঁধে ঝোলানো চামড়ার ব্যাগ। মাথার চুল ছোট করে কাটা। স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যাওয়া শিক্ষিকাদের হাঁটার মধ্যে যে ব্যস্ততার ভাব থাকে, দীপ্তিবৌদির তা নেই, উনি হাঁটছেন আস্তে আস্তে।

মোড়ের মাথায় এসে দীপ্তিবৌদি ট্রাম স্টপে দাঁড়ালেন। আমি একটা থামের আড়ালে রইলুম। তারপর ট্রাম যখন প্রায় এসে পড়েছে, ঠিক তখনই আমার কাঁধে একটা চাপড়।

যেন জীবনে আমি কখনো এত ভয় পাইনি, শরীরটা একেবারে কেঁপে উঠল। মুখ ফিরিয়ে দেখি, রমেন।

—কী রে এখানে কী করছিস?

—এই একটু এসেছিলুম এদিকে।

—শোন, নীলু, তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হলো...

দীপ্তিবৌদি ট্রামে উঠে পড়েছেন, কণ্ডাকটার ছাড়বার ঘণ্টা দিয়েছে। রমেনের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললুম, আমার একটা বিশেষ কাজ আছে রে, পরে--।

দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়লুম সেকেণ্ড ক্লাসে। বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছে। অনুসরণকারীর যে এরকম বিপদ হতে পারে, তা আগে ভাবিনি। প্রথমেই এরকম বাধা! আমি নিজেই বুঝতে পারছি, আমার ভাবভঙ্গি বেশ সন্দেহজনক। ইস্কুলের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে কেউ হাত ছাড়িয়ে এরকমভাবে ছুটে গিয়ে ট্রামে ওঠে না। পেছনেই আর একটা ট্রাম আসছে।

রমেন একেবারে হাঁ হয়ে গেছে। তা হোক, দীপ্তিবৌদি আমায় দেখতে পাননি তো? এ পাড়ায় অনেকেই আমাকে চেনে। আরো কেউ হয়তো লক্ষ্য করেছে যে দীপ্তিবৌদি যে ট্রামে উঠলেন সেই ট্রামেই আমি দৌড়ে এসে উঠছি। তাও সেকেণ্ড ক্লাসে। যাই হোক, আর চিন্তা করে লাভ নেই।

একবার সতর্ক চোখ বুলিয়ে দেখে নিলুম, এই কামরায় আমার চেনা কেউ আছে কিনা। ঠিক রয়েছে একজন। আমার ছোটমামার বন্ধু ঝণ্টু মামা। জানালা দিয়ে চেয়ে আছেন বাইরের দিকে। আমায় দেখতে পাননি, নাকি দেখেও না-দেখার ভান করছেন? সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছেন বলে লজ্জা পাচ্ছেন! ভালোই হলো।

দীপ্তিবৌদি কোন স্কুলে কাজ করেন তা আমি জানি না। প্রত্যেক স্টপেই

নজর রাখতে হবে। দরজার কাছে গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। ট্রাম ডালহাউসি পৌঁছে পুকুরের চারপাশে প্রায় তিন ভাগ ঘোরার পর নামলেন দীপ্তিবৌদি। তারপর এগোলেন মিনিবাসের দিকে।

এইবার আমি আর একটা বিপদ গুনলাম।

মিনিবাস বেশ ছোট বস্তু, তা ছাড়া একটাই দরজা। এর মধ্যে তো আত্মগোপন করা অতি শক্ত। প্রাণপণে মনে করবার চেষ্টা করলুম, এ পর্যন্ত কোনো ডিটেকটিভ গল্পে মিনিবাসে অনুসরণ করার কোনো টেকনিক পড়েছি কিনা। নাঃ, কোনো ইংরিজি বইতে কখনো মিনি বাসের উল্লেখ থাকে না। তাছাড়া, চেনা কারুকে অনুসরণ করারও নিশ্চয়ই অন্য কোনো কায়দা আছে।

পেশাদার গোয়েন্দাদের কাছে এক্‌স্ট্রা দু'-চারখানা দাড়ি-গোঁফ থাকে, যখন যেটা খুশি পরে নেয়। আমি এমনকি একটা সান গ্লাস পর্যন্ত আনিনি।

দীপ্তিবৌদি একটা মিনিবাসে উঠে পড়লেন, টালিগঞ্জের। আমি তবু বাইরে ঘোরাঘুরি করতে লাগলুম। মনস্থির করতে পারছি না, অন্য কোনো উপায়ও খুঁজে পাচ্ছি না। দীপ্তিবৌদি বসেছেন মাঝামাঝি সীটে। ক্রমে বাস ভরে যেতে লাগল। আর কোনো উপায় নেই। এই মিনিবাসটা ছাড়লে আর দীপ্তিবৌদির সন্ধান পাব না। পুরো সকালটা বৃথা যাবে। যা থাকে কপালে ভেবে একেবারে ছাড়ার মুখে উঠে পড়ে ড্রাইভারের পাশে লম্বা সিটটায় বসলুম।

কতদূর যেতে হবে জানি না, তাই টিকিট কাটলুম একেবারে ডিপো পর্যন্ত। একটু একটু খটকা লাগছে, এতদূরে দীপ্তিবৌদির স্কুল? রাসবিহারী মোড়, টালিগঞ্জ ব্রীজ পেরিয়ে যাচ্ছি, বাস ফাঁকা হয়ে আসছে আবার। দীপ্তিবৌদি একটা বই পড়ছেন। আমিও মুখের কাছে কাগজ মেলে আছি।

আনোয়ার শা রোডের কাছাকাছি আসতে দীপ্তিবৌদি উঠে দাঁড়ালেন। এবারে আর মুখের সামনে কাগজ রেখে লাভ নেই, কারণ নামতে হবে এক সঙ্গে, ধরা দিতেই হবে।

দীপ্তিবৌদিই প্রথম আমাকে দেখতে পেয়ে খানিকটা বিস্ময় মেশানো হাসি দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছ?

আমি তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্ময় দেখিয়ে বললুম, ওমা, আপনি এই বাসেই ছিলেন বুঝি? দেখতে পাইনি তো! আমিও তো এখানেই নামবো।

বাস থেমে গেছে। কণ্ডাকটার কর্কশভাবে চেঁচিয়ে বলল, নামুন-নামুন, আপনাদের জন্যে কি একঘণ্টা দাঁড়াবো না কি?

দীপ্তিবৌদি এক ঝলক তাকালেন তার দিকে। তারপর টুক করে একটা ছোট্ট লাফ দিয়ে নামলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন্ দিকে যাবে?

আমি আন্দাজেই আনোয়ার শা রোড দেখিয়ে দিলুম। তারপর দু'জনে হাঁটতে লাগলুম পাশাপাশি।

দীপ্তিবৌদি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এই দুপুরবেলা...তুমি কোথাও কাজ টাজ করো না?

—দুটো টিউশানি করি, সকালে আর রাত্তিরে।

—তুমি এখন কিছু পড়ছ?

—হ্যাঁ, মহাভারত।

দীপ্তিবৌদি পাশ ফিরে হাসলেন আমার চোখের দিকে চেয়ে। তারপর বললেন, তোমার সঙ্গে আমার কোনোদিন ভালো করে কথাই হয়নি। আমি ফেরার পর তো আর তোমাকে দেখিইনি। সেইজন্যই জিজ্ঞেস করছিলুম, তুমি কি এখনো ছাত্র আছ না পাশ টাশ করে বেরিয়েছ?

—কাল বড়মা-র ঘরে আপনি আমায় দেখলেন, একটাও কথা বললেন না তো?

—ওমা বলিনি বুঝি। কাল একটু তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিলুম। আচ্ছা শোনো, তুমি কফি হাউসে যাও? কলেজ স্ট্রিটে। আমি এক সময় খুব যেতুম। এখনও আবার যেতে ইচ্ছে করে।

—চলুন না একদিন।

—তুমি আমায় নিয়ে যাবে? একা একা যেতে কী রকম যেন লাগে।

—হ্যাঁ, নিয়ে যেতে পারি, যে-কোনোদিন।

—এখনো ওখানে বাচ্চা বাচ্চা কবিরা আসে! আমাদের কলেজ জীবনে একজন কবিকে নিয়ে খুব হৈ চৈ হতো, তার নাম অমর রায়।

—হ্যাঁ, সে মারা গেছে।

—তাই নাকি? আহা রে। আমার খুব ভালো লাগত তার কবিতা, একটু পাগলাটে পাগলাটে।

—একটা কথা জিজ্ঞেস করব বৌদি?

—কী, বলো?

—আপনি বিলেত থেকে চলে এলেন কেন?

—উঁ, চলে এলুম। কারণ খুব একটা ভালো লাগছিল না। সবার কি আর সব জায়গা ভালো লাগে?

তারপরই কথাটা ঘুরিয়ে দীপ্তিবৌদি বললেন, বেশ মেঘ করে এসেছে, শিগগিরই বৃষ্টি আসবে মনে হচ্ছে। চলি, আমি এই বাড়িটাতে যাব।

—আচ্ছা। আমার বন্ধুর বাড়ি আর একটু এগিয়ে।

একটা পাঁচিল ঘেরা গেটওয়ালা বাড়ি। গেটটা ঠেলে দীপ্তিবৌদি ভেতরে ঢুকে গেলেন।

বড়মা তো তাহলে একটা কথা ঠিকই বলেছেন। দীপ্তিবৌদি যে বাড়িটাতে গেলেন সেটা কোনক্রমেই ইস্কুল নয়। বেশ বড় বাড়ি, কিন্তু নির্জন, কম্পাউণ্ডে একটা আমগাছ আছে।

রহস্য বেশ ঘনীভূত হয়ে এসেছে। ইস্কুলে পড়াবার নাম করে দীপ্তিবৌদি দুপুরে অন্য কোথাও যান। কেন?

এখন আমি কি করি? কাছাকাছি কোনো চায়ের দোকানও দেখছি না। আমি ভেবেছিলুম দীপ্তিবৌদির ইস্কুলটা দেখে নিয়ে বাড়ি চলে যাব, আবার আসব ছুটির সময়। কিন্তু এখানে উনি কতক্ষণ থাকবেন, তারই তো ঠিক নেই।

এটা কার বাড়ি? সরস্বতীদি থাকেন টালিগঞ্জে, কিন্তু সে তো ট্রাম ডিপোর কাছে। দীপ্তিবৌদির কোনো আত্মীয় থাকেন এখানে? যতদূর জানি দীপ্তিবৌদি পাটনার মেয়ে, এখানে ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময় হস্টেলে থাকতেন। তা হলেও অবশ্য ওঁর আত্মীয় থাকতে পারে কলকাতায়।

শার্লক হোমস হলে বাড়িটার বাইরে দাঁড়িয়েই বুঝে যেতেন ভেতরে কে কে থাকে। গেটের সামনে পড়ে-থাকা একটা খালি দেশলাই দেখে বলে দিতেন বাড়ির মালিক খোঁড়া কি না।

এরকুল পোয়ারো হলে সোজা গিয়ে কলিং বেল টিপতেন। তারপর কোনো লোক এসে দরজা খুললে তিনি তাঁর গোঁফ চুমরে বলতেন, বাড়ির মালিককে বলো, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা এসেছে!

ইনসপেকটর মেইগ্রে হলে এপাশের তিরিশখানা আর ওপাশের তিরিশখানা বাড়ি ও দোকান-টোকানে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই দেয়াল-ঘেরা বাড়ির সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ সমস্ত তথ্য বার করে ফেলতেন। অবশ্য কেউ খুনটুন হলে তবেই। এমনি এমনি কি একটা বাড়ি সম্পর্কে পাড়ার লোকের কাছে খোঁজ নেওয়া যায়?

পেরি মেজন হলে কোনো দ্বিধা না করে সুট করে ঢুকে যেতেন এই বাড়ির মধ্যে। তাঁর পকেটে থাকে সব-খোল চাবি, সুতরাং কোনো তালাই তাঁর কাছে বাধা নয়।

কিন্তু আমার দ্বারা এসব সম্ভব নয়। গোয়েন্দা হিসেবে আমার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। বড় বড় গোয়েন্দাদের সবারই গোঁফ থাকে। গোঁফ না রেখে আমার এ লাইনে আসা একটু ভুল হয়েছে। গোঁফ থাকলেই ব্যক্তিত্ব থাকে। রাস্তায় একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেই মনে হচ্ছে সবাই আমাকে দেখছে। কতক্ষণই বা দাঁড়িয়ে থাকব। আমি

এবারে অবশ্য কেটে পড়তেও পারি। বড়মাকে একটা কিছু গল্প বানিয়ে বললেই হবে। অবশ্য সেটা খুব সহজ কাজ হবে না। বড়মাকে ধোঁকা দেওয়া বেশ শক্ত। বড়মার কাছে আমি কথা দিয়েছি, দীপ্তিবৌদি বাড়ি ফেরা পর্যন্ত সারাক্ষণ আমি ওকে অনুসরণ করব।

বড়মা কি দীপ্তিবৌদির চরিত্রে সন্দেহ করেছেন?

অবশ্য দীপ্তিবৌদির চালচলন খানিকটা রহস্যময় ঠিকই। ওঁর স্বামী রয়েছেন লণ্ডনে, আর উনি লণ্ডনে গিয়েও ফিরে এলেন হঠাৎ।

পি-এইচ.ডি. করার পর সরোজদা কিছুদিন পড়িয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। দীপ্তিবৌদি সেই সময় ছিলেন ওঁর ছাত্রী। বড়মা কিংবা ও বাড়ির কেউই খুশি হননি এ বিয়েতে। কারণ উনি কোনো বনেদি পরিবারের মেয়ে নন, গায়ের রঙ সেরকম ফর্সা নয় এবং ব্রাহ্মণ। অবশ্য সরোজদা ছেলেবেলা থেকেই বাড়ির অবাধ্য।

বিয়ের পর মাত্র দু'বছর কলকাতায় ছিলেন সরোজদা। সেই সময় সরোজদা প্রায়ই বলতেন, আর বেশিদিন এ বাড়িতে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব!

সিঙ্গিবাগানের ঐ দেবেদের বাড়িতে সরোজদাই বলতে গেলে একমাত্র সক্ষম পুরুষ। তাঁর এক কাকা বদ্ধ উন্মাদ, অন্যজন অপদার্থ। পাঁচ পুরুষের ধনী পরিবারটিতে নানা দিক থেকে পচন শুরু হয়ে গেছে। সব সমস্যা এক সরোজদাকেই সামলাতে হতো। সরোজদার এক বিধবা দিদি থাকেন ওখানে, তা ছাড়াও বাড়িতে আশ্রিতের সংখ্যা অনেক। প্রাচীন গাছের মতন, পুরোনো সংসারের গায়েও অনেক পরগাছা লেগে থাকে, তাদের ছেঁটে ফেলাও যায় না।

সরোজদা সব দিক থেকেই আধুনিক মনের মানুষ। বনেদি বাড়ির ঠাটবাট তিনি সহ্য করতে পারতেন না। সেইজন্যই সরোজদা পালিয়ে গেলেন বিদেশে। কিন্তু দীপ্তিবৌদির সেখানে মন টিকলো না। এ বড় আশ্চর্য কথা, এরকম আগে শোনা যায়নি।

দীপ্তিবৌদি একলা ফিরে আসার পর অনেকেই ধরে নিয়েছিল যে এবারে ওদের ডিভোর্স হবে। স্বামী-স্ত্রী আলাদা থাকলে সেরকমই মনে হয়। কিন্তু দীপ্তিবৌদি এসে উঠলেন শ্বশুরবাড়িতে। সরোজদা বছরে একবার দেশে আসেন, তখন দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীতে বেশ ভাব।

এইরকম ভাবেই কেটে যাচ্ছে বছরের পর বছর।

আনোয়ার শা রোডে কয়েকবার পায়চারি করতেই তিনটি ছেলে এসে আমাকে ধরল। একটা বেশ প্যাটার্ন করে আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তাকালো ত্যারছা চোখে।

—এখানে কী চাই দাদা?

—এ পাড়ায় নতুন মাল দেখছি।

—কিসের আশায় এখানে ঘোরাঘুরি হচ্ছে?

আমি অতিশয় সরল মুখ করে বললুম, আমার একটা চাবি হারিয়ে গেছে, এই রাস্তাতেই কোথাও পড়েছে। তাই দেখছি যদি খুঁজে পাই।

প্যান্টের একটা পকেট উল্টে বার করে এনে ফুটোটা দেখালুম। প্যান্টের একটা পকেটে ফুটো আছে বলেই চাবির গল্পটা মনে এসেছে।

—কিসের চাবি?

—বাড়ির, না গাড়ির, না আলমারির?

—পেতলের না স্টিলের?

আমি দ্বিতীয় ছেলেটির দিকে সপ্রশংস চোখে তাকালুম। বেশ ভাষাজ্ঞান আছে দেখছি, পাড়ার মাস্তান না হয়ে কবি হলেও তো পারত।

আমি বললুম, এই সাধারণ একটা পেতলের চাবি। আমার সুটকেসের।

এবারে দ্বিতীয় ছেলেটি স্তম্ভিত করে দিয়ে তার পকেট থেকে গোটা তিনেক চাবি বার করল। তার মধ্যে থেকে পেতলের একটা চাবি তুলে নিয়ে বলল, এটা তো? আমি এই একটু আগে কুড়িয়ে পেলুম!

আমতা আমতা করে বললুম, হ্যাঁ, এটাই মনে হচ্ছে।

—আলবাৎ এটাই। এক রাস্তায় কি একরকম দুটো চাবি পড়ে থাকবে?

—ঠিক বলেছেন, তা হলে ওটাই আমার। অনেক ধন্যবাদ।

আমার বাড়ানো হাতের ওপর একটা চাঁটি মেরে প্রথম ছেলেটি বলল, দাঁড়ান-দাঁড়ান, অত ব্যস্ততার কী আছে। সুটকেসের চাবি যখন বলছেন, আর এমন হন্যে হয়ে খুঁজছেন, তখন সুটকেসে ভালোই মালকড়ি আছে মনে হচ্ছে। আমরা কষ্ট করে খুজে দিলুম, কিছু ছাড়ুন।

—কত?

—কিছু না হোক, দুটো বড় পাত্তি।

—কুড়ি? চাবিওয়ালা ডেকে দু'টাকা আড়াই টাকায় নতুন চাবি পাওয়া যায়।

—সেদিন আর নেই, দাদা। একটা চাবিওয়ালা চট করে রাস্তা থেকে খুঁজে বার করুন তো? সাতদিন ধরে খুঁজলে যদি একজনকে পান। যাক গে পনেরোটা টাকাই দিন।

—পনেরো টাকায় একটা চাবি?

—আপনি যে বললেন, খুব দরকারি। ক্যাশবাক্স না কিসের? ঐ দেখুন বৃষ্টি এসে গেল, দিন দিন বারোটা টাকাই দিন! আর বেশি ঝুটঝামেলা করবেন না।

রাস্তা দিয়ে লোকজন যাচ্ছে আসছে, দুটি সাইকেল রিক্সাওয়ালা কাছেই দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদের দিকে। জানি, এদের কারুর কাছ থেকেই সাহায্য পাওয়া যাবে না।

বারোটি টাকা খসে গেল পকেট থেকে। নিজেকে বেশি চালাক প্রমাণ করবার জন্য এর পরেও দেঁতো হাসি দিয়ে বললুম, সত্যি বড্ড উপকার করলেন। চাবিটা আজই না পেলে এমন অসুবিধায় পড়তুম!

—পেলেন তো, এবারে শিগগির বাড়ি চলে যান। ফুটো পকেটে আর রাখবেন না যেন!

হনহন করে হেঁটে চলে এলুম মোড়ের দিকে। বাপরে, এমন ধুরন্ধর মাস্তান আমাদের নর্থ ক্যালকাটায় নেই। পকেটে সব সময় তিন চার রকম চাবি নিয়ে ঘোরে। চাবির গল্প আগেও কেউ কেউ বলেছে নিশ্চয়ই।

এখন এই মোড়ে দাঁড়ানোও বিপজ্জনক। তাহলে আমার গোয়েন্দাগিরির এখানেই ইতি! এ কাজে বেশ খরচও আছে দেখছি। অবশ্য এ কাজের ফি হিসেবে বড়মা আমাকে একগিনি আগেই দিয়েছেন।

ঐ আর একটা কাজ বাকি আছে। গিনিগুলো বিক্রি করা। সেটাই বা কী করে সম্ভব তাও জানি না।

ইলশেগুঁড়ি থেকে এখন বেশ ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে। কাছাকাছি সেরকম কোনো দোকানঘরও নেই যে আশ্রয় নেব। ভিজতেই লাগলুম। তারপর একটা ট্রাম আসতেই উঠে পড়লুম সেটায়।

আজকের মতন শুধু এইটুকুই জানা গেল যে দীপ্তিবৌদি কোনো ইস্কুলে পড়ান না, এত দূরের একটা দেয়াল-ঘেরা বাড়িতে আসেন। এটাও কম নয়। রীতিমতন রহস্যজনক ব্যাপার।

মাঝে মাঝে ভাবতে ভালো লাগে যে কোনো কোনো মানুষের ডাবল লাইফ আছে। বাড়িতে একরকম, বাড়ির বাইরে অন্য কোথাও গোপন আর একরকম জীবন। ঠিক ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিস্টার হাইড না হলেও দুটো একেবারে আলাদা।

দীপ্তিবৌদিকে অনুসরণ করা আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়। সব গোয়েন্দাদেরই একজন করে অ্যাসিস্টেন্ট থাকে, সাধারণত তারা বেশ বোকা বোকা হয়। পাঠকদের মন তারা উল্টো দিকে নিয়ে যায়।

আমারও একজন সহকারী দরকার। এমন একজন কেউ, যাকে দীপ্তিবৌদি কখনো দেখেননি।

মনে মনে চিন্তা করতে লাগলুম, সে রকম কাকে পাওয়া যায় গাঁট্টাগোট্টা

চেহারা দরকার, আর গোঁফ থাকলে ভালো হয়। আমি তাকে যা বলব সে তাই শুনবে। এমন কে আছে।

ট্রাম যখন এলগিন রোড পার হয়েছে, তখন আমার মনে পড়ল বাপির কথা। হ্যাঁ, বেশ একটু বোকাবোকা আছে, আবার গায়ে জোরও আছে। দরকার হলে পাঁচিল টাঁচিল ডিঙোতেও পারবে। আনোয়ার শা রোডের মাস্তানদের খপ্পরে যদি পড়ে, তা হলে দু'চার ঘা খেতেও পারবে যেমন, উল্টে দু'চার ঘা দিতেও পারবে সেরকম।

অবশ্য বাপির গোঁফ নেই, তা আর কী করা যাবে। ঐটুকু অভাব পুষিয়ে নিলেই চলবে। তা ছাড়া সহকারীর চেয়ে আমারই গোঁফ থাকাটা বেশি প্রয়োজনীয় ছিল। সহকারীর বেশি ব্যক্তিত্ব না থাকাই ভালো।

বাপি থাকে ভবানীপুরে। ওর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছে দেড়মাস আগে, তখনও বেকার ছিল, এর মধ্যে চাকরি পেয়ে গেছে কি? টপ করে ট্রাম থেকে নেমে পড়ে হাঁটা শুরু করলুম।

এটা একটা সৌভাগ্যই বলতে হবে যে বাপির বাড়ি পৌঁছেই দেখলুম, ঠিক তখুনি ও সেজেগুজে বেরুচ্ছে। আর এক মিনিট পরে এলে দেখা হতো না।

আমার কালো, রোগা পটকা চেহারার পাশে বাপিকে মনে হবে ঠিক দেবদূত। বাপি প্রায় ছ'ফুট এবং স্বাস্থ্যবান। গায়ের রং ফর্সা, আর সব সময় সাদা প্যাণ্টশার্ট পরতে ভালোবাসে। আজ সে একটা টাই-ও পরেছে গলায়। এই রকম চেহারার ছেলেরা মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভ হয়। যে-কোনো কোম্পানির সেলস্ ডিপার্টমেণ্টেই সুন্দর চেহারার ছোকরাদেরই শুধু চাকরি দেয়, এর মধ্যে কিছু একটা সেক্রের ব্যাপার আছে মনে হয়। সুতরাং বাপির বেকার থাকার কথা নয়। ও চাকরি পেয়েছেও কয়েকবার, কিন্তু কিছুদিন পরেই ছেড়ে দেয়।

আমাকে দেখে বাপি বলল, কী রে তুই এখন এলি? তাহলে বোস বাড়িতে, আমি ঘুরে আসছি।

—তুই কোথায় যাচ্ছিস?

—ব্যাঙ্কে। আমার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে একটার সময়।

বাপির মতন বেকার ছেলেদেরও ব্যাঙ্কে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট থাকে? দেশের বেশ উন্নতি হচ্ছে।

আমি বললুম, আমি আর একলা বসে থেকে কী করব? চল, তোর সঙ্গে যাই।

—তোকে কিন্তু বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। ম্যানেজারের সঙ্গে আমার কতক্ষণ লাগবে তার ঠিক নেই।

—ম্যানেজারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট?

—হ্যাঁ। তুই এসেছিস, ভালোই হয়েছে, নীলু। তুই আমার সঙ্গে কাজ করবি? তোকে আমি পার্টনার করে নিতে পারি।

আমার ধারণা ছিল, এই পৃথিবীতে বাপির মতন ছেলেরা সব সময় অন্যের সহকারী হয়। নিজের বুদ্ধিতে কিছু চালাবার ক্ষমতা এদের থাকে না।

—কিসের পার্টনার?

—আমি তো বিজনেস শুরু করছি। সব ঠিক হয়ে গেছে। ব্যাঙ্ক লোন দেবে।

—কিসের বিজনেস?

—চিংড়িমাছ!

—বাঃ।

একটু থেমে আমি ভাবলুম, একবার বলা যথেষ্ট না, তাই আরো দুবার বললুম, বাঃ! বাঃ!

—খুব ভালো প্রসপেকট। সুন্দরবনে ভেড়ি লীজ নিচ্ছি, বিরাট বড় এরিয়া, তোকে নিয়ে যাব একদিন।

আমি আবার তিনবার বাঃ বললুম।

—তুই ইন্টারেস্টেড?

—চিংড়িমাছে কে না ইন্টারেস্টেড ভাই?

—ভেরি গুড। তুই কাল থেকেই কাজে লেগে পড় তা হলে? তোকে সব বুঝিয়ে দেব।

—চিংড়িগুলো কোথায় আছে?

চলতে চলতে থমকে গিয়ে বাপি আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর বলল, তুই কি খাওয়ার কথা ভাবছিস? আমার বিজনেসের একটা চিংড়িমাছও কেউ খেতে পারবে না।

—চিংড়িমাছ কেউ খেতে পারবে না? কেন, বিষাক্ত?

—এক্সপোর্ট আইটেম। সব বাইরে চলে যাবে। বাজারে একটাও চিংড়িমাছ দেখতে পাস আজকাল?

—মাঝে মাঝে তো দেখতে পাই।

—বাজে কথা। সব বাইরে চলে যায়। বাঙালির চিংড়িমাছ খাবার কোনো দরকার নেই। বাঙালি ইলিশ খাক, ট্যাংরা খাক, আর ঐ যে ইয়ে, কী বলে, অ্যামেরিকান কই খাক। চিংড়ি হচ্ছে ফরেন এক্সচেঞ্জ।

—খুব ভালো কথা। কবে থেকে সব শুরু হচ্ছে।

—প্র্যাকটিক্যালি শুরু হয়েই গেছে বলতে পারিস। এখন ব্যাঙ্ক থেকে

লোনটা পেয়ে গেলেই...।

—তা হলে তুই এখন বেশ ব্যস্ত, বল!

—দারুণ ব্যস্ত। ডিটেইলড প্রজেক্ট বানাতে হচ্ছে, প্রচুর পেপার ওয়ার্ক, আর চিঠিপত্র লেখা...হ্যাঁ, তোকে আমি চিঠিপত্র ড্রাফটিং-এর কাজটা দিতে চাই। ট্যাক্সি, ট্যাক্সি!

ট্যাক্সিতে চাপবার পর বাপি নিজেই কৈফিয়তের সুরে বলল, খুব কাছেই ব্যাঙ্কটা, তবু ট্যাক্সিতে যেতে হয়, বুঝলি না, নইলে ওরা ফালতু পার্টি ভাববে।

তারপর একটু নিচু গলায় বলল, এখন থেকে লোকজনের সামনে তুই আর আমায় বাপি বলে ডাকিস না। মিঃ সরকার বলবি। আর আপনি বলবি। বুঝলি?

এলগিন রোডের কাছে যেখানে আমি ট্রাম থেকে নেমেছিলুম, সেখানেই ব্যাঙ্ক। দরোয়ানও একবার তাকিয়ে দেখল না আমরা ট্যাক্সি থেকে নামছি কি না।

বাপি বেশ সাড়ম্বরে প্যাণ্টের পকেট থেকে পার্স বার করে অনেকক্ষণ খুঁজে খুচরো টাকা তুলে ভাড়া মেটালো। তারপর এক প্যাকেট বেশ দামি সিগারেট কিনে ঢুকল ভেতরে। আমি ক্যাশ কাউন্টারের সামনের বেঞ্চে বসে রইলুম।

বাপি ওর দামি সিগারেট আমাকে অফার করেনি। ওটা বোধহয় ম্যানেজারের জন্যে। নিজের সিগারেট বার করে ধরাতে হলো। সময়টা বাজে নষ্ট হচ্ছে। বাপিকে আমি অলস আর প্রেম-রোগী বলে জানতুম, সেই হঠাৎ ব্যবসায়ী বাঙালি হতে চলেছে। একটা কোম্পানীর ডিরেকটর। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট। তাকে আমার সহকারী গোয়েন্দার ভূমিকা নিতে রাজি করানোর চেষ্টাই একটা দুরাশা।

বাপিকে তা হলে পাওয়া গেল না, আর কার কথা ভাবা যায়? বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বেকার কেউ নেই। তাছাড়া যে-কজন নিজেরাই প্রেমে জড়িয়ে পড়েছে, তারা নিশ্চয়ই এখন অন্য কোনো মহিলাকে ফলো করতে রাজি হবে না। তাদের প্রেস্টিজে লাগবে।

বাপিই সব দিক থেকে খুব উপযোগী ছিল। চাকরির মতনই, ওর কোনো বাঁধা প্রেম নেই। ধরে আর ছাড়ে। এর মধ্যে সে অবস্থা নিশ্চয়ই বদলায়নি। যে-মানুষ প্রেমে হাবুডুবু খায়, তার মাথায় কখনো এরকম উচ্চাঙ্গের ব্যাবসার চিন্তা আসতে পারে না। শুধু ব্যাবসা নয়। একেবারে এক্সপোর্ট!

কাউন্টারের সামনে বেশি লোক নেই, একজন মহিলা আর জনাচারেক পুরুষ।

যথারীতি অলসভাবে কাজকর্ম চলেছে। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা নিশ্চয়ই কোনো জায়গা থেকে যথাসম্ভব আস্তে হাঁটার ট্রেনিং নেয়।

হঠাৎ সব কিছু বদলে গেল।

ঠিক যেন আমাকে সাহায্য করবার জন্যই এই সময় হুঁড়মুড়িয়ে ঢুকে এলো পাঁচ-ছ'জন ছোকরা। একজন বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠল, কেউ নড়বে না!

বাংলা খবরের কাগজে প্রায়ই ব্যাঙ্ক ডাকাতির এমন খুঁটিনাটি বিবরণ পড়তে হয় যে এর পরবর্তী চিত্রনাট্য আমার মুখস্থ। সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়িয়ে জয় গৌর ভঙ্গিতে হাত দুটো উঁচু করে রইলুম।

কেউ চ্যাঁচামেচি করল না, ভদ্রমহিলা অজ্ঞান হয়ে গেলেন না। সবাইকে যেন স্ট্যাচু খেলার মতন স্ট্যাচু হতে বলা হয়েছে। আমি আড়চোখে দেখলুম একজন ডাকাত ম্যানেজারের ঘরে ঢুকছে, হাতে বেশ একখানা বড় মতন রিভলভার, কিংবা সেটা পাইপগানও হতে পারে, কখনো তো চোখে দেখিনি সেটা কী বস্তু!

এই রে। এখন ম্যানেজারের ঘরে বাপি রয়েছে। সে আবার দুঃসাহস দেখাবার চেষ্টা করবে না তো? ডাকাতের গুলিতে প্রাণ দিলে শুধু খবরের কাগজে একদিনের জন্য নাম থাকবে। এত ছোট কারণে কি প্রাণ দেওয়া উচিত?

ছেলেগুলোর সাহস আছে বটে, মুখোস পর্যন্ত আঁটেনি, মুখগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পরে যদি আমি কোনোদিন হঠাৎ রাস্তায় দেখে ফেলি? নাঃ, ওদের মুখগুলো মনে রাখবার কোনো চেষ্টাই করব না। চলন্ত রেলের কামরা থেকে বাইরের দৃশ্য, হেড মাস্টারমশাই বেত নিয়ে ক্লাসে ঢুকছেন, শ্যাম থাপা টি ভিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে, বাজারে প্রচুর চিংড়ি মাছ এসেছে, দ্বিতীয় সেতুর ওপর দিয়ে গঙ্গা পার হচ্ছি, ভাবতে লাগলুম এসব।

পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই ব্যাপারটা চুকে গেল। গুলিগোলা কিছু চলেনি। নেহাৎ নিয়মরক্ষার জন্য বাইরে দুটি বোমা ফাটিয়ে চলে গেল ছোকরারা। তারপর শুরু হলো হুড়োহুড়ি। এবারে দেখা গেল চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরাও কত জোরে ছুটতে পারে।

ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো বাপি। তার চুল উস্কোখুস্কো, টাইয়ের গিঁট আলগা। চিত্রনাট্য অনুযায়ী ডাকাতরাই নিশ্চয়ই তার চুল এলো করে টাই খুলে দিয়ে গেছে।

আমি বাপির হাত ধরে টেনে বললুম, শিগগির চ, পুলিশ আসবার আগে। ব্যাঙ্ক ডাকাতি হলেই পুলিশ কাস্টোমারদের সঙ্গে গল্প করে অনেকক্ষণ ধরে।

বাপি আলুথালু গলায় বলল, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। আমার ডব্‌ল সর্বনাশ হলো।

—কেন, তোর এই ব্যাঙ্কে অনেক টাকা ছিল? তোর টাকা তুই ঠিকই পাবি।

—ধ্যাৎ! সে কথা বলছি না। আর কি ব্যাঙ্ক আমায় লোন দেবে এখন? ম্যানেজারের সঙ্গে কথা প্রায় পাকা হয়ে এসেছিল...ব্যাটারা যদি আর এক ঘণ্টা পরেও আসত!

—দুটোর পর ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যায়, সে কথা ডাকাতরাও জানে! সোওয়া একটা থেকে পৌনে দুটোর মধ্যেই সবচেয়ে ভালো ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়।

—এখন কী হবে। প্রায় পনেরো-ষোলো লাখ নিয়ে গেছে, এখন আর ওরা আমায় টাকা দেবে?

—আরে পনেরো-ষোলো লাখ তো একটা ব্যাঙ্কের পক্ষে নস্যি। কিছুই না। ব্যাঙ্ক ডাকাতির পর তুই কোনোদিন কোনো ম্যানেজারকে কাঁদতে দেখেছিস?

—আমি আগে কখনো ডাকাতিই দেখিনি।

—আহা, খবরের কাগজের ছবির কথা বলছি। নেভার! আজও এর পর ম্যানেজার টিফিনে কাটলেট খাবে। কেন জানিস? ওদের কোনো লস্-ই নেই, সব টাকাটাই ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানি দিয়ে দেবে।

—তা হলে ইনসিওরেন্স কোম্পানির ম্যানেজার কাঁদবে তুই বলতে চাস?

—তা আমি জানি না। ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে সোজাসুজি ডাকাতিও হয় না। এদের কথা কাগজেও লেখে না। তারা টাকাটা কীভাবে ম্যানেজ করে তা আমি বলতেও পারব না।

—দূর ছাই ইনসিওরেন্স! আমার কারবার ব্যাঙ্কের সঙ্গে। এই ডামাডোলের পর ম্যানেজার কি আর আমার সঙ্গে দেখা করবে শিগগির?

—চান্‌স খুব কম। কাল কাগজে ছবি বেরুচ্ছে, সুতরাং ম্যানেজার হিরো হয়ে যাচ্ছে। এখন এই রোমহর্ষক গল্পটা বাড়িতে, আত্মীয়স্বজনের কাছে, পাড়া-পড়শীর কাছে বলতে হবে অনেকবার, এখন ম্যানেজারের সময় কোথায়? লোন-ফোনের মতন অর্ডিনারি জিনিস নিয়ে তিনি মাথা ঘামাবেন কী করে?

পুলিশ এখনো আসেনি, রাজ্যের উটকো কৌতূহলী লোক ছুটে যাচ্ছে ব্যাঙ্কটার দিকে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি ট্রাম লাইনের উল্টো দিকে।

বাপি ভেঙে-পড়া গলায় বলল, ভেবেছিলুম ডিল্‌টা আজ কম্‌প্লিট হলে তোকে এর পর লাঞ্চ খাওয়াব। তুই খেয়ে বেরোসনি নিশ্চয়ই?

—না।

—কিন্তু লাঞ্চ আর আজ হলো না। মুড়ি-ছোলাসেদ্ধ খেতে চাস তো বল্।

—চল্, আমিই তোকে আজ লাঞ্চ খাওয়াব, বাপি। তোর সঙ্গে আমার একটা বিজনেস ডিল আছে।

—বিজ....তুইও বিজনেস করছিস নাকি?

—ব্যাবসা ছাড়া বাঙালির উন্নতির আর কোনো রাস্তা আছে? তুই কী খেতে চাস, চাইনিজ, না মোগলাই?

—তুই আগেই ক্যাপিটাল পেয়ে গেছিস? কে দিল?

—কলকাতা শহরে টাকার অভাব? হাওয়ায় উড়ছে। ধরতে জানলেই হলো। পুলিশের গাড়ি এসে পড়ল, চল, আমরা এই ট্রামটায় উঠে কাটি।

ধর্মতলায় এসে আমরা নিজাম হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়ে দুটো করে রোল খেয়ে লাঞ্চ সারলুম। বাপি যতবারই আমায় বিজনেস-এর কথা জিজ্ঞেস করে, ততবারই আমি হাত তুলে বলি, দাঁড়া, আগে খাওয়াটা শেষ করতে দে।

বাপি এক সময় অধৈর্য হয়ে বলল, আমার হলো ডবল বিপদ, আর তুই এমন ভাব করছিস, যেন রাজস্থান লটারির টিকিট পেয়েছিস?

—তোর ডবল বিপদটা কী করে? একটা তো বুঝলুম, এই ব্যাঙ্কের টাকা না-পাওয়ার ব্যাপারটা।

—মিতুনকে আমি কথা দিয়েছিলুম লঞ্চে করে সুন্দরবনে নিয়ে যাব।

—মিতুন?

—তুই চিনবি না। আমার কোম্পানির জয়েন্ট ডিরেকটার করেছি মিতুনকে। আমার জীবনের, আমার হৃদয়ের, আমার সব কিছুরই জয়েন্ট ডিরেকটার হবে মিতুন।

—তুই তা হলে বিয়ে করছিস?

—জাস্ট অর্ডিনারি বিয়ে নয়। বললুম না, সব ব্যাপারেই জয়েন্ট পার্টনারশিপ, সেই জন্যই তো আমার বিজনেসটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আরম্ভ করা দরকার।

—তা রোববার সুন্দরবন বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার অসুবিধে কোথায়? কতই বা খরচ!

—তুই বুঝছিস না! মিতুন কি এমনি এমনি আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে নাকি? সে রকম মেয়েই না। এই রবিবারই আমাদের ঐ ভেড়ির টাকা অ্যাডভান্স করার কথা। কোম্পানির জয়েন্ট ডিরেকটার হিসেবে মিতুন সাইট দেখতে যাবে। আমি যত টাকা দেব, মিতুনও তত টাকা দেবে।

—প্রেমিকারা আজকাল টাকাও দেয় নাকি?

—খবর্দার প্রেমিকা প্রেমিকা বলবি না। আমরা সব ব্যাপারে সমান। তাই আমরা জয়েন্ট ডিরেকটার।

—তা ক'দিনের জন্য সুন্দরবন যাওয়াটা পেছিয়ে গেল, এই তো?

—এই নিয়ে পাঁচবার পেছোলো। প্রত্যেকবার ফাইনাল হতে হতে একটুর জন্য কেঁচে যায়। এর পর মিতুন আর আমায় বিশ্বাস করবে?

—ব্যাঙ্ক ডাকাতির ব্যাপারটা তো কাগজে পড়েই বুঝবে।

—ও যা জেদি মেয়ে, ও নিশ্চয়ই ভাববে, ঐ ব্যাঙ্কে যে ডাকাতি হবে তা আমি আগেই জানতুম।

—সত্যিই জানতিস নাকি?

—নীলু, আমার এই দুঃসময়ে তুই ঠাট্টা করছিস?

—তা হলে যতদিন না ব্যাঙ্কের লোনটা পাচ্ছিস, ততদিন তোর মিতুনকে নিয়ে সুন্দরবন ভ্রমণের কোনো আশা নেই দেখা যাচ্ছে।

—তুই কোনো ভেড়ির মালিককে চিনিস?

—এর পর তুই কোনদিন জিজ্ঞেস করবি আমি কোনো ব্যাঙ্কের মালিককে চিনি কিনা।

—আবার ঠাট্টা? বুঝেছি, তোর দ্বারা কোনো উপকার হবে না। এবারে তোর বিজনেসটা কী বলতো?

—হ্যাঁ, এবারে বলা যেতে পারে। এলগিন রোডের ঐ ব্যাঙ্ক থেকে তোর আপাতত কিছু কাজ হবার আশা নেই। ওদিকে তোর এখন যাওয়াই উচিত নয়। সাধারণত দেখা যায়, যতদিন না পরের ডাকাতিটা হচ্ছে, ততদিন আগের ব্যাঙ্কটা বেশ সরগরম থাকে, কাগজে লেখালেখি হয়, সবাই আলোচনা করে। পরের ডাকাতিটা হলেই আগেরটার কথা সবাই ভুলে যায়। এখন, দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশের ব্যাঙ্ক ডাকাতরা খুব একটা অ্যাকটিভ নয়, তারা মাসে চারটের বেশি ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে উঠতে পারে না। কেমন কিনা? এক সপ্তাহে দুটো ডাকাতিও হয়েছে, তবে তা খুব রেয়ার। অ্যাভারেজে মাসে চারটেই হয়। এই মাসটা একত্রিশ দিনে। তা হলে সাত পূর্ণ তিনের-চার দিন পর তুই নেক্সট ডাকাতিটা আশা করতে পারিস। আট দিনই ধর, স্কোয়ার ফিগার হলে সুবিধে হয়।

—তুই কী বলছিস নীলু? তোর মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে?

—এক্ষুনি সব পারফেক্টলি ক্লিয়ার করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। অর্থাৎ হাতে রইল আট দিন সময়। এই আট দিন তোর হাতে কোনো কাজ নেই। মিতুন রেগে থাকবে, তাকে নিয়ে এখন ঘুরে বেড়ানোও আউট অব দা কোয়েশ্চেন। সুতরাং এই আট দিন তুই পুরোপুরি ফ্রি। এর মধ্যে তুই একটি মেয়েকে ফলো করবি।

—অ্যাঁ?

—তুই আমার কথা ফলো করতে পারছিস না? সকাল দশটা থেকে রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত একটা মেয়েকে ফলো করতে হবে তোকে। তিন চারদিনই যথেষ্ট।

—এটা তোর বিজনেস?

—হ্যাঁ। মনে কর, আমি একটা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি খুলেছি। তুই আমার সহকারী কিংবা পার্টনার হতে পারিস, অথবা যদি চাস ফুরনেও কাজ করতে পারিস। ইনফর্মেশান এনে দিবি, তার বদলে ফি নিয়ে যাবি। আপাতত একটি মহিলার সারা দিনের অ্যাকটিভিটি জানার কাজটাই হাতে এসেছে। একেবারে বিজনেস ডিল ভাই, খবর দিবি, হাতে হাতে টাকা নিয়ে যাবি!

—শালা, এবার তোর পেছনে আমি একটা লাথি কষাবো! তোর প্রেমিকার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ হয়েছে বলে আমি ঘুরব তার পেছনে পেছনে!

—প্রেমিকা আবার এর মধ্যে এলো কোথা থেকে? ভদ্রমহিলা আমার বৌদি হন।

—তোর আবার দাদা জন্মালো কবে? আমি আজই যাচ্ছি তোদের বাড়িতে। মাসিমাকে বলব, আপনার গুণধর ছেলে এখন এইসব শুরু করেছে।

—তুই এখনো সীরিয়াসলি নিচ্ছিস না, বাপি! এটা পিওরলি প্রফেশনাল ব্যাপার। জাস্ট একটা কাজ। ডিগনিটি অফ ওয়র্ক বলে একটা কথা আছে না? ঝাড়ুদারের কাজ, আর—ইয়ে—ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কাজ দুটোই সমান, কারণ দুটোই কাজ। এটাও সেরকম।

—ভদ্রমহিলা কে?

—সেটা আপাতত সিক্রেট। উনি আমাদের ক্লায়েন্ট। না-না, ভুল হলো, একজন ক্লায়েন্ট আমাদের এই ভদ্রমহিলা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে বলেছেন। এসব ব্যাপারে সিক্রেসি মেইনটেইন করা খুব জরুরি ব্যাপার।

—তুই নিজে ঐ ভদ্রমহিলার পেছন পেছন ঘুরছিস না কেন?

—তার কারণ, উনি আমায় চেনেন। আমি চেষ্টা করেও ধরা পড়ে গেছি। তোর মুখটা ওঁর কাছে অচেনা। সেইটেই তোর সুবিধে। কী করে মেয়েদের ফলো করতে হয়, আশা করি সে ব্যাপারে তোর কোনো ট্রেনিং-এর দরকার নেই। তুই নিজেই ঐ বিদ্যার একটা ট্রেনিং স্কুল খুলতে পারিস।

এবার ভুরু কুঁচকে একটুখানি চিন্তা করল বাপি। আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলালো কয়েকবার। ওর যেন একটু-একটু আগ্রহ জন্মাচ্ছে।

এবারে জিজ্ঞেস করল, ভদ্রমহিলাকে দেখতে কেমন?

—রোগা-পাতলা ছিমছাম চেহারা। তবে কুড়ি পঁচিশজন মেয়ের মধ্যে বসে

থাকলে ওঁর দিকেই আগে চোখ পড়বে।

—ম্যারেড, না আন্‌ম্যারেড?

এবার আমি সপ্রশংস দৃষ্টিতে বাপির দিকে তাকালুম। এই না হলে বাপি? সাধে কি আর আমি ওকে বেছেছি। বাপির চেহারা দেখে ও মিনিট পাঁচেক ওর চকচকে কথা শুনে যে-কেউ মুগ্ধ হবে। কিন্তু মিনিট পনেরো কথা বললেই বোঝা যায়, ওর হেড অফিসে অনেকখানি জায়গা ভাড়া দেবার জন্য খালি আছে। যদিও, দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ মেয়েই বাপির মতন ছেলেরই প্রেমে পড়ে।

আমি বললুম, বৌদিরা সাধারণত ম্যারেডই হয়। কোনো আনম্যারেড বৌদির কথা আমি এখনো শুনিনি।

বাপি হতাশ ভাবে বলল, ধুস্!

—দ্যাখ বাপি, আমি তোকে শুধু ঐ ভদ্রমহিলা সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলেছি, তোকে তার প্রেমে পড়তে হবে, এমন কোনো কথা নেই।

—তুই বললি, এখন আমার আটদিন ছুটি। এই আটদিন আমি শুধু শুধু একজন মহিলার পেছনে ঘুরে বেড়াব?

—চমৎকার কাজ কি না বল ; কাজও করা হবে, মনে ফুর্তিও থাকবে। ওয়ার্ক উইথ প্লেজার যাকে বলে!

—কিন্তু এতে আমার লাভটা কী হবে?

—তুই তোর কাজের পারিশ্রমিক পাবি।

—মহিলা যদি কোনো রেস্তোরাঁয় ঢোকেন, কিংবা সিনেমায় যান...

—এই ধরনের কাজে এক্সপেন্‌স অ্যাকাউন্‌ট বলে একটা ব্যাপার থাকে। তোর যা বাড়তি খরচ-খরচা হবে বিল করে দিবি, সেটা তোকে দিয়ে দেওয়া হবে। তবে একটা কথা। তুই তো চা খেতে ভালোবাসিস না। এ কাজের জন্য চা-খাওয়া কিন্তু এসেনশিয়াল। কারুকে দিনের পর দিন ফলো করতে হলে কত চায়ের দোকানে যে বসতে হবে তার ঠিক নেই।

—চায়ের দোকানে বসে আমি চায়ের বদলে ডবল ডিমের ওমলেট খাব, কাটলেট খাব। সে আমি ঠিক ব্যবস্থা করে নিতে পারব। শোন নীলু, তোর এই কাজে আমি সাহায্য করতে রাজি আছি। কিন্তু তার বদলে তোকেও একটু সাহায্য করতে হবে আমাকে।

—নিশ্চয়ই! কী সাহায্য বল্।

—তোকে একটু মিতুনকে ম্যানেজ করতে হবে।

—মিতুনকে? তাকে তো আমি চিনিই না।

—হ্যাঁ চিনিস। আগে তোকে ইচ্ছে করেই বলিনি। ওদের বাড়িতে এক সময় তোর যাতায়াত ছিল। মিতুন তোকে দাদার মতন মনে করে।

—ওদের বাড়িতে...আমি ?

—সিঙ্গিবাগানের দেব-দের বাড়ি। ও বাড়ির মেজকর্তার সেজ মেয়ে হচ্ছে মিতুন।

—মেজো কর্তার....মানে....ঝুঁকোবাবুর মেয়ে.. .মিতুন?

৩

সারাদিন ঘোরাঘুরির পর আমি বাসে বসে মিতুনের কথা ভাবতে ভাবতেই বাড়ি ফিরছিলুম। মিতুনের মুখখানা আমার ঠিক মনে নেই. ওকে খুব সম্প্রতি দেখিও নি।

ঝুঁকোবাবুরও দু'পক্ষের বিয়েতে চারটি .না পাঁচটি যেন মেয়ে। একেবারে শেষে একটি ছেলে জন্মেছে। সেই ছেলেটির জন্মের আগে মিতুনই যখন সবচেয়ে ছোট মেয়ে ছিল, তখন তাকে ছেলে সাজিয়ে রাখা হতো। ছেলেদের পোশাক, ছেলেদের মতন চুল ছাঁটা, ছেলেদের মতন বন্দুক-পিস্তল খেলনা। আর দুরন্তও ছিল বটে! সেইজন্য ওর ডাকনাম মিলিটারি। খেলনা বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে ও ওদের বাড়ির বেলজিয়াম গ্লাসের আয়না ভেঙেছে, একজন দাসীর পা খোঁড়া করে দিয়েছে। একদিন তো আমাদের সামনেই সে ছাদ থেকে একটা বেড়াল ফেলে দিয়েছিল।

একটু বড় হয়েও, সেভেন-এইটেও মিতুন ফুলপ্যান্ট অর শার্ট পরেই স্কুলে যেত। দুরন্তপনাও কমেনি একটুও। পুরোপুরি টম বয়। সেই তখনই ওকে আমি শেষ দেখি। সেই মিতুন?' বাপির মতন ছেলের সঙ্গে সে জীবন নামক জয়েন্ট স্টক কোম্পানির সমান অংশীদার হতে রাজি হয়েছে? বাপির জন্য আমার করুণা হওয়া উচিত।

তিন-চার বছর আগে একদিন বাজারে ও-পাড়ার একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি উৎকট চোখমুখ করে বলেছিলেন, ঝুঁকোবাবুর মিলিটারি মেয়ে কী করেছে জানো? পাড়ার একটা ছেলে ওকে কলেজে যাওয়ার পথে কী নাকি আওয়াজ দিয়েছিল। তারপর একদিন ওদের বারান্দা থেকে সেই ছেলেটির মাথায় এক ডেচ্‌কি ফুটন্ত গরম জল ঢেলে দিয়েছে! ছেলেটিকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছিল, মরেই যেত আর একটু হলে! এখন ঐ মেয়েকে দেখলে পাড়ার বাঘা

বাঘা মাস্তান ছেলেরা ভয়ে ছুটে পালায়।

বীরাঙ্গনা মেয়েরা খুব চমৎকার ব্যাপার। তাদের শ্রদ্ধা করা উচিত। কিন্তু দূর থেকে। তাদের কাছাকাছি যাওয়া কোনো কাজের কথা নয়। শাস্ত্রেই বলেছে, নখী, শৃঙ্গী ও বীরাঙ্গনাদের থেকে সব সময় শত হস্ত দূরে থাকবে।

বাসটা এক জায়গায় বাঁক নিল। আমার পাশে যে ভদ্রলোক বসেছিলেন, তিনি একটু আগে নেমে গেছেন। সীটটা খালি। পরের স্টপেই আমার পাশে এসে বসল আর একজন।

আমি একেবারে ভূত দেখার মতন চমকে উঠলুম। দীপ্তিবৌদি!

এর আগে আর কোনোদিন দীপ্তিবৌদির সঙ্গে আমার ট্রামে-বাসে দেখা হয়নি। আর আজই পরপর দু'বেলা। দীপ্তিবৌদিই কি এবার আমায় ফলো করছেন নাকি?

মিষ্টি করে হেসে দীপ্তিবৌদি বললেন, এই দ্যাখো, আমি তোমার কথাই ভাবছিলুম। আর তোমার সঙ্গেই আমার আবার দেখা হয়ে গেল।

—আমার কথা ভাবছিলেন?

—হ্যাঁ। সকালে তোমাকে মিনিবাসে দেখবার পর থেকেই মনের মধ্যে একটা কথা ঘুরছে।

—হ্যাঁ, অ্যাঁ! মানে, আমি তো আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম ওদিকে।

—সেজন্যই তো। তার মানে দুপুরের দিকে এখন সেরকম কোনো কাজ থাকে না। তাহলে তুমি কয়েকটা দিন আমায় একটু সাহায্য করবে?

—সাহায্য? আপনাকে? নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! কী করতে হবে বলুন তো!

—সে তোমাকে আমি পরে বলে দেব! বিশেষ কিছু না, তবে আমার সঙ্গে সঙ্গে একটু ঘুরতে হবে তোমাকে।

—আপনার সঙ্গে ঘুরব?

—কেন, আপত্তি আছে? তোমার বান্ধবীরা রেগে যাবে? আমি তো তোমার চেয়ে বয়েসে কত বড়!

দীপ্তিবৌদি আমার চেয়ে বড় জোর বছর পাঁচেকের বড় হতে পারেন, কিন্তু দেখায় আরো কম। এখন বাসের অন্য লোকেরা যদি ওঁকে আমার বান্ধবী ভাবে, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কিন্তু আমি যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। এসব কী বলছেন দীপ্তিবৌদি? কাল থেকে আমি ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরব সারাদিন? উনি কি দরজার আড়াল থেকে বড়মার কথা শুনতে পেয়েছিলেন? তাও তো সম্ভব নয়, বড়মা

কথা বলেছিলেন ফিসফিস করে। ঐ ঘরের মধ্যে টেপ রেকর্ডার লুকোনো আছে?

—কী, নীলু, উত্তর দিচ্ছ না যে? রাজি তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে রাজি, নিশ্চয়ই রাজি!

—কাল তাহলে তুমি সাড়ে দশটার সময় আমাদের বাড়ি চলে এসো।

—আপনাদের বাড়ি?

—আমিও তোমাদের বাড়ি যেতে পারি। তুমি কোথায় থাকো বলো? কিংবা, মাঝামাঝি কোনো জায়গায়, তুমি এই এগারোটা আন্দাজ এসপ্লানেডে চলে আসতে পারবে? সুরেন ব্যানার্জি রোড আর চৌরঙ্গির মোড়ের বাস স্টপে?

—হ্যাঁ, আসব। এগারোটা তো!

—আমায় যেন বেশিক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখো না।

—আমি পাঁচ মিনিট আগে আসব।

—বাঃ, শিভালরাস ইয়ংম্যান! তুমি সকালে বৃষ্টি ভেজোনি তো? একটু পরেই তো বৃষ্টি নামল!

—খুব বেশি না! সেরকম বৃষ্টিও তো হয়নি।

একটুক্ষণ চুপ করে রইলুম দু'জনে। বাসটা বেশ ফাঁকা। এরকম সময় কেন এত ফাঁকা বাস তা কে জানে। কোনো লোক দরজায় ঝুলছে না, ভেতরেও কেউ দাঁড়িয়ে নেই।

দীপ্তিবৌদি আবার অতি সরল মুখ করে জিজ্ঞেস করলেন, কালকে মা তোমার সঙ্গে দরজা বন্ধ করে কী কথা বলেছিলেন বলো তো? খুব যেন একটা গোপন কথা। দেখে আমার খুব ভালো লাগল। আজকাল তো মা কারুর সঙ্গেই ভালো করে কথা বলেন না। তুমি ওঁর ছোটছেলের বন্ধু ছিলে....তোমাকে দেখে তাই মন খুলতে পেরেছেন।

আমার বুক ধড়াস ধড়াস করছে। কিন্তু আমায় বিচলিত হলে চলবে না। এবার আমাকে একটু আপার হ্যাণ্ড নিতে হবে।

—কাল বড়মা আমায় কী বলেছেন, আপনি জানেন না?

—না তো?

—সত্যি জানেন না?

—বাঃ, দরজা বন্ধ ছিল, তাছাড়া তোমরা না বললে আমি জানবই বা কী করে?

আমি মনস্থির করে ফেলেছি। এসব ক্ষেত্রে অর্ধ-সত্যই হচ্ছে প্রকৃষ্ট পথ। তা ছাড়া, এতে আমার দায়িত্বও অনেকটা কমে যাবে।

আমি বললুম, বৌদি—সকালবেলা আপনাকে দেখেই একটা কথা বলব বলব ভেবেলিুম, কিন্তু বলা হয়নি। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে আপনাকে জানান উচিত।

—কী বলো তো? কী ব্যাপার?

বাসের চারদিকে আমি একবার চোখ বুলিয়ে গলা নিচু করে বললুম, এখানে ঠিক বলা যাবে না। চলুন, আপনার সঙ্গে আমি নামছি, নেমে বলব।

বাকি পথটা বেশ একটা সাসপেন্স রেখে আমি চুপ করে রইলুম।

তারপর দীপ্তিবৌদির স্টপ আসতেই দু'জনে নেমে পড়ে, আমি একটা সিগারেট ধরালুম। বড় একটা টান দিয়ে বললুম, ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে বড়মা আমাকে একগাদা মোহর বিক্রি করতে দিয়েছেন।

—মোহর?

—মানে সোনার গিনি। দুটো তো একই।

—না, এক নয়। সে যাই হোক, তা বিক্রি করতে দিয়েছেন তোমাকে, আমি কি করব বলো? ওঁর জিনিস উনি বিক্রি করবেন......

—না, আমি ভাবলুম, আপনাকে একবার জানানো দরকার।

—ক'খানা?

—পনেরোটা। না স্যরি। চোদ্দটা। সাত দু'গুনে চোদ্দ। এগজ্যাকটলি সাত জোড়া।

—গিনি আবার জোড়া হয় বুঝি।

—না, মানে, দু'খানা দু'খানা করে গুনেছিলাম কিনা।

—চোদ্দটা গিনি? সে যে অনেক টাকা দাম।

—আমার ঠিক আইডিয়া নেই।

—সোনার গিনি তো। একসঙ্গে এতগুলো বিক্রি করছেন, কই, বাড়িতে কোনো উৎসব টুৎসব তো নেই এখন! মা এত টাকা দিয়ে কী করবেন।

—সেও তো একটা কথা!

—মাকে তা হলে জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে!

—খবর্দার, খবর্দার! বড়মা আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে, কারুকে বলা চলবে না! আপনাকে যে আমি বলেছি, এটা বড়মা জানতে পারলে আর আমায় আস্ত রাখবেন না!

—তা হলে তুমি আমায় বললে কেন? আমি যদি কোনো কথা তোমায় গোপন রাখতে বলি, তাও তুমি অন্যদের বলে দেবে?

—না-না, সেরকম ব্যাপার নয়। আমি ভাবলুম আপনাদের বাড়ির সম্পত্তি

বড়মা হঠাৎ বিক্রি করে দিচ্ছেন, আপনারা কেউ জানবেন না......

—আমাদের বাড়ির সম্পত্তি আবার কী? তুমি জানো না, ও বাড়িতে যে যা পারে, সে তাই বিক্রি করে দেয়। অবশ্য মা'র তো বিক্রি করার অধিকার আছেই!

—তবু, ঐ সব গিনি, রেয়ার জিনিস, আজকাল কেউ চট করে বিক্রি করে না!

—তুমি এক কাজ করতে পার। তুমি খবর নাও, বাজারে এখন গিনির কী রকম দাম । তারপর তুমি এগুলো আমায় দিয়ে দিও, টাকাটা আমি তোমায় দিয়ে দেব।

—এক্সেলেন্ট আইডিয়া! এতে আমার কী সুবিধে হলো বলুন তো? গয়নার দোকানে গিনি বিক্রি করে আমার চুরির দায়ে ধরা পড়ার সম্ভাবনাটা উপে গেল। অতগুলো গিনি নিয়ে আমি কোনো দোকানে যেতাম.....একটা আধটা হলে অবশ্য কেউ মাথা ঘামায় না!

—তা হলে নীলু, কাল এগারোটা?

—হ্যাঁ, তা হলে আমি ওগুলোও নিয়ে আসব।

দীপ্তিবৌদি চলে গেলেন বাড়ির দিকে।

আমি আরো একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম সেখানে। বেশ একখানা ঘটনাবহুল দিন গেল। এর মধ্যে ব্যাঙ্ক-ডাকাতির ব্যাপারটাই সবচেয়ে সাদামাটা। কোনো উত্তেজনাই হলো না। সিনেমায় এর চেয়ে অনেক ভালো দেখা যায়।

যাই হোক, সব ভালো যার শেষ ভালো। দীপ্তিবৌদির সঙ্গে রাত্তিরের সাক্ষাৎকারটি যেন নিখুঁত নুন ঝাল দিয়ে অনবদ্য একটি রান্না। অনেকক্ষণ মুখে স্বাদ লেগে থাকে।

বাড়ি ফিরলুম যখন, তখন রাত্তির মাত্র সোওয়া ন'টা। অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশ তাড়াতাড়ি ফিরেছি। আজ কারুর মুখ ভার দেখতে হবে না।

আমরা থাকি একটা দোতলার ফ্ল্যাটে, তিনখানা ঘর। তার মধ্যে সিঁড়ির কাছের ঘরটা আমার আর ছোটকাকার। অবশ্য ছোটকাকাই ঘরটার তিনচতুর্থাংশ দখল করে রেখেছে। আমার শুধু একটা খাট আর একটা সুটকেস, তারও তালা নেই। ছোটকাকা কখনো ইস্ত্রি করা শার্ট না থাকলে কিংবা খুচরো পয়সার অভাব হলেই আমার সুটকেস হাঁটকে দেখবে। বেকারদের কোনো প্রাইভেসি থাকে না।

আমাদের ঘরের পরে ছোট ছাদ, তারপর আর দু'খানা ঘর। এই ছাদটাই আমার রাত্তিরের মরূদ্যান।

খেয়েদেয়ে উঠে ছোটকাকার কিছুক্ষণ শুয়ে শুয়ে ধ্যান করা অভ্যেস। তখন

আলো জ্বালা চলবে না, ঘরের মধ্যে সামান্য শব্দ করাও চলবে না। এরকমভাবে প্রায় ৪৫ মিনিট পর ছোটকাকা ঘুমিয়ে পড়ে। তখন আমি আলো জ্বেলে বই পড়তে পারি, যত রাত ইচ্ছে জাগতে পারি। ঐ ধ্যানের প্রভাবে ছোটকাকার আর ঘুম ভাঙে না।

মাঝখানের ঐ সময়টা আমি ছোট ছাদে ঘুরে বেড়াই, সিগারেট খাই, আকাশ দেখি, ফুলের গন্ধ শুঁকি।

আজও খেয়েদেয়ে উঠে সেই ছোট ছাদটিতে পায়চারি করতে কিসের যেন একটা অভাব অনুভব করলাম। প্রত্যেক দিনই যে ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়, তা নয়। কলকাতা শহরের নিজস্ব একটা ভ্যাপসা গন্ধ আছে, যা অন্যসব গন্ধকে ছাপিয়ে যায়। কিন্তু ছাদটা কীরকম যেন ন্যাড়া লাগছে।

তারপরই বুঝতে পারলুম, আর অমনি আমার বুকের মধ্যে দামামা বাজতে লাগল।

ছোট ছাদটার তিন দিকের দেয়াল ঘেঁষে রাখা ছিল অনেক ফুলের টব। সবই ফুলের নয় অবশ্য, এর মধ্যে কয়েকটা কাঁচালঙ্কা গাছ ও পেঁয়াজ কলির। এমনকি দু'একটা বেগুন গাছ লাগাবারও পরীক্ষা হয়েছিল। এসবই আমার মায়ের শখ।

এখন লক্ষ্য করলুম, তার মধ্যে অর্ধেক টবই এখন নেই। হঠাৎ কী করে যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আমি অবশ্য বাড়ি ফিরেই আমাদের ঘরের কোণের আমার নিজস্ব টবটার দিকে এক ঝলক দৃষ্টি দিয়েছিলুম, এবং সেটা যথাস্থানে আছে দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম। এখনো সেটা আছে। কিন্তু তার কাছাকাছি আরো অনেকগুলি নেই।

ছুটে গেলুম সেই টবটার দিকে। আমার বুকের দামামার ধ্বনি আরো তীব্র হলো। ভুল দেখেছি, এটা আমার সে টব নয়। আমার টবটা ছিল হলদে জবা ফুলের, এটা গোলাপি জবার গাছ।

হলদে ও গোলাপি জবার মধ্যে কোনোটার প্রতিই আমার সে রকম পক্ষপাতিত্ব নেই, এমনি জবা ফুল নিছক লাল রঙেরই বা হতে যাবে কেন তা নিয়েও আমি মাথা ঘামাই না। তবু আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

শুধু এই কোণে কেন, এই ছাদে কোথাও আর একটিও জবা ফুলের টব নেই।

এ রকম কাণ্ড আগে কখনো হয়নি। আমার বাল্যকাল থেকেই আমি ছাদের এই টবগুলোকে অজর, অমর দেখে আসছি। কোনোদিন তাদের জায়গা বদল হয় না পর্যন্ত। আর আজই এই কাণ্ড?

আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। কেউ যেন আমার বুক থেকে হৃৎপিণ্ড খুবলে নিয়েছে। এখন আমার কাঁদবার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই।

বাড়িতে আমার নিজস্ব নির্ভরযোগ্য কোনো গোপন জায়গা নেই বলেই বড়মা-র গিনিগুলো আমি একটা খালি দু'ভরির মত জর্দার কৌটোর মধ্যে ভরে একটা হলদে জবা ফুলের টবের মাটিতে পুঁতে রেখেছিলুম। সোনার গিনির সংস্পর্শে এসে হলদে জবা হঠাৎ গোলাপি হয়ে উঠবে, এমনও আশা করা যায় না। তবু আমি সেই টবেরই মাটি হাতড়ে দেখলুম, একটা কেচোঁ ছাড়া হাতে কিছুই ঠেকলো না।

হাত ধোওয়ার পর্যন্ত সময় পেলুম না, সেই মাটি মাখা হাতেই মায়ের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিলুম, দরজা দু পাল্লা সপাটে খুলে ভগ্নদূতের মতন ঢুকে পড়ে টপ্পা দেওয়া গলায় বললুম মা-আ-আ-টব? ফুলের ট-অ-অ-ব? কোথায় গেল? অনেক টব দেখছি না। গোলাপি জবা, না না, হলদে জবা—

মা তাঁর এই ছেলেব কোনোদিনই বোটানি বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহের পরিচয় পাননি। সুতরাং মায়ের পক্ষে বিস্মিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তিনি বই পড়ছিলেন, মুখ তুলে আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন এমনভাবে যেন আমি সোয়াহিলি ভাষায় কথা বলছি।

আমি আবার বললুম, কোথায় গেল সেই গোলাপি জবার টব। না-না, দূর ছাই, গোলাপি জবার কথা বলছি না, হলদে জবা কোথায় গেল? তুমি বসে বসে বই পড়ছ? এদিকে যে সর্বনাশ হয়ে গেছে?

মায়ের মুখে এবারে ফুটে উঠল প্রগাঢ় আতঙ্ক। অনেকদিন আগে ছাদের রেলিং-এর ওপর আমার ঠাকুর্দাকে এক পায়ে ব্যালান্স করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমাব মায়ের মুখের চেহারা ঐ রকম হয়েছিল। আমার ঠাকুর্দার অবশ্য সেখান থেকে পড়ে গিয়ে মরে যাবার ভয় ছিল না, কারণ সে কাজটি তিনি বেশ কিছুদিন আগেই সেরে রেখেছিলেন।

মা কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে কান্না জড়ানো গলায় বলতে লাগলেন, তোর কী হয়েছে? ও নীলু? তুই এ রকম করছিস কেন? তোর আবার পেট ব্যথা করছে নাকি? শুয়ে পড়, এখানে শুয়ে পড়!

এমন এমন সময় আসে যখন অতিরিক্ত মাতৃস্নেহের প্রতি সঠিক সম্মান দেখানো সম্ভব হয় না। আমি মরছি আমার নিজের জ্বালায়, এখন কি মাতৃস্নেহ উপভোগের সময়। হঠাৎ এর মধ্যে পেটের কথা আসছে কী করে?

আমি বললুম, ফুলের টব কোথায়? গোলাপি, আঃ গোলাপি বলছি না, হলদে জবা ফুলের টব কোথায়? শিগগির বলো!

আমার কথার উত্তর না দিয়ে মা আমার মাথা চেপে ধরে আমার ঘুমন্ত দিদিদের নাম ধরে ব্যাকুলভাবে ডাকতে লাগলেন।

মায়ের হাতের ছোঁয়ায় কিছু একটা জাদু আছে স্বীকার করতেই হবে। মা আমার মাথাটা ধরামাত্র আমি বুঝতে পারলুম আমার ব্যবহারটা হয়তো অনেকের কাছে ঠিক স্বাভাবিক না-ও মনে হতে পারে। আমার এক দূর সম্পর্কের কাকাকে গত বৎসর রাঁচী পাঠাতে হয়েছিল.....।

মার বাহু থেকে আমার মাথাটা উদ্ধার করে জোর করে একটা হাসি দেবার চেষ্টা করলুম। সেটা খানিকটা অট্টহাসির মতন হয়ে গেলেও তাতেই কিছু কাজ হলো। সেই উৎফুল্ল ভাবটা বজায় রেখে বললুম, মা, ভয় পাচ্ছ কেন? আমার কিছু হয়নি। রোজ রাত্তিরে আমি ছাদে পায়চারি করি আর দেখি কোন ফুল ফুটছে। আজ দেখছি আদ্ধেক টবই নেই।

মা বললেন, ফুলের টব? সেকথা আগে বলিস নি কেন? তুই হলদে জবা ভালোবাসিস, আগে বলবি তো।

—হলদে জবা? না-না, গোলাপী জবা, না-না, হলদে জবা, তুমি ঠিকই বলেছ?

—জবা ফুল নিয়ে তোর এত মাথা ব্যথা.....

—সে বেচারি জবা গাছটা গেল কোথায়? রোজ দেখি, আজই দেখছি না।

—তুই আগে বললে দিতুম না।

—দিয়ে দিয়েছ? কাকে?

—তোর ফুলমাসিকে!

আমাদের দাদামশাইয়ের কৃতিত্বে আমার মাসির সংখ্যা অনেক। দশ-এগারো জন তো হবেই। সারা দেশে তাঁরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। নাম শুনে হঠাৎ কে যে কোন্ জন তা চট করে মনে পড়ে না। তারপর বিদ্যুৎ চমকের মতন মনে পড়ল, যিনি এই ফুলমাসি, তিনি থাকেন শ্রীরামপুরে।

—ফুলমাসি....টব নিয়ে গেছে?

—আজ এসেছিল বিকেলে.....তোর সঙ্গে তো কোনোদিনই দেখা হয় না। যেদিনই আসে, দুঃখ করে বলে, নীলুকে একদিনও দেখি না!

—তারপর কী হলো?

—তারপর মানে কিসের পর?

—ছোটমাসি আমাকে দেখতে পান না বলে দুঃখ করার পর

—জানিস তো ও ফুল কী রকম ভালোবাসে। আমাদের বাড়ির টবগুলোকে তো কেউ যত্ন করে না, কেউ মনে করে জলও দেয় না। সবই করতে হয় আমাকে। তা আমি কতদিক সামলাবো।

—তারপর? মানে, কতদিক সামলানোর পর?

—ও বলল, দিদি, ইস। ফুল গাছগুলোর কী অবস্থা করেছিস! তার থেকে ওগুলো বরং আমায় দিয়ে দে। আমার ওখানে অনেক জায়গা—। ওরা স্টেশন ওয়াগান নিয়ে এসেছিল...

—ব্যস, চাইল আর অমনি দিয়ে দিলে?

—আবার তুই এ রকম অদ্ভুতভাবে কথা বলছিস? কী হয়েছে সত্যি করে বল তো? মাথা ব্যথা করছে? জ্বর হয়েছে?

—না-না, কিছু হয়নি। মানে, ফুলের টবগুলো দিয়ে দিয়েছ। বেশ করেছ। তবে, ঐ হলদে জবাটা, ওটার দিকে রোজ রাত্তিরে কিছুক্ষণ চেয়ে না থাকলে আমার ঠিক ঘুম আসে না।

—ও গাছটায় তো কালকেই মোটে প্রথম একটা ফুল এসেছিল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেই কথাই বলছি। যাকগে শুয়ে পড়ো গিয়ে।

মাকে বললুম বটে, কিন্তু আমি নিজে সারা রাত দু'চোখের পাতা জুড়তে পারলুম না। বুকের মধ্যে যেন সমুদ্রের ঢেউ আর পাগলা হাওয়া উথাল পাথাল করতে লাগল।

৪

ফুলমাসির বরকে ফুল মেসো বললে তিনি বিলক্ষণ চটে যান। তিনি একজন জবরদস্ত পুরুষ মানুষ, ঐ ধরনের পলকা নাম তাঁর একেবারেই পচ্ছন্দ নয়। তাঁর নাম রণবীর, তাই তাঁকে আমরা বীর মেসো বলি।

এই বীর মেসো একটি জুট মিলের ম্যানেজার। শ্রীরামপুরের কাছে একটা জুট মিলের কম্পাউণ্ডের মধ্যেই তার সুদৃশ্য বাংলো। সেখানে আমি মাত্র একবারই গেছি।

ভোরবেলা কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছি আমি। গঙ্গাস্নানযাত্রীদের সঙ্গে প্রথম ট্রাম ধরে চলে এসেছি হাওড়ায়। সাড়ে পাঁচটা থেকেই লোকাল ট্রেন ছাড়তে শুরু করে।

বড়মা আমাকে কী বিপদেই ফেলেছেন। পনেরোখানা, না, চোদ্দখানা গিনি, তার দাম অন্তত চব্বিশ-পঁচিশ হাজার তো হবেই। বাঁদিপোতার হাটে আমাকে সশরীরে বিক্রি করলেও এত টাকা পাওয়া যাবে না। কিংবা যদি সাড়ে পঁচিশ কি পৌনে ছাব্বিশ হাজার হয়, তাহলে তো আরো মহাসমস্যা!

ট্রেন একেবারে ফাঁকা। একটা খালি কামরায় জানলার পাশে বসে আমি গুনগুন করে গাইতে লাগলুম। ক্রমে গানটা বেশ উদাত্ত হতে লাগল। গানটা এই রকম:

আহা রাজারানী মার্কা
নোট গিনি টাকা
দুনিয়াকে বোকা বানিয়েছে!
আহা—

এই গানটা কার লেখা, কার সুর দেওয়া কিংবা কবে আমি শিখেছি তা কিছুই জানি না। কিন্তু এই পোড়ারমুখো গানটাই যে এখন মনে পড়তে লাগল কেন কে জানে! আমি প্রাণপণে চেষ্টা করলুম, এটা ভুলে গিয়ে অন্য কোনো গান গাইবার। কিছুতেই আর কোনো গান মনে পড়ছে না, জনগণমন ছাড়া। কিন্তু ট্রেনের জানলায় বসে একা-একা কেউ জনগণমন গায়?

শ্রীরামপুর স্টেশনে পৌঁছোলুম সোওয়া সাতটায়। জিলিপি, সিঙ্গাড়া ও চা পানে খানিকটা সময় খরচ করলুম। ঝোঁকের মাথায় হুট করে বেশি তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। মাসির বাড়ি গেলে যে আদর-যত্ন বা চা-জলখাবার পাব না তা নয়। কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে, ফুলমাসি ওঠেন অনেক দেরি করে, সাড়ে-আটটা, নটার আগে তো নয়ই। আর বীর মেসো জাগেন খুব ভোরে। নিজের নামকে সার্থক প্রমাণ করবার জন্যই তিনি ব্যায়াম-ট্যায়াম করেন আর কি!

প্রথমেই বীর মেসোর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে খুব আগ্রহ নেই আমার।

যদি দেখা হয়েই যায় তা হলে আমার উদ্বোধনী সংলাপ কী হবে?

...অনেকদিন আমায় দেখেন নি আপনারা, তাই নিজে থেকে দেখা দিতে এলাম!

কিংবা, কাল আমাদের বাড়ি থেকে যে হলদে জবা গাছের টবটা গ্যাঁড়া মেরে এনেছেন, সেটা চটপট বার করুন তো!

অনেক বিচার-বিবেচনা করে আমি এ দুটো সংলাপকেই অনুপযুক্ত বলে ফেলে দিলুম। তার বদলে নতুন এবং মোক্ষম কোনো কথাও মনে এলো না। যাই হোক, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

পরপর দু'কাপ চা শেষ হলো। বুকের মধ্যে যতই দাপাদাপি চলুক মুখে একটা বেশ শান্ত গাম্ভীর্যের ভাব এনে একটা সাইকেল রিক্সায় চড়ে বসলুম। এবং সিগারেট ধরালুম মৌজ করে।

রিক্সাওয়ালাকে পাটকলটির নাম বলতেই সে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, পাঁচ টাকা লাগবে কিন্তু!

গচ্চার বাজার পড়েছে, এখন সবাই সব দিক থেকে মারবে। যাক গে! বাজারে যার সাড়ে পঁচিশ কিংবা পৌনে ছাব্বিশ হাজার টাকা দেনা, সে কি আর পাঁচ টাকার জন্য তোয়াক্কা করে? উদার ভাবে বললুম, ঠিক আছে, তাই পাবে!

ট্রেনে আসতে আসতেই ঠিক করে ফেলেছি, গিনিগুলো যদি শেষ পর্যন্ত না পাই, তা হলে এখান থেকেই সাধু হয়ে হরিদ্বারে চলে যাব, আর কোনোদিন ফিরব না। ফিরব না মানে সত্যিই আর কোনোদিন ফিরব না। হরিদ্বারে গিয়ে নতুন নতুন গান গাইব।

যা আশঙ্কা করেছিলুম, তাই। পাটকলের গেট দিয়ে ঢুকে খানিকটা এগোতেই বাগানের মধ্যে দেখতে পেলুম বীর মেসোমশাইকে। একটা ছোট জাঙ্গিয়া পরে তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়োচ্ছেন।

অনেকদিন না দেখলে যে মানুষের স্মৃতি বিভ্রম হতে পারে, তা আগে খেয়াল করিনি। আমায় এগিয়ে আসতে দেখে বীর মেসো গতিহীন দৌড় থামিয়ে দিয়ে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? কী চাও?

এই অবস্থায় যা করা উচিত, তাই করলুম। বীর মেসোর ঘামে ভেজা পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে প্রণাম ঝাড়লুম।

—বীর মেসো, চিনতে পারছেন না, আমি নীলু?

আমার কাঁধ ধরে পুরুর প্রতি আলেকজাণ্ডারের ভঙ্গিতে বীর মেসো বললেন, ওঃ নীলু? বাঃ, চমৎকার! সকালবেলায় অতি সুখবর! তুমি আমার শালির ছেলে নীলু, তাই তো? কার বিয়ে? কার অন্নপ্রাশন? কার পৈতে? আমরা কালই গিয়েছিলুম, কেউ কিছু বলল না তো? ও বুঝেছি, তা হলে তোমার নিজেরই! ইউ ওলড স্কাউনড্রেল, তা হলে এতদিন পরে—।

বাগানের চতুর্দিকে চোখ বোলাতে বোলাতে আমি বললুম, ফুলমাসি উঠেছেন?

বীর মেসো বললেন, সূর্য উঠে অনেক পুরোনো হবার আগে তো তোমার ফুলমাসির ঘুম ভাঙে না। মেয়েটি কে? স্বজাতি? তোমার সঙ্গে কতদিনের চেনা? ওঃ হো, নীলা নিশ্চয়ই! হ্যাঁ, নীলা! তোমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে নীলা! চমৎকার, চমৎকার, বাঃ, লক্ষ্মী ছেলে!

—কে নীলা?

—আমার জ্যাঠতুতো দাদার মেয়ে। কিছুতেই আর মেয়েটার জন্য পাত্র ঠিক করা যাচ্ছিল না, অত ভালো মেয়ে, অন্তত পঞ্চাশ জনের সঙ্গে.... তুমি হলে একান্ন

নম্বর, তোমার মাকে অনেকদিন থেকেই বলছিলাম, তোমার মতন একটি চমৎকার পাত্র হাতের কাছে থাকতে....রাজি হলে তা হলে? খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছ! ঠকবে না বুঝলে! বাঃ বাঃ বাঃ বাঃ বাঃ!

বীর মেসো আমার পিঠে অতি উৎসাহে একটা থাবড়া মারলেন।

ফার্স্ট সেকেণ্ড হতে না পারি, জীবনের কোনো ব্যাপারেই আমার একান্নতম হবার শখ নেই। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, বীর মেসো একা-একাই কথা বলে যান, উনি স্বগতোক্তি স্পেশালিস্ট, আমায় কিছু বলার সুযোগই দিচ্ছেন না।

বীর মেসো তাঁর জ্যাঠতুতো দাদার মেয়ে নীলার গুণগান করে যেতে লাগলেন আর আমি বাগানের সব দিক খুঁজতে লাগলুম চোখ দিয়ে। হলদে-জবা গাছ একটাও দেখতে পাচ্ছি না। আমার জিভে যেন কালমেঘ খাওয়ার স্বাদ।

হঠাৎ কথা থামিয়ে বীর মেসো আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকালেন।

তারপর কপালে একটা চাপড় মেরে বললেন, আমি কী বোকা! শুধু শুধু বকবক করে যাচ্ছি। নীলা তো এখানেই রয়েছে, তুমি তাকে দেখার জন্যই এত ভোরে ছুটে এসেছ, কেমন কি না! ঠিক ধরেছি। মুখ দেখলেই বোঝা যায়, ঘন ঘন চোখের পাতা নড়ছে, চঞ্চল ভাব, এখন আমার কথা শুনতে ভালো লাগবে কেন? হাঃ হাঃ হাঃ! শুধু শুধু তোমায় আমি আটকে রেখেছি। আর তুমি ছটফট করছ। নীলা! নীলা! এই তো একটু আগে বাগানেই ছিল, কী সব গাছ টাছ লাগাচ্ছিল!

এতক্ষণ বাদে আমি নীলা সম্পর্কে আকৃষ্ট হলুম।

—গাছ লাগাচ্ছিল?

—হ্যাঁ। তোমার ফুলমাসির মতন নীলাও খুব গাছ টাছ ভালোবাসে। তবে তফাৎ হচ্ছে, তোমার ফুলমাসি নিজে কিছু করে না, সব মালির ওপর বরাত দিয়ে দেয়, আর নীলা নিজে জল-কাদা ঘাঁটে। গাছের যত্ন নেয়। কাল তোমাদের বাড়ি থেকে কী সব গাছগাছড়া, লতাপাতা আনা হয়েছে তো।

—কোথায়?

—নীলা কোথায় গেল? কাছাকাছি আছে নিশ্চয়ই।

—আর সেই টবগুলো?

—টব, কিসের টব?

—ঐ যে কাল নিয়ে এসেছেন আমাদের বাড়ি থেকে। সেগুলো দেখছি না তো!

—কী জানি বাপু! ওসব তোমার মাসির ডিপার্টমেন্ট। আমার অত গাছ-পালা নিয়ে আদিখ্যেতা নেই। গাছে ফুল ফুটে থাকবে, আমি দূর থেকে দেখব, ব্যাস!

ফুল না ফুটলে দেখব না, ফুরিয়ে গেল! তা বলে টবে গাছ লাগাও, রোজ জল ঢালো, হ্যানো, ত্যানো, ওসব দেখলেই আমার বিরক্ত লাগে। কাল কী হলো জানো না? তোমার মাসী তো এক গাদা টব তুলেছে গাড়িতে। রাস্তায় যা অবস্থা তা তো কহতব্য নয়। গাড়ি এক একবার লাফিয়ে ওঠে আর টবগুলো ঢকা ঢক করে উল্টে গড়াগড়ি যায়। দুটো তা ভেঙেই গেল। মাটি কাদায় একেবারে মাখামাখি। যাচ্ছেতাই অবস্থা! আমি ভাঙা টবদুটো রাস্তাতেই ফেলে দিলুম।

—অ্যাঁ? ফেলে দিয়েছেন?

আমি এত জোরে চেঁচিয়ে উঠলুম যে বীর মেসো চমকে উঠলেন। আমার মুখের দিকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকালেন তার পরে।

—তুমিও গাছ-প্রেমিক নাকি হে? ঝোপঝাড় ভালোবাসো! নীলার সঙ্গে মিলবে ভালো। যাই হোক, চিন্তা করো না, টব-ভাঙলেও গাছ ফেলে দিই নি। গাছগুলো উপড়ে তুলে নিয়ে ভাঙা টব-মাটি ফেলে দিয়েছি।

—কোথায়? কোথায় ফেললেন?

—দিল্লি রোডে কোথায় যেন, রাত হয়ে গিয়েছিল তো, আরে, ঐ তো নীলা! এই নীলা, নীলা!

বীর মেসোর সঙ্গে সঙ্গে আমিও মুখ ফেরালুম। বাংলোর বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে লাল রঙের ছাপা শাড়ি পরা একটি তরুণী মেয়ে। হাতে চিরুনি।

বীর মেসো আমার কাধ ধরে বললেন, চলো ব্রাদার, ফর্মাল ইনট্রোডাকশানটা হয়ে যাক। এই তো বেশ ভালো, একদম ঘরোয়া সাজে আছে, কোনো রকম মেকআপ নেই, একেবারে খাঁটি বাঙালি মেয়েটিকে দেখতে পাবে।

মেয়েটির ভুরু সোজা হলো না, সেই রকম চোখ রেখেই বলল, ওকে তো আমি চিনি। আগে দেখেছি।

আমি অবশ্য নীলাকে আগে কখনো দেখেছি কিনা মনে করতে পারলুম না। যে-সব মেয়েরা সমস্ত পুরুষ জাতটাকেই শত্রু বলে মনে করে, মনে হলো এই মেয়েটিও সেই দলে। বেশ বোঝা যায় আমার উপস্থিতি সে পছন্দ করছে না।

বারান্দায় কয়েকটা মোড়া রয়েছে, বীর মেসো তার একটায় গ্যাঁট হয়ে বসে অন্য একটায় চাপড় মেরে বললেন, বসো, নীলু, বসো। নীলা, তুই-ও বোস। তুই যে বললি, তুই নীলুকে আগে দেখেছিস, কোথায় দেখেছিস?

—সিনেমায়!

—সিনেমায়? নীলু সিনেমায় নেমেছ নাকি? জানতুম না তো! বাঃ বাঃ! অতি

সুখবর। এ ফিলম স্টার ইন দা ফ্যামিলি! আজকাল তো ওদেরই যুগ, ঐ যে কী যেন একজন হীরো, বোম্বাইয়ের, সে নাকি টাকার বিছানায় শোয়—

—আমি ওকে কোনো সিনেমায় দেখিনি!

—এই যে বললি তুই ওকে সিনেমায় দেখেছিস? একবার বললি দেখেছিস, আবার বলছিস দেখিনি।

—কোনো সিনেমায় অভিনয় করতে দেখিনি।

—তা হলে সিনেমায়....ওঃ হো! মানে, তুই ওর সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলি? বাঃ বাঃ বাঃ! তবে তো আগে থেকেই তোদের বেশ ভাব-টাব, ইয়ে...

—তুমি কি বলো মেজো কাকা। আমি যার তার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাব? তুমি আমায় কী ভাবো?

—আহা, নীলুর সঙ্গে যাওয়া কী আর যার তার সঙ্গে যাওয়া হলো? নীলু তো আমাদের প্র্যাকটিক্যালি ফ্যামিলিরই লোক, আমার শালির ছেলে। নীলুর স্বভাব-চরিত্রও খুব ভালো, এমনকি বিড়ি-সিগারেট পর্যন্ত খায় না।

—ঐ তো বুক পকেটে দেখতে পাচ্ছি সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই।

—ও, তাই নাকি? তাহলে সবে ধরেছে। আহা, পুরুষ মানুষদের মাঝেমাঝে একটু আধটু ওসব না টানলে ঠিক ব্যক্তিত্ব ফোটে না। এই দ্যাখো না, আমি কি ওসব খাই? কিন্তু ইউনিয়নের লিডাররা আমার সঙ্গে যখনই দেখা করতে আসে, তখনই আমি ফস করে একটা চুরুট ধরাই।

কথাবার্তা যেদিকে এগোচ্ছে তাতে আমি ক্রমশই হতাশ হয়ে পড়ছি। আমার প্রসঙ্গটা তুলবারই কোনো সুযোগ পাচ্ছি না। এদিকে বেশি দেরি হলেও মুস্কিল, এগারোটার সময় আবার দীপ্তিবৌদির সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে।

এইসময় ভেতর থেকে একজন ট্রে-তে করে চা নিয়ে এসে রাখল আমাদের সামনে। নীলা বলল, আর একটা কাপ নিয়ে এসো, তিন কাপ করতে হবে।

আমি গা মুচড়ে বললুম, আমার না হলেও চলবে। মানে, আমি বেশি চা খাই না।

বীর মেসো বললেন, দাঁড়াও, চা তো খাবেই। তার আগে রসুন খাক। এই নবু, আরো দু' কোয়া রসুন নিয়ে আয়। এই নাও, নীলু, এখান থেকে একটা রসুন খেয়ে ফেলো। আরো আসছে। ওরে, জলও আনিস। নীলু, কচমচ করে চিবিয়ে খাবে, গিলে ফেললে চলবে না কিন্তু।

আমি আঁতকে উঠলুম। কাঁচা রসুন চিবিয়ে খাওয়া, সে কি মানুষের পক্ষে সম্ভব? ট্রেতে দু' কোয়া রসুন রয়েছে, তার মধ্যে থেকে একটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন বীর মেসো।

—না-না, আমি রসুন খাব কেন?

—আরে খাও, খাও, খেয়ে দ্যাখো, একেবারে অমৃত। রসেন ঊন, রসুন! অর্থাৎ এতে কোনো রসেরই অভাব নেই। এর কত গুণ জানো? অম্বল, উইণ্ড, চোঁয়া ঢেঁকুর, রক্তচাপ, মাথা ধরা সব সেরে যাবে একদম।

কিন্তু বীর মেসো, আমার তো অম্বল, উইণ্ড, চোঁয়া ঢেঁকুর....এর কোনোটাই হয় না। যা হয় না, তা সারাবার খুব একটা দরকার আছে কী?

—আরে এখন হয় না, কিন্তু হতে কতক্ষণ? প্রিভেনশান ইজ বেটার দ্যান কিওর! ইংরেজ মুনি-ঋষিরা বলে গেছেন!

—মাপ করুন, বীর মেসো। কাঁচা রসুনের গন্ধে আমার বমি আসে।

—অ, সে কথা আগে বললেই তো হতো!

বীর মেসো প্রথমে নিজের দু'কোয়া রসুন খেলেন বেশ তরিবৎ করে। ওঁর কাজের লোকটি আমার জন্য যে দু'কোয়া নিয়ে এলো, তাও মুখে পুরে দিয়ে বললেন, অধিকন্তু না দোষায়! বুঝলে।

এর পরে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বীর মেসোর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। তিনি মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ, রে, নীলা, তুই নাকি নীলুকে সিনেমায় দেখেছিস। অথচ ওকে সিনেমার পর্দাতেও দেখিস নি, ওর সঙ্গে এক সঙ্গে সিনেমা দেখতেও যাস নি, তা হলে ব্যাপারটা কী হলো? নীলু, তুমি ওকে কোনোদিন সিনেমায় দেখেছ?

—না তো!

—তবে? তুই যে একেবারে ধাঁধায় ফেলে দিলি রে, নীলা।

—কিছুই ধাঁধা নেই এর মধ্যে। আমি ওকে সিনেমা হলেই দেখেছি। টর্চ নিয়ে সীট দেখিয়ে দিচ্ছিল। অন্তত তিনবার দেখেছি, চিত্রমায়া হলে।

—টর্চ নিয়ে সীট দেখিয়ে দিচ্ছিল? সিনেমা হলে? যাঃ, কী বলছিস?

—ঠিকই বলছি।

বীর মেসো বিমূঢ় ভাবে আমার দিকে তাকালেন।

আমি একেবারে হতবাক হয়ে গেছি। এরকম কথা যে শুনবো তা আমার সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না। হ্যাঁ ঠিকই, আমি কিছুদিন সিনেমা হলের অন্ধকারে টর্চ হাতে নিয়ে দর্শকদের সীট দেখিয়েছি। বেকার জীবনের নানান্ কাণ্ডের মধ্যে এটাও একটা কাণ্ড। আমাদের পাড়ার ফণীদা চিত্রমায়া হলে ঐ কাজ করতেন। ছেলেবেলা থেকেই ওকে ঐ কাজ করতে দেখেছি। বছর দু'এক আগে ফণীদা একবার তাঁর মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে তীর্থ করতে গেলেন হরিদ্বারের দিকে। সেই সময় তিনি আমায় বললেন, তুই তো কিছু করিস না এখন, তুই আমার বদ্‌লি-

কাজ করবি, নীলু? তিনশো টাকা পাবি। কাজ খুব হাল্‌কা। তুই তিনটে-ছ'টার শো শুধু করবি, ন'টার শো করতে হবে না, সে আমি ব্যবস্থা করে যাব! আমি ভেবেছিলুম, মন্দ কী! এই বাজারে তিনশো টাকাই বা কে দেয়। উপরন্তু সব সিনেমা ফ্রি-তে দেখতে পাব। রাজি হয়ে গেলুম। তখনই জেনেছিলুম, ঐ কাজের লোকেদের বলে আশার। তবে কাজটা সহজ নয় মোটেই। অন্ধকারের মধ্যে সাবলীল ভাবে হাঁটা চলা করা কি চাট্টিখানি কথা? ওর জন্য বিশেষ প্র্যাকটিস দরকার।

সে কাজ আমি করেছিলুম মাত্র এক মাস বারোদিন। ডিউটি পীরিয়াডে আমাকে থাকতে হতো অন্ধকারের মধ্যে। সেই অবস্থায় আমায় দেখে কেউ মনে রাখবে এবং এতদিন পর দেখে চিনতে পারবে, এ কি বিশ্বাস করা যায়?

আমার স্তম্ভিত মুখ দেখেই বোধহয় বীর মেসো আন্দাজ করলেন যে তাঁর জ্যাঠতুতো ভাইঝি একেবারে বাজে কথা বলছে না। তবু, আমারই মতন তিনি একই সন্দেহে বললেন, কিন্তু আমি যত সিনেমা দেখেছি, কোনো সিনেমা হলেরই টর্চ হাতে আলো-দেখানো একটা লোকেরও তো মুখ আমার মনে নেই। তোর কী করে মনে রইল? এ যে বড় আশ্চর্য কথা বললি!

নীলা ঝাঁঝালো গলায় বলল, মনে থাকবে না কেন? এই লোকটা আমার পা মাড়িয়ে দিয়েছিল। একবার না, দু'বার।

এবারে আমি আড়ষ্টতা কাটিয়ে, খানিকটা মুগ্ধ ভাবে নীলার দিকে তাকালুম। ধন্য এর স্মৃতিশক্তি! জীবনের সব অভিজ্ঞতাই কিছু না কিছু কাজে লাগে। কালই ফণীদাকে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে আসতে হবে। সেই যে এক মাস বারো দিনের একটা চাকরি করেছিলুম, তার মধ্যে কত জনের পা মাড়িয়ে দিয়েছি কে জানে। কিন্তু একজন অন্তত তা মনে রেখে তার মনে আমার সম্পর্কে স্থায়ী একটা অপছন্দ এঁকে রেখেছে। সুতরাং একান্নতমতেই থেমে থাকলে চলবে না, নীলার জন্য বাহান্নতম'র খোঁজ করতে হবে। কিংবা তিপান্ন, চুয়ান্ন, পঞ্চান্ন, কিছু বলা যায় না!

বীর মেসো চুপ করে ব্যাপারটা বুঝে নেবার চেষ্টা করছেন। তারপর নতুন উৎসাহে আবার শুরু করলেন, যাই বলো. কাজটা কিন্তু ভালো। এতদিন ভেবে দেখিনি। মানুষকে অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখানো। নোবল ডীড ইনডীড! বুদ্ধদেবও বলেছেন, অন্ধকার হইতে আলোয় লইয়া যাও!

নীলা বলল, আর সেই সময় অন্যের পায়ের কড়ে আঙুল চিপ্‌টে দাও!

আমি সঙ্গে সঙ্গে নীলার দু'পায়ের পাতার দিকে তাকালুম। কোনো আঙুলেই কোনো বিকৃতি চোখে পড়ল না।

এই আলোচনা আর বেশিদূর গড়াতে পারল না। কারণ, এবারে এসে উপস্থিত হলেন ফুলমাসি। কাঁচা ঘুম ভেঙে, কিংবা একটা স্বপ্ন অর্ধেক দেখে উঠে এসেছেন মনে হয়। চোখে সেই রকম একটা হারিয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া ভাব।

বারান্দায় এসে ফুলমাসি তাঁর স্বামীর উদ্দেশে বললেন, অফিসে গিয়ে আজ আমার জন্য গাড়ি পাঠাতে বলো। ভুলে যেও না কিন্তু।

বলেই আর কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে তিনি দমকা ঝড়ের মতন আবার উধাও হয়ে গেলেন।

বীর মেসো চেঁচিয়ে বললেন, এই, শোনো শোনো! কে এসেছে দেখলে না? নীলু এসেছে।

আবার ঠিক একই রকম গতিতে ফিরে এসে চোখদুটো যেন জোর করে খুলে ফুলমাসি বললেন, নীলু? কোন নীলু? সেই পাজি, হতচ্ছাড়া ছুতোর মিস্তিরটা?

নীলা খিলখিল করে হেসে উঠল।

এবার যেন ভালো করে ঘুম ভাঙল ফুলমাসির। আমার দিকে চেয়ে বললেন, ওমা, এযে দেখছি আমাদের নীলু? কী রে, তুই কোথা থেকে এলি? এই সাতসকালে। কারুর আবার অসুখ বিসুখ হয়েছে নাকি? অ্যাঁ? তোকে দেখে যে আমার ভয় করছে!

বীর মেসো বললেন, না-না, নীলু ভালো খবর নিয়ে এসেছে! ও রাজি হয়ে গেছে! এবার দিন টিন দেখে লাগিয়ে দিলেই হয়!

ফুলমাসি বললেন, রাজি! কিসে রাজি।

বীর মেসো পত্নীর দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু সদ্য ঘুম-ভাঙা ফুলমাসি তা বুঝতে পারলেন না।

আমি বললুম, ফুলমাসি আমি বেড়াতে এলুম তোমাদের এখানে।

ফুলমাসি বললেন, বেড়াতে এলি এখানে? কল্‌কাতা ছেড়ে এই পোড়ার ছাই জায়গায় কেউ বেড়াতে আসে? যাক গে, এসেছিস বেশ করেছিস। ক'দিন থেকে যা! তবে ভালো লাগবে না। আগে থেকেই বলে রাখছি।

বীর মেসো বললেন, আরে, কেন ভালো লাগবে না? নীলাও এখানে রয়েছে, দু'জনে মিলে বেশ এক সঙ্গে বেড়াবে!

ফুলমাসি তাঁর স্বামীর দিকে একটা ভীমরুল মার্কা দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলেন।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম। এই না শুনেছিলুম ফুলমাসি আমাকে দেখবার জন্য উতলা হয়ে থাকেন, আমাদের বাড়িতে গিয়ে হা-হুতাশ করেন। কই, এখন তো সেরকম কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না।

উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, ফুলমাসি, তোমার এখানে নাকি দারুণ বাগান করেছ, সেটা একটু দেখব।

—বাগান আব কোথায়? সব গোরুতে খেয়ে যায়। আর মালিটাও যেমন কুঁড়ে, তেমন গাঁজাখোর।

—তবে যে শুনেছিলুম তোমার যে খুব ফুলের শখ? গোলাপি জবা, না-না, হলদে জবা.....

—ছিল তো শখ। কিন্তু গোরুতে সব খেযে যায় যে! কাল তোর মায়ের কাছ থেকে কতকগুলো টবের গাছ নিয়ে এলুম। তোদের বাড়িতেও অযত্নে নষ্ট হচ্ছিল। এখানে তবু যদি মালিটার হাতে পড়ে কিছু হয়। ও গাঁজা খায় বটে, কিন্তু হাতটা খুব ভালো। মরা গাছকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে।

—ওর মধ্যে কয়েকটা গাছ আমার খুব প্রিয় ছিল, মা না বলে কয়ে হুট করে দিয়ে দিয়েছে।

—তোর যদি ইচ্ছে করে ফেরৎ নিয়ে যা না!

—তুমি যদি কিছু না মনে করো ছোটমাসি, তা হলে একটা হলদে জবার গাছ আছে, ওটাকে আমি টবশুদ্ধ নিয়ে যাব। ঐ গাছটাকে আমি নিজের হাতে জল দিয়ে মানুষ করেছি।

বীর মেসো ধিক্কারের স্বরে বললেন, একটা ফুলের টব তুমি ট্রেনে করে ফেরৎ নিয়ে যাবে? তারপর হাওড়া স্টেশনে নেমে সেটা নিয়ে ট্রামে-বাসে চাপতে পারবে না। ট্যাক্সি নিতে হবে। কত খরচা পড়বে? সামনের বছর রথের মেলা থেকে গোটাকতক ওরকম গাছ কিনে নিও বরং।

—আপনি বুঝতে পারছেন না মেসোমশাই, ওটা যে আমার নিজস্ব পোষা গাছ। আপনার বাড়ির পোষা কুকুর হারিয়ে গেলে কি আপনি রাস্তা থেকে যে কোনো একটা কুকুর ধরে আনবেন?

—কী জানি বাবা। আমি কুকুর বুঝি না, গাছও বুঝি না।

ফুলমাসি ভুরু তুলে বললেন, পোষা গাছ! এত জিনিস থাকতে তুই গাছ পুষতে গেলি? তাও আবার জবা ফুল গাছ?

নীলা এতক্ষণ বাদে খিলখিল করে হেসে উঠল।

আমি খানিকটা গর্বিত ভাবে বললুম, তা হলেই দ্যাখো গাছ পোষার কথা শুনেছো আগে? গাছেরা আমার খুব বাধ্য, কথা শোনে।

সিঁড়ি দিয়ে এক পা নেমে আমি আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললুম, ফুলমাসি, কাল নাকি তোমরা দুটো টব রাস্তায় ফেলে দিয়েছো? সেই হলদে জবা গাছটা ফেলে দাও নি তো?

ফুলমাসি বললেন, হলদে জবা না কালো জবা তা তো মনে নেই। তবে গাছ তো ফেলা হয়নি। শুধু ভাঙা টব ফেলা হয়েছে। সবগুলো মালির ঘরের সামনে রাখা আছে, গিয়ে দ্যাখ না।

বীর মেসো মিষ্টি করে বললেন, নীলা, তুই একটু ওর সঙ্গে যা-না, মা! ওকে মালির ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আয়।

ফুলমাসি বললেন, নীলা, বেশি দেরি করিস নি। জলখাবার তৈরি করতে বলেছি কিন্তু।

আমার ইচ্ছে করছিল মালির ঘরের দিকে ছুটে যেতে। কিন্তু নীলা পাশে রয়েছে বলেই তা সম্ভব নয়। বুকের মধ্যে গুড়গুড় করছে। এবারে একলা পেয়ে নীলা আমায় কী শাস্তি দেবে কে জানে। দু'বছর আগে সেই পা মাড়িয়ে দেবার প্রতিশোধ নেবে না?

একটুখানি নিঃশব্দে যাবার পর নীলা বলল, একটা গোল টিনের কৌটো তো?

ঠিক যেন দারুণ ইলেকট্রিক শক লাগল। প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম। এই মেয়েটা কি জাদুকরী?

—তার মানে?

—আমার আগে বোঝা উচিত ছিল। একটা ফুল গাছ, তাও জবা ফুল, তার জন্য কোনো ছেলের কক্ষণো এত দরদ থাকতে পারে না। নিশ্চয়ই অন্য কোনো ব্যাপার আছে। তারপরেই মনে পড়ল, একটা মর্চে পড়া টিনের কৌটো, খুব সম্ভবত জর্দার কৌটো আমি দেখেছি একটা ভাঙা টবের মধ্যে।

—ভাঙা টবের মধ্যে?

—কাল রাত্তিরে গাড়ি থেকে নামাবার সময়ও কয়েকটা টব ভেঙেছে। তার মধ্যেই তো দেখলুম।

—তারপর? সেই কৌটোটা এখন কোথায়?

—বলব কেন? ওটার মধ্যে কী আছে শুনি? কী এমন জরুরি ব্যাপার।

আমি নীলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়লুম। আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝরে পড়তে লাগল মুগ্ধতা। এই মেয়েটি কি মানবী, না দেবী? আমার এতখানি উপকার কেউ কোনোদিন করেনি। ও যেন আমার ধড়ে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে।

—আপনি ওটা খোলেননি?

—বড্ড টাইট হয়ে আছে, চেষ্টা করেও খুলতে পারলুম না। অবশ্য একটু গরম করলেই খোলা যাবে।

—দেখুন, ইয়ে, আমি আপনার পায়ে ধরতে রাজি আছি। আপনার পা ধোয়া জল, মানে চন্নামৃতও খেতে পারি। কিংবা আরো যা হুকুম করেন, তাই

শুনব। শুধু কথা দিন, ঐ কৌটোটার কথা ফুলমাসি বা মেসোকে বলবেন না?

—উঁহু, ওসব কথায় ভুলছি না। কী এমন মূল্যবান জিনিস আছে কৌটোটার মধ্যে?

—কয়েকটা চিঠি! একটা মেয়ে লিখেছিল। খুব প্রাইভেট ব্যাপার কিনা, তাই বাড়ির কেউ যাতে দেখে না ফেলে.....

—খুব দামি চিঠি বোঝাই যাচ্ছে, ঝনঝন শব্দ হচ্ছিল।

—কটা কাঁইবিচিও ভরে রেখেছি, যাতে কেউ হঠাৎ দেখলেও কিছু সন্দেহ না করে।

—কাঁইবিচি? তার মানে তেঁতুল বিচি।

—হ্যাঁ, কাঁইবিচি মানে তেঁতুল বিচি।

—একটা জবা ফুলগাছের নিচে কাঁইবিচি পুঁতে রাখার কী মানে হয়?

—কোনো মানে হয় না বুঝি? হা-হা-হা-হা। তাই তো। সত্যিই তো কোনো মানে হয় না। হা-হা-হা-হা!

—পাগলের মতন হাসতে শুরু করলেন যে?

—আমার খুব আনন্দ হচ্ছে, সামলাতে পারছি না!

—আনন্দ হচ্ছে? ঐ চিঠিগুলো ফেরৎ পাবেন বলে?

—হ্যাঁ, আমি তো প্রায় আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম।

—আপনাকে জেলে দেওয়া উচিত।

—জেলে? আমাকে?

—নিশ্চয়ই! আপনি আমার পা মাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেজন্য এখনো পর্যন্ত ক্ষমা চাননি। আবার আমারই সামনে অন্য একটা মেয়ের প্রেমপত্রের কথা বলে আনন্দে লাফাচ্ছেন?

—না, ঠিক লাফাইনি, একটু হেসেছি শুধু, সত্যি অন্যায় হয়ে গেছে খুব, মানে, ঐ পা মাড়িয়ে দেওয়া। জানেন, দ্বিতীয়বার আপনার পা মাড়িয়ে দিয়ে আমার এমন অনুতাপ হয়েছিল যে সেই জন্যই ঐ চাকরি ছেড়ে দিলুম।

—এখন কী করা হয়?

—এখন, এখন আমি একজন সত্যান্বেষী।

—আসলে তো দেখছি মিথ্যার ডিপো। কাকা যে একটু আগে বললেন, নীলু রাজি হয়েছে, তার মানে কী! কিসের রাজি!

—ওঃ হো! আপনি জানেন না বুঝি? বীর মেসো অনেক দিন ধরে আমায় একটা চাকরির কথা বলছিলেন, আমি কলকাতা ছেড়ে এখানে এসে থাকতে রাজি হচ্ছিলুম না। তারপর কালই ঠিক করলুম নিয়ে নেব।

—শুধু চাকরি, আর কিছু না?

—আর কিছু? হ্যাঁ, কোয়ার্টার, কোয়ার্টারও পাব, খুব কাছাকাছি, তখন আপনার সঙ্গেও প্রায়ই দেখা হবে।

—আপনার ঐ জর্দার কৌটোটা আমি গঙ্গায় ফেলে দেব!

—কেন? গঙ্গা কি দোষ করেছে? আজেবাজে জিনিস ফেলে গঙ্গার জল নোংরা করা কি উচিত? এমনিতেই তো সব নদীর জল দূষিত হয়ে যাচ্ছে.....মানে ওয়াটার পলিউশান, খুব খারাপ জিনিস, আমাদের উচিত নদীর জল পবিত্র রাখা....

—আমি সব জানি! আপনারা ভাবেন কি! আপনারা রাজি হলেই মেয়েরা সব মেনে নেবে? মেয়েদের মতামতের কোনো মূল্য নেই? মেজকাকা বললেই আমি অমনি আপনাকে পছন্দ করব? আপনার মতন একটা দায়িত্বহীন, অপদার্থ.....একটি মেয়ে ভরসা করে আপনাকে চিঠি লিখেছে, আর আপনি সেটা যেখানে সেখানে.....

কথা বলতে বলতে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে নীলা। তার কথাগুলো ঠিক যেন সুধাবর্ষণ করছে আমার কানে। কোনো মেয়ের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান পেয়েও যে এত আনন্দ হয়, তা কি আমি আগে জানতুম।

ইচ্ছে হলো ওকে খুশি করার জন্য ঝেড়ে নিজের নিন্দে করি। নীলু ছেলেটা শুধু যে দায়িত্বহীন, অপদার্থ তাই-ই নয়, মিথ্যেবাদী, ঘুম থেকে দেরি করে ওঠে, নিজের জামার বোতাম সেলাই করতে পারে না, টাকাপয়সা নয়-ছয় করে, প্রেম করে যার তার সঙ্গে, রোজ স্নান করে না পর্যন্ত!

কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে অপরাধীর মতন মুখ করে, মাথা নীচু করে রইলুম।

আর একটু দূরেই মালির ঘর। কৌটোটা উদ্ধার না করা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। ওটা হাতে পাবার পর নীলার এই সব ভালো ভালো কথা শুনলে আরো ভালো লাগত। যাই হোক, এখন নীলার মেজাজ অনুযায়ীই চলতে হবে। বীর মেসোর বাংলোর দিকে তাকিয়ে দেখলুম, বারান্দায় কেউ নেই।

নীলার মুখখানা থমথমে হয়ে এসেছে। যে-কোনো সময় বর্ষণ হতে পারে। আবেগে ধরা গলায় সে বলল, আমায়ও একজন চিঠি লিখেছিল, সাত খানা, তার প্রত্যেকটি আমি অতি সাবধানে রেখে দিয়েছি। মাঝে মাঝে পড়ি। তার সঙ্গে সারাজীবন আর দেখা না হলেও তাকে আমি ভুলব না।

—দেখা হবে না কেন?

—জানি না, সে এখন কোথায় আছে। শুনেছিলাম তার কোম্পানি তাকে

বিলেতে পাঠাবে। হয়তো বিলেত থেকে ফেরেইনি। কন্টিনেন্টাল ড্রাগ কোম্পানির এরিয়া ম্যানেজার ছিল।

—বিলেত থেকে আপনাকে চিঠি লেখেনি? তার সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছিল কী করে? মানে, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেউ কি?

—না-না, আত্মীয়-টাত্মীয় না। এমনিই আলাপ। আমাদের বাড়ি তো চন্দননগরে। ঠিক সাড়ে তিন বছর আগের কথা, একদিন আমি ট্রেনে উঠতে যাচ্ছি, ও হুড়োহুড়ি করে নামছিল, আমার সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল, আমার হাতের বইপত্র ছিটকে পড়ল.......

দেখা যাচ্ছে, যে-সব ছেলেরা অন্ধকারে নীলার পা মাড়িয়ে দেয় কিংবা ট্রেন থেকে নামবার সময় ধাক্কা মারে, তাদেরই শুধু ও মনে রাখে? দ্রুত চিন্তা করতে লাগলুম, নীলার এই ধাক্কাদানকারী পত্রলেখকটিকে নিয়ে কীভাবে ওকে আরো দুর্বল করে ফেলা যায়।

—তারপর?

—সে আপনার মতন অভদ্র নয়। বইগুলো তো তুলে দিলই, তারপর এমনভাবে তাকালো আমার দিকে, তাতে জগৎ সংসার ভুলে যাওয়া যায়। তখন থেকে প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই দু'তিন দিন দেখা হতো ওর সঙ্গে। ওর সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়াতুম, ব্যান্ডেল চার্চে গেছি।

—কী নাম ছিল বলুন তো?

—কেন বলব? তারপর আপনি এই কথা নিয়ে ঢাক পেটান আর কি চারদিকে।

—খুব সুন্দর চেহারা তো? বেশ লম্বা।

—দেবদূতরা লজ্জা পেয়ে যাবে।

—মাথার চুল কোঁকড়া?

—ঠিক কোঁকড়া নয়, ঢেউ খেলানো।

—ফর্সা রঙ, গোঁফ আছে?

—গোঁফ নেই, বড় বড় জুলপি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ বড় বড় জুলপি। মনে হচ্ছে এই ভদ্রলোককে আমি চিনি, মানে দেখেছি। কন্টিনেন্টাল ড্রাগ কোম্পানিতে আমি প্রায়ই যাই তো, আমার ছোটমামা কাজ করেন!

—সত্যিই, ঐ অফিসে আপনি যান?

—প্রায়ই তো যাই, সপ্তাহে অন্তত দু'দিন। শ্যাম্পল্-এর ওষুধ বিনা পয়সায় পাওয়া যায় তো!

—শেষ কবে গেছেন?

—কবে? আজ শুক্রবার তো, গত সোমবারই গেছি।

—তখন ওকে দেখেছেন?

—হ্যাঁ, দেখেছি, যত দূর মনে হচ্ছে। ছোটমামার সঙ্গে এসে একবার কথা বলে গেলেন।

নীলার মুখটা একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেল। চোখ ভরে এলো জলে। ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, তা হলে ও বিলেত থেকে ফিরে এসেছে? আর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে নি? অথচ সে কথা দিয়েছিল....

আমি নীলার পিঠে হাত রাখতে গিয়েও হাতটা সরিয়ে নিলুম। এটা খুব ভুল হয়ে যাচ্ছিল। আমার গলার আওয়াজটা যতটা মিষ্টি করা যায়, তার চেয়েও একটু বেশি মিষ্টি করে বললুম, কালই আমি কন্টিনেন্টাল ড্রাগসে যাচ্ছি, সব খবর নেব, না-না, ডাইরেক্টলি প্রথমেই ওকে কিছু বলব না, আগে একটু একটু করে ভাব জমিয়ে জেনে নিতে হবে ওর মনের ভাবটা। আপনি ওর নামটা আমায় নির্ভয়ে বলতে পারেন।

—আপনি সত্যিই এতটা করবেন আমার জন্য?

—নিশ্চয়ই, আপনি আমার কৌটোটা ফেরৎ দিচ্ছেন, আর আপনার জন্য আমি সামান্য এইটুকু করতে পারব না?

এবারে নীলা বড় বড় পা ফেলে এগোলো মালির ঘরের দিকে। এ সব সাহেবি আমলের কোয়ার্টার্রি, মালির ঘরটাও বেশ সুন্দর। আর ছিমছাম। বাগানের এক প্রান্তে, টালির ছাদ দেওয়া বিলিতি কটেজের মতন, পেছনেই নদী।

খালি টবগুলো এক জায়গায় ডাঁই করা। গাছগুলো সব বার করে কিছু লাগানো হয়েছে, আর কিছু মাটি মাখা অবস্থায় পড়ে আছে। খাঁকি হাফ প্যান্ট ও গেঞ্জি পরা একজন যুবক একটা খুরপি হাতে নিয়ে মাটি খুঁড়ছে একটু দূরে। একবার মাত্র আমাদের দিকে তাকিয়ে সে আবার নিজের কাজ করে যেতে লাগল।

একটা টবের মধ্যে থেকে নীলা তুলে আনল জর্দার কৌটোটা।

কিন্তু অমন মূল্যবান জিনিসটা ফেরৎ পেয়েও আমি আনন্দ করতে ভুলে গেলুম। সকাল থেকেই আমার বুকের মধ্যে আশঙ্কায় কেটল ড্রাম বাজছিল ভিরি ডিরি করে, এবারে একেবারে দমাম দমাম করে জয়ঢাক বেজে উঠল।

নীলার দিকে ভুরুর ইঙ্গিত করে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, ঐ ছোকরাটি কে?

নীলা বলল, ও তো মালির ভাই। ক'দিন ধরে এখানে এসে আছে, চাকরি খুঁজছে। বেশ ভালো ছেলে।

আমি কিছুতেই মুখ মনে রাখতে চাই নি, তবু স্পষ্ট মনে আছে। কাল দুপুরেই একে দেখেছি ব্যাঙ্ক ডাকাতির সময়। এই ছেলেটিই তো লম্বা পিস্তল হাতে নিয়ে ঢুকেছিল ম্যানেজারেব ঘরে!

৫

দীপ্তিবৌদি ঘড়ি দেখছিলেন। আমার ঠিক পাঁচ মিনিট দেরি হয়েছে। কী ভাবে যে এসে পৌঁছোলুম, তা জানিয়ে কোনো লাভ নেই বলে আমি কান-এঁটো-করা হাসি দিয়ে বললুম, বাঙালি মেয়ে হয়ে যে আপনি একেবারে ঠিক সময়ে আসবেন, ভাবতেই পারিনি!

দীপ্তিবৌদি বললেন, আমি আর ঠিক দশ মিনিট দেখতুম। তার মধ্যেও তুমি না পৌঁছোলে ধরে নিতুম, তুমি আর আসবে না, তুমি সীরিয়াস নও।

—না-না, আমি খুবই সীরিয়াস, দীপ্তিবৌদি!

—তাহলে চলো! সারা দুপুর আমার সঙ্গে থাকতে হবে কিন্তু।

একটা মিনিবাসের ছেলে চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করছে, দীপ্তিবৌদি এগোলেন সেই দিকে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবাব পর ডান দিকেই পুরো সীটটা খালি। দীপ্তিবৌদিকে জানলার ধারে বসতে দিয়ে আমি পাশে বসবার পর তাকালুম বাইরের দিকে।

তখন চোখ পড়ল ঠিক সামনেই একটা দোকানের দরজায় চোখ বড় বড় করে দাঁড়িয়ে আছে বাপি।

এই রে, বাপিকে তো খবর দেওয়া হয়নি যে তার আর এই কাজ করার দরকার নেই। কাল রাত্তির থেকে সিচুয়েশান পাল্টে গেছে। কিন্তু খবর দেব কী করে, যা সব কাণ্ড হলো রাত্তির থেকে!

বাসটা ছেড়ে দিয়েছে। রাগে কুঁকড়ে গেছে বাপির মুখখানা। হাত-পা ছুঁড়ে কী যেন বলবার চেষ্টা করল আমাকে। আমি দীপ্তিবৌদির কাঁধের ওপর দিয়ে আমার বাঁ হাতটা নিয়ে জানলার বাইরে আঙুল নেড়ে বাপিকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, তোকে আর আসতে হবে না, তুই ফিরে যা!

ও কতটুকু বুঝল তা কে জানে! অন্তত দৌড়ে এসে এই বাসেই যে উঠল না, সেইটুকু যা রক্ষে।

দীপ্তিবৌদি অদ্ভুত চোখে তাকালেন আমার দিকে।

আমি তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললুম, বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে কিনা দেখছিলুম। দেখুন, দেখুন, আকাশের চেহারা, এক্ষুনি বৃষ্টি নামবে মনে হচ্ছে না?

—বর্ষাকালে বৃষ্টি হবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে?

—আমার বৃষ্টিতে ভিজতে খুব ভালো লাগে।

—শোনো নীলু, কাল যে তোমায় বলেছিলুম, গিনিগুলো আমি রেখে তোমায় টাকাটা দিয়ে দেব, সেটা বোধহয় ঠিক হবে না। পরে আমি ভেবে দেখলুম।

—তা হলে কী হবে?

—এতগুলো টাকা! বুড়ো মানুষের হাতে কক্ষনো বেশি টাকা দেওয়া উচিত নয়। যা-তা ভাবে খরচ করে ফেলতে পারে। আমি মায়ের সঙ্গে কথা বলে আঁচ করার চেষ্টা করছিলুম, এত টাকা ওঁর কেন দরকার!

—সর্বনাশ, আমার নাম বলেননি তো?

—না, তা বলিনি। এমনকি আমি জিজ্ঞেস করলুম, মা, আপনার কোনো কিছু কেনা টেনার আছে? কিংবা তীর্থ করতে টরতে কোথাও যাবেন? আপনার ছেলে কিছু টাকা পাঠিয়েছে।

—বড়মা যাবেন তীর্থ করতে? ওঁর তো ধর্ম কর্মে কোনো মন নেই!

—শোনো না, কী বললেন উনি! একেবারে যেন আঁতকে উঠলেন। বললেন, না-না, আমার কিছু টাকার দরকার নেই। সরোজ টাকা পাঠিয়েছে, ও তোমার কাছেই রেখে দাও! জানি, খুব আত্মম্ভরী মানুষ, ছেলের রোজগারের টাকা নিতে চান না কক্ষনো, কিন্তু এতগুলো গিনিই বা উনি বিক্রি করতে দিলেন কেন?

—সেটা তো আমিও বুঝতে পারছি না।

—একমাত্র একটা ব্যাপার হতে পারে। মেজোকাকার মেয়ে মিতুনকে উনি ভালোবাসেন। মিতুনের কথায় উনি খুব দুর্বল হয়ে পড়েন। মিতুনরা কয়েক বন্ধু মিলে কী করেছে জানো? ওরা একটা ঝটিকা বাহিনী করেছে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, দেখো নি?

—না, আমার ঠিক চোখে পড়েনি।

—ওরা ঠিক করেছে, বিয়ের সময় কোনো পাত্রপক্ষ যদি পণের টাকা নেয়, তা হলে ঠিক বিয়ের আসরের মধ্যে ঝটিকা বাহিনীর মেয়েরা গিয়ে বরকে চাবুক মেরে আসবে।

—চমৎকার জিনিস। মিতুনের উপযুক্ত আইডিয়াই বটে।

—এর মধ্যে তো দু' জায়গায় মেরেও এসেছে।

—সত্যি?

—এক জায়গায় তো এই নিয়ে পুলিশ কেস হয়ে গেল। তুমি তো জানো, মেজোকাকা কিছুই করতে পারেন না। মা-ই উকিল ডেকে থানায় ঘুষের ব্যবস্থা করে সব মিটিয়েছেন। তুমি কি ভাবছো, এর পর মা খুব বকে দিয়েছেন মিতুনকে?

মোটেই না, বরং আরো উৎসাহ দিচ্ছেন। বলছেন, ঠিক করেছিস, বেশ করেছিস! ঐ অনামুখো ছেলেগুলোকে চাবকে লাল করে দিবি। মুখে দাগ ফেলে দিবি! বলতে বলতে এমন হয়ে যান, যেন উনি নিজেই চাবুক মারবেন। নীলু, তুমি কিন্তু খুব সাবধান। তোমার এখনো বিয়ে হয়নি তো? যদি পণ নাও......

—আমি চাইলেই বা আমায় দিচ্ছে কে?

—এদিকে মেজোকাকা আর মেজোকাকীমা তো মিতুনের বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, ওর তেইশ বছর বয়েস হলো...

—মিতুন এত বড় হয়ে গেছে?

—তা তো হবেই! মিতুনের আবার বিয়ের শর্ত কী জানো? সম্বন্ধ করে তো বিয়ে হবেই না। পাত্র ও নিজে বেছে নেবে। আর তার সঙ্গে লাইফ পার্টনারশিপ হবে। ছেলে আর মেয়ে দু'জনে একটা কোম্পানি খুলে জয়েন্ট ডিরেক্টর হবে, এক বছর ট্রায়াল রান, তারপর মন্ত্র পড়ে বা রেজিস্ট্রি করে বিয়ে।

—চমৎকার আইডিয়া। এর পর সারা দেশ ব্যবসায়ী দম্পতিতে ভরে যাবে।

—গত বছর মিতুন একটা ছেলেকে পছন্দ করে তার সঙ্গে চিরুনির ব্যাবসা শুরু করেছিল।

—চিরুনির ব্যাবসা? এর তো কোনো মার নেই। এর ডিমাণ্ড কক্ষনো কমবে না, কারণ প্রত্যেক মানুষেরই একটা করে চিরুনি দরকার, যতদিন না টাক পড়ে। আমিও তো এই ব্যাবসা শুরু করলে পারি!

—ছ' মাস বাদেই ওদের ব্যাবসা ফেল পড়ে। সেই ছেলেটি উধাও হয়ে যায়। তাকে আর কোনোদিন দেখাই যায়নি।

—খুন হয়ে গেছে নাকি?

—শুনেছি মিতুন তার ঝটিকা বাহিনী নিয়ে ছেলেটাকে পেটাতে গিয়েছিল। ছেলেটা ভয় পেয়ে এমন দৌড় মারে যে শেষ পর্যন্ত মীরাট না কাঠগুদাম কোথায় যেন চলে গেছে, আর ফেরেনি।

—চিরুনির ব্যাবসাও যে চালাতে পারে না, সে ছেলের শাস্তি পাওয়াই উচিত।

—এবারে আবার কার সঙ্গে যেন মিতুন চিংড়ি মাছের ব্যবসায় নামছে।

—মিতুনের বেশ ব্যাবসা-বুদ্ধি আছে বলুন! চিংড়ি মাছও কোনোদিন বাজারে পড়ে থাকে না।

—কিন্তু এটাও ফেল্ করবে আমি জানি। তোমার বড়মার এই সব ব্যাপারে খুব উৎসাহ। বাড়িতে তো ছেলে নেই, তাই তিনি মেয়েদের দিয়েই ওঁর সমস্ত পাগলামির আইডিয়া কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সব বনেদি বাড়ির লোকেরা কখনো ব্যাবসা করতে পারে না। ওদের গায়ে আছে পুরনো জমিদারি

রক্ত, ওরা ব্যাবসা বোঝে না। যে ছেলেটির সঙ্গে মিতুন আবার ব্যাবসায় নামছে, বুঝতে পারছি তার কপালে দুঃখ আছে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করতে গিয়ে চমকে উঠলুম। আমাদের মিনিবাসটার পাশ দিয়ে যাচ্ছে একটা ট্যাক্সি। তার মধ্য থেকে দাঁত খিচিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে বাপি।

এই রে, বাপি তা হলে আমাদের ফলো করা ছাড়ে নি? তাও আবার বিলিতি গোয়েন্দাদের স্টাইলে ট্যাক্সি ভাড়া নিয়েছে। ঐ টাকাটা তো আমাকেই দিতে হবে। আমাকেই ফলো করবে আমার টাকায়? বাপির কী বুদ্ধি, এইটুকু বুঝছে না যে আমি নিজে যখন এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে রয়েছি তখন ওর আর পেছনে পেছনে আসবার দরকার নেই।

দীপ্তিবৌদির কাঁধের ওপর হাত দিয়ে আবার জানলা দিয়ে বাপিকে ইঙ্গিত করলুম একটা, কিন্তু ততক্ষণে আমাদের বাসটা অনেক এগিয়ে গেছে।

দীপ্তিবৌদি বললেন, তুমি যদি আমার কাঁধে হাত রাখতে চাও, ভালো করে রাখো। একবার রাখছ, একবার সরিয়ে নিচ্ছ কেন?

--না-না, হাতটা এমনিই ভুল করে চলে যাচ্ছে!

—শুনে তোমার কী মনে হচ্ছে, মিতুনের এই চিংড়িমাছের ব্যাবসার জন্যেই মা টাকার জোগাড় করছেন?

—তাই তো মনে হচ্ছে এখন।

—নষ্ট হবে জেনে শুনেও আমি এটা এনকারেজ করতে পারি না। আমি যদি না জানতুম, সেটা আলাদা কথা। এই টাকাটা কত ভালো কাজে লাগতে পারে। তুমি এক কাজ করো, এই গিনিগুলো তুমি আমাদের স্কুলকে ডোনেশান দিয়ে দাও!

-- আপনাদের স্কুলে?

—হ্যাঁ, আমাদের একটা স্কুল আছে। সেখানে তোমায়—

—কিন্তু এগুলো তো বড়মা আমায় বিক্রি করতে দিয়েছেন। আমি এগুলো দান করব কী করে?

—তুমি তোমার বড়মাকে বলবে যে ওগুলো হারিয়ে গেছে।

—আমি বললেই সে কথা উনি বিশ্বাস করবেন?

—তুমি এই সব বনেদি বাড়ির মেজাজ জানো না। ভালো করে খাবার না জুটলেও মেজাজটি ঠিক রাখা চাই! তুমি যদি হারিয়ে যাওয়ার কথা বলো, তা হলে তোমার বড়মা বলবেন, যাক গে যাক! গেছে, গেছে! তুই ও নিয়ে আর চিন্তা করিসনি।

—দীপ্তিবৌদি, আপনি আমাকে মিথ্যা কথা বলতে শেখাচ্ছেন?

—তুমি বুঝি কখনো মিথ্যা কথা বলো না?

—না, ঐ একটা জিনিস পাবেন না আমার কাছে। মিথ্যা কথা বলতে গেলেই আমার জিভ আটকে যায়।

—বাঃ, শুনে ভালো লাগল। তা হলে তুমি গিনিগুলো মাকে ফেরৎ দিয়ে এসো।

এর পর একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন দীপ্তিবৌদি।

আমি আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলুম। সকালবেলা একজন জলজ্যান্ত ব্যাঙ্ক-ডাকাতকে দেখে এসেছি। দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে সে এক মালির ভাই সেজে বাগানে মাটি খুঁড়ছে। টাকাগুলো ঐ মাটির তলাতেই লুকিয়ে রেখেছে বোধহয়। এ ব্যাপারে কিছু একটা ব্যবস্থা নেওয়া আমার কর্তব্য নিশ্চয়ই। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমার উচিত পুলিশের কাছে যাওয়া। কিন্তু সবাই যে বলে বাঘে ছুঁলেই আঠারো ঘা, আর পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ। নীলার জবানবন্দী শুনে পুলিশ যদি আমার জর্দার কৌটোর ভেতরের প্রেমপত্র দেখতে চায়? কোনো মেয়ের লেখা প্রেমপত্র তখন আমি জোগাড় করব কী করে? প্রেমপত্র কি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়? অথচ, এই সামান্য কারণের জন্য একটা ডাকাত ছাড়া পেয়ে যাবে, এটাও ঠিক নয়।

তা হলে এখন আমার কী রকম ভূমিকা? দীপ্তিবৌদিকে অনুসরণ করা এবং বাপির দ্বারা অনুসরণিত হওয়া। নিজেকে চোর প্রমাণিত না করে গিনি বিক্রেতা। বাপির হয়ে মিতুনের কাছে ওকালতি, আবার নীলার হারানো প্রেমিককে উদ্ধার করে দেবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছি। কন্টিনেন্টাল ড্রাগ কোম্পানির নামটা শোনা শোনা। বিজ্ঞাপনে দেখেছি চেনা কেউ কোনোদিন ওখানে চাকরি করত? ওদের অফিসটা কোথায় জানি না, টেলিফোন গাইড দেখলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। এই ডামাডোলের বাজারে সেই কোম্পানিটা আবার কলকাতা ছেড়ে বাঙ্গালোরে উঠে যায়নি তো?

দীপ্তিবৌদি বললেন, চলো এসে গেছি!

আবার সেই আনোয়ার শা রোডের মোড়। বাস থেকে নেমে আমি দীপ্তিবৌদির পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলুম, সেই চাবির ভাঁওতা দেওয়া ছেলে তিনটেকে দেখা যায় কিনা! আর কিছু না হোক, একটা তাচ্ছিল্যের হাসি তো ছুঁড়ে দিতে পারতুম ওদের দিকে।

সেই পাঁচিল-ঘেরা বাড়িটাতে ঢুকলেন দীপ্তিবৌদি। ভেতরে একটা আম গাছ ও ঘাসে ভরা চত্বর। তারপর একটা ছোট একতলা বাড়ি। সেই বাড়ির বারান্দায় একজন নার্স দাঁড়িয়ে।

দীপ্তিবৌদিকে দেখে নার্সটি বলল, আপনি এসে গেছেন। তা হলে আমি খেয়ে আসি?

দীপ্তিবৌদি বললেন, যান।

তারপর বাড়ির মধ্যে ঢোকবার আগে দীপ্তিবৌদি আমায় বললেন, শোনো, নীলু, তোমার সঙ্গে একজনের আলাপ করিয়ে দেব। তাঁকে আমি খুব ভালোবাসি। তোমার সরোজদাও ওঁকে খুব ভালোবাসেন। তোমার সরোজদার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যাবার পর উনি আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়, তাই তোমার সরোজদা বলেছেন, আমি যেন মাঝে মাঝে এসে ওঁর কাছে থাকি।

আমি বিস্ফারিত চোখে দীপ্তিবৌদির দিকে তাকালুম। এ আবার কী গল্প।

দীপ্তিবৌদি আবার বললেন, দেবতুল্য মানুষ। তবে এখন মাথায় একটু গোলমাল হয়েছে।

—আপনার বিয়ের পর উনি আপনাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন কেন? আগে চাইলেই তো পারতেন।

—বাঃ, বিয়ের আগে যে উনি আমায় চিনতেনই না।

—সরোজদাও একে ভালোবাসেন বলছেন?

—হ্যাঁ, ইনি তোমার সরোজদার মাস্টারমশাই ছিলেন! সরোজ এর কাছে দারুণ ঋণী। চলো, ওঁকে দেখলে তোমারও খুব ভালো লাগবে। হ্যাঁ—একটা কথা, উনি তোমায় যা জিজ্ঞেস করবেন, তুমি হ্যাঁ বলে যাবে। যা বলবেন, মেনে নেবে।

—সব কথায় হ্যাঁ বলব? যদি উনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি একটা গাধা? তা হলেও হ্যাঁ বলব?

—হ্যাঁ। সেটাই বলবে। উনি একদম প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেন না। ডাক্তাররাও বলেছে, ওঁর কোনো কথায় কেউ প্রতিবাদ করলেই ওঁর রোগ বেড়ে যাবে।

—ওঁর কী রোগ?

—ঐ যে বললুম, মাথার রোগ।

এবারে আমরা দরজা ঠেলে ঢুকলুম একটা ঘরের মধ্যে। সমস্ত জানালা বন্ধ, ঘরের ভেতরটা আবছা অন্ধকার। ইজি চেয়ারে বসে আছে একজন বৃদ্ধ, পাশে জ্বলছে একটা টেবল ল্যাম্প। বৃদ্ধের গালে সাদা ধপধপে দাড়ি, মাথায় টাক। ঐ টাক না থাকলে অনায়াসে ওঁকে রবীন্দ্রনাথের ছোট ভাই বলা যেত।

দীপ্তিবৌদি বললেন, ইনিই বিখ্যাত অধ্যাপক ভবতোষ সরকার। আর এ হচ্ছে নীলু, আমার দেওরের বন্ধু।

বৃদ্ধের চোখ দুটি বেশ উজ্জ্বল। আমার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, দেওরের বন্ধু?

দীপ্তিবৌদি আর আমি দু'জনেই এক বললুম, হ্যাঁ।

—তার মানে আমার শত্রু?

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দীপ্তিবৌদির দিকে তাকালুম। এ প্রশ্নের উত্তরেও হ্যাঁ বলতে হবে?

দীপ্তিবৌদি নিজেই উত্তর দিলেন হ্যাঁ। একটু একটু। যেমন সব মানুষই সব মানুষের শত্রু। আবার বন্ধুও। যেমন সব মানুষই সব মানুষের বন্ধু। বন্ধুই বেশি। সেই হিসেবে ও আমাদের বন্ধু।

বৃদ্ধ বললেন, ও। তা বেশ! বসো। তোমরা খেয়ে এসেছো? পেটে আগুন জ্বলছে, তবু আমি বললুম, হ্যাঁ।

দীপ্তিবৌদি কাছে গিয়ে বৃদ্ধের কাঁধে হাত রেখে বললেন, এবারে আমি তোমায় খাইয়ে দিই?

বৃদ্ধ অভিমানের সুরে বললেন, জানিস দীপ্তি, আজ ব্রেকফাস্টে আমার টোস্টে ওরা মাখন লাগিয়ে দেয়নি!

—তাই নাকি? খুব অন্যায় তো! আমি রামুকে ডেকে বকে দিচ্ছি।

—রামুকে তুই ছাড়িয়ে দে। ও মহা পাজী, আর একদম লেখাপড়া জানে না। যারা লেখাপড়া জানে না, তাদের গায়ের গন্ধ আমি একেবারে সহ্য করতে পারিনা!

এই বলেই বৃদ্ধ কটমট করে তাকালেন আমার দিকে।

দীপ্তিবৌদি বললেন, নীলুকে এনেছি, ও আমাদের স্কুলের ব্যাপারে সাহায্য করবে।

—এবারে স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভা কবে? সেদিন কিন্তু আমায় নিয়ে যেতে হবে।

—হ্যাঁ, নিয়ে যাব।

পাশের একটা গোল টেবিলে খাবার ঢাকা আছে। দীপ্তিবৌদি ঢাকা তুলে চামচে করে খাবার খাইয়ে দিতে লাগলেন বৃদ্ধকে। ঠিক যেন একটা শিশুকে খাওয়াচ্ছেন। মাঝে মাঝে মৃদু বকুনি দিয়ে বলছেন, ওকি, চিবোনো বন্ধ করলে কেন? না-না, এই ভাতটুকু খেয়ে নিতে হবে। আর এক টুকরো মাংস দিই?

বৃদ্ধ জলের গেলাসটিও নিজের হাতে ধরেন না। দীপ্তিবৌদি তাঁকে জল খাইয়ে মুখ ধুয়ে মুছে দিলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, নীলু, তুমি কাছে এসে বসো। উনি তোমার সঙ্গে কথা বলবেন।

আমি একটা মোড়ায় বসেছিলুম, সেটি বৃদ্ধের পায়ের কাছে টেনে আনলুম।

বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন. ঈশ্বর ক'রকম জানো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বেশ। এখন বলো তো ঈশ্বর কী খেয়ে হজম করতে পারেন না?

আমি হ্যাঁ বলতে গিয়েও থেমে গেলুম। দীপ্তিবৌদি ওঁর পেছন দিকে দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁর মাথার দিকে আঙুল দেখিয়ে ইঙ্গিত করলেন। কী বলতে চান দীপ্তিবৌদি, ঈশ্বর এই বুড়োটাকে খেয়ে হজম করতে পারবেন না। এতই ছিবড়ে এর মাংসে?

বৃদ্ধ বললেন, শোনো, যার উত্তর জানা নেই, তা আমায় জিজ্ঞেস করবে।

—আজ্ঞে, আপনি বলে দিন।

—নিজেকে। হে হে হে হে! কী, ঠিক বলিনি?

—হ্যাঁ।

—এবারে বলো তো, আমি কী খেয়ে হজম করতে পারি না?

—এই মানে, নিজেকে, না মানে, ঈশ্বরকে।

—মুরগির ডিম! তবু কেন দীপ্তি আমায় মুরগির ডিম খাওয়ায় তা জানো?

—না। মানে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি।

—ও জোর করে খাওয়ায় আর আমি তবু খেয়ে নিই কেন তাও জানো।

—হ্যাঁ।

দীপ্তিবৌদি বললেন, এই, কী দুষ্টুমি হচ্ছে। আমি তোমায় জোর করে মুরগির ডিম খাওয়াই?

—তুমি চুপ করো দীপ্তি। এখন আমি ওকে পড়াচ্ছি। রোজ তোমায় একা পড়াই. আজ আর একটি নতুন ছাত্র পেয়েছি। বেশ ভালো ছেলে, টপাটপ হ্যাঁ বলতে পারে। এবারে বলো তো ছোকরা, কেন ও জোর করে খাওয়ায়, কেন আমি খাই? উত্তর না জানলে আমায় জিজ্ঞেস করবে।

—আপনি বলুন।

—ভালোবাসা! ভালোবাসাতেই মুরগির ডিম হজম করায়। ভালোবাসা থাকলে শীতকালে শীত করে না, গ্রীষ্মকালে ঘাম হয় না, পুকুরে চান করলে জ্বর হয় না, ঠিক কি না।

—হ্যাঁ।

—ভালোবাসা না থাকলে কি হয় জানো?

—আপনি বলুন।

—জ্বর হয়, গেঁটে বাত হয়, বিলেত চলে যায়, মন্ত্রী হয়, কুকুরের ডাক শুনলে ভয় পায়। বুঝলে?

—হ্যাঁ।

—এবারে বলো, পদার্থ কয় প্রকার?

—আপনি বলুন।

—দুই প্রকার। পদার্থ আর অপদার্থ। তার মধ্যে অপদার্থও আবার দুই প্রকার। পুরুষ অপদার্থ আর নারী অপদার্থ। নারী অপদার্থ আবার তিন প্রকার। কুমারী অপদার্থ, সধবা অপদার্থ আর বিধবা অপদার্থ। এর মধ্যে সধবা অপদার্থও তিন প্রকার, ছিচকাঁদুনি, ক্ষ্যান্ত গর্দানী, আর ভুজুং ভুজুং অপদার্থ। বাকি রইল শুধু দীপ্তি। অর্থাৎ দীপ্তি ছাড়া আর সবাই অপদার্থ, এবার বুঝলে?

—হ্যাঁ।

এই রকম ভাবে প্রায় এক ঘন্টা ধরে বৃদ্ধ আমাকে পড়ালেন। তারপর বললেন, আজ শুধু ফিলসফি পড়ালাম, কাল ফিজিক্স পড়াবো। পরশু তোমার পরীক্ষা। ঠিক আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

দীপ্তিবৌদি এবারে বৃদ্ধকে কোলে করে তুলে নিয়ে খাটে শুইয়ে দিলেন। তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, এবারে লক্ষ্মী ছেলের মতন একটু ঘুমিয়ে নাও তো।

বৃদ্ধের একটি হাত দীপ্তিবৌদির কোমর জড়িয়ে রইল। দীপ্তিবৌদি গুনগুন করে একটা গান শোনাতে লাগলেন।

এক সময় বৃদ্ধের ফিঁচ ফিঁচ করে নাক ডাকা শুরু হতেই আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজা ভেজিয়ে দিলাম।

দীপ্তিবৌদি বললেন, নীলু, তুমি আজ আমার খুব উপকার করলে। এই ভবতোষ সরকার এক সময় কী রকম নামকরা অধ্যাপক ছিলেন তুমি ভাবতে পারবে না। তোমার সরোজদা তো এঁরই হাতে গড়া। টানা পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে অধ্যাপনা করেছেন। এখনো প্রত্যেকদিন কারুকে না কারুকে না পড়ালে ওঁর শান্তি হয় না।

—এই রকম পড়ানো?

—আহা, মাথাটা একটু খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু এক সময় তো বিরাট পণ্ডিত ছিলেন। লণ্ডন ইউনিভার্সিটির খাতা দেখতেন।

—কিন্তু এরকম পড়ানোর ধাক্কায় যে আর একটু হলে আমারই মাথা খারাপ হয়ে যেত।

—তোমার এমন কিছু কষ্ট হয়নি, নীলু। উনি রোজ আমায় নতুন ছাত্র এনে দিতে বলেন। কিন্তু এত ছাত্র আমি কোথায় পাই। একদিন কেউ এলে আর দ্বিতীয় দিন আসতে চায় না। তুমি মাঝে মাঝে আসবে তো নীলু? আমার জন্য এইটুকু কষ্ট করতে পারবে না?

আমার এর মধ্যে এমনই হ্যাঁ বলা অভ্যেস হয়ে গেছে যে এবারও বললুম, হ্যাঁ।

তা হলে আমার আর একটা ভূমিকা বাড়লো। ছাত্রের ভূমিকা। এই যদি ফিলজফি পড়ানো হয়, তা হলে ফিজিক্সটা আরো কত শক্ত হবে কে জানে?

দীপ্তিবৌদি বললেন, তোমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তুমি খেয়ে আসোনি। চলো, আগে কোথাও একটু কিছু খেয়ে নিই।

সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মোড়ের দিকে আসতেই দেখতে পেলুম, একটা ট্যাক্সির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শ্রীমান বাপি। আমার দিকে একটা কুটিল দৃষ্টি হেনে মুখটা ফিরিয়ে নিল।

আমরা রাস্তা পার হতে না হতেই বাপির ট্যাক্সিটা চলতে শুরু করল। ও কি সারাদিনের জন্য একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে নিয়েছে নাকি? সবটাই এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট!

একটা ট্রাম আসতেই দীপ্তিবৌদি উঠে পড়লেন। আমরা নামলুম কালীঘাটের কাছে। তারপর একটা দোকানে ঢুকে খাবার অর্ডার দেওয়া হলো।

খেতে খেতে দীপ্তিবৌদি বললেন, আমি রোজ দুপুরে আর সন্ধেবেলা ওঁর কাছে যাই। আমি না খাইয়ে দিলে উনি কিছুতেই খেতে চান না। উনি আমাকে ওঁর স্ত্রী মনে করেন কি না!

—ওঁর আর কেউ নেই?

—না। উনি তো বিয়ে করেননি কখনো। মাথা খারাপ হবার পর থেকেই আমাকে বিয়ে করার শখ হয়েছিল। ওঁর দুটি ভাইপো ভাগ্নী আছে। কিন্তু তারা সম্পত্তির লোভে আসে এই ভেবে উনি তাদের বাড়িতে ঢুকতে দেন না। একটা চাকর আছে, আর একটা নার্স, দ্যাখো না, এতবড় একজন পণ্ডিত মানুষের এখন এই অবস্থা। আমার ওপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে আছেন এখন। অথচ সব সময় তো ওঁর কাছে এসে থাকতে পারি না।

—কেন থাকেন না?

—তোমার সরোজদা বলেছেন, যতদিন ওঁর মা বেঁচে আছেন, ততদিন আমাকে ঐ বাড়িতেই থাকতে হবে। আমি কলকাতায় থেকেও অন্য কোথাও থাকব, সেটা মা সহ্য করতে পারবেন না। ওঁদের বংশের অসম্মান হবে। তাছাড়া

তুমি দেখেছ তো, মা কী রকম ছেলেমানুষি করেন। আমি ওষুধ খাইয়ে না দিলে কিছুতেই খেতে চান না।

—ওঁকে কোনো হাসপাতাল বা পাগলা গারদে ভর্তি করে দেন নি কেন?

—ছিঃ, নীলু! ওঁর মতন একজন অসামান্য গুণী লোক...

—না-না, আমি বলছিলুম যাতে ওঁর ভালো চিকিৎসা হয় সেই জন্য...

—কোনো চিকিৎসাতেই ওঁর আর সারবার আশা নেই।

—আপনি ভবতোষ সরকারের কথা বড়মাকে কিছু জানাননি?

—কেন জানাইনি জানো? তাহলে মায়ের হিংসে হবে। আমি পুরোপুরি ওঁর সেবা না করে আরো একজনের সেবা করছি জানলে উনি সহ্য করতে পারবেন না। বুড়ো বয়েসে মানুষের এরকম হয়।

—আচ্ছা দীপ্তিবৌদি, আপনি বাড়িতে শাশুড়ির সেবা করবেন আর এখানে এসে একজন বুড়ো অধ্যাপকের সেবা করবেন এটাই কি আপনার জীবন!

দীপ্তিবৌদি হাসলেন। হাসির সময় ওর চোখ দুটি ঝকঝক করে।

—তুমি কি আমাকে শুধু সেবাপরায়ণা কুলবধ্ ভেবেছ নাকি? না-না, আমার অন্য বন্ধুবান্ধব আছে, আমার অন্যরকম জীবনও আছে। এই যে তুমি আমার সামনে বসে অনবরত সিগারেট টেনে যাচ্ছ, গন্ধটা বেশ লাগছে আমার। এক একদিন আমি রাত্তিরে বন্ধুদের পার্টিতে সিগারেট খাই। একটু আধটু জিন আর বীয়ারও খাই।

—বাঃ! এবারে আপনাকে বেশ মানুষ মানুষ লাগছে। এতক্ষণ দেবী দেবী মনে হচ্ছিল।

—শোনো, আর একটা কাজ আছে। তোমাকে এখনো আমার সঙ্গে ঘুরতে হবে কিন্তু।

—কোথায় যাব?

—ঐ যে ভবতোষ সরকার, উনি তাঁদের পাড়ায় একটা স্কুল খুলেছিলেন। শিক্ষক মানুষ তো, কোনো না কোনোভাবে শিক্ষার সঙ্গে জড়িত না থাকলে উনি সুস্থির বোধ করেন না। প্রথম প্রথম কিছুদিন তিনি নিজেই সেই স্কুলে পড়িয়েছিলেন।

—সর্বনাশ!

—না-না, তখন মাথার অবস্থা এতটা খারাপ ছিল না। মোটামুটি পড়াতে পারতেন। এখন অবশ্য ওঁর পায়ে বাত, হাঁটতেও পারেন না। নইলে ওঁকে আটকানো মুস্কিল হতো। যাই হোক, ওঁর ধারণা স্কুলটা এখনো চলছে। আসলে স্কুলটা উঠে গেছে।

—কেন?

—ঐ যে আনোয়ার শা রোড রাস্তাটা চওড়া করা হলো, সেই সময় ভেঙে ফেলা হয়েছে বাড়িটা। সেকথা ওঁকে জানানো হয়নি, দুঃখ পাবেন। সরকার যাতে ক্ষতিপূরণ দিয়ে আর একটা স্কুল বাড়ির ব্যবস্থা করে দেয়, সেজন্য আমি চেষ্টা করছি। এ পাড়ার দু'জন এম. এল. এ.-কে ধরে ব্যবস্থা করতে হবে। এখন তাঁদের কাছে যাব, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।

—আমি সঙ্গে থেকে কী করব?

—এ দেশের অবস্থা তো তুমি জানো। একা কোনো মহিলা দেখা করতে গেলে, কেউ সীরিয়াসলি কোনো কথা শোনে না। গদগদ চোখে তাকায়, কদিন ঘুরে ঘুরে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেইজন্যই তোমাকে সঙ্গে রাখতে চাই।

—কিন্তু জানেন, দীপ্তিবৌদি, কোনো সুন্দরী মহিলার সঙ্গে যদি একজন অবাঞ্ছিত পুরুষ থাকে, কেউ তাকে পছন্দ করে না। সবাই তার দিকে ঘৃণার চোখে তাকায়। মনে মনে বলে, এই আপদটা আবার এলো কেন।

—যাঃ। আমিও সেরকম সুন্দরী নই, আর তোমায় দেখেও কেউ ঘৃণা করবে না। আমিই সব কথা টথা বলব, তুমি শুধু একটু গোবেচারির মতন মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাতে তোমার এমন কিছু অসুবিধে হবার কথা নয়।

—অর্থাৎ বলছেন, আমার মুখটাই গোবেচারির মতন? কষ্ট করে আর সাজতে হবে না!

—সব তাতেই তোমার ইয়ার্কি, না? চলো, উঠে পড়ি।

আমার অনেক আপত্তি সত্ত্বেও দীপ্তিবৌদিই জোর করে দাম মিটিয়ে দিলেন। বাইরে এসে দেখলুম, এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেকগুলো ট্যাক্সি রয়েছে। এর মধ্যে কোন্ ট্যাক্সিতে যে বাপি বাবাজী বসে আছে কে জানে!

ও যখন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে ঠিক করেছে, তখন ওর ট্যাক্সিতেই তো আমরা গেলে পারি। শুধু শুধু আলাদা ট্রামে-বাসে গিয়ে লাভ কি?

ভালো করে খুঁজতেই একটা ট্যাক্সিতে দেখতে পেলুম বাপিকে। ওকে ডাকতে যেতেই সেটা ছেড়ে চলে গেল!

বারবার পেছনে ফিরে আমার দিকে রোষকটাক্ষ দিতে লাগল। আমি ওকে দু'বার হাতছানি দিলুম, ও তাও বুঝতে পারল না।

দীপ্তিবৌদি জিজ্ঞেস করলেন, কাকে ডাকছ?

আমি বললুম, কই, কারুকে ডাকিনি তো! হাতে ঝিঁঝিঁ ধরে গেছে। তাই একটু ব্যায়াম করছিলুম।

৬

আমি জানতুম, বাড়ি ফেরার আগে আজই বাপি আমাকে এসে ঠিক ধরবে। কিন্তু ও যে অন্ধকারের মধ্যে ডাকাতের মতন আমার ওপর লাফিয়ে পড়বে, এতটা আশা করিনি।

সারা রাস্তা লোডশেডিং। ট্রাম থেকে নেমে আমি প্রথমেই মনে করবার চেষ্টা করছিলুম যে কাছেই একটা হাইড্রেন্টের মুখ খোলা আছে, সেটা ডানদিকে না বাঁ দিকে। এমন সময় হুট করে কোথা থেকে এসে বাপি শক্ত করে আমার কাঁধে হাত রেখে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, দেড় ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি!

আমি বললুম, তুই আমার বাড়িতে গিয়ে বসলেই পারতিস!

—বাড়িতে? এসব কথা বাড়িতে হয়? দুশ্চরিত্র, বদমাস, নিরামিষাশী, ব্যভিচারী, ঘাসের মধ্যে সাপ!

—আরে চুপ, চুপ! এসব কী বলছিস রে, পাড়ার লোক শুনতে পাবে।

—তুই না বলছিলি বাড়িতে গিয়ে বসতে? তোর মাকে যদি সব বলে দিতুম আমি? বন্ধুর সঙ্গে কোনো বন্ধু যে এরকম ব্যবহার করতে পারে—

—চল ঐ পার্কের বেঞ্চিতে গিয়ে বসি। তুই সব ভুল বুঝেছিস বাপি! তোকে খবর দেবার সময় পাইনি।

—খবর মানে? ঢাক- ঢোল পিটিয়ে সারা কলকাতা রটাতে চাস? তুই একটা মেয়ের সঙ্গে ঘুরবি, ফুর্তি করবি, আর আমি তোকে পাহারা দেব, এই তুই ভেবেছিলি? এই আমাদের পার্টনারশিপ!

আরে, তোকে আর ফলো করতে হবে না, এই তো আমি বলতে চেয়েছিলুম কতবার। তুই বুঝতেই পারলি না।

—ফলো করতে হবে না মানে? তুই-ই কি ভাবছিলি তোর কথা অনুযায়ী তোদের আমি ফলো করেছি? আমি দেখতে চেয়েছিলুম, তুই কত দূর নষ্ট হতে পারিস! প্রথমে তো আমি নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারি নি! শেষকালে কিনা মিতুনের বৌদির সঙ্গে!

—বলছি তো, ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। ঘটনাটা বদলে গেছে। দীপ্তিবৌদি আমাকেই যে সঙ্গে নিতে চাইবেন, সেটা কাল দুপুরে আমি জানতুম না। তা হলে কি তোকে ফলো করতে বলতুম? এরকম ফলো করার মানে কি বল?

—কী মানে তা তুই-ই জানিস! পারভার্ট! গভীর জলের মাছ হয়েছিস তুই আজকাল। মিতুনের বৌদির সঙ্গে প্রেম করিস। তোর এত সাহস!

—আরে ছি ছি, বৌদি সম্পর্কে ওরকম কথা বলতে নেই। দীপ্তিবৌদিকে আমি শ্রদ্ধা করি।

—শ্রদ্ধা! ন্যাকামো? আমি নিজের চোখে সব দেখেছি। ফাঁকা বাসে উঠে গলা জড়াজড়ি করে ফিসফিস করে কথা বলা, ছি ছি!

—আমিও ছি ছি বলতে পারি। বাসের মধ্যে কখন গলা জড়াজড়ি করলুম?

—করিস নি? আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে কাঁধের ওপর হাত রাখলি, একবার না, দু' দু'বার আমি দেখেছি।

—সে তো তোকে ইশারা করবার জন্য!

—ফের চালাকি? তারপর আনোয়ার শা রোডের ঐ বাড়িটায় দুপুর কাটাতে যাস রোজ তোরা দু'জনে।

—রোজ? আমি আজই প্রথম।

—আমার সাক্ষী আছে। ঐ পাড়ার তিনটে ছেলে বলল, তোকে কালও ওখানে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে। তোর নাকি চাবি হারিয়ে গিয়েছিল।

—আরে শোন, শোন, সব কথা ঠিক করে শোন...

—তারপর দু'জনে গেলি রেস্টুরেণ্টে খেতে। ক্যাবিনের মধ্যে, পর্দা ফেলে।

—মোটেই পর্দা ফেলা ছিল না।

—হ্যাঁ ছিল, আলবাৎ ছিল।

—বেয়ারারা যদি পর্দা ফেলে দিয়ে যায়, আমি কী করব? খিদে পেলে খেতে যাব না?

—আরে আমি তখন বাইরে বসে আঁটি চুষছিলুম। শোন, নীলু, আজ আমি একটা ছুরি নিয়ে বেরিয়েছিলুম, যদি কোনো কাজে লাগে। এখন ইচ্ছে হচ্ছে, সেই ছুরিটা নিয়ে তোকে খুন করে ফেলি। এখানে অন্ধকার আছে, কেউ দেখতেও পাবে না।

—ছিঃ বাপি, বন্ধু কখনো খুন করে না। এ ফ্রেণ্ড ইন নীড ইজ এ ফ্রেণ্ড ইনডিড! আমার কলারটা অত জোরে চেপে ধরিস না, ছেড়ে দে।

—বন্ধু না ছাই! বন্ধুর মতনই কাজ করেছিস বটে আজ। তোকে আমি খুন করছি না কেন জানিস? তার কারণ, মিতুন তোকে বড় দাদার মতন শ্রদ্ধা করে। আজ সকালে যখন আমি মিতুনকে ফোন করে বললুম, কয়েকদিন একটু ব্যস্ত থাকব, নীলুর একটা জরুরি ব্যাবসার কাজে সাহায্য করতে হবে, তাই কয়েকদিন দেখা হবে না, অমনি মিতুন বলল,ও নীলুদা, আচ্ছা তা হলে ঠিক আছে! এত শ্রদ্ধা করে তোকে মিতুন, আর তুই ওদের বাড়ির এই সর্বনাশ করছিস? বৌদির চরিত্রে যদি কলঙ্ক রটে যায়, তা হলে আমার মা-বাবা মিতুন সম্পর্কে কী ভাববেন?

—অত উত্তেজিত হোস না। শান্ত হ। বৌদির সঙ্গে আমার কিচ্ছু হয়নি। ইন

ফ্যাক্ট, আমি তো চাইছিলুম, তোর ট্যাক্সিতেই আমরা উঠব। তুই খালি সটকে পড়ছিলি।

—আমার ট্যাক্সিতে? বাঃ! চমৎকার! মিতুনের বৌদি তারপর আমাকে চিনে রাখুক আর কি! একদিন তো আলাপ হবেই। সেদিন নিশ্চয়ই বলে দিত, এই ছেলেটাই তো একদিন ট্যাক্সি নিয়ে আমায় ফলো করেছিল। তখন!

—তোর ট্যাক্সিতে চাপলেই উনি বুঝতেন কী করে যে তুই আমাদের ফলো করছিস? হঠাৎ কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় না?

—অর্থাৎ তুই আমাকে আর একটা কোনো ফাঁদে ফেলতে চাইছিলি। তোকে আর বিশ্বাস নেই! যাকগে, ট্যাক্সির কথায় মনে পড়ে গেল। আমার ট্যাক্সি ভাড়া, সিগারেট আর চা-বিস্কুট খরচ হয়েছে আজ একশো আশি টাকা। দে, টাকাটা দে!

—একশো আশি টাকা? বলিস কি?

—আমি মিথ্যে কথা বলছি?

—না মানে, একদিনে একশো আশি টাকা এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট; কোম্পানি ডকে উঠে যাবে যে দু'দিনেই!

—টাকাটা তুই দিবি কি না!

—দেব, দেব। তুই বিল করে দে আগে, এসব হিসেব পত্তরের ব্যাপার।

—আমি তোর সঙ্গে আর কোনো পার্টনারশিপে নেই। টাকাটা এক্ষুনি দিয়ে দে। আর একটা কথা জানতে চাই। তুই তো বৌদির সঙ্গে লাস্টে ওদের বাড়িতেই গেলি দেখলুম। মিতুনকে বলেছিস আমার কথা? বলেছিস তো আমার ব্যাঙ্ক লোনটা পেতে দু'চারদিন কেন দেরি হচ্ছে?

বাপির পকেটে ছুরি আছে শুনেই আমার মনটা খচখচ করছিল। কী যেন একটা মনে পড়ার কথা। এবার ও ব্যাঙ্কের কথা উচ্চারণ করতেই আর একটা পরিকল্পনা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল।

এবারে আমি বাপির কাঁধ খামচে ধরে বললুম, শোন, আজ একটা সাঙ্ঘাতিক জিনিস আবিষ্কার করেছি। একটু মাথা ঠাণ্ডা করে যদি এগোতে পারিস, তা হলে তোর আর কোনো চিন্তা নেই। ছটফট না করে মন দিয়ে একটু শুনবি?

—আবার যদি তুই আমার সঙ্গে কোনোরকম চালাকির চেষ্টা করিস, নীলু, তাহলে এবারে কিন্তু আমি তোকে আর ছাড়ব না। মিতুনকে সব বলে দেব। বলব, তুই ওর বৌদিকে পাপের পথে প্রলোভন দেখাচ্ছিস, আর ওদিকে তুই পণ নিয়ে বিয়ে করছিস! তুই ব্যভিচারী! দেখবি, মিতুনের ঝটিকা বাহিনী তেড়ে আসবে। তোর নাড়ি ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবে!

—বাজে কথা ভুলে গিয়ে আমার কথাটা শোন, বাপি। মনে কর, কাল তোদের

ব্যাঙ্কে যে ডাকাতিটা হয়ে গেল, তার একজন ডাকাতকে তুই ধরে ফেললি, আর অনেক টাকাও উদ্ধার করে দিলি। তখন কী হবে? কাগজে তোর ছবি ছাপা হবে। পুলিশের কাছ থেকে পুরস্কার পাবি। আর তোর ব্যাঙ্ক আহ্লাদে আটখানা হয়ে তুই যত টাকা চাইবি, তত টাকা তোকে লোন দিয়ে দেবে। ঠিক কি না?

—তুই আমায় রূপকথা শোনাচ্ছিস?

—একদম খাঁটি সত্যি কথা। তারপর ধর, মিতুনও বেশ একটু মিলিটারি মেজাজের। ও যখন জানবে তুই এমন বীরপুরুষ, তখন তোর প্রতি ওব প্রেম কতটা বেড়ে যাবে!

—তুই কি আমায় ছেলেমানুষ পেয়েছিস?

—আরে না, এরকম সুযোগ জীবনে পাবি না।

—আসল কথাটা বল না।

—আসল কথাটা হচ্ছে, কালকেব ব্যাঙ্ক ডাকাতদের মধ্যে একজনকে আমি দেখেছি। সে কোথায় আছে আমি জানি।

—তবু তুই পুলিশে খবর দিস নি?

—পুলিশে খবব দিলে তোব কৃতিত্বটা থাকত কোথায়? আমি তো তোর কথা ভেবেই এতক্ষণ চেপে রেখেছি। এখন তুই যদি গিয়ে কাজ সারতে পারিস!

—আমি, আমি ডাকাত ধরব?

—হ্যাঁ ধরবি। কেন, পারবি না? আমি দেখে এসেছি, ছেলেটার গায়ে বেশি জোর নেই। পেছন থেকে গিয়ে আচমকা খুব জোরে জাপটে ধরে চেঁচিয়ে উঠবি, ডাকাত! ডাকাত! ব্যস, তা হলেই হবে। সেখানে অনেক লোক আছে, সবাই ছুটে আসবে। তাছাড়া, তোব সঙ্গে তো ছুরি আছেই।

—আসলে ছুরি নেই। ছুরি কোথায় পাব? এমনিই তোকে ভয় দেখাচ্ছিলুম।

—ঠিক আছে, তোর গায়ে জোর তো আছে। তাতেই হবে। ভয় নেই কিছু, ও একলা আছে। আমার প্ল্যান একদম নিখুঁত। কোথায় ও টাকা লুকিয়ে রেখেছে, তাও আমি জানি। বাগানে মাটির নিচে। সবাই মাটির নিচেই দামী দামী জিনিস রাখে। চল, তা হলে আর দেরি করা ঠিক নয়।

—কোথায় যেতে হবে?

—শ্রীরামপুর।

—শ্রীরামপুর? অত দূরে? এই রাতে?

—আর দেরি করলে ডাকাত যদি ফস্কে যায়? হয়তো কাল ভোর রাতেই হাওয়া হয়ে যাবে।

—নীলু, তুই আমায় একলা এত বড় রিস্ক নিতে বলছিস?

—একলা কেন, আমিও তো সঙ্গে থাকব। তা ছাড়া সাকসেসফুল হলে তোর কত লাভ হবে, সেটাও ভেবে দ্যাখ। খবরের কাগজে ছবি, মিতুনের প্রেম আর ব্যাঙ্কের লোন, সব এক সঙ্গে! আমি তো তোর উপকার করবার জন্যই...।

—চল তা হলে। তুই সব সত্যি বলছিস তো? আমার গা ছুঁয়ে বল।

ট্যাক্সি নিয়ে সোজা হাওড়ায়। এবারেও ট্যাক্সি ভাড়া বাপিই দিল। ট্রেনের টিকিটও কাটল সে-ই। সত্যি ব্যাঙ্ক ডাকাতকে ধরতে পারলে ওর যা লাভ হবে তার তুলনায় তো এসব কিছুই না।

কাল সারারাত আমার ঘুম হয়নি, উঠেছিও খুব ভোরে। তারপর সারাদিনের এত ধকলে ঘুমে আমার চোখ টেনে আসছে। একসময় হঠাৎ ধড়মড় করে জেগে উঠে দেখি বাপিও ঘুমে ঢুলছে।

আমি ওকে ধাক্কা দিয়ে বললুম, এই বাপি! শ্রীরামপুর পেরিয়ে যায়নি তো?

বাপি বলল, না রে, না। ঘুমোলেও আমি স্টেশনের চা-ওয়ালাদের ডাক শুনে বুঝতে পারি কোন স্টেশন। একসময় তো আমি প্রায় প্রত্যেকদিনই শ্রীরামপুর-চন্দননগর যাতায়াত করতুম কিনা-

—কেন, এদিকে যাতায়াত করতিস কেন?

—ঐ যে কন্টিনেন্টাল ড্রাগস-এ কিছুদিন সেল্‌স রেপ-এর কাজ করেছিলুম!

—কন্টিনেন্টাল ড্রাগস? মাই গুডনেস! সেই সময় তুই চন্দননগর স্টেশনে একটা মেয়েকে একদিন ধাক্কা দিয়েছিলি!

—হ্যাঁ, মানে, তুই কী করে জানলি?

—তুই নিজেই তো একদিন বলেছিলি, তারপর খুব প্রেম হয়েছিল মেয়েটির সঙ্গে।

—ও, বলেছিলুম বুঝি? ভুলেই গিয়েছিলুম সে কথা!

—তারপর মেয়েটার সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখিসনি?

—কী করে রাখব, চাকরিটাই যে চলে গেল?

—চাকরির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক কী?

—চাকরির জন্য যদি চন্দননগর আসতে না হয়, তাহলে চন্দননগরের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবার কোনো মানে হয়?

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম। এখন আর ফিরে যাবার কোনো মানে হয় না। পরের স্টেশনেই শ্রীরামপুর।

সাইকেল রিক্সায় ওঠার পর বাপি একবার আমার হাত চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল, নীলু, ঠিক পারব তো? ডাকাতটা যদি গুলি করে?

আমি বললুম, কোনো ভয় নেই। আমরা ঝোপের ধারে লুকিয়ে থাকব। আগে দেখে নেব ভাল করে।

গেটের দারোয়ান আমায় চেনে গেছে। আমাকে ফিরে আসতে দেখে বিনা কথায় গেট খুলে দিল। বাপিকে নিয়ে আমি বাগানের মধ্যে একটু দাঁড়ালুম। পৌনে দশটা বাজে। ফুলমাসিদের বাংলো অন্ধকার। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে এর মধ্যে? না, একটা ঘরে শুধু টেবল ল্যাম্প জ্বলছে।

আমি ফিসফিস করে বললুম, মালির ঘর ঐ কোনার দিকে। চল, ঐ দিকে যাই।

সত্যিকারের গোয়েন্দার মতন আমরা গাছের আড়ালে আড়ালে এগোতে লাগলুম পা টিপে।

বাপি জিজ্ঞেস করল, কুকুর নেই তো?

—না। আমার বীর মেসো কুকুর অপছন্দ করে।

—নেপালী দারোয়ান?

—না রে!

—যদি ডাকাতটা ঘুমিয়ে পড়ে?

—তাহলে তো আরো সুবিধে। ঘুমের মধ্যে ওর গলা চেপে ধরবি। ওর কাকাটা গাঁজাখোর, সুতরাং তার গায়ে নিশ্চয়ই একটুও জোর নেই।

—টাকাটা কোথায় রেখেছে তুই জানিস?

—ওর ঘরের সামনেই দেখবি তিনটে গোলাপ গাছ পাশাপাশি। ডাকাতটা সেখানকার মাটি খুঁড়ছিল সকালবেলা।

মালির ঘরের সামনে গিয়ে দেখি দরজায় তালা ঝুলছে। বাপি বলল, যাঃ! চলে গেছে!

আমি বললুম, না-না, থাকতে পারে। আমায় কোনো সন্দেহ করেনি, চলে যাবে কেন? কাকা-ভাইপো দু'জনেই নিশ্চয়ই গাঁজা খেতে গেছে কোথাও। আমাদের আর একটু অপেক্ষা করতে হবে। এসব কাজে ধৈর্য লাগে।

আস্তে আস্তে আমরা বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। যতদূর সম্ভব অন্ধকারে, আর নিঃশব্দে।

একবার বীর মেসোর বাংলোর পেছন দিকটায় এসে পড়ে দেখলুম, যে ঘরে আলো জ্বলছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে একটি মেয়েকে। খুব সম্ভত নীলা। বই পড়ছে।

তারপরই চোখে পড়ল। জানলার কাছেই বাগানে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাংলার মতন চেয়ে আছে ঘরের দিকে। লোকটা খাঁকি প্যান্ট আর গেঞ্জি পরা।

আমি বললুম, বাপি, ঐ যে!

সঙ্গে সঙ্গে একটা গণ্ডারের মতন হুড়মুড়িয়ে ছুটে গেল বাপি। লোকটাকে জড়িয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে ষাঁড়ের মতন চ্যাঁচাতে লাগল, শিগগির আসুন, ধরেছি, ধরেছি! ডাকাত ধরেছি!

গেট থেকে ছুটে এলো দারোয়ান, বীর মেসোর ঘরের দরজা খুলে গেল। নীলা একটা প্রকাণ্ড টর্চের আলো ফেলল ওদের দু'জনের ওপর।

বাপি মুখ তুলেই ওকে দেখে বলল, শিগগির লোক ডাকুন, আমি ধরে রাখতে পারছি না...অ্যাঁ? কে? নীলা!

নীলা বলল, তুমি? তুমি? তুমি?

আমি বুঝলুম, এর মধ্যে আর আমার থাকা ঠিক নয়। এরপর ওদের ব্যাপার ওরা বুঝে নেবে। ঝটিকা বাহিনী এ ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেবে তাও আমার জানার দরকার নেই। এখনো দৌড়ে গেলে লাস্ট ট্রেন ধরা যাবে বোধহয়।

তোমার তুলনা তুমি

শ্যামল চক্রবর্তী
প্রীতিভাজনেষু

১

রাজীব বলল, জানিস, আমাদেব এখানে একবার বাঘ এসেছিল। বছর দু' এক আগের কথা। হয়তো সত্যি কোন বাঘ আসেনি, পুরো ব্যাপারটাই গুজব কিংবা হুজুগ, কিন্তু তাই নিয়েই কী তোলপাড় কাণ্ড!

আমি হালকা অবিশ্বাসের হাসি দিয়ে বললুম, বাঘ? এখানে?

ছিমছাম ছোট্ট শহর। একটা পাতলা চেহারার নদী, তার দু'দিকে ছড়ানো ছিটানো কিছু পাকা বাড়ি, তাদের ফাঁকে ফাঁকে জারুল, কৃষ্ণচূড়া, দেবদারু আর শাল গাছ। এখানে একটাই পিচ বাঁধানো রাস্তা, বাকি সব শুর্কির, দ্রষ্টব্য স্থান বলতে একটা পুরোনো আমলের গীর্জা, বাজারের কাছটা যথারীতি ঘিঞ্জি আর নোংরা। কাছাকাছি তেমন বন-জঙ্গলও কিছু নেই।

পশ্চিম বাংলায় বাঘ আছে সুন্দরবনে আর তরাইয়ের জঙ্গলে। তা বলে বাঁকুড়া জেলার হাজীপুরে বাঘ?

রাজীব বলল, খুব একটা অবিশ্বাস্য কিছু নয়। তুই রাণীবাঁধেব নাম শুনেছিস? এখান থেকে খুব দূর নয়, সেখানে প্রত্যেক বছব বুনো হাতির পাল আসে ধান খাবার জন্য। আর ঝিলিমিলি বলে খুব সুন্দব একটা জায়গা আছে, তোকে একদিন সেখানে নিয়ে যাব, সেখানে নাকি সত্যিই একটা লেপার্ড এসেছিল একবার। উড়িষ্যার বর্ডার তো কাছেই, ওদিকের জঙ্গল থেকে দু' একটা বাঘ ছিটকে আসতে পারে। ঐ যে বড় অশথ গাছটা দেখছিস, পেছনে অনেকটা বনতুলসীর ঝোপ, ঐখানে নাকি বাঘটা এসে ঘাপটি মেরে বসেছিল।

নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা একটা গৃহ-বিরল পাড়ায় এসে উপস্থিত হয়েছি। ওপারে সেই অশথ গাছটা। সেদিকে তাকিয়ে রোমাঞ্চ হলো।

বছর তিনেক ধরে এখানকার একটা স্কুলে মাস্টারী করছে রাজীব। আমরা সবাই বলি, রাজীব ইচ্ছে করে নির্বাসন নিয়েছে। পড়াশুনোয় বেশ ভালো ছেলে ছিল রাজীব, স্কুলে বরাবর ফার্স্ট হয়েছে, কলেজেও প্রথম দু' বছর পড়েছে স্কলারশিপ নিয়ে, কিন্তু বি এ পাশ করার পর এম এ পড়লই না। রাজীবের বাবা বলেছিলেন ওকে আই এ এস পরীক্ষায় বসতে, রাজীবের তা একদম পছন্দ ছিল না, সেই থেকেই মন কষাকষি, তারপর হঠাৎই একদিন রাজীবের পলায়ন। হয়তো আরো অন্য কোন কারণ ছিল, যা আমরা জানি না। বেশ কয়েক মাস জানতেই

পারা যায়নি রাজীব কোথায়। যখন জানতে পারা গেল, তখন রাজীবের বাবা এবং অন্য আত্মীয়স্বজনরা এসে কত ঝুলোঝুলি করলেন, কিন্তু রাজীব আর ফিরে যায়নি। রাজীবের মামাদের অবস্থা বেশ ভালো, কলকাতায় ওর জন্য দু' তিনটি উঁচু জাতের চাকরির প্রলোভন দেখান হয়েছিল, কিন্তু রাজীবের মতে সে এইখানেই খুব চমৎকার আছে।

ক্লাস এইট-নাইন থেকেই গান বাজনা নিয়ে খুব মেতে উঠেছিল রাজীব। আমাদের পাড়ার কালুদা অর্থাৎ সত্যেন সরকার ওস্তাদ আলি আকবর খাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য। উনি নাকি কিছুদিন মাইহারে গিয়ে প্রবাদ-প্রসিদ্ধ সঙ্গীতপুরুষ ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁরও পদসেবা করে এসেছেন। সেই কালুদা বাড়িতে কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীকে শেখান, রাজীব গিয়ে যোগ দিল সেই আসরে। প্রথম প্রথম ও চুপ করে বসে থাকত। একদিন কালুদা রাজীবকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আরে এ ছোকরার তো খুব সুরের কান আছে, ওর মাথার দোলানি দেখলেই বোঝা যায়। তুই গানটান করিস নাকি ?

রাজীব এমনিতে লাজুক ধরনের ছেলে, কোনদিন ওকে আমরা গান গাইতে শুনিনি। আমরা বরং যখন তখন হেঁড়ে গলায় গান গেয়ে উঠি রাজীব তখন চুপ করে থাকে আর মিটিমিটি হাসে। কালুদাও অনেক চেষ্টা করে রাজীবকে দিয়ে কোন গান গাওয়াতে পারেননি। একদিন ওর হাতে একটা সরোদ তুলে দিয়ে কালুদা বললেন, এটা মাটিতে আছড়ে ভেঙে ফেলতে পারবি ! যদি পারিস, তোকে আমি একশো টাকা দেব !

বলাই বাহুল্য, রাজীব সেই সরোদ ভাঙতে পারেনি।

পরে একদিন কালুদা খুব মজা করে বলেছিলেন সেদিনের ঘটনাটা। বুঝলি, নীলু, যদি তোরা তখন রাজীবের মুখখানা দেখতি। সরোদটা হাতে নিয়ে যেন ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠল। আমতা আমতা করে বলল, আমি এটা ভাঙব। আপনি কী বলছেন, কালুদা ! আমি বললুম, হ্যাঁ, ভাঙ্‌না, তাহলে একশো টাকা পাবি। রাজীব বলল, কালুদা, আপনি আমাকে এমন কথা বলতে পারলেন ? সামান্য একশো টাকার জন্য...। ছেলেটা একদম ঠাট্টাও বোঝে না। যেন সত্যিই আমি ওকে সরোদটা ভাঙতে বলেছিলুম !

এ কথা ঠিক, রাজীব ছেলেবেলা থেকেই খুব সীরিয়াস ধরনের। আমাদের মতন ফোক্কড় নয় !

এর পর কালুদার কাছে রীতিমতন নাড়া বেঁধে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল রাজীব। সেই যে সরোদ ধরল, তারপর প্রতিদিন দশ-বারো ঘণ্টা ধরে রেওয়াজ চলল। আমি এক-এক সময় ওর কাছে গিয়ে দেখেছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ও স-র-গ-ম করে চলেছে, তখন ওর মুখখানা অন্য রকম।

ক্রমশ ও এত বেশি ঝুঁকলো বাজনার দিকে যে কলেজে এসে তার জন্য ক্ষতি হতে লাগল পড়াশুনোর। তাই নিয়ে বাড়িতে অশান্তি, বকাবকি। আর পাঁচ জন মধ্যবিত্ত বাঙালির মতন ওর বাবাও চেয়েছিলেন যে ছেলে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করবে, ভালো চাকরির উপযুক্ত হবে।...

রাজীব বলল, চল, নদীর ওপারটায় যাই।

আমি বললুম, চল, কী আছে ওদিকে!

রাজীব অদ্ভুতভাবে আমার মুখের দিকে তাকাল, তারপর বলল, সব কিছুই তো নদীর ওপারে থাকে, তাই না?

প্যায়জামা, গেরুয়া পাঞ্জাবি আর কাঁধে একটা ঝোলা-ব্যাগ, রাজীবের চেহারা এখন বাংলা ফিলমের আদর্শবাদী স্কুল মাস্টারের মতনই অনেকটা। তবে মুখে একটা অভিমানের রেখা। বোধহয় সেটা লুকোবার জন্যই রাজীব দাড়ি রেখেছে, তবু বোঝা যায়।

পাকা ব্রীজ নেই, একটা বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে আমরা পার হয়ে এলুম নদীটা। এদিকে বাড়ির সংখ্যা কম, আর তুলনায় পরিষ্কার। একটু দূরেই ধান খেত, তারপর যেন দিগন্ত পর্যন্ত ফাঁকা।

রাজীব বলল, তুই তো মুকুটমণিপুর থেকে বাস বদলে এসেছিস, সেটা অনেক ঘুর পথ। ইচ্ছে করলে দুর্গাপুর থেকে নদীর এ পার পর্যন্ত অনেক শর্টকাটে আসা যায়। অবশ্য গাড়িতে।

অশত্থ গাছ তলায় দাঁড়িয়ে আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুই বাঘটা দেখেছিলি?

—বললুম যে, কেউই ঠিক নিজের চোখে দেখেনি, সবাই অন্যের কাছে শুনেছে। অনেকটা ভূত দেখার মতন। সাঁওতাল পাড়ার লোকেরা শেষ পর্যন্ত এই বনতুলসীর ঝোপটায় মশাল ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল, ততক্ষণে বাঘ নাকি সটকে পড়েছে।

—বেশ জায়গাটা কিন্তু, চুপচাপ, শান্ত...

—ঐ দু' বছর আগে বাঘের গুজবে যা কিছু তবু একটা চাঞ্চল্য হয়েছিল, তারপর আবার সব শান্ত। এখানে কোন ঘটনা ঘটে না। কিন্তু, তুই খুব ঠিক সময়ে এসেছিস। চল চা খাই।

একটু দূরেই একটা শিব মন্দির, তার চাতালের কাছে একটা পাঁচমিশেলি দোকান, সেখানে চা-ও পাওয়া যায়।

মাস্টারমশাই বলে সবাই রাজীবকে একটু খাতির করে। দোকানদার আমাদের জন্য দু' গেলাস স্পেশাল চা বানিয়ে দিল। অর্থাৎ ওপরে দুধের সর ভাসছে, চিনি বেশি।

রাজীব এক প্যাকেট সিগারেটও কিনল।

স্কুল বয়েস থেকেই রাজীবের সঙ্গে আমার একটু বিশেষ রকম বন্ধুত্ব। এখানে চলে আসার পর এই তিন বছরে রাজীব অবশ্য আমাকে একটা চিঠিও লেখেনি। আমিও লিখিনি। তাতে কিছু যায় আসে না। অন্য বন্ধুরা সবাই চাকরি পেয়ে গেছে, আমি এখনও বেকার। আমার পায়ের তলায় সর্ষে, প্রায়ই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াই, বেলেতোড়ে শিল্পী যামিনী রায়ের বাড়ি দেখতে এসে মনে পড়ল, এই অঞ্চলেই তো কোথায় যেন হাজীপুর, যেখানে রাজীব থাকে, একবার ঘুরে গেলে তো হয় ! লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করতে করতে পৌঁছে গেলুম গতকাল সন্ধের পর। হাজীপুর বাজারের বাস স্ট্যাণ্ড থেকে একটা ছেলে তার সাইকেলের পেছনে আমায় বসিয়ে পৌঁছে দিল রাজীবের বাড়িতে। এখানকার ইস্কুলের সঙ্গে হোস্টেল আছে, সেখানেও থাকেন কয়েকজন টিচার, কিন্তু রাজীব একটা নিরিবিলি একতলা বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছে।

আমায় দেখে রাজীব জড়িয়ে ধরে বলেছিল, নীলু, তুই এসেছিস ? কী আশ্চর্য ব্যাপার দ্যাখ, আমি দু' দিন ধরে ঠিক তোর কথাই ভাবছি বারবার !

আমি জানি রাজীব মিথ্যে কথা বলে না। কোন কারণে ও নিশ্চয়ই আমার কথা মনে করেছিল।

—টেলিপ্যাথি ! দ্যাখ, সেই টানেই আমি চলে এলুম !

একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বাসনপত্র মেজে, ঘর ঝাঁট দিয়ে, জল তুলে রেখে চলে যায়। রান্না করে রাজীব নিজে। আলু সেদ্ধ, ডিম সিদ্ধ আর কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে ফ্যানা ভাত রাজীবের অতি প্রিয় খাদ্য। আমার সম্মানে কাল রাত্রে খিচুড়ি আর পার্শে মাছ ভাজা হয়েছিল।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে দুই বন্ধুতে কত সুখ দুঃখের গল্প হলো। শুধু কলকাতায় ফেরার প্রসঙ্গ তুললেই রাজীব চুপ করে থাকে। এই তিন বছরে রাজীব একবারও কলকাতায় পা দেয়নি। কিংবা কখনো পা দিলেও নিজেদের বাড়িতে তো যায়নি, আমাদের বন্ধুদের সঙ্গেও দেখা করেনি একবারও। এমনকি নন্দিতার সঙ্গেও আর কোন যোগাযোগ রাখেনি রাজীব। আর নন্দিতা মেয়েটাও কি অদ্ভুত, সেও কি এককথায় ভুলে গেল রাজীবকে ? আমাদের সামনে সে কোনদিন রাজীবের প্রসঙ্গ তোলে না।

কালুদাও বহু খোঁজ করেছেন রাজীবের। আমাদের সঙ্গে দেখা হলেই আফশোষ করেন। আমাকে একদিন কালুদা খুবই আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, জানো, নীলু, বোধ হয় সবটাই আমার দোষ। না, না ওর বাপ-দাদারা কী ভাবছে তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। সঙ্গীত এমনই জিনিস, একবার যদি অন্তরে গেঁথে যায়, তাহলে এক-একজন লোক আর দিমাগ্ ঠিক রাখতে পারে না, একেবারে মাতোয়ারা হয়ে যায়। তাদের আর সংসারের অন্য কোন কিছুতেই

মন বসে না। এই যে সব বড় বড় গাইয়ে বাজিয়েদের দেখছ, এদের চেয়েও আরো অনেক আচ্ছা আচ্ছা কলাবন্ত গুণী অকালে হারিয়ে গেছে।

অল্প বয়েসে কত মানুষ যেমন সন্ন্যাসী হয়ে পাহাড়ে চলে যায়, আর সংসারে আসে না। এরা নিজেদের অন্তরের সুর নিয়েই মশগুল হয়ে থাকে।

কালুদার এ কথা আমি ঠিক মেনে নিতে পারিনি, মর্মও ঠিক বুঝিনি। কী করেই বা বুঝব, আমি তো সঙ্গীতের জন্য পাগল হইনি।

ক্লাস নাইন-টেনের দু-বছর শুধু স-র-গ-ম রেওয়াজ করার পর কালুদা রাজীবকে বলেছিলেন, এ ছেলের তো সোনার হাত। এবার তোকে গৎ দেব, তারপর আস্তে আস্তে রাগ-রাগিণীর আসলি রূপ চিনতে শিখলে আমার ঘরের যা কিছু আছে সব তোকে দেব। আমার নিজের কেরামতি ফুরিয়ে গেলে তোকে আমার গুরুর কাছে নিয়ে যাব। কিন্তু তোকে একটা জবান দিতে হবে, রাজু। অন্তত দশ বছর পূর্ণ না হলে তুই কোন আসরে কিংবা রেডিওতে, এমনকি পাড়ার কোন ফাংশানেও বাজাতে পারবি না।

এ কথা শুনে রাজীব লজ্জায় মাথা নুইয়ে ফেলেছিল। টাকার জন্য কিংবা হাততালির জন্য সে লোকজনের সামনে বাজাচ্ছে, এই চিন্তাতেই যেন সে একেবারে মরমে মরে যায়।

কালুদা তবু বলেছিলেন, পেটের দায়ে আজকাল অনেকেই দেবী সরস্বতীকে রাস্তায় রাস্তায় বাঁদরীর মতন নাচায়...দেখছি তো...কিন্তু শিল্পকে যারা নিজের রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে না পারে. .

আমি উপস্থিত ছিলুম সে সময়। আমার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, খুব তো বলছেন, কালুদা! এদিকে আপনার গুরু যে আজকাল সারা বছরই প্রায় আমেরিকায় পড়ে থাকেন, সে কিসের জন্য, টাকার জন্য নয়? আমরা তো ওঁর হাতের বাজনা এখন শুনতেই পাই না!

কিন্তু একথা আমি উচ্চারণ করিনি। কারুর সামনে তার গুরু নিন্দা করা উচিত নয়। কালুদা আলী আকবর খাঁর অন্ধ ভক্ত। প্রত্যেকবার ওঁর নাম নেবার সময় কালুদা নিজের দু' কানে হাত ছোঁয়ান। কালুদার নিজের পারিবারিক অবস্থা ভালো নয়। চারটি ছেলেমেয়ে। বৌদি একটা ইস্কুলে মাস্টারি করেন, আর কালুদাদের পৈতৃক বাড়ির সামনের দুটি দোকান ঘরের ভাড়া পান, এই নিয়ে কোন রকমে চলে। অথচ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে কালুদা নেন মাত্র এক টাকা করে। কিছু না নিলে নাকি বিদ্যা সম্পূর্ণ হয় না, এই জন্য। আজকালকার দিনে একথা চিন্তা করা যায়?

কালুদার ধারণা তিনি এ জীবনে যত শিষ্য-শিষ্যা পেয়েছেন, তাদের কারুর সঙ্গেই রাজীবের তুলনা চলে না। ওর মধ্যে আছে বিধিদত্ত ক্ষমতা, অন্য কারুর

যা শিখতে লাগে দু' তিন বছর, রাজীব তা শিখে নেয় দু' তিন মাসে। কিংবা কোন একটা রাগ রূপ একবার শুনেই ও যে রকম নিখুঁত তুলতে পারে, তা একেবারে অবিশ্বাস্য। কালুদা মৌজুদ্দীন নামে পুরোনো কালের এক বিখ্যাত গায়কের কথা বলেন, তাঁর নাকি ছিল এই ক্ষমতা। এই মৌজুদ্দীন বেশিদিন বাঁচলে ফৈয়াজ খাঁকেও টেক্কা দিতে পারতেন।

রাজীবের বাবা ধীরুকাকা কালুদার মুখে এইসব শুনে বিরক্তই হতেন। গান বাজনার সঙ্গে ধীরুকাকার কোন সম্পর্কই নেই। তিনি বড় জোর মনে করতেন, মন দিয়ে লেখাপড়া, চাকরি-বাকরি, বিয়ে-থা ঘর-সংসার করার পর সন্ধের দিকে মাঝে মাঝে একটু আধটু পিড়িং-পাড়াং করলে কোন ক্ষতি নেই। শ্বশুরবাড়ির তুলনায় তাঁর সংসার তত সচ্ছল নয়, এই চিন্তাতেই ধীরুকাকা মুষড়ে রইলেন সারা জীবন।

প্রথম প্রথম দু'এক মাস রাজীব নাকি মাইনে পেয়ে কিছু টাকা বাড়িতে পাঠিয়েছিল, ধীরুকাকা নেননি, রাগ করে মানি-অর্ডার ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর আশা ছিল, ছেলে আই এ এস হবে, তার বদলে ইস্কুল মাস্টাব ছেলের উপার্জনের ভাগ নিতে তাঁর সম্মানে লেগেছিল।

কাল রাত্তিরে মনে পড়ে যাচ্ছিল এই সব কথা।

রাজীবের ঘরে সরোদটা দেখে আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, তুই এখানে রেওয়াজ করিস!

—এই একটু আধটু।

—কেন, একটু-আধটু কেন? এখানে তো তোর অফুরন্ত সময়!

—সময় থাকলেই তো হয় না। সময় তো সব মানুষেরই হাতে আছে, তার মধ্যে খুব কম লোকই সময়টাকে দরকারি করে তুলতে পারে।

আমি মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলুম, সাথ-সঙ্গত করার জন্য এখানে তবলচি পেয়েছিস?

—এখানে একটা থিয়েটার ক্লাব আছে, সেখানে এক ভদ্রলোক তবলা বাজান। ওঁকে আমি মাসে তিরিশ টাকা দিই, সপ্তাহে দু'দিন করে আসেন। কিন্তু ভদ্রলোকের একেবারে লয় ঠিক নেই। হাতটাও কেমন যেন মেকানিক্যাল।

হঠাৎ আমার দিকে পাশ ফিরে রাজীব জিজ্ঞেস করেছিল, আর তুই? নীলু, তুই প্র্যাকটিস রাখিসনি?

—ধুৎ, আমার দ্বারা কি ওসব হয়!

রাজীব ধড়মড় করে উঠে বসে বলেছিল, খাটের তলায় ডুগি-তবলা আছে, তুই একটু নিয়ে বোস তো, নীলু। তোর সঙ্গে একটু বাজাই।

—পাগল নাকি! আমি কিছু পারব না।

তবু রাজীব জোর করে আমায় খাট থেকে টেনে নামাল।

বছর দু'-একের জন্য রাজীব ওর সঙ্গীতচর্চার সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ফেলেছিল। গৎ প্র্যাকটিস করবার সময় একজন তবলার তবলচি দরকার।

কলকাতায় সত্তর-আশি টাকার কমে কোন সাধারণ তবলচি পাওয়া যায় না। তবু রাজীব সত্তর টাকা মাইনে দিয়ে একজন তবলচি রেখেছিল মাস তিনেক, মায়ের কাছ থেকে টাকাটা চেয়ে নিত। ধীরুকাকা জানতে পেরে গেলেন কিছুদিনের মধ্যেই—আবার তা নিয়ে মন কষাকষি।

রাজীব তাতেও দমে না গিয়ে একদিন আমায় বলেছিল, তুই একটু আমায় সাহায্য করবি, নীলু? তোকে আমি শিখিয়ে দেব, তুই শুধু একটু ঠেকা দিতে পারবি আমার সঙ্গে?

আর কোন গান-বাজনার যন্ত্রে আমি হাত দিইনি কক্ষনো। তাছাড়া আমার এই গোদা-গোদা আঙুলে তুলোধোনা যন্ত্র ছাড়া আর কিছু কি বাজান সম্ভব?

কিন্তু রাজীব নাছোড়বান্দা। ও নিজে কখনো তবলা শেখেনি, কিন্তু ঐ যে তিন মাস একজন তবলচিকে বাজাতে দেখেছে, তাতেই ও বেশ তবলা বাজাতে পারে। আমাকে প্রায় জোর করেই রাজীব দাদ্‌রা, কাহারবা আর তিনতালের বোল শেখাতে লাগল। একেবারে আঙুল ধরে ধরে, ঠিক যেমনভাবে অ-আ-ক-খ শেখান হয়। মাঝে মাঝে আমি হাল ছেড়ে দিতে চাইলেও রাজীব ছাড়বে না। দিন কয়েক সরোদ বাজান বন্ধ রেখে ওদের বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে চললো আমার তবলা শিক্ষা।

আমার কোন কৃতিত্বে নয়, রাজীবের ধৈর্যেই মাস দু'-একের মধ্যে আমার আঙুলে ঐ তিনটি বোল রপ্ত হয়ে গেল। রাজীব আমার পিঠে চাপড়ে বলেছিল, এই তো চাই! তোকে তো আর লহরা দেখাতে হবে না। তুই শুধু ঠেকা দিয়ে যাবি, আর গুণে গুণে মাত্রা ঠিক রাখবি। দাদ্‌রা ছ' মাত্রা, কাহারবা আট মাত্রা আর তিন তাল ষোলো মাত্রা, ব্যস!

কিন্তু এমনিতে ডুগি-তবলায় বোল্ ফোটাতে পারলেও সাথ-সঙ্গত করা অত সোজা নয়। শুধু ঠেকা দিয়ে যাওয়াতে এটা প্রচণ্ড একঘেয়েমি আছে। একটুও অন্যমনস্ক হলে চলে না, ঠিক যেন সমুদ্রের ধারে বসে কেউ এক লক্ষ ঢেউ গোনার আদেশ দিয়েছে।

মাঝে মাঝেই আমার তাল কেটে যায়, সম-এর জায়গায় মেলে না, কিংবা হঠাৎ বেড়ে যায় লয়। তার জন্য আমি দুঃখিত হলেও রাজীব নিরাশ হয় না, মিষ্টি করে বলে, তুই ঠিক পারবি, নীলু আর একটু মন দে, ঠিক পারবি!

আমি বলতুম, কী করে পারব? তুই যখনই বিস্তার শুরু করিস, অমনি আমার সব গোলমাল হয়ে যায়—

রাজীব বলত, তখন তুই ঘাড় গুঁজে মাত্রা গুনে যাবি শুধু আর কোন দিকে মন দিবি না, দেখবি, সমে সমে ঠিক মিললে কত আনন্দ হবে!

কিন্তু আমি কী করে অত একাগ্র হব! সেই সময় আমার মনে তিন-চার রকমের চিন্তা সব সময় ঝাপটা মারছে। প্রত্যেকটাই প্রবল। কখনো ভাবি, সাঙ্ঘাতিক সব বিধ্বংসী কবিতা লিখে বাংলা সাহিত্যটাকে একেবারে লণ্ডভণ্ড করে দিতে হবে! কখনো ভাবি, লেখা-ফেকা কিছু না, কলম দিয়ে কিছু হয় না, হাতে বন্দুক ধরতে হবে, এক্ষুনি চাই একটা বিপ্লব, এই পচা-গলা সমাজব্যবস্থাকে আমূল পাল্টে দেওয়াই সব চেয়ে প্রথম কাজ। আবার এক-এক সময় মনে হয় সমস্ত পরিচিত জগৎ থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে আমি হারিয়ে যাব, জাহাজে খালাসী হয়ে আলু কাটার কাজ নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ব বিপুল বিশ্বে। এরই মধ্যে জড়িয়ে থাকে আর একটি চিন্তা, ঐ যে রানী নাম্নী মেয়েটি, আমি যেমনভাবে ভাবি ওর কথা, সেও কি তেমনভাবে আমার কথা ভাবে? তা যদি সে না ভাবে, তাহলে আর আমার বেঁচে থেকে লাভ কী?

এর মধ্যে, প্রায়ই সন্ধেবেলা রাজীবের সামনে বসে এক মনে গুট গুট করে তবলা বাজান কি আমার পক্ষে সম্ভব! তবু যে যেতুম, তার কারণ দুটি। রাজীবের সরোদ শেখার সাঙ্ঘাতিক ঝোঁক এবং ওর অসহায় অবস্থা দেখে আমার মনে হত, আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব, ততটুকু সাহায্য ওকে করা উচিত। আর, রাজীবদের পাশের বাড়িটাই রানীর মাসীর বাড়ি, রানী ওখানে প্রায়ই বিকেলের দিকে আসে, হঠাৎ তো রানীর সঙ্গে দেখা হয়েও যেতে পারে। রানীর সঙ্গে দেখা হলেই আমার বুক কাঁপে, আর তাতে যে কী সুখ!

সরোদটা দেয়াল থেকে পেড়ে নিয়ে রাজীব আমায় বলল, তুই তবলা নিয়ে বোস নীলু, দেখি, তোর হাত ঠিক আছে কি না।

খাটের তলা থেকে ডুগিটা টেনে তাতে দু' একটা চাঁটি দিতেই কী রকম ঢ্যাপঢেপে বেসুরো আওয়াজ বেরুল।

রাজীব বলল, বাঁধা নেই, দাঁড়া বেঁধে দিচ্ছি আমি।

হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে রাজীব ডুগি-তবলা সুরে আনল। ওর হাতে বেশ চটাং চটাং শব্দ, কিন্তু আমি চাঁটি মারতেই আবার বেসুরো।

আমি হেসে ফেলে বললুম, আর আমি পারব না রে, রাজু!

রাজীব বলল, কেন পারবি না। আমি খুব একটা সহজ কাহারবা বাজাব। তোর মাত্রা মনে আছে তো? চার-চার ছন্দ।

মাটিতে বাঁ হাত চাপড়ে চাপড়ে রাজীব দেখিয়ে দিল, ধা-গ-তে-টে। না-গ-ধি-ন ...ধা-গ-তে-টে। না-গ-ধি-ন্...

কিন্তু আগে রাজীবের সঙ্গে বাজিয়ে বাজিয়ে তবু আমার যেটুকু রপ্ত হয়েছিল,

এই তিন বছরের অনভ্যাসে তা আবার নষ্ট হয়ে গেছে। নিজের আওয়াজ আমার নিজের কানেই খারাপ লাগছে।

ও দুটো ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমি বলেছিলুম, বৃথা চেষ্টা। আর আমার দ্বারা হবে না।

—কেন হবে না? তুই আমার কাছে কয়েকদিন থাক, আবার তোর হাত সড়গড় হয়ে যাবে।

—রাজু, তুই বরং খানিকটা আলাপ কর, শুনি। অনেকদিন তোর বাজনা শুনিনি।

রাজীব একটা সুর ধরল। খানিকক্ষণ শোনার পর আমার মনে হলো মারু বেহাগ বাজাচ্ছে। কালুদার কাছ থেকে রাজীব কোন্ কোন রাগ তুলেছিল, তা আমার সবই জানা। কোন রকম বেহাগ তো আমি ওকে আগে কখনো বাজাতে শুনিনি। এমন বুক নিঙড়ানো আর্তনাদেব মতন সুর ও কবে শিখল? মীড়ের কাজ কি অপূর্ব! এ যেন যন্ত্রের শব্দ নয়, অন্তরীক্ষের কোন অলৌকিক কান্না। মুহরাটাও চমৎকার, অনেকদিন আগে হীরাবাঈ বরোদেকরের মুখে একটা মারু বেহাগ শুনেছিলাম, 'রাসিয়া যা হু না', অনেকটা যেন সেই রকম।

গুরু নেই, তালিম দেবার কেউ নেই, তবু রাজীব এমন সুন্দরভাবে বাজাতে শিখল কী করে? এ কি ওর একলব্যের সাধনা? অথবা আমি বেশি বেশি মুগ্ধ হচ্ছি? আমি আর গান-বাজনার কী বুঝি, আমার ছেলেবেলার বন্ধু বাজাচ্ছে, তাই হয়তো আমার এত বেশি ভালো লাগছে।

একটা বালিশ টেনে নিয়ে মাটিতেই শুয়ে পড়ে আমি শুনতে লাগলুম রাজীবের বাজনা। শুনতে শুনতে আনন্দের সঙ্গে খানিকটা আফশোষ মিশে গেল। মনে হলো, আমিও তো সঙ্গীতের যে-কোন একটা শাখার চর্চা করলে পারতুম! আমি কবিতা লিখে বাংলা সাহিত্য লণ্ডভণ্ডও করিনি, আর বন্দুক হাতে নিয়ে বিপ্লবে যোগ দেবার সম্ভাবনাও ক্রমশই পিছিয়ে যাচ্ছে। জাহাজে খালাসীর চাকরি নিয়ে বেরিয়ে পড়ার স্বপ্নটা আর এখন মাথায় আসে না। এমনকি রানী সম্পর্কেও সেই তীব্র টানটা কমে গেছে। এখনো রানীর সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু কই, আর আমার বুক কাঁপে না তো! সঙ্গীতের মতন এমন তন্ময়তা আর কিছুতেই নেই বোধ হয়। এই তো রাজীব, ক্লাস থ্রি থেকে আমরা একসঙ্গে পড়াশুনো করেছি, একসঙ্গে বেড়ে উঠেছি, অথচ এখন আমার সামনে বসে যে রাজীব সরোদ বাজাচ্ছে, সে যেন আমার চেয়ে অনেক বড়, অনেক গভীর, ঈশ্বর-উপলব্ধির মতন একটা কিছু ছাপ ওর মুখে পড়েছে।

বাড়ির ওপর রাগ করে কোন গ্রামে ইস্কুল মাস্টারী নিয়ে চলে যাওয়া এমন কিছু অভিনব ব্যাপার নয়। কিন্তু কতদিন থাকতে পারে সেই অভিমান, খড় জোর

ছ' মাস ? ইকনমিকস অনার্সে সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট হওয়া ছেলে রাজীব, নিজের চেষ্টাতেই ও কলকাতায় একটা মোটামুটি চাকরি অনায়াসে জুটিয়ে নিতে পারত, ওর সঙ্গীতচর্চারও সুবিধে হতো। তবু তিন বছর ধরে এই হাজীপুরের মতন একটা এঁদো জায়গায় অজ্ঞাতবাস, এতখানি মনের জোর রাজীব পেল কোথায় ? আমি তো পারতুম না !

এইসব ভাবতে ভাবতে একটা ভীষণ মন খারাপ আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলল। গলার কাছে বাষ্প আটকে যাচ্ছে, হঠাৎ যেন এক সময় আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠব। গ্রামের স্কুলে সামান্য একটা মাস্টারী করেও রাজীবের মনে প্রশান্তি আছে, সেই তুলনায় আমি কী, সম্পূর্ণ ব্যর্থ !

অথবা, ঐ মারু বেহাগ রাগটাই আমার এমন মন খারাপ করে দিল !

বাজনা শেষ হবার পর আরো অনেকক্ষণ গল্প করে আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম প্রায় শেষ রাতে।...

মন্দিরের পাশের দোকান থেকে চা খেয়ে দু' জনে দুটো সিগারেট ধরিয়ে এগোতে লাগলুম ডান দিকে।

সব মফঃস্বল শহরেরই একটা বিশেষ ধরনের ভ্যাপসা গন্ধ আছে। গ্রীষ্মে আর শীতে সেই গন্ধ বদলায়। বর্ষাকালটাতেই শুধু মেঘের গন্ধ আর সব গন্ধকে ঢেকে দেয়। গ্রাম কিংবা হাটুরে শহরগুলোর রাস্তা বর্ষায় কাদা প্যাচপেচে হয়ে গেলেও, শুধু ঐ সময়ই গাছপালা ও বাড়িগুলো খানিকটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

গন্ধ আছে, কিন্তু এইসব জায়গায় কোন নিজস্ব রং নেই। সব কিছুই ময়লা। অবশ্য এই এপ্রিলের শেষে এখানে ওখানে কিছু কৃষ্ণচূড়া গাছ গোলাপি-লাল হয়ে আছে।

নদীর এ পারে সেই ভ্যাপসা গন্ধটা অনেক কম। ফাঁকা জায়গাও বেশি।

—তুই এদিকে বাড়ি নিলি না কেন রে, রাজু ?

—ঐ যে বাঁশের সাঁকোটা দেখলি, ওটা প্রত্যেকবার বর্ষাকালে ভেঙে যায়। বর্ষায় এই নদীতে জল হয় খুব। ঐ দিকটাতেই পুরোনো হাজীপুর। এদিকে আগে ঐ শিব মন্দিরটা ছাড়া বিশেষ কিছু ছিল না। এখন দুর্গাপুর থেকে এদিকে রাস্তা হওয়াতে এদিকে বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে।

—বর্ষাকালে লোকে কী করে এদিকে আসে ?

—খেয়ার নৌকো থাকে।

—এই নদীটার ওপরে একটা ব্রীজ বানাতে পারে না ?

—ব্যস্ততার তো কিছু নেই। কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যে নিশ্চয়ই তৈরি হবে ব্রীজ।

আমি একটু হেসে রাজীবের মুখের দিকে তাকিয়ে বললুম, ঠিক বলেছিস, ব্যস্ততার কী আছে !

—এবার ডানদিকে চল, নীলু!

দু' জন লোক রাজীবকে থামিয়ে কী সব কথা বলতে লাগল। আমি এগিয়ে গেলুম ডানদিকে।

একটু দূরে একটি খুবই সুদৃশ্য একতলা বাড়ি। হয় বাড়িটি একেবারে নতুন, অথবা সদ্য রং করা হয়েছে। বাড়িটির চারপাশে অনেকখানি কম্পাউণ্ড জুড়ে বাগান। তারকাঁটা ও মেহেদি ঝোপ দিয়ে বাগানটি ঘেরা। কয়েকটি বেশ বড় বড় গাছও আছে, একটা মহুয়া গাছ দূর থেকে দেখেই চিনতে পারা যায়।

এ রকম বাড়ি আমি হাজীপুরে আর একটাও দেখিনি। বাড়ির হাতায় একটা জিপ গাড়িও রয়েছে।

রাজীব আমার কাছে এসে পৌঁছোবার পর জিজ্ঞেস করলুম, ঐ বাড়িটা কার রে?

—আমরা ঐ বাড়িটার কাছেই যাচ্ছি।

কিন্তু বাড়িটার গেটের দিকে গেল না রাজীব। আরো অনেকটা এগিয়ে বুক পর্যন্ত উঁচু মেহেদি ঝোপের বেড়ার পাশে দাঁড়াল। আমার হাত চেপে ধরে বলল, এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক, নীলু। কোন কথা বলবি না।

আমি চমকে রাজীবের মুখের দিকে তাকালুম। ওর গলার আওয়াজ বদলে গেছে, চোখ দুটি বেশি উজ্জ্বল, সমস্ত শরীরটা যেন টান টান। বাঁ হাতটা নিজের দাড়িতে বোলাচ্ছে ক্রমাগত।

—কী ব্যাপার, এটা কার বাড়ি?

—এটা একটা ইরিগেশান বাংলো।

—আমরা এখানে দাঁড়ালুম কেন? এখানে কে থাকে!

—একটু আস্তে কথা বল, নীলু!

নিজের গলার স্বর নামিয়ে ফিসফিস করে রাজীব বলল, তোকে বলেছিলুম না বছর দু-এক আগে এখানে একটা বাঘ আসার কথা। সেবার সত্যিই বাঘ আসেনি। কিন্তু এবার এসেছে। তিন দিন আগে। বাঘ কিংবা সিংহ বলতে পারি না। তাকে দেখাবার জন্যই তো তোকে এখানে নিয়ে এলুম। ঐ দিকে দ্যাখ!

২

তখন প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে, আকাশ থেকে নামছে একটু একটু ছায়া। এই রকম সময়ে লম্বা গাছগুলোকে আরো বেশি লম্বা মনে হয়। বেশ ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে।

আমি কথাবার্তার মধ্যে হেঁয়ালি থাকলে চট্ করে ধরতে পারি না। সত্যি কথা বলতে কী, রাজীব যখন বলল আমাকে বাঘ কিংবা সিংহ দেখাবে, আমি ছেলেমানুষের মতন ভেবেছিলুম, এই বাড়িটার বাগানে বুঝি সত্যিকারের কোন বাঘ বা সিংহ আছে।

—কই ? কই ?

রাজীব আমার কাঁধ খিমচে ধরে বলল, চুপ, চুপ !

এই সময় বাড়ি থেকে চার পাঁচজন লোক বেরিয়ে এল। তাদের মধ্যে একজন বেশ দীর্ঘকায়, ছ'ফুটের বেশিই মনে হয়, সুপুরুষও বটে, বাকি লোকগুলো হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ করা, হাত কচলানো চামচা ধরনের।

দীর্ঘকায় লোকটি বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল সামনের দিকে, একবার একটা ফুল ভর্তি গাছের কাছে দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে গন্ধ শুঁকল, কিন্তু কোন ফুল ছিঁড়ল না, তারপর বাগানের ডান পাশে একটা গোল বেদির ওপর বসল। অন্য লোকগুলো তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সে হাত নেড়ে চলে যেতে বলল তাদের।

রাজীব বলল, দেখেছিস ?

—কে ইনি ?

—তুই কী রে, নীলু ? এখনো চিনতে পারিস নি ? ইনি আলিম খাঁ !

আলিম খাঁ-কে কী দেখব, আমি রাজীবকে দেখেই বিস্ময় সামলাতে পারছি না। রাজীবের চোখ মুখ অস্বাভাবিক, সারা শরীর কাঁপছে। যেন সে হঠাৎ সামনে ভগবানকে দেখতে পেয়েছে।

আমি এতটা গোলা নই যে নাম শুনেও আলিম খাঁকে চিনতে পারব না। বিখ্যাত খেয়াল গায়ক, এঁর বিশেষত্ব হলো ইনি খেয়াল ছাড়া ঠুংরি বা ভজন টজনের মতন হাল্কা কিছু গান না কখনো। গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে আলিম খাঁকে কে না চেনে ! আমিও রেকর্ডে শুনেছি ওঁর গান।

রাজীব যদি বলত, ঐ যে দ্যাখ বসে আছে চে গুয়েভারা, তা হলে আমিও লাফিয়ে উঠতুম। কিংবা সত্যজিৎ রায় ! কিংবা নাট্যকার আয়ানেস্কো। কিংবা সালভাদোর দালি, কিংবা চার্লি চ্যাপলিন, কিংবা গোলাম আলী খাঁ কিংবা ইনগ্রিড বার্গম্যান। কিন্তু ওস্তাদ আলিম খাঁ সম্পর্কে আমার বুকে কোন ধড়ফড়ানি জমা নেই।

তবু আমি খানিকটা অবিশ্বাসের সঙ্গে বললুম, তুই কী করে জানলি ? তুই চিনিস আলিম খাঁকে।

—ওকে কখনো চিনতে ভুল হতে পারে ? কত ছবি দেখছি, একবার একটা কনফারেন্সে ওঁর গানও শুনেছি। ঐ নাক, আর ঐ রকম থুতনি আর কোন মানুষের হতে পারে ?

—অতবড় একজন গায়ক, এই ছোট্ট একটা জায়গায় আসবেন কেন ?

—নিশ্চয়ই বিশ্রাম নিতে এসেছেন। কিছুদিন আগে কাগজে পড়েছিলাম উনি একদিন পেটের যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। আমাদের এই হাজীপুরে এক পীর সাহেবের মাজার আছে। বেশ বিখ্যাত সেটা। সেখানকার একটা কুয়োর জলে অনেকের নাকি পেটের অসুখ সেরে যায়, হিন্দু মুসলমান সবাই নিতে আসে।

—আমারও পেটের যন্ত্রণা হয়, আমাকে খাওয়াস তো সেই জল!

—বল্ নীলু, বিশ্বাস করা যায়, চোখের সামনে অতবড় একজন ওস্তাদকে দেখছি! ওঁর মতন গায়ক আর কোনদিন জন্মাবে কি না সন্দেহ! আমার হাজীপুরে আসা এতদিনে সার্থক হলো।

আমি আবার তাকিয়ে দেখলুম, শিরদাঁড়া সোজা করে বসে আছে আলিম খাঁ, মুখখানি আকাশের দিকে, হাত দুটি হাঁটুর ওপর রাখা, সেই অবস্থায় একদম স্থির। ঠিক ধ্যানস্থ মনে হয় না বরং মনে হয় যেন কোন রাজা-বাদশাব মতন একাকী আত্মচিন্তা করছেন।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, খুব রাগী লোক, নারে?

—ধ্যাৎ! রাগী কেন হবেন? খুব বড় সঙ্গীতশিল্পীরা কখনো রাগী হতে পারেন না, ওঁরা মহাপুরুষ।

—তা হলে আমরা এখানে বোকার মতন দাঁড়িয়ে আছি কেন! কেন ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে যাচ্ছি না?

—আলাপ করব...আমরা? আমাদের মতন এলেবেলে লোক ওঁর মতন একজন মানুষকে ডিসটার্ব করতে যাব কেন?

—বিখ্যাত গুণীদের সঙ্গে আলাপ করতে যায় না লোকে? আমরা অটোগ্রাফ চাইব।

—তুই পাগল হয়েছিস, নীলু! উনি এসেছেন এখানে নিরিবিলিতে থাকবার জন্য...এই হাজীপুরের মতন জায়গায় আমি ছাড়া আর কেউই ওঁকে চিনতে পারবে না...

আসলে আমিও যে অচেনা লোকজনের সঙ্গে আলাপ করার ব্যাপারে খুব একটা ওস্তাদ, তা নয়। একবার আমাদের বাড়ির খুব কাছেই একটা রাস্তার মোড়ে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলুম। হ্যাঁ, ঐ আর একজন, যাঁকে দেখলে আমার বুক কাঁপার কথা। সত্যিই বুক কাঁপছিল, খুবই ইচ্ছে করছিল, কাছে গিয়ে দু'-একটা কথা বলি। ঐ কিন্নরীটির কণ্ঠে শুধু গানই শুনেছি, সাধারণ কথা-বার্তা কীরকম ভাবে উচ্চারণ করেন তা শোনার জন্য খুবই লোভ হয়েছিল। কিন্তু কী যে লজ্জা আমায় পেয়ে বসল, খালি মনে হতে লাগল, আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালে উনি যদি বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকোন, তা হলে সব স্বপ্ন ভেঙে যাবে! তাই দূর থেকেই শুধু দেখে গেলুম, যতক্ষণ না উনি একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়লেন।

কিন্তু কাপুরুষদের মধ্যে যেমন দু'-একজন হঠাৎ সাহসী হয়ে ওঠে, সেইরকম আমি রাজীবের হাত চেপে ধরে বললুম, চল না, দেখি একবার, উনি তো আর সত্যি সত্যি বাঘ-সিংহের মতন কামড়ে দেবেন না!

রাজীব তবু রাজি নয়, আমি জোর করে ওকে টানতে টানতে নিয়ে গেলুম গেটের দিকে।

গেটটা খোলা, ভেতরে যেতে কোন বাধা নেই। তা ছাড়া ডাকবাংলোতে যে-কেউ ঢুকতে পারে।

আস্তে আস্তে গিয়ে দাড়ালুম সেই গোল বেদিটার কাছে। উনি তখনও সেই একই রকম ভাবে বসে আছেন। আমাদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পাননি।

একটা কিছু বলে সম্বোধন করতে হবে। কী যেন বলতে হয়? বন্দেগী? কিন্তু নাটকে বা উপন্যাসে দেখেছি বন্দেগী'র পরই জাঁহাপনা এসে যায়। এঁকে কি জাঁহাপনা বলা উচিত? আর একটা আছে, সেলাম আলেকুম, কিন্তু সেটা যেন আবার অতি সাধারণ লোকজনের ক্ষেত্রে চলে, এঁর মতন একজন গুণী ব্যক্তি...।

কিছু ঠিক করার আগেই খাঁ সাহেব আমাদের দিকে ফিরলেন। আর অমনি রাজীব এগিয়ে গিয়ে ঝপ করে ওঁর সামনে বসে পড়ে পায়ের ধুলো নিল। আমিও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে, অটোমেটিক্যালি হাত জোড় করে বললুম, নমস্কার।

আলিম খাঁ রাজীবের প্রণামেও বাধা দিলেন না, আমার নমস্কারেরও কোন উত্তর দিলেন না। একবার রাজীবের দিকে, আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন।

তারপর উনিও চুপচাপ, আমরাও চুপচাপ। দারুণ অস্বস্তিকর ব্যাপার। একটা কিছু আমাদেরই বলা দরকার। কিন্তু কী বলব! ইনি নিশ্চয়ই উর্দু ছাড়া আর কিছু বোঝেন না।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতন একটা শব্দ আমার মাথায় এসে গেল। গুস্তাকি! এই কথাটা তো এখানে খাটে।

আমি বললুম, গুস্তাকি মাফ কিজিয়ে খাঁ সাব...

উনি এবার ওঁর গভীর চোখের দৃষ্টি স্থাপন করলেন আমার মুখের ওপর। লক্ষ্য করলুম, ওঁর চোখের মণিদুটি কালো নয়, বাদামি। এই ধরনের চোখ দেখলেই একটু ভয় ভয় করে। রাজীব বাঘ-সিংহের সঙ্গে তুলনাটা ঠিকই দিয়েছিল। উনি এখনো কোন কথা বলছেন না, বোধহয় অপেক্ষা করছেন, আমি আরো কিছু বলব। কিন্তু আমার যে উর্দুর স্টক শেষ!

রাজীব উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে অপরাধীর মতন। সব দায়িত্ব যেন আমার।

ঈষৎ কাঁপা গলায় বললুম, আপকো অটোগ্রাফ্...

বললুম বটে, কিন্তু মনে মনে জানি, পকেটে এক টুকরো কাগজও নেই।

কাগজ সঙ্গে না নিয়ে কেউ অটোগ্রাফ চাইতে আসে ? দারুণ বিপদের মুখে পড়লে একটা না একটা বুদ্ধি বেরিয়ে আসে ঠিকই। আমার বুকপকেটে একটা পাঁচ টাকার নোট, সেইটা ঝট করে বার করে এগিয়ে দিয়ে বললুম, ইসমে আপকো অটোগ্রাফ...এই রাজু তোর কলমটা দে !

এবার খাঁ সাহেবের মুখে একটু যেন হাসির ঝিলিক এসেই মিলিয়ে গেল তক্ষুনি। আমার হাতের টাকাটার দিকে তাকিয়ে জলদ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, পাঁচ টাকায় হোবে না...শও রূপেয়াকা নোট নিকালো। .

রাজীব আর আমি একবার দৃষ্টি বিনিময় করলুম। দু' জনের চোখের ভাষা দু' রকম। রাজীব যেন বলতে চায়, ছিঃ নীলু, তুই একটা সামান্য পাঁচ টাকার ওপর সই করতে বলে এতবড় একজন গুণীকে অপমান করলি ! আর আমি বলতে চাইলুম, খাঁ সাহেব একটুখানি ভাঙা বাংলা বললেন না ? তা হলে কি এবার বাংলাতেই কথাবার্তা এগোনো যায় ?

খাঁ সাহেব নিজের পাশের জায়গাটা হাত দিয়ে চাপড়ে বললেন, আও, ইধার বয়ঠো। তুমলোগ দোনোবাবু ইধার কোন কাম করো ?

—আমরা আপনার ভক্ত।

—হাঁ, হাঁ ! বেশক ! আগে তো বলো, ম্যায় কৌন হুঁ, দিলীপকুমাব ইয়া রাজকাপুর ?

আরে, ইনি তো তাহলে তেমন রাগী বা গম্ভীর নন। আমাদের ছেলেমানুষ ভেবে ইয়ার্কি করছেন।

রাজীব এখনো সেই একই অবস্থায় দাড়িয়ে আছে। সব কিছু কথাবার্তা চালিয়ে যাবার দায়িত্ব বুঝি আমার ?

—খাঁ সাব, আপ হিন্দুস্তানকা মসুর কলাকার, আমরা আপনার গান শুনেছি, এবকম জায়গায় এসে, মানে হিয়াপর আপকো দর্শন মিলা, ইয়ে হামলোগকো বহুৎ সৌভাগ্যিয়...হ্যায়...

খাঁ সাহেব ভুরু তুলে ছদ্ম-বিস্ময়ে বললেন, হাঁ ? মেরা গানা শুনা হ্যায় ? কেমুন লাগে হামারা গান ? বালো লাগে ? বালো ? রবীন্দর সঙ্গীতসে ভি বালো ?

—খাঁ সাব, আপনি বাংলা জানেন ?

—হাঁ, জানে। থোড়া একটু জানে। আগে আউর ভি আচ্ছা জানতাম। বয়ঠো, আও, কাঁহে খাড়ে রহা হ্যায় ?

রাজীব আর আমি এবার সন্তর্পণে খাঁ সাহেবের ডান পাশে বসলুম। সেখানে এক প্যাকেট বেশ দামি সিগারেট আব দেশলাই রাখা ছিল, খাঁ সাহেব একটি সিগারেট ধরালেন, তারপর আপন মনে কথা বলতে লাগলেন। মাঝে মাঝে দু' একটা খুবই দুর্বোধ্য উর্দু শব্দ থাকলেও মোটামুটি ভাবার্থ বুঝতে আমাদের কোন অসুবিধে হলো না।

আলিম খাঁ বললেন, তুম লোগ এহি হাজীপুরে থাকো, তব্ ক্যায়সে মেরা গানা শুনা? হিঁয়াপর রেকর্ড মিলতা?

এবার আমার আত্মাভিমানে একটু ঘা লাগল। নিজেদের মফঃস্বলের লোক হিসেবে পরিচয় দিতে মোটেই ভালো লাগে না। সেই জন্য আমি তাড়াতাড়ি বললুম, খাঁ সাব, আমরা আসলে কলকাতার লোক। হামারা দোস্ত্ রাজীব হিঁয়াপর মাস্টারী করে, তাই আমি ওর কাছে বেড়াতে এসেছি, মানে; ঘুমনে আয়া, ফির্ চলা যাউঙ্গা।

আলিম খাঁ জিজ্ঞেস করলেন, কলকাত্তামে কাঁহা পর রয়নেবালা তুম লোগ?

আমি বললুম, রাজীব থাকে বিবেকানন্দ রোডের কাছে। আপ জান্‌তে হেঁ বিবেকানদ রোড কিধার হ্যায়?

আলিম খাঁ বললেন, হাঁ হাঁ। ফির বাতাও, ভিভেকানন্দ রোডকা কিস্ সাইড পর!

আমি বললুম, গিরীশ পার্ক মালুম হ্যায়? তার খুব কাছে, একদম নজদিগমে..

—হাঁ, হামি সব চিনি। গিরীশ পার্ককা বগলমে এক বহোৎ বঢ়িয়া কচৌরি আর জিলাবিকা দুকান হায় না? কিৎনিবার খায়া। হামি তো থাকতাম উধারে। উস টাইমমে তুম লোগ পয়দা ভি নেহি হুয়া...।

এর পর খাঁ সাহেব আমাদের শোনাতে লাগলেন তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনা।

প্রথম যৌবনে খাঁ সাহেব একটানা পাঁচ-ছ' বছর ছিলেন কলকাতা শহরে। তখন তাঁর শিল্পী হিসেবে কোন নাম হয়নি। অল্প বয়েসে তাঁর বাবা মারা গেছেন। তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার ছিল চারটি বিবি, বিরাট সংসার, সুতরাং খুবই টানাটানির অবস্থা। তাঁদের বংশে কারুর নোকরি করা নিষেধ, অথচ চলেই বা কী করে। তরুণ আলিম খাঁ তখন ইন্দোরের কাছে দেওয়াসে ওস্তাদ রজব আলী খাঁ-এর কাছ থেকে তালিম নিচ্ছেন, কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনেরও তো একটা ব্যাপার আছে। তাই ভাগ্যান্বেষণে তিনি চলে এসেছিলেন কলকাতায়। চাকরির সন্ধানে নয়, তিনি শুনেছিলেন কলকাতায় গান-বাজনার খুব কদর, রইস আদমীর অভাব নেই, একটা কিছু হিল্লে হয়ে যাবেই। আস্তানা মিলেছিল ইন্দোরেরই এক চেনাজানা লোকের বাড়িতে, বহুবাজারে। কিন্তু কলকাতায় এসে কিছুদিনের মধ্যেই টের পেলেন কলকাতায় সঙ্গীতের জগতে বেশ দলাদলি রয়েছে, একজন ভালো মুরুব্বি না পাকড়ালে অন্দরে ঢোকা যায় না। বড় না-লায়েক ছোকরার মতো এখানে ওখানে মাইফেল শুনতে যান, ভিড়ের মধ্যে বসতে হয়। পাথুরিয়াঘাটায় ঘোষবাবুদের এক মাইফেলে গান করেছিলেন গুলাম আলী খাঁ, সঙ্গে তাঁর লেড়কা বাচ্চা মুনাব্বর, শুনতে শুনতে আলিম খাঁ'র দিল বড় ছট্‌ফট্ করছিল, ভাবছিলেন যে একবার সুযোগ পেলে তিনিও এখানে তার ঘরের ঝাণ্ডা উঁচা করবেন। সাহস করে সে কথা বলেই ফেললেন সে আসরের এক কর্তাব্যক্তিকে। আরো পাঁচ জন সে কথা শুনে ঠাট্টা

বিদ্রূপ শুরু করে দিলেন। এ ছেলেটা বলে কী? পিতৃ পরিচয় দিচ্ছে কিরানা ঘরানার, আবার তালিম নিয়েছে বলছে রজব আলী খাঁর কাছে, এই পাঁচমিশেলী গান সে শোনাতে চায় এখানে? কলকাতার লোকদের রুচি সে জানে না? এত শস্তা এখানে নাম করা? ঘোষবাবুদের বাড়ির মজলিশে কি যে সে সুযোগ পায়?

সেইদিনই তরুণ আলিম খাঁ মনে মনে শপথ নিয়েছিলেন, সারে হিন্দুস্তানে তিনি প্রমাণ করবেন যে ঘরানা পরিচয় কিংবা খানদান ছাড়াও কেউ সর্বশ্রেষ্ঠ কলাকার হতে পারে।

যাই হোক, ইন্দোরের সেই পরিচিত ভদ্রলোকটি হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন। আলিম খাঁ পড়লেন অকূল পাথারে, তখন তাঁর ফিরে যাবার মতন রেল ভাড়াও নেই, কলকাতায় থাকবার মতন কোন জায়গাও নেই। তখন দয়াপরবশ হয়ে এক বাড়ির দারোয়ান তার একটা খাটিয়ায় শুতে দিল, গরমকাল, তিনি রাত্তিরবেলা শুয়ে থাকেন ফুটপাথে খাটিয়া পেতে, পেটে খিদে, ঘুম আসে না, রেওয়াজও বন্ধ...

হঠাৎ কথা থামিয়ে আলিম খাঁ ভরাট গলায় উচ্চহাস্য করে উঠলেন। আমাদের দিকে ফিরে দু' হাত ছড়িয়ে বললেন, উয়ো খাটিয়া ইতনা ছোটা থা...ঠিক সে রাখনা তো পাঁও নিকাল যাতা, আর শর্ পাঁও ভিতরে আনলে মাথা বাহার চলে যায়...

প্রায় সওয়া ছ' ফুট লম্বা লোকটির পক্ষে একটি ছোট্ট খাটিয়ায় শোওয়া যে কতখানি অস্বস্তিকর তা আমরাও অনুভব করলুম। কিন্তু আলিম খাঁর স্মৃতিচর্চার মধ্যে কোন তিক্ততা নেই, তিনি ঐ কথাটাই বারবার বলে হাসতে লাগলেন খুব।

রাজীবের সারা মুখে একেবারে মুগ্ধতা মাখানো। একজন ভারত-বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনের অজ্ঞাত কাহিনী যেন আমরাই প্রথম শুনছি।

কিন্তু গল্প আর বেশি দূর এগোল না। বাংলোর গেট দিয়ে ঢুকল একটি গাড়ি, সেটা থেকে নামল তিন চারজন লোক। গাড়ির আওয়াজ শুনে বাংলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল খাঁ সাহেবের অনুচররা। তারা সবাই মিলে এগিয়ে আসতে লাগল এই বেদিটার দিকে।

আলিম খাঁ অচঞ্চল হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন স্থিরভাবে। ওদের মধ্যে একজন হোমরা-চোমরা ধরনের ব্যক্তি কাছাকাছি এসে বলল, আদাবারজ খাঁ সাব।

খাঁ সাহেব শুধু একটি হাত তুললেন কপালের দিকে।

কয়েকজন অনুচর এক সঙ্গে বিগলিত স্বরে যা বলল, তাতে বোঝা গেল যে মটর গাড়ির আগন্তুকটি একজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তিনি ওস্তাদজীর সঙ্গে কোন কাজের কথা বলতে এসেছেন।

খাঁ সাহেব আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তুম দোনো বয়ঠকে রহো। চলে যাবে না।

তিনি উঠে এগিয়ে গেলেন দলটির দিকে। রাজীব ফিস্‌ফিস করে বলল, ঐ টাক-মাথা লোকটির নাম শেখ আনোয়ার আলি, এখানকার এম এল এ, আমরা এবার উঠে পড়ি !

—কিন্তু খাঁ সাহেব যে আমাদের চলে যেতে নিষেধ করলেন ? আমরা একটু বসে যাই।

খাঁ সাহেবের জীবনকাহিনীটা জমেছিল বেশ। উনি যে শুধু বড় গায়ক তাই নন গল্পও বলেন বেশ ভালো। বউবাজারে ফুটপাথের ওপর খাটিয়ায় শুয়ে থাকত একটি ছেলে, সে-ই আজ ভারত বিখ্যাত গায়ক। শুনেছি এখন একটা ফাংশানে গাইবার জন্য উনি পনেরো না কুড়ি হাজার টাকা নেন। এ যেন রূপকথা !

রাজীব বলল, উনি একটা কি দারুণ কথা বলেছেন, লক্ষ্য করেছিস ? ঘরানা-পরিচয় কিংবা খানদান ছাড়াও নিজের চেষ্টায় বড় শিল্পী হওয়া যায়। উনি তা প্রমাণও করেছেন।

—মহাভারতের কর্ণের মত।

—মুখের মধ্যে কী রকম একটা তেজের ভাব। আর ঐ যে থুতনি ওরকম আর কোন মানুষের হয় !

আলিম খাঁর চিবুকে একটা বৈশিষ্ট্য আছে ঠিকই। চিবুকের ডগাটা মনে হয় যেন সামনের দিকে একটু এগোনো। নাকটাও ঈগল পাখির ঠোঁটের মতন। এই রকম মুখে স্বাভাবিক ভাবেই একটা অহঙ্কারের ছাপ ফুটে থাকে, কিন্তু আলিম খাঁ'র ব্যবহারে কোনো অহঙ্কারের চিহ্ন তো পাইনি। আমাদের মতন দুটো অচেনা উটকো ছোকরার সঙ্গে তিনি যেরকম গল্প শুরু করে দিলেন সেটা সত্যিই খুব আশ্চর্যের।

আলিম খাঁর চেহারার আর একটি ব্যাপারও প্রথমেই আমার নজরে এসেছিল। একটি জিনিসের অনস্তিত্ব। এ পর্যন্ত আমি যত বিখ্যাত মুসলমান সঙ্গীতজ্ঞের ছবি দেখেছি, তাঁদের সকলের দাড়ি না থাকলেও গোঁফ আছে প্রত্যেকেরই। কিন্তু আলিম খাঁর গোঁফ-দাড়ি কিছুই নেই। রাঁচিতে মুখুজ্যেবাবু নামে এক রসিক বৃদ্ধ আমায় প্রথম আলাপেই বলেছিলেন, তোমার গোঁপ নেই কেন ? গোঁপ না থাকলে কি পুরুষমানুষ বলে চেনা যায় ?

রাজীব বলল, আমার এতদিন ধারণা ছিল, আলিম খাঁ কিরানা ঘরানার গায়ক। উনি নিজের মুখেই আজ তা অস্বীকার করলেন। ওঁর গায়কী সম্পূর্ণ আলাদা।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কিরানা ঘরানা নামটা শোনা শোনা। ঐ ঘরানায় আর কোন্ বিখ্যাত গায়ক আছে রে ?

—একজন নাকি ? গানের জগতে তো কিরানা ঘরানারই রাজত্ব। ওঁদের সম্রাট বলতে পারিস আবদুল করীম খাঁ সাহেবকে। তিনি ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় গুণী।

তাঁর দুই মেয়ে, হীরাবাঈ, সরস্বতীবাঈ তো আছেনই, তা ছাড়াও সওয়াই গন্ধর্ব, গাঙ্গুবাঈ হাঙ্গল, ভীমসেন জোশী...

আরো কিছুক্ষণ বসে থাকবার পরও আলিম খাঁ ফিরে এলেন না। বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে, দূরে শেয়াল ডাকতে শুরু করেছে। উনি কি ভুলে গেলেন আমাদের কথা? সিগারেট টানতে টানতে চটাপট শব্দে মশা মারতে লাগলুম আমরা দু' জনে। আর বেশিক্ষণ এভাবে বসে থাকা যায় না।

—চল বাজু, এবার কেটে পড়ি।

—ওঁকে কিছু না বলে গেলে উনি যদি রাগ করেন? ঐ এম এল এ ভদ্দরলোকটি এসেই সব ভণ্ডুল করে দিলেন। খাঁ সাহেব এমন চমৎকার গল্প বলছিলেন, এরকম সুযোগ কি আর জীবনে পাব?

—তুই বোস, আমি দেখছি।

—হুট করে ভেতরে ঢুকে পড়বি? সেটা ভালো দেখাবে না।

আমি উঠে গিয়ে বাংলো বাড়িটার পেছন দিকে চলে গেলুম। সব কটি ঘরে আলো জ্বললেও একটি ঘর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

চুপি চুপি গিয়ে দাঁড়ালুম সেই ঘরের একটি জানালার পাশে।

আলিম খাঁ ঠিক পদ্মাসনের ভঙ্গিতে শিরদাঁড়া সোজা করে বসে আছেন খাটের ওপর, সামনের একটি চেয়ারে এম এল এ সাহেবটি, বাকি সব লোক দাঁড়ানো। এম এল এ সাহেবই তাঁর পেশার যথাৰ্থতা প্রমাণ করবার জন্য একা কথা বলে যাচ্ছেন একনাগাড়ে।

আলিম খাঁর হাতে একটি গেলাস। পাশের একটি বোতল থেকে তিনি সেই গেলাসে যে জিনিসটি ঢাললেন, সেটা মোটেই কোনো পীর সাহেবের মাজারের উপকারী কুয়োর জল নয়।

ফিরে এসে রাজীবকে বললুম, চল, আজ আর অপেক্ষা করে কোন লাভ নেই।

রাজীব উঠে দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বললে, আচ্ছা চল। কাল খুব ভোরে উঠতে পারবি?

—কেন?

—কাল সূর্য ওঠার আগে এখানে চলে আসব। উনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকে রিওয়াজ করেন, দূরে দাঁড়িয়ে সেটা শুনতে হবে। এরকম চান্স আর জীবনে পাওয়া যাবে না।

—ঠিক আছে, আসা যাবে।

—নীলু, তুই হঠাৎ এসে পড়ে যে আমার কী উপকার করেছিস! গত দু'দিন ধরে আমি বাউণ্ডারির বাইরে দাঁড়িয়ে খাঁ সাহেবকে শুধু দেখেই চলে গেছি। তুই না এলে আমার একার সাহসে কুলোত না ওঁর সঙ্গে আলাপ করবার। আজকের

দিনটা আমার জীবনে একটা সোনার অক্ষরে লিখে রাখার মতন দিন।

ফেরার পথে বাঁশের সাঁকোটা পার হবার সময় রাজীব আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—আকাশের দিকে চেয়ে দ্যাখ, নীলু!

যে-রকম হয় মফঃস্বলের আকাশ, অনেক বেশি তারা, অনেক বেশি নীল। কিন্তু রাত্তিরবেলা নড়বড়ে বাঁশের সাঁকোর ওপরে দাঁড়িয়ে আকাশের সৌন্দর্য দেখার শখ আমার নেই।

—কী?

—তোর মনে হচ্ছে না, মানুষ হয়ে বেঁচে থাকা সত্যি খুব সুন্দর?

৩

সূর্য ওঠার আগেই আমরা পৌঁছে গেলুম বটে, কিন্তু পাক্কা দু' ঘন্টা আমাদের চুপচাপ বসে থাকতে হলো। আলিম খাঁ বেশ দেরি করে ঘুম থেকে ওঠেন।

যৌবনে পাঁচ ছ' বছর কলকাতায় থেকে তিনি কি এই বাঙালি-স্বভাবটা পেয়ে গেছেন!

গায়কদের সম্পর্কে এই ছবিটাই আমাদের মনে গাঁথা থাকে, অতি প্রত্যূষে সেই সঙ্গীতসাধক চক্ষু বুজে কণ্ঠসাধনা করছেন, নাভি থেকে উঠে আসছে নাদ-ব্রহ্ম। সে রকম কিছু দেখা বা শোনার সৌভাগ্য আমাদের হলো না।

সাতটা আন্দাজ শুধু একটা লুঙ্গি পরে, খালি গায়ে বেরিয়ে এলেন আলিম খাঁ, মুখে সিগারেট।

প্রথমে কিছুক্ষণ তিনি আমাদের দেখতে পেলেন না, আমরাও কাছে এগিয়ে গেলুম না। আমরা বসে রইলুম সেই গোল চাতালে।

সারা বাগানটা পায়চারি করতে লাগলেন আলিম খাঁ। মাঝে মাঝেই তিনি কোন একটা গাছের সামনে থেমে যাচ্ছেন। কী যেন বলছেন বিড়বিড় করে। উনি কি গাছের সঙ্গে কথা বলেন?

কাল সন্ধেবেলাতেও লক্ষ্য করেছি, উনি গাছ থেকে ফুল না ছিঁড়ে গন্ধ শোঁকেন নিচু হয়ে। কিংবা ফুলের পাপড়িতে হাত বুলোন খুব নরম ভাবে।

একটা পাখি টি-টি করে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত চেয়ে রইলেন সেই পাখিটার দিকে। তারপর নিজেও অবিকল সেই পাখিটার অনুকরণে টি-টি করে উঠলেন। রাজীব আমাকে একটা খোঁচা মেরে ফিসফিসিয়ে বলল, শুনলি? কি দারুণ না?

আমি অবশ্য এর মধ্যে দারুণ কিছু পেলুম না। পাখির ডাক নকল করতে

অনেকেই পারে। বরং ওঁব ঐ গাছের সঙ্গে কথা বলাটা আমাকে বেশি আকৃষ্ট করছে।

উনি আবার একটা ফুল গাছের সামনে দাঁড়াতেই একটা বেশ বড় আকারের ভোমরা শব্দ করতে করতে ঘুরতে লাগল ওঁকে ঘিবে। খাঁ সাহেব ভোমরাটিকে ভয় পেলেন না, নিজেও মুখ দিয়ে শব্দ করতে লাগলেন ভোমরাটির মতন। ঠিক যেন একটা বাচ্চা ছেলে।

আমি আর রাজীব দূর থেকে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলুম একজন মহাপুরুষের ছেলেখেলা।

খাঁ সাহেব আবো অনেক কাণ্ড কবতে লাগলেন। ভোমবাটা চলে যাবাব পরে তিনি তাঁর নাকের সামনে একবার ডান হাত, আব একবার বাঁ হাঁত ধরলেন, তারপর ঐ বকমই করতে লাগলেন পর্যায়ক্রমে। যতদূর মনে হলো, তিনি খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছেন আব মিলিয়ে দেখছেন, তাব দুই নাকেব ফুটোর মধ্যে কোন দিকের নিঃশ্বাস বেশি জোরে।

কিন্তু এব পরে তিনি যে কাণ্ডটা শুরু করলেন তার মানে আমরা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলুম না। উনি হঠাৎ দু'হাত তুলে অদ্ভুত ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে দৌড়োতে লাগলেন, একবাব নিচু হচ্ছেন, একবার শূন্যে লাফিয়ে উঠছেন। সত্যি কথা বলতে কী, এই রকম অবস্থায় দূর থেকে যে-কেউ দেখলে ওঁকে পাগল ভাববে।

আমি বাজীবেব চোখেব দিকে তাকালুম। বাজীবের দৃষ্টিতেও সেই একই বিস্ময়।

একটু পরে বোঝা গেল, উনি তখন একটা ফড়িংকে ধববাব চেষ্টা কবছিলেন। ফড়িং বেচারা ধরা না পড়ে বেচে গেল, কাবণ তখুনি একটা গম্ভীব গর্জন শোনা গেল আকাশে। একটা জেট প্লেন উড়ে আসছে। আওযাজে যেন আকাশ ভেঙে দিযে যাবে। প্লেনটা যত দূরে চলে গেল, তত আওয়াজটা মোলাযেম হতে লাগল। এক সময় রীতি মতন সুরেলা—।

আসলে প্লেনের আওয়াজটা মিলিয়ে যাবার পরও আমরা যা শুনতে পাচ্ছিলুম, তা খাঁ সাহেবেব কণ্ঠস্বব।

রাজীব বলল, শুদ্ধ ধৈবত!

বুঝতে পারলুম, প্রকৃতিকে অনুকরণ করা খা সাহেবের একটা প্রিয় শখ। আকাশ দিযে উড়ে যাওয়া পাখির মতন, এরোপ্লেনও তো আজকাল প্রকৃতিই!

এর পর বাংলো থেকে একজন লোক বেরিযে এল। তার হাতে একটা ট্রের ওপর একটা কাচের গেলাসে অর্ধেক ভর্তি কোন পানীয়। সেটা চা কিংবা কোন সরবৎ নয়, রং একেবারে ঘন সবুজ।

রাজীব বলল, নিম পাতার রস। সব বড় বড় গায়কদের খেতে হয়।

আমার মনে পড়ল, কোথায় যেন পড়েছি, রবীন্দ্রনাথও নিয়মিত নিমপাতার রস খেতেন। তখনই বুঝে গেলুম, আমার দ্বারা আর এ জীবনে মহাপুরুষ হওয়া হলো না। বাপ্‌রে, রোজ সকালে অতখানি নিমপাতার রস খেতে হবে? আমি একদম তেতো সহ্য করতে পারি না।

লোকটির হাত থেকে গেলাসটি নিয়ে খাঁ সাহেব বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে নিলেন এক চুমুকে। তখনই তাঁর চোখ পড়ল আমাদের দিকে।

কিন্তু উনি আমাদের দেখেও দেখলেন না। অলস ভাবে আমাদের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে আবার অন্য দিকে তাকালেন। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে গোটা বাগানটা ঘুরে ঢুকে গেলেন বাংলোর মধ্যে।

যাঃ, উনি চিনতে পারলেন না আমাদের? এত সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে আসা বৃথাই গেল।

রাজীবের মুখখানা ম্লান হয়ে গেছে।

আমি ভাবলুম, মহাপুরুষরা সাধারণত খেয়ালিই হয়। কাল সন্ধেবেলা উনি অন্যরকম মুডে ছিলেন, তাই আমাদের সঙ্গে খুব গল্প করছিলেন, আজ মেজাজ বদলে গেছে, তাই আর আমাদের কথা মনে নেই।

রাজীবকে বললুম, কী আর করবি! চল এখন যাওয়া যাক। বিকেলের দিকে এসে না হয় আবার ট্রাই করা যাবে।

রাজীব যন্ত্রের মতন উঠে দাঁড়াল। সত্যি আর বসে থাকার কোন মানে হয় না। খিদেও পেয়েছে বেশ।

গেটের দিকে এগোতে শুরু করেছি, একটা লোক ছুটতে ছুটতে এসে বলল, খাঁ সাব গোস্‌লখানেমে গায়া। আপলোগকো জেরা ঠ্যায়রনে বোলা।

রাজীব অমনি আবার হাতে স্বর্গ ফিরে পেল।। আমার দিকে ফিরে বলল, দেখেছিস! বলেছিলুম না—

অথচ রাজীব কিন্তু কিছুই বলেনি।

আবার ফিরে গিয়ে বসলুম সেই গোল জায়গাটায়। রোদ যেমন চড়া হয়েছে, পেটের মধ্যে খিদেটাও সেইরকম চচ্চড় করছে। সকালে বেশিক্ষণ কি না খেয়ে থাকা যায়? সারা রাত একটা ঘুমের পরিশ্রম গেছে না! খালি পেটে সিগারেট টানতেও ইচ্ছে করে না।

মহাপুরুষদের বাথরুম করতে কত সময় লাগে তাই বা কে জানে!

মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পর সেই আর্দালিটি আবার এলো আমাদের কাছে। তার হাতে গোটা চারেক পাকা কলা।

খুব খিদের সময় ঐ কলাই চলবে বটে, কিন্তু সাধারণত কলা-ফলা টাইপের জিনিস আমার একদম পছন্দ নয়। খাঁ সাহেব কি ফলাহার নিয়ে ব্রেকফাস্ট করেন

নাকি ? তবে যে শুনেছিলুম খানদানি মুসলমানরা সকালবেলাতেই বিরিয়ানি, গোস্ত, কাবাব, মুর্গ মশল্লাম চালাতে শুরু করেন। উনি কি ভেবেছেন, মুসলমানি খানা খেতে আমাদের আপত্তি হবে ? হায়রে, আমাদের যে ঐ সব খাবারের নাম শুনলেই জিভে জল আসে। আর্দালিটিকে জিজ্ঞেস করলুম, ইয়ে কলা কৌন ভেজা ?

—খাঁ সাব বোল দিয়া। আপলোগ চায়ে পিয়েঙ্গে ?

খানিকটা নির্লজ্জের মতন বললুম, হাঁ, হাঁ চা তো জরুর পিয়েগা, লেকিন চা-কা সাথ টা কেয়া হ্যায় ?

—রোটি ?

—হাঁ, ঠিক হ্যায়। লেকিন কেয়া দেকে রুটি খায়েগা ? শুধু শুধু তো রুটি নেহি খায়ে গা। সাথ মে কেয়া হ্যায় ?

—ভুনা গোস, কলেজি।

অতি উৎসাহের সঙ্গে আমি বলে ফেললুম, বহুৎ খুব ! বহুৎ খুব ! যদিও জানি না ঐ কথাটি গানের সময় বলে, না খাবাবের বিষয়ে বলে !

লোকটি চলে যাবার পর রাজীব আমাকে বলল, তুই কী রে ! একটুও চক্ষু-লজ্জা নেই ?

আমি বললুম, দ্যাখো ভাই, খাওয়ার ব্যাপারে চক্ষুলজ্জা থাকলে চলে না। যখন দেবে, তখন তো তুই-ও খাবি, খাবি না ? শুধু শুধু দোষটা হলো আমার।

অল্পক্ষণ পরেই বেশ পরিপাটি করে প্লেট সাজিয়ে খাবার এল। সেই গাছতলাতেই বসে আমরা ভোজনপর্ব সেরে নিলুম। গরম মাংস আর মেটের চচ্চড়ির অপূর্ব স্বাদ। দারুণ ঝাল ঝাল। তারপর বেশ তৃপ্তির সঙ্গে সবে মাত্র সিগারেট ধরিয়েছি, এমন সময় লোকটি এসে জানাল যে খাঁ সাব আমাদের ভেতরে ডেকে পাঠিয়েছেন।

রাজীব সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় আস্ত সিগারেটটাই ফেলে দিল। আমি বাংলোর গেট পর্যন্ত যেতে যেতে ঘনঘন কয়েকটা টানে সিগারেটটা প্রায় শেষ করে ছাড়লুম।

ভেতরে ঢোকার পর খাঁ সাহেব আমাদের প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, তুম লোগোকো পাশ সিগ্রেট হ্যায় ? একঠো দেও।

তারপর আর্দালির উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে বললেন, নাদের ! জলদি সিগ্রেট মাঙওয়াকে লাও !

আলিম খাঁও নাস্তা খেতে বসেছেন, কিন্তু সঙ্গে একটি ভর্তি বীয়ারের বোতল। বোতলটা সদ্য ফ্রীজ থেকে বার করা হয়েছে, গায়ে ঠাণ্ডা জমে আছে। খাবার টেবিলের ওপরে রয়েছে আর একটি খালি রামের বোতল।

সর্বনাশ! খাঁ সাহেব এখানে এসেছেন পীরের মাজারের বিখ্যাত কুয়োর জল খেয়ে পেটের ব্যামো সারাতে, আর উনি সকাল থেকে মদ্য পান শুরু করেছেন। পীরের মাজারের জল যতই শক্তিশালী হোক, পারবে বীয়ারের সঙ্গে পাল্লা দিতে?

আমাদের দু'জনেরই দৃষ্টি বীয়ারের বোতলটির প্রতি নিবদ্ধ দেখেই সম্ভবত উনি বললেন, ইত্তো গরম তুমহাদের দেশমে, অার পানীমে ভি টেস্ট্ নেহি...

আলিম খাঁকে সিগারেট দেবার সৌভাগ্য আমিই অর্জন করলুম।

রাজীব বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করল, খাঁ সাব, এখানে পীর সাহেবের মাজারের পানীর খুব নাম, আপনার কিছু উপকার হয়েছে?

উনি ডান হাতটি অবহেলার ভঙ্গিতে আন্দোলিত করে বললেন, ছোড়ো ও বাত! সব বাকোয়াস্!

বীয়ারের বোতলটি তুলে বললেন, ইয়ে দাবাই সবসে আচ্ছা! তারপর বোতলের গলা ধরেই লাগালেন দীর্ঘ এক চুমুক।

আমি আর রাজীব অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলুম। যেন মহান ব্যক্তিদের এই সব জিনিস সোজাসুজি দেখতে নেই।

আলিম খাঁ পরে আছেন একটা চেক লুঙ্গি আর একটা হাত কাটা গেঞ্জি। এই বয়েসেও চমৎকার স্বাস্থ্য, একটুও চর্বি নেই। অথচ স্বাস্থ্য-রক্ষার কোন নিয়মই উনি মানেন না। ঘুম থেকে উঠেই উনি সিগারেট ধরান। কাল রাতে নিশ্চয়ই ঐ রামের বোতলটি শেষ করেছেন, সকালে আবার বীয়ার পান করতে শুরু করেছেন। ভোজনেও কম যান না। এক-একটা আস্ত কাবাব টপ করে পুরে দিচ্ছেন মুখে।

খেতে খেতেই আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তুম লোগ ঠিক সে নাস্তা কিয়া?

আমি বললুম, হাঁ, খাঁ সাব। আপনার আর্দালি আমাদের অনেক খাবার দিয়েছে। ভুনা গোস্ বহুৎ আচ্ছা থা।

—তুম লোগ কাঁহে ভাগ্ গ্যয়া কাল?

—আপনার কাছে লোকজন এসেছিল, আপনি ব্যস্ত ছিলেন।

খাঁ সাহেব আবার হাতটি বিরক্তির ভঙ্গিতে নাড়লেন। এখানে ভিড়-ভাট্টা ওঁর পছন্দ নয়। কিন্তু আমাদের উনি বসবার নির্দেশ দিলেন, তারপর বললেন, তুমলোগকো নাম বাতাও!

দু'জনের নাম বলার পর আমি আরো যোগ করলুম, খাঁ সাব, আমার এই দোস্ত্ রাজীব, ইয়ে বহুৎ আচ্ছা সরোদ বাজাতা হ্যায়। ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ সাব হ্যায় না?

আলিম খাঁ অন্যমনস্কভাবে বললেন, হাঁ হাঁ!

—উনকা এক বঁঢ়িয়া শিষ্‌যিওয়া, মানে, প্রিয় শিষ্য হ্যায় সত্যেন সরকার,

হামলোগ কালুদা বোলতা হ্যায়, সেই কালুদা ওকে তালিম দেন।

উনি আবার আগের মতন বললেন, হাঁ, হাঁ। রাজীবের সরোদ শেখার ব্যাপারটাতে পাত্তাই দিলেন না।

রাজীব আমাকে খোঁচা মারছিল বারবার, এবার সে কথা ঘোরাবার জন্য বলল, খাঁ সাব, কাল আপনি কলকাতার আপনার ছেলেবেলার গল্প বলছিলেন, সবটা শেষ হয়নি, যদি এখন বলেন—

খাঁ সাব বললেন, হাঁ, পাঁচ বরষ ছিলম কলকাত্তা, কভি হিঁয়া কভি হুঁয়া, তারপর এক বাংগালী লেড়কী শাদী করলুম।

খাঁ সাহেব বাঙালি বিয়ে করেছেন? তার মানে উনি পশ্চিম বাংলার জামাই? পতৌদির মতন! এ খবর রাজীবও জানত না।

খাঁ সাহেব কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার বললেন, উনকা ইন্তেকাল হো গ্যয়া। কিত্‌না খুবসুরৎ উত্‌নাহি কোমল থি।

ইন্তেকাল কথাটার মানে না জানলেও বোঝা গেল যে খাঁ সাহেবের সেই বাঙালি পত্নী আর বেঁচে নেই।

—তুম্ লোগ শাদী নেহি কিয়া?

আমরা দু'জনেই সলজ্জ হাসিমুখে ঘাড় নাড়লুম। কিন্তু খা সাহেবের পরবর্তী বাক্যটি শুনেই আমাদের চার চক্ষু বিস্ফারিত! চড়কগাছও বলা যায়!

জওয়ান পাঠ্যে, আভিতক শাদী নেহি কিয়া? দেখো, হামাকে দেখো, হামার এগারোঠা বিবি। চার সরকারী, আওর পাঁচ বিবি আগলবাগলমে হ্যায়, আওর দো বিবি ইয়ে দুনিয়া ছোড়কে চলে গ্যয়ে।

বলেন কী ইনি? এগারোটা বিয়ে? ইনি মানুষ না দৈত্য? সকাল থেকে মদ্যপান করেন, এগারোটা বউ সামলেছেন, তার মধ্যে গান-বাজনার চর্চা করেন কখন? অথচ উনি যে ভারতের এক নম্বর গায়ক, তাতেও সন্দেহ নেই।

আমাদের থ-মেরে যাওয়ার ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করলেন আলিম খাঁ। হো-হো করে হাসতে লাগলেন।

তখন আমি ভাবলুম, তাহলে এগারোটা বিয়ের ব্যাপারটা সত্যি নয়। উনি আমাদের সঙ্গে মজা করছেন। কোন মানুষের যদি এক সঙ্গে এগারোটা বউ থাকে, তাহলে সে আর এক মিনিটও নিশ্বাস ফেলার ফুরসৎ পায়? গান-বাজনার চর্চা করবে কখন? আরবদেশের শেখদের অনেক বউ থাকে শুনেছি, কিন্তু পর পর বিয়ে করে যাওয়া ছাড়া তারা কী-ই বা কাজ করে? তারা কেউ গায়ক বা লেখক অন্তত হয় না।

যেন আমার মনের কথাটাই বুঝতে পেরে আলিম খাঁ বললেন, ক্যেয়া, বিশ্‌ওয়াস হোচ্ছে না? সাচ্‌মুচ কহতা হুঁ। চাহে তো বিলায়েত খাঁ ইয়া রবিশঙ্করকো

পুছো। সবকোই জানতা—

আবার স্মৃতিচর্চায় ফিরে গিয়ে উনি বললেন, হাঁ, উস টাইমমে কলকাত্তায় হামি খুব ঘুড্ডি ওড়াতাম। বাঙালীলোক ঘুড্ডি উড়াতে খুব ভালোবাসে। হামারভি ন্যশা লেগে গিয়েছিল, দুপর সে সামতক খালি ঘুড্ডি ওড়ানো...হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! কিরানা ঘরাণাকা সাথ ৰিফ এহি একই মিল আছে হামার, আবদুল করীম খাঁ সাব ভি ঘুড্ডি উড়াতে বহোৎ পসন্দ করতেন। তুমলোগ ঘুড্ডি উড়াও না?

রাজীব ইস্কুলের শেষ দিকেই ছেড়ে দিয়েছিল, আমি কলেজে উঠেও দু'তিন বছর ঘুড়ি উড়িয়েছি। এখনও বিশ্বকর্মা পুজোর দিন হাত নিশপিশ করে। আকাশে ঘুড়ির প্যাঁচ দেখলে রাস্তায় যেতে যেতে আমি থমকে যাই।

—হ্যাঁ, আমরা ঘুড়ি ওড়াতে খুব ভালোবাসি।

—ঠিক হ্যায়। কলকাত্তা যাকে তুমহাদের সাথ ঘুড্ডি উড়াবো। মেরা কেরামৎ দেখোগে!

আমি রাজীবের কাঁধ চাপড়ে বললুম, হ্যাঁ, ঠিক আছে, এই রাজীবদের বাড়িতে বহুৎ বড়া ছাদ হ্যায়, আমরা আপনার সঙ্গে প্যাঁচ খেলব।

রাজীব এ কথার একবর্ণও বিশ্বাস করল না। ওর জীবন-দেবতা ওস্তাদ আলিম খাঁ সাহেব ওদের বাড়ির ছাদে উঠে সাধারণ মানুষের মতন ঘুড়ি ওড়াবেন, এই দিবাস্বপ্ন সে বিশ্বাস করবে কী করে?

আলিম খাঁ আমার দিকে চেয়ে বললেন, ঠিক তো, চ্যালেঞ্জ?

রাজীব বিমর্ষ ভাবে বলল, খাঁ সাব, আপনি কি কলকাতায় গেলে আমাদের চিনতে পারবেন? আমরা অতি সামান্য...

উনি ভুরু তুলে বললেন, ইয়ে ক্যা বাত হ্যায়? কেনো না চিনতে পারব? তুম লোগ এসে যাবে হামার হোটেলে।

রাজীব আবার বলল, খাঁ সাব, আবার বলছি, আপনার সঙ্গে যে আমাদের দেখা হলো, এতে আমরা ধন্য, আপনি যে আমাদের সঙ্গে ডেকে কথা বললেন, সে জন্য আমাদের জীবন সার্থক। এর পর যদি আপনি আমাদের আর চিনতে নাও পারেন—

আলিম খাঁ হাত তুলে বললেন, আরে ইয়ার, ইয়ে বাত ছোড়ো। এইসব দিললগি হামার পসন্দ হোয় না। গপসপ মারো। তুমলোগ তো কলকাত্তাকো রহেনাওয়ালা, তবে ইখানে কী কোরছো? বেড়াতে আসছো?

কালকেই আমি আমাদের পরিচয় দিয়েছিলুম, উনি বোধহয় ভুলে গেছেন কিংবা আমার জগাখিচুড়ি হিন্দী-উর্দু বুঝতে পারেননি।

আমি রাজীবের কাজের পরিচয় দিয়ে আমার আগমনের হেতু জানালুম। উনি আমার দিকে একটু সপ্রশংস চোখে তাকিয়ে প্রশ্রয়ের হাসি দিলেন।

মনে হলো, যেন, বেকার ভ্রাম্যমানদের ওঁর খুব পছন্দ।

তারপর রাজীবকে বললেন, ছুট্টি মিলতা নেহি? আভি ছুট্টি হ্যায় না! কলকাত্তামে চলে যাও! হামি তো পার্শো লৌটকে যাবো কলকাত্তা। ইধারে তো আদমিলোক ঝামেলা করতে হ্যাঁয় কি ফাংশন কোর্বে...। ফুঃ! ফাংশান! কৌন সমঝেগা ইধার!...উ মাজারকা পানি উনিকা বাত সব বাকোয়াস! বেহুদা আদমিদের উসবে কাম হোয়, হামার তো পেটের দরদ কুচ্ছু সারলো না। তুম্ লোগ এইসা করো, কলকাত্তা চলে আও। এহি শনিবার রবীন্দর সদনমে হামার প্রোগ্রাম আছে, রাত সাড়ে নও বাজে সে বারা বাজে তক, তুমলোগ হামার সাথে ভেট করো, হামি তুমাদের স্টেজকা উপর বসিয়ে দেব। হাঁ?

আমি এবার অনেকখানি ভরসা পেয়ে বল্লুম, খাঁ সাব, আপনি যখন আমাদের এতখানি বললেন, তখন ভয়ে ভয়ে একটা অনুরোধ করব।

—কী? 'অনুরোধ' কী?

—মানে...রিকোয়েস্ট...খুব সামান্য...এখানে তো এখন কেউ নেই, আপনি আমাদের একটু ছেড়-ছার্ শুনাবেন?

খাঁ সাহেব একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, আভি নেই...খএর মওকা মিলনে পর কভি শুনাউঙ্গা...

কয়েক মুহূর্ত বাদে আবার প্রফুল্ল হয়ে বললেন, স্কুলকা দো-এক কিস্যা শুনাও। হিঁয়া লেড়কালোক কিৎনি বদ্‌মাস্?

বুঝলুম যে সব সময় গান বাজনার লোকেরাই ওঁকে ঘিরে থাকে, আর ঐ সব গল্পই করে বলে উনি তাতে বিরক্ত। উনি অন্যরকম গল্প শুনতে চান।

খানিকক্ষণ আমরা আবোল-তাবোল যা খুশি বকে গেলুম, উনি খুব হাসতে লাগলেন মজা পেয়ে। নিজেও শোনালেন ছেলেবেলার কয়েকটা দুষ্টুমির কাহিনী। এমনকি, আর্দালি এসে একবার খবর দিল যে কে একজন দেখা করতে এসেছে, খাঁ সাহেব তাকে ধমক দিয়ে বললেন, এখন বিরক্ত করো না, বাইরে বসিয়ে রাখো।

একবার হঠাৎ রাজীবকে জিজ্ঞেস করলেন যে রাজীব তো সরোদ শেখে, কিন্তু এখানে স্কুলে চাকরি করলে তার তালিম নেবার অসুবিধে হয় না?

খাঁ সাহেব এই কথা বলায় রাজীব ধন্য হয়ে গেল। উঠে গিয়ে ও খাঁ সাহেবের পা ছুঁয়ে বলল, খাঁ সাব, আমি এখনও কিছুই শিখিনি। আপনি আশীর্বাদ করুন, যাতে আমি সঙ্গীতকে নিজের জীবনে অন্তত গ্রহণ করতে পারি।

উনি রাজীবকে আশীর্বাদ করলেন না। হাত ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে বললেন, আল্লাহি জানে, হরেক ইন্‌সানকে দিমাগ কিস্ কদর্ লায়েকিসে ভরা হুয়া হ্যায়। তুম্‌হার ভিত্‌রে যে কী গুণ আছে, উয়ো তুম্ খুদ জান্‌তে হো? পহ্‌লে নিজেকে নিজে জানো।

নিজের বুকে হাত বোলাতে বোলাতে তিনি আবার বললেন, ইয়ে যো শরীর, ইয়ে হ্যায় সুর কা মন্দির। যো শ্বাস তুমি ছোড়ো আর টানো, বুকের ভিতরে যো টিপ টিপ্ টিপ শব্দ হয়..ই সব জিন্দেগীকে তাল্ আউর লয়, ইসিকো সাথ্ আচ্ছিতরো সে জান-পহ্ছান হো যায় তো...আর যো খুন, মানে রক্তো তুমহার শরীরে প্রবাহিত হোচ্ছে, ওহি আসলি সঙ্গীত চিনতে শিখো... নিজেকে জানো, দুনিয়ামে কিসিকো পরোয়া মত্ করনা...দেখো, হাম্মার কৌই ঘরানাকা জলুস নেহি, এই সা কউন গুরু ভি নেহি...যো শিখা হ্যায় খুদ শিখা ম্যায়...গলেমে সুর রহে, শরীর তন্দুরুস্ত, মোহতাজ খুদাকা, দুনিয়াকা নহী...।

খাঁ সাহেব উর্দু-বাংলা মিশিয়ে অনেক কিছু বলে গেলেন, তার সবটা পরিষ্কার বোঝা গেল না, তবু এক সুখের অনুভূতিতে মন ভরে গেল। জীবনে কোন কিছুতে গভীর উপলব্ধি না হলে কেউ এরকম ভাবে কথা বলতে পারে না। উনি যেন আমাদের জানার রাজ্য ছাড়িয়ে অজানার সীমানায় নিয়ে যাচ্ছিলেন।

দরজার কাছে আরো কয়েকজন লোক উঁকি মারছে। এবার আমাদের যাওয়া উচিত। রাজীব আর আমি উঠে দাঁড়ালুম। খাঁ সাহেব নিজে আমাদের বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন এবং আবার বললেন, কলকাত্তামে জরুর মিল্না...ম্যায় তুমলোগোকা ইন্তিজার করুঙ্গা...ঠিক আসবে, হাঁ ?

৪

কলকাতায় আমি বন্ধুদের কাছে হিরো হয়ে গেলুম। যেন দারুণ একটা জয়ের ব্যাপার করে এসেছি। তিন বছরের মধ্যে কেউ পারেনি, কিন্তু আমি ফিরিয়ে এনেছি রাজীবকে।

আমি মনে মনে বললুম, এখনই কি, এর পর দেখবি। যখন ওস্তাদ আলিম খাঁর সঙ্গে একসঙ্গে রবীন্দ্রসদনের স্টেজে বসব। তারপর ওঁকে যদি একদিন ঘুড়ি ওড়াবার জন্য নিয়ে আসতে পারি, তাহলে খবরের কাগজে ছবি বেরিয়ে যাবে নিশ্চয়ই। আমার ছোট জামাইবাবুর সঙ্গে একজন রিপোর্টারের চেনা আছে।

রাজীব যে ঠিক আমার অনুরোধেই এসেছে, তা অবশ্য নয়। আলিম খাঁ ওকে কলকাতায় দেখা করতে বলেছেন। সেই অনুরোধই রাজীবের কাছে আদেশ।

রাজীবের জন্য ওদের বাড়িতে বেশ একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেছে। যেন হারানো ছেলেকে ফিরে পাওয়া। রাজীবের মা একদিন আমাদের সব বন্ধুদের নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন। সেখানে অনেকদিন বাদে দেখলুম নন্দিতাকে।

নন্দিতা মেয়েটি ভারি অদ্ভুত ধরনের। কখন যে কী রকম ব্যবহার করবে,

কোন ঠিক নেই। এক-একদিন ওকে দেখেছি দারুণ উচ্ছল, প্রাণবন্ত, ইয়ার্কি-ঠাট্টা করে অনবরত, আবার কোন-কোনদিন খুব ম্লান কিংবা গম্ভীর, দেখলে যেন চিনতেই পারে না। ঐ জন্য আমি কক্ষনো নন্দিতার সঙ্গে প্রথমে নিজে থেকে কথা বলি না।

নন্দিতা রাজীবের মাসতুতো বোন। ঠিক আপন নয়, একটা কিছু ঘোরালো সম্পর্ক আছে। স্কুল জীবন থেকেই ওকে চিনি। এখন নন্দিতা বেশ ছিপছিপে লম্বা হয়েছে। কম বয়েসে ওর গায়ের রং কালোর দিকেই ছিল, এখন বেশ উজ্জ্বল, চোখ দুটি গভীর। প্রথম নজরে কেউ নন্দিতাকে রূপসী বলবে না, কিন্তু কয়েকবার তাকাবার পরই বোঝা যায়, ওর মুখে বেশ একটা আলগা লাবণ্য আছে।

রাজীবদের বাড়ির দোতলার ঢাকা বারান্দায় আমরা সাত-আট জন বন্ধু মেঝেতেই খবরের কাগজ পেতে খেতে বসেছি, নন্দিতা একবার চলে গেল আমাদের সামনে দিয়ে। কারুর সঙ্গেই কোন কথা বলল না। অর্থাৎ আজ ওর দ্বিতীয় রকম মেজাজ। নন্দিতা পরে আছে একটা সাদা সিল্কের শাড়ি। যতদূর মনে পড়ে, নন্দিতাকে আমি সব সময় সাদা শাড়িতেই দেখেছি।

আমি চোখ তুলে দেখলুম রাজীবের দিকে। রাজীব ওর পাশে বসা উৎপলের সঙ্গে মন দিয়ে কথা বলছে। নন্দিতাকে ও লক্ষ্যই করেনি। রাজীবের এতখানি অমনোযোগই যেন সন্দেহের বিষয়। আজ হঠাৎ আমার মনে হলো, হয়তো নন্দিতার সঙ্গে কোন মনোমালিন্যের জন্যই রাজীব কলকাতা ছেড়ে হাজীপুরে অভিমান করে থাকছে।

বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র আমিই জানি, পৃথিবীতে নন্দিতা ছাড়া আর কোন মেয়ের প্রতি রাজীবের দুর্বলতা নেই। লাজুক ছেলে রাজীব, নিশ্চয়ই ও কোনদিন নন্দিতার সঙ্গে প্রেম-ভালোবাসার কথা বলেনি। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি, এক সময় নন্দিতা সম্পর্কে ওর বেশ একটা অধিকার বোধ ছিল। এটা কোন মাসতুতো দাদার অধিকার বোধ নয়।

খাওয়াদাওয়া শেষ করার পর সিগারেট টানবার জন্য আমরা একতলায় যাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নামছি, সেই সময় আবার দেখলুম নন্দিতাকে। রাস্তার দিকে আর একটা যে ছোট ব্যালকনি, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে নন্দিতা, একা।

আমার সঙ্গে এবারে চোখাচোখি হতেই নন্দিতা আমাকে ডাকল।

যাক, তা হলে দেবী প্রসন্ন হয়েছেন, উনি দয়া করে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

নন্দিতার কাছে যেতেই একটা দারুণ ভালো গন্ধ পেলুম। বিদেশী পারফিউম। নন্দিতাদের বাড়ির অবস্থা রাজীবদের চেয়ে অনেক ভালো, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ওদের নিজস্ব বাড়ির সামনে একটা ছোট্ট বাগান আছে। গত বছর এম

এ পাশ করেছে, এখন নিশ্চয়ই ওর বিয়ের সম্বন্ধের জন্য ওর বাবা-মা ব্যস্ত। এইসব মেয়েদের সাধারণত বিলেত-আমেরিকার বাঙালিরা নিয়ে যায়।

—কী রে, নন্দিতা?

নন্দিতা প্রথমেই কোন কথা বলল না, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সোজাসুজি। মুখে হাসি নেই। স্বীকার করতেই হবে, আমার চেয়ে বয়েসে দু'তিন বছরের ছোট হলেও নন্দিতার স্বভাবে এমন একটা ব্যক্তিত্ব আছে, যার কাছে আমরা একটু দমে যাই।

—কী ব্যাপার, ডাকলি কেন আমায়?

রেলিং-এর ওপর ভর দিয়ে খানিকটা কাত হয়ে নন্দিতা বলল, তোমার বন্ধুকে বলো, সে এখনো কালুদার সঙ্গে দেখা করেনি কেন?

—কে, রাজু? কাল সন্ধেবেলা আমি নিজে কালুদার বাড়িতে গিয়েছিলুম রাজুর সঙ্গে। কালুদা বাড়ি ছিলেন না।

—আজ সকালে যাওয়া উচিত ছিল আবার।

—ব্যস্ততার কী আছে। রাজুর প্রায় দেড় মাস ছুটি, এখানেই থাকছে। তা ছাড়া একথা তুই নিজে রাজুকে বলছিস না কেন?

—ওর সঙ্গে আমার কথা বন্ধ।

—বাবাঃ! তোরা দেখছি এখনো ছেলেমানুষ রয়ে গেছিস। আড়ি? আঙুলে আঙুল ঠেকিয়ে এবারে ভাব করে ফ্যাল।

—তার কোন দরকার নেই।

—আড়ি তো আজ তুই হঠাৎ এলি যে? রাজুকে শুধু দেখবার জন্য?

—মাসীমা নেমন্তন্ন করেছেন, তাই এসেছি।

—কালুদার সঙ্গে রাজুর দেখা হয়নি, সে কথা তুই জানলি কী করে? তুই তো থাকিস অন্য পাড়ায়।

—কালুদা আমার ছোট বোন ঊর্মিকে সেতার শেখান। আমাদের বাড়িতে আসেন।

তখন আমার মনে পড়ল, নন্দিতাদের বাড়িতে বেশ একটা গান-বাজনা চর্চার আবহাওয়া আছে। রাজুর বাবা ধীরুকাকা যেমন একদম ওসব পছন্দ করেন না, নন্দিতার বাবা কিন্তু নিজেই ভালো বেহালা বাজান। একবার ওদের বাড়িতে এক আসরে আখতারি বাঈ দুর্দান্ত কয়েকটা গজল্ গেয়েছিলেন, আমরা শুনতে গিয়েছিলাম। নন্দিতাও এক সময় মৈনুদ্দিন ডাগরের কাছে গান শিখত।

এই গান-বাজনার আকর্ষণই রাজু আর নন্দিতাকে কাছাকাছি এনেছিল নিশ্চয়। কলেজ জীবনে রাজু একেবারে সঙ্গীতের ঘোরের মধ্যে ছিল। আমরা যখন অন্যান্য বিষয়ে কথা বলতুম, রাজু চুপ করে থাকত তখন। গান-বাজনার

কথা উঠলেই ও বলত, বড্ড শক্ত রে। সঙ্গীতের একেবারে ভেতরে ঢোকা খুবই শক্ত।

নন্দিতার মুখের ভাবটা আগের থেকে অনেকটা পাল্টে গেছে। চোখের দৃষ্টি অনেক গভীর। মেয়েদের যে একটা সাধারণ শাড়ি গয়নার জগৎ থাকে, তার থেকে যেন অনেক উঁচুতে উঠে গেছে নন্দিতা। কপালের ওপর এসে পড়েছে গুঁড়ো গুঁড়ো চুল, হাওয়ায় উড়ছে শাড়ির আঁচল, এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে নন্দিতা। আমিও যেন এক অন্য নন্দিতাকে দেখছি।

এই সময় নিচ থেকে ভাস্কর আর উৎপল এক সঙ্গে আমায় ডাকল, নীলু। এই নীলু।

আঃ, এই বন্ধুদের জ্বালায় কিছুতেই কোন মেয়ের সঙ্গে একটু একলা কথা বলার উপায় নেই। ওদের তো কাণ্ডজ্ঞান নেই, এখন আমি নিচে গেলে রাজুর সামনেই ওরা আমায় প্যাঁক দেবে। নন্দিতার সঙ্গে রানীর চেনা আছে। রানীর কোন বান্ধবীর সঙ্গে আমি কি হিড়িক দিতে পারি ? তা ছাড়া কোন বন্ধুর প্রেমিকার দিকে আমি কক্ষনো নজর দিই না। আমার আর যত দোষই থাক, আমি ভদ্রলোক। অন্তত অনেকে তো সেই কথাই বলে।

নন্দিতার প্রতি আমার কোন দুর্বলতা নেই, কিন্তু ওর শরীর থেকে আসা বিদেশী সৌরভের ঘ্রাণ নিতে আমাব বেশ ভালো লাগছে। নন্দিতার হাতে আঙটি বা বালা নেই, কানে দুল নেই, ও কোন অলঙ্কার ধারণ করে না, ও ভালোবাসে সুগন্ধ।

—তুই যে গান শিখছিলি, এখনও শিখিস ?

এ কথার সরাসরি কোন উত্তর না দিয়ে নন্দিতা পালটা প্রশ্ন করল, তোমার বন্ধু যে গাজীপুর না কাজিপুর কোথায় থাকে, সেখানে সরোদটা সঙ্গে নিয়ে যাবার কী দরকার ছিল ? ওটা কি দেয়ালে সাজিয়ে রাখবার জন্য ?

আমি হেসে ফেললুম। সত্যিই ছেলেমানুষের মতন ঝগড়া। এম এ পাশই করুক, আর যতই ব্যক্তিত্ব দেখাক, নন্দিতা আসলে একটা বাচ্চা মেয়ে। কেন যেন মনে হলো, ওদের দু'জনকে নিয়ে শিগগিরই কোন একটা বড় ঘটনা ঘটবে। মাসতুতো ভাই-বোনের ব্যাপার, খানিকটা গণ্ডগোল তো হবেই। যদিও আজকাল ওসবে কিছু আসে যায় না, আর ওরা এমন কিছু ঘনিষ্ঠ মাসতুতো ভাই-বোনও নয়। তবু বাবা মায়েরা এই নিয়ে তুলকালাম করতে ভালোবাসে, যদিও শেষ পর্যন্ত নিজেরাই হেরে যাবে, একথা জেনেও।

—রাজুর আর কী কী খবর চাই তোর, বল। সব জানিয়ে দিচ্ছি।

—আমার আর কিছু জানবার দরকার নেই। শুধু ওকে বলো, কালুদার সঙ্গে একবার দেখা করতে। আমাদের বাড়িতে গিয়ে যখন শুনলেন যে ও ফিরেছে, তখন দুঃখু করছিলেন।

হাজীপুর থেকে ফেরবার পথে রাজীব আমার কাছ থেকে একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিল। আলিম খাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের ব্যাপারটা কিছুতেই অন্যদের কাছে গল্প করা চলবে না। তা হলে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকেই চাইবে আমাদের সূত্র ধরে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। সবাই গান-বাজনা ভালো না বাসুক, তবু একটা হুজুগ। কিন্তু এতে আলিম খাঁ নিশ্চয়ই বিরক্ত হবেন, এবং সেটা আমাদের উচিত না. রাজীব ঠিকই বুঝেছে। কিন্তু এরকম একটা গল্প চেপে রাখা কি সোজা ? পেটের মধ্যে গজগজ করে। নন্দিতা হাজীপুরের প্রসঙ্গ তোলায় আমার ইচ্ছে হচ্ছিল ওর কাছে বলে ফেলতে, কিন্তু ঐ যে রাজীবের কাছে প্রতিশ্রুতি !

নিচে নেমে আসবার পর যথারীতি একজন বলল, কী রে, নন্দিতার সঙ্গে তোর অত আঠা কিসের রে ? এতক্ষণ ধরে গল্প !

আরেকজন বলল, কোন সুবিধে হবে না। ঠাকুর ফ্যামিলির একটা ছেলে ওদের বাড়িতে খুব যাতায়াত করছে, আমি জানি।

নন্দিতার সঙ্গে রাজুর আলাদা বিশেষ সম্পর্কের কথা অন্য কেউ জানে না। রাজুর মাসতুতো বোন সম্পর্কে দু'-একটা লঘু কথা তো চলতেই পারে।

আর একজন বলল, নন্দিতা আজকাল ভাবি সুন্দর দেখতে হয়েছে রে ! আমার সঙ্গে একদিন বুক ফেয়ারে দেখা। আমাকে বিশেষ পাত্তাই দিল না। বেশ একটা অহংকারী-অহংকারী ভাব !

রাজীব নিঃশব্দে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ঐ দৃষ্টি আমি চিনি। ঈর্ষার নয়, প্রবল ঔৎসুক্যের।

এখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে নন্দিতার প্রসঙ্গ চলবেই। সেটা বেদনাদায়ক হবে রাজীবের পক্ষে। তাই আমি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, আমি চলি, আমার খুব জরুরি কাজ আছে একটা।

কারুকে বাধা দেবার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম রাস্তায়।

সন্ধেবেলা রাজীব ঠিক আমার বাড়িতে এসে হাজির। আমি তখন সবে বেরুতে যাচ্ছিলুম, রাজীবকে দেখে বললুম, চল, কফি হাউসে গিয়ে বসি। অনেক দিন যাওয়া হয়নি।

—কফি হাউসে ? সেখানে তো অনেক চেনা লোক। চল না, ময়দানে গিয়ে বসা যাক।

—কফি হাউসে তো চেনা লোক থাকবেই। তোর দেখা করতে ইচ্ছে করে না ? তুই তো তিন বছর যাসনি !

—হাজীপুরে থাকতে থাকতে আমার কী অভ্যেস হয়ে গেছে, জানিস, বেশি লোকজনের মধ্যে থাকতে ভালো লাগে না। এই কলকাতা শহরেই যেন হাঁপিয়ে উঠছি।

—আবার অভ্যেস হয়ে যাবে।

রাস্তায় বেরিয়ে বাস স্টপে দাঁড়িয়ে আমি জিজ্ঞেস করলুম, কালুদার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

—হ্যাঁ। আমায় দেখে জড়িয়ে ধরে প্রায় কেঁদেই ফেললেন। কালুদা আমাকে প্রায় নিজের ছেলের মতন ভালোবাসেন !

—কালুদা নন্দিতার বোনকে সেতার শেখাতে যান, তুই জানিস ?

—আজই শুনলুম। অনেক কথা হলো কালুদার সঙ্গে।

—তা হলে কোথায় যাব ? কফি হাউস, না ময়দান ?

—তুই বল। গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলে কেমন হয় ? অনেকদিন ফুচকা খাওয়া হয়নি...।

—চল্ নন্দিতাদের বাড়ি যাই।

—নন্দিতাদের বাড়ি ? কেন হঠাৎ ?

—ন্যাকামি করিসনি, রাজু ! তুই আমার কাছে এসেছিস কেন ? নন্দিতার সঙ্গে দুপুরে কী কথা হলো, তা শোনবার জন্য তো ? আমি তোর ঘাড় ধরে নিয়ে যেতে চাই, তুই ওর কাছে ক্ষমা চাইবি, সব মিটে যাবে। এমন ছেলেমানুষী করিস !

—ওর কাছে আমি ক্ষমা চাইব কেন ?

—কারণ, ঝগড়া হলে প্রথমে মেয়েরা ক্ষমা চায় না, ছেলেদেরই চাইতে হয়। এটাই নিয়ম।

—ওর সঙ্গে তো আমার ঝগড়া হয়নি।

—তা হলে কথা বন্ধ হলো কেন ?

—ঐ যে একটা ট্যাক্সি আসছে। ট্যাক্সি নিবি ? অনেকদিন ট্যাক্সি চাপিনি।

—ঐ ট্যাক্সি ড্রাইভার যদি নিতে রাজি হয়, তা হলে বুঝব, তুই বিরাট ভাগ্যবান।

—তা হলে বিশেষ কিছুই বদলায়নি দেখছি।

—ক্রমশই খারাপ হয়ে যাচ্ছে এই শহরটা। তুই তো তিন বছর পরে এলি, তোর চোখে পড়ছে না ? আচ্ছা, রাজু, তুই কি এই তিন বছরে সত্যিই একবারও কলকাতায় আসিসনি ?

—না ! একবার শুধু পুণা গিয়েছিলাম, হীরা বাঈয়ের গান শুনতে।

—আশ্চর্য ! অদ্ভুত !

রাজীবের ভাগ্য খুব খারাপ নয়, কারণ তৃতীয় ট্যাক্সিটি আমাদের নিতে রাজি হলো। রাজীবই নির্দেশ দিল, আমরা গঙ্গার ধারে যাব।

একটা সিগারেট ধরাবার পর আমি বেশ কায়দা করে জিজ্ঞেস করলুম, এটা কি কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো হবে, যদি আমি জিজ্ঞেস করি, রাজীব

ঘোষালের সঙ্গে নন্দিতা চ্যাটার্জির কথা বন্ধ হবার কারণ কী?

রাজীব উদাসীন ভাবে বলল, ওর আলী আকবর খাঁর বাজনা পছন্দ হয় না।

—ব্যস, এইটুকুই?

—ওর মতে বিলায়েৎ খান অনেক উঁচু জাতের শিল্পী, অনেক সিনসিয়ার, আলী আকবর এদেশে থাকেনই না, সাহেবদের খুশি করবার জন্য হালকা করে বাজান...।

—এই সব কথা বলা খুব দোষের? লোকে তো দুজন শিল্পীর তুলনা করতেই পারে। অনেক সময় লোকে হালকা ভাবেও বলে। হয়তো নন্দিতা তোকে রাগিয়ে দিতে চাইছিল...।

—ওর যদি বিলায়েৎ খাঁকে বেশি পছন্দ হয়, তাতে কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু সে জন্য ওস্তাদ আলী আকবর খাঁকে অপমান করার অধিকার ওর নেই। সবাই জানে আলী আকবর কত বড় শিল্পী!

—অর্থাৎ তুই নিজেই কথা বন্ধ করেছিস, তাই না? সত্যি করে বল তো!

—আমি বলেছিলুম, কোন শিল্পী সম্পর্কে যদি কেউ অশ্রদ্ধেয় ভাবে কথা বলে, তা হলে তার সঙ্গে আমার কোন কথা বলতে ইচ্ছে করে না। তখন ও বলেছিল, কারুর যদি ইচ্ছে না করে, তা হলে তার সঙ্গে জোর করে কথা বলার ইচ্ছেও আমার নেই।

—এটাই শেষ সংলাপ? কোথায় হয়েছিল?

—আমাদের বাড়ির ছাদের ঘরে।

আমি যেন দেখতে পেলুম দৃশ্যটা। ছোট ঘরটার মেঝেতে বসে আছে রাজু, আর জানলার কাছে দাঁড়িয়ে নন্দিতা। খুব রাগ হলেও রাজু চেঁচিয়ে কথা বলে না। নন্দিতাও নিশ্চয়ই চ্যাচামেচি করেনি, কাঁদেনি। সেইজন্যই রাজু বলছে, ওটা ঝগড়া নয়।

তারপর তিন বছরেরও বেশি দু'জনের কথার বন্ধ, কেউ কারুকে দেখেনি। একটাও চিঠিপত্র লেখেনি। তবু ওদের পরস্পরের প্রতি টান যে একটুও কমেনি, তা আমি খুব ভালোভাবেই বুঝেছি। দু'জনেই কী সাঙ্ঘাতিক জেদী!

—আচ্ছা, রাজু, আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আলী আকবর না হয় তোর গুরুর গুরু। তাঁর নিন্দে তোর সহ্য হবে না। কিন্তু ওস্তাদ আলিম খাঁ তো তোর গুরু নন! কেউ যদি ওঁর নিন্দে করে, ধর, আমিই যদি বলি, ও লোকটা গাইতে জানে না, তা হলে তুই কী করবি?

—তা হলে, নীলু, তোর সঙ্গেও আমি মেলামেশা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হব। ও রকম ইডিয়েটের মতো কথা কেউ বললে, তার সঙ্গে মিশে আমি সময় নষ্ট করতে যাব কেন? সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক আলিম খাঁ, তিনি আমার গুরু হবেন, এ ভাগ্য নিয়ে আমি জন্মাইনি। কিন্তু গান-বাজনাকে যারা সামান্যও

ভালোবাসে, তাদের সকলেরই উনি এক হিসেবে গুরু। তুই ওঁর মুখে উতরি রেখাব দেওয়া আশাবরী শুনেছিস কখনো? বেশির ভাগ গায়কই তো আশাবরী গাইতে গিয়ে ভৈরবী কিংবা জৌনপুরী মিশিয়ে ফেলে, চড়ি রেখাব এসে যায়। কিংবা তুই খাঁ সাহেবের গলায় মারোয়া শুনেছিস? শুনতে শুনতে তোর মনে হবে, দেবতা বা গন্ধর্ব ছাড়া কোন মানুষের গলা দিয়ে এরকম সুর বেরুনো বুঝি সম্ভব নয়।

রাজীব খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ছে দেখে আমি ওর কাঁধ চাপড়ে বললুম, বাবারে বাবা, তোর সঙ্গে কি একটু ঠাট্টা-ইয়ার্কিও করার উপায় নেই?

—সব ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করলে মানুষের জীবনটাই হালকা আর অর্থহীন হয়ে যায়। সেইজন্যই আমি সীরিয়াসলি ভাবছি, আলিম খাঁ সাবের কাছে আমরা আর যাব কি না। ওঁদের গান দূর থেকে শোনাই ভালো। বেশি মেলামেশা করলে যদি আমরা ওঁকে একজন সাধারণ মানুষ বানিয়ে ফেলি?

—আমি শিল্পীদের সাধারণ মানুষ হিসেবে দেখতেই পছন্দ করি।

—তুই এ পর্যন্ত ওরকম ক'জন বড় শিল্পীকে খুব কাছাকাছি থেকে দেখেছিস?

আমি একটু দমে গেলুম। আলিম খাঁর মতন অত খ্যাতিমান আর কোন মানুষের পাশে বসে গল্প করার সুযোগ আমি এ পর্যন্ত পাইনি। আমাদের বাড়ির পাশে থাকতেন চন্দনদা আর রিনি বৌদি। সেই রিনি বৌদি এখন বোম্বেতে গিয়ে বেশ মাঝারি ধরনের সিনেমার হিরোইন হয়েছেন। কিন্তু রিনি বৌদির নাম এই প্রসঙ্গে করা যায় না।

তবু খানিকটা জেদের সঙ্গে আমি বললুম, সে তুই যাই বল, যত বড় শিল্পীই হোক, তাকে আমি গুরুঠাকুর বানাবার পক্ষপাতী নই। আমি কোনদিন কারুর অন্ধ ভক্ত হতে পারব না!

—নীলু, তুই বাজে কথা বলছিস। এবার আমার মনে পড়েছে। কলেজে তুই স্নেহময়ের সঙ্গে একবার ঝগড়া করেছিলি না? কেন ঝগড়া হয়েছিল? স্নেহময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিন্দে করেছিল। ও বলেছিল, মানিকবাবুর লেখা ও দু' পাতার বেশি পড়তেই পারে না।

—স্নেহময়টা একেবারে গবেট। ও সাহিত্যের কিস্যু বোঝে না।

—তবে? তুই ওর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করিসনি?

—আরে, স্নেহময় তো একটা ছেলে! ছেলেদের সঙ্গে এরকম ছোটখাটো ব্যাপারেও ঝগড়া হতে পারে, তা বলে নন্দিতার মতন একটা চমৎকার মেয়ের সঙ্গে তুই এরকম সামান্য ব্যাপারে কথা বন্ধ করে থাকবি?

—তুই এখনও বলছিস এটা সামান্য ব্যাপার?

গঙ্গার ধারে এসে পড়বার পর রাজীব ট্যাক্সি থামিয়ে ভাড়া মিটিয়ে দিল। রাজীব আজ পরেছে একটা সাদা প্যান্ট আর একটা সুন্দর নীল ডোরাকাটা হাওয়াই শার্ট। গেরুয়া পাঞ্জাবি পরা গ্রামের সেই স্কুল মাস্টারটিকে এখন আর চেনাই যায় না।

প্রথমে গোটা দশেক করে ফুচকা খেয়ে নিয়ে আমরা আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলুম গঙ্গার ধার দিয়ে। অন্ধকার জল চোখের বেশ শান্তি দেয়। এই সব জায়গার ভ্রাম্যমাণ নারী-পুরুষদের মধ্যে বেশ একটা পরিচ্ছন্ন সুখী সুখী ভাব আছে। এই জায়গাটা যেন কলকাতা নয়, বিদেশের কোন রাস্তা।

হঠাৎ রাজীব জিজ্ঞেস করলে, রানী কোথায় রে?

—গোয়া বেড়াতে গেছে। প্রত্যেক বছরই তো ওরা এই সময় কোথাও না কোথাও বেড়াতে যায়।

—তুই যাবি না?

—গোয়া? তোর মাথা খারাপ! অত পয়সা কোথায়?

—দ্যাখ নীলু, আমাদের এখন যা বয়েস, এই সময়ে জীবনের গতি ঠিক করে নিতে হয়। আমরা যা হতে চাই, এখন যদি তা ঠিক না করে ফেলি, সে জন্য সাধনা না করি, তা হলে পরে পস্তাতে হবে। অনেকের এজন্য ফ্রাসট্রেশান এসে যায়।

—সে জন্য এর মধ্যেই কি যথেষ্ট দেরি হয়ে যায়নি?

—তার মানে?

—আমাদের পক্ষে ইহজীবনে আর ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া হবে না। তুই অবশ্য এখনো আই এ এস পরীক্ষার জন্য বসতে পারিস, তোর বয়েস পেরিয়ে যায়নি।

—আমি পেশার কথা বলিনি। আমি বলেছি, জীবনের উদ্দেশ্যের কথা। তোর জীবনের উদ্দেশ্য কী, ভেবেছিস?

—আমার জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই। আমার ইচ্ছে সারা জীবন বাতাসের সঙ্গে ভেসে বেড়ানো।

—ইয়ার্কি করিসনি। আমি তোকে সীরিয়াসলি জিজ্ঞেস করছি।

—তা হলে এক কাজ করলে হয়। আমিও তা হলে রানীর সঙ্গে খুব ঝগড়া করে কোন এঁদো পাড়াগাঁতে স্কুল মাস্টার হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেব, তা হলে তোর মতন সীরিয়াস হতে পারব।

—ফের ইয়ার্কি?

—আমার কথা বাদ দে। রাজু, তুই কী হতে চাস? তোর জীবনের উদ্দেশ্য কী? সঙ্গীতের সাধনা?

—সাধনা কতটা করতে পারব জানি না। তবে, গান-বাজনার মধ্যে ডুবে থাকলেই আমি সব চেয়ে বেশি শান্তি পাই। মনে হচ্ছে এর জন্য আমি সব কিছু ত্যাগ করতে পারি।

—সব কিছু? এমনকি নন্দিতাকেও?

—তুই এর মধ্যে নন্দিতাকে টেনে আনছিস কেন? ও আমার একরকম

আত্মীয় হয়, তার বেশি কিছু তো নয়। দু' দিন বাদে বিয়ে হয়ে কোথায় চলে যাবে, আর কোন সম্পর্কই থাকবে না।

—তা হলে তুই কি নারীবর্জিত জীবন কাটাবি নাকি ? মধুর রস বাদ দিয়েও কি সঙ্গীতের সেই আকর্ষণ থাকে ?...

আমাদের দুই বন্ধুর নিভৃত গূঢ় আলোচনা আর বেশি অগ্রসর হতে পারল না। বিপরীত দিক থেকে আসা চারজন যুবক-যুবতী আমাদের দেখে হৈ হৈ করে উঠল। রমেন, সুজয় আর ওদের দুই বান্ধবী। চেনা লোকদের এড়াবার জন্য রাজীব কফি-হাউসে যেতে চায়নি, কিন্তু চেনা লোক কোথায় নেই ?

রমেনরা আমাদের ছাড়ল না, টেনে নিয়ে গেল রেস্তোরাঁয়। তারপর অন্য গল্প।

ফেরার পথেও আমরা আলাদা হবার সুযোগ পেলুম না। রমেনের গাড়ি আছে, সে আমাদের পৌঁছে দেবেই। রমেন নানারকম মজার গল্প বলতে ভালোবাসে, ওদের সঙ্গের মেয়ে দুটিও খুব হাসে। আমি ওদের সঙ্গে খানিকটা তাল দিয়ে চললেও রাজু আগাগোড়াই প্রায় নিঃসঙ্গ রইল।

সেই সন্ধেবেলা নন্দিতার প্রসঙ্গ নিয়ে কোন মীমাংসা হলো না।

রবীন্দ্র সদনে আলিম খাঁ'র অনুষ্ঠানের দিন রাজীব জেদ ধরে রইল, ও কিছুতেই আলিম খাঁ'র সঙ্গে দেখা করে স্টেজে বসবে না। ও টিকিট কেটে গান শুনবে। সবচেয়ে কম দামি টিকিট পনেরো টাকার। তিরিশটা টাকা শুধু শুধু খরচ করবার কোন মানে হয় ? কিন্তু রাজীব কিছুতেই আমার ওজর-আপত্তিতে কান দিল না।

যেমন হয়, প্রথমে কয়েকজন স্থানীয় শিল্পী, তারপর দু'-তিনজন আমন্ত্রিত শিল্পী, একেবারে শেষে ওস্তাদ আলিম খাঁ সাহেবের গান। এই সব অনুষ্ঠান আমি শেষ পর্যন্ত উপভোগ করতে পারি না। বন্ধ ঘরে বসে পাঁচ ঘণ্টা ধরে একটানা গান-বাজনা শোনা যায় ? একবার গান, তারপর যন্ত্রবাজনা, তারপর নাচ, তবলা লহরা, আবার গান, এক সঙ্গে এত ভালো ভালো জিনিস রাখা যায় মাথার মধ্যে ? সব গুলিয়ে যায় না ? এক সঙ্গে চার পাঁচখানা বই, একবার এটা একবার ওটা পড়া যায় ? আর্ট গ্যালারিতে পাঁচ ঘণ্টা ধরে যারা সব ছবি দেখে নেবার চেষ্টা করে, তারা আসলে কিছুই দেখে না। সাহেবদের দেশে কোন গান-বাজনার অনুষ্ঠান তো পাঁচ-ছ' ঘণ্টা চলে না। কোন এক সাহেব লিখেছে, খুব ভালো জিনিস মানুষের মস্তিষ্ক নাকি একটানা চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বেশি সহ্য করতে পারে না।

ফ্যাশানের বশবর্তী হয়ে কিংবা আগ্রহের আতিশয্যে অনেকে সারা রাত ধরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান শোনে, কিন্তু আমি পারি না। আমার ঘুম এসে যায়। এই সত্যি কথাটা স্বীকার করতে তো লজ্জা নেই।

এবারেও তাই হলো। গোড়ার দিকের নানা রকম গান-বাজনা-নাচানাচির পর

আলিম খাঁ'র অনুষ্ঠান যখন এলো, তখন আমার চোখের পাতা ভারি হয়ে এসেছে। বাইরে গিয়ে বার বার চোখে জল দিয়ে কিংবা সিগারেট টেনেও সেই লক্ষ্মীছাড়া ঘুম তাড়ানো যায় না। ফিরে এসে সীটে বসা মাত্র তন্দ্রা এসে যায়।

চেনাশুনো আর কেউ এসেছে কি না আমি গলা উঁচু করে খোঁজবার চেষ্টা করি। সে রকম কারুকে দেখতে পাই না। অবশ্য আমরা বসেছি অনেক পেছনে। এই সব অনুষ্ঠানে সবাই দারুণ সাজপোশাক করে আসে। কলকাতার লোকদের যে এখনো কত দামি দামি শাল আছে, তা দেখতে পাওয়া যায় শুধু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জলসায়। এক সঙ্গে এত ফর্সা-ফর্সা মেয়েও আর কোথাও দেখা যায় না।

রাজীব তো গান শুনছে না, সারা শরীর দিয়ে যেন সে আলিম খাঁ'র কণ্ঠের সুর শোষণ করছে। মাঝে মাঝে খোঁচা দিয়ে আমায় ডেকে বলছে, নীলু! এই নীলু! এই গমকের কাজটা শুনলি? আর কেউ পারবে?

একবার আমি ঘুমে অনেকখানি ঢুলে পড়তেই রাজীবের নজরে পড়ে গেল। আমি যেন সাঙ্ঘাতিক কোন পাপ করে ফেলেছি, এইভাবে রাজু আমার দিকে তাকিয়ে বললে, নীলু! তুই...

কোন রকমে উঠে বসে চোখ রগড়ে আবার মনোযোগ দেবার চেষ্টা করি। কিন্তু প্রচণ্ড ঘুমের সময় যেমন খিদে নষ্ট হয়ে যায়, সেইরকমই আমার সঙ্গীত-তৃষ্ণা এখন অন্তর্হিত। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, আলিম খাঁ যেন গাইতে গাইতে চোখ দিয়ে কাকে খুঁজছেন। নিশ্চয়ই আমাদেরই। যদিও আমরা বসে আছি হলের একেবারে শেষ দিকে, ওঁর পক্ষে আমাদের দেখতে পাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

একবার আমি ফিসফিস করে রাজীবকে বললুম, আমরা যে খাঁ সাহেবের সঙ্গে একবারও দেখা করলুম না, সেটা কি ভালো হলো? অন্তত খবরটা দেওয়া দরকার যে আমরা এসেছি।

অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে দেখা করব!

কিন্তু ততক্ষণ বসে থাকার ধৈর্য আর আমার নেই। ঘুম আমাকে প্রায় মাতাল করে তুলেছে। এভাবে গানও শোনা যায় না, শুধু শুধু নিজেকে কষ্ট দেওয়া। ঠিক করলুম, এবার কেটে পড়তে হবে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আমি বললুম, আমি একবার যাচ্ছি স্টেজে!

রাজীব আমার হাত ধরে টেনেও থামাতে পারল না, আমি মাঝখানের প্যাসেজ দিয়ে গটগটিয়ে হেঁটে গেলুম স্টেজের দিকে। এবার আলিম খাঁ নিশ্চয়ই আমায় দেখতে পাবেন।

স্টেজের দু' পাশের ছোট্ট সিঁড়ি দিয়ে ফটোগ্রাফার ও কর্মকর্তারা অনেকেই ওঠানামা করছে বারবার। আমিও অম্লানবদনে তাদেরই একজন সেজে নির্ভয়ে উঠে গেলুম ঐ একটা সিঁড়ি দিয়ে।

ওপরে উঠে একবার পেছন ফিরে চোখ বুলোলুম অডিটোরিয়ামের দিকে। অনেকেরই থুতনি ঠেকে গেছে বুকে। প্রথমেই চোখ পড়ল, সামনের চার নম্বর সারিতে বসে আছে নন্দিতা। এক পাশে ওর ছোট বোনকেও চিনতে পারলুম। নন্দিতার আর একপাশে একটা বেশ নায়ক-নায়ক চেহারার যুবক প্রায় নন্দিতার কাঁধে হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

এই কি তা হলে ঠাকুর বাড়ির কোন ছেলে, নন্দিতার নতুন প্রেমিক?

৫

আলিম খাঁ কোন হোটেলে ওঠেননি, উঠেছেন পার্ক সার্কাসের একটি ফ্ল্যাট বাড়িতে। তাঁর কোন ভক্ত তাঁর ব্যবহারের জন্য একটি সুসজ্জিত ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়েছে কিছুদিনের জন্য।

তিনতলার দক্ষিণ খোলা ফ্ল্যাট, জানলায় দাঁড়ালে পার্ক সার্কাস ময়দানের সমস্ত সবুজ দেখা যায়।

আপাতত এই ফ্ল্যাটই আমাদের আড্ডাখানা। রাজীব আর আমি পর পর চারদিন এসেছি এখানে।

আলিম খাঁর আবাস একেবারে মুক্ত-দুয়ার। কত লোক যে আসছে, যাচ্ছে তার ঠিক নেই। কে যে কতজনের জন্য রান্না করে পাঠাচ্ছে, তাও জানি না, কারণ প্রায়ই আমরা নানা রকম ভালো ভালো খাবার পেয়ে যাচ্ছি। কোন রকম আড়াল-আবডাল নেই, খাঁ সাহেবও সবার সঙ্গে বসেই খান।

যারা আসে, তারা প্রায় সবাই তাঁর স্তুতিকারক। তারা একটানা আলিম খাঁর প্রশংসা করে যায়, তিনি বিশেষ কিছু না বলে শুধু মাথা নেড়ে বলেন, হাঁ, হাঁ। শুধু পুরুষ নয়, দলে দলে মহিলারাও আসেন, কেউ কেউ অনেকক্ষণ থাকেন। কলকাতার অনেক নাম করা গায়ক-গায়িকা সেতারী-তবলিয়াকে আমরা দেখবার সুযোগ পেয়ে গেলুম খুব কাছ থেকে।

একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম, খাঁ সাহেব অন্যদের সেলাম বা অভিবাদনের কোন উত্তর দেন না, শুধু ডান হাতটা একটু ওপর দিকে তোলেন। অনেকেই তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কদমবুসি করে, কিন্তু তিনি কখনো আশীর্বাদ করেন না। কেউ কেউ তাঁকে গান শোনায়, তিনি চোখ বুজে শুনে যান, আর বলেন, হাঁ, হাঁ, বেশক! উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন না কারুর। অন্যদের শত অনুরোধেও কিন্তু তিনি নিজে একবারও গলা খোলেন না। কেউ বিশেষ পেড়াপেড়ি করলে তিনি একটা টেপ রেকর্ডার-এর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, উসমে হ্যায়, শুন্ লেও।

দুটি ব্যাপারে আমার খুব খটকা লেগেছে। সকাল-দুপুর-সন্ধেবেলা এসেছি,

কিন্তু আলিম খাঁকে কক্ষনো রিয়াজ করতে শুনিনি। এবং তাঁকে নামাজ পড়তেও দেখিনি। অন্যান্য মুসলমান গায়কদের জীবনীতে পড়েছি, তারা সকলেই খুব ধর্মপ্রাণ। খাঁ সাহেবের আর্দালি নাদের কাছেই একটা মশজিদে নামাজ পড়তে যাবার জন্য ছুটি চাইলে খাঁ সাহেব মাথা হেলিয়ে সম্মতি দেন। কিন্তু নিজে যান না। তিনি খুদা কা মর্জি, খুদা হাফিজ, ইনসাল্লা এইসব কথা প্রায়ই উচ্চারণ করলেও মনে হয় যেন এগুলো কথার লবজ। তাঁর ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে কি না তাতেও সন্দেহ হয়, কারণ, তিনি একদিন হঠাৎ একটা কথা বলেছিলেন, যা কোন আস্তিকের মুখে আশা করা যায় না। তিনি বলেছিলেন, মুঝে উসকি পরওয়া নেহি, উসে মেরি পরওয়া নেহি...। আমি ওঁর পরোয়া করি না, উনিও আমার পরোয়া করেন না। খাঁ সাহেব যেন নিজেই নিজেকে তৈরি করেছেন। এই নিখিল বিশ্বে তিনি একা এবং নিজেই নিজের ঈশ্বর।

আর একদিন তিনি কথা প্রসঙ্গে মীর্জা গালিবের গল্প বলছিলেন। হাতে তখন তাঁর মদের পাত্র। একজন বেশ বয়স্ক বাঙালি তবলচি, যাঁর সঙ্গে আলিম খাঁর দীর্ঘ দিনের পরিচয়, তিনি খানিকটা সস্নেহ ভর্ৎসনার সুরে বললেন, খাঁ সাহেব, এবার ওটা ছাড়ুন। আর কত খাবেন ! একদিন খোদার কাছে তো জবাবদিহি করতে হবে ! তখন আলিম খাঁ বলেছিলেন, মীর্জা গালিবের সেই কথাটা জানো ? একবার একজন বলল, যারা মদ খায়, আল্লা তাদের প্রার্থনা শোনেন না। গালিব তুরন্ত জবাব দিলেন, ভাই, যার মদ আছে, সে আবার কিসের জন্য প্রার্থনা করবে ? বলেই আলিম খাঁ প্রাণখোলা হা-হা অট্টহাস্য করে উঠলেন।

ঘরে সব সময়ই অন্তত আট-দশজন লোক থাকে। অনেকে তাঁর সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হবার জন্য কয়েক ঘণ্টা তাঁর কাছে বসে কাটিয়ে যায়। তাঁর মুখের কথা শুনতে চায়। একজন মহিলাকে প্রায় সর্বক্ষণই দেখি। এঁর নাম প্রমীলা দে সরকার, রাজীব আমায় জানিয়েছিল যে এই মহিলা ইদানীং খেয়াল গেয়ে মোটামুটি নাম করেছেন। বছর পঁয়তিরিশেক বয়েস হবে, একটু ভারী চেহারা, রং বেশ ফর্সা, মুখখানা গোল ধরনের। ইনি আলিম খাঁর শিষ্যা। খাঁ সাহেব এঁর সঙ্গে বেশ নরম সুরে কথা বলেন, ঠাট্টা-ইয়ার্কিও করেন প্রায়ই। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর খাঁ সাহেব যখন পাশের ঘরের বিছানায় একটু বিশ্রাম নিতে যান, তখন এক-একদিন তিনি প্রমীলাকে ডেকে নিয়ে যান তার মাথা টিপে দেবার জন্য। আমার সন্দেহ হয়, বোধহয় এই প্রমীলা দে সরকারকে খাঁ সাহেব বারো নম্বর শাদী করে ফেলবেন !

আমি আর রাজীব অধিকাংশ সময়ই চুপ করে বসে থাকি। কখনো উঠতে চাইলে খাঁ সাহেব হাত তুলে বলেন, আরে, বয়ঠো, বয়ঠো ! বসে থাকতে অবশ্য আমার বেশ ভালোই লাগে। কতরকম মানুষ আসে, কতরকম আলোচনা। এ আমার পক্ষে এক নতুন অভিজ্ঞতা, এত গান-পাগলা মানুষও আছে এ দেশে !

অন্য সকলেই শুধু গান-বাজনা কিংবা গায়কদের গল্প করে। ঘর একটু ফাঁকা হলে আলিম খাঁ আমাদের দু' জনের সঙ্গে মেতে ওঠেন অন্য রকম গল্পে। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাদের ব্যক্তিগত কথা জানতে চান। ছোট গায়কদের শুধু গান-বাজনাই ধ্যান-জ্ঞান, আর এত বড় গায়ক হয়েও আলিম খাঁর কত দিকে কৌতূহল। আমি একবার ট্রেনে বিনা-টিকিটে চাইবাসা গিয়েছিলুম শুনে ওঁর কি শিশুর মতন আনন্দ ! আমার হাত চেপে ধরে বললেন, চলো বেটা, তুমি আমি একদিন বিনা-টিকিটে ডায়মণ্ডহারবার ঘুরে আসি !

শমীম আখতার নামে আর একটি ছেলেও প্রায়ই আসে। ছেলেটি সম্ভবত আমাদেরই সমবয়েসী। ছেলেটির চেহারা যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি যেন গুণের অন্ত নেই। ফুটফুটে গায়ের রং, দীর্ঘকায়, মনে হয় কোন খানদানি বংশের সন্তান, ও উর্দু, বাংলা, মারাঠী আর ইংরেজি এই চার রকম ভাষায় কথা বলে যেতে পারে অনর্গল, আর গান-বাজনা বিষয়ে কথায় ওর মুখে যেন খই ফোটে। ওর জন্ম ইন্দোরে, আলিম খাঁ ওকে বাচ্চা বয়েস থেকে চেনেন। বছর দশেক ধরে ও আছে কলকাতায়, ওর বাবা একজন বড় ব্যবসায়ী। এ সবই আমরা জানতে পেরেছি নানান টুকরো কথাবার্তায়।

প্রথম প্রথম এই শমীমকে বেশ চালিয়াৎ মনে করে আমি আর রাজীব বেশি পাত্তা দিইনি। কিন্তু ও নিজেই গায়ে পড়ে আমাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিল। আসলে ছেলেটি বেশ সরল।

এই শমীমই আমাদের জানাল যে আলিম খাঁর স্বভাবের কয়েকটা অদ্ভুত দিক আছে। মাঝে মাঝে দশ বারো কি পনেরো দিন উনি একেবারে গান-বাজনা থেকে দূরে সরে থাকেন। রিয়াজ করেন না, কেউ হাজার অনুরোধ করলেও গান শোনান না; তখন যেন উনি গায়কই নন। শুধু গল্প-গুজবে সময় কাটান। তারপর হঠাৎ আবার একটা সময় আসে, যখন উনি আর দেখা করেন না কারুর সঙ্গে। দরজা বন্ধ করে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই গলা সাধেন। আবার মাঝে মাঝে ওঁর শখ চাপে একা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর। তখন উনি কোথায় যান, কেউ টের পায় না। এক এক সময় নাকি উনি কোন মেয়েকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান মাসের পর মাস !

আলিম খাঁর বাড়ির আড্ডায় আমি বেশ মজা পেলেও রাজীব একটু মুষড়ে পড়ছিল। ওর ইচ্ছে আলিম খাঁর খালি গলার রিয়াজ শোনার, কিংবা কয়েকটি রাগরাগিণীর আসল রূপ বুঝে নেওয়ার। কিন্তু আলিম খাঁ সেদিক দিয়েই যান না। বরং গতকাল আলিম খাঁর মুখে কয়েকটা কথা শুনে রাজীব বেশ আঘাতই পেয়েছিল। কাল আলিম খাঁ একজন লোকের সঙ্গে স্টিলের দামের ওঠা-পড়া বিষয়ে বেশ সাগ্রহে আলোচনা করছিলেন। বোঝা গিয়েছিল স্টিলের ব্যাবসায় ওঁর বেশ কিছু টাকা লগ্নী করা আছে। বোম্বাইয়ের একটা বেশ বড় ওষুধের দোকানেরও

উনি মালিক। ইন্দোরে ওঁর টাকায় একটা সিনেমা হল তৈরি হচ্ছে।

এইসব কথা শুনে রাজীব আমার দিকে এমন ভাবে তাকিয়েছিল, যার মানে, বলেছিলুম না, মহান শিল্পীদের খুব কাছাকাছি যেতে নেই, তাতে তাঁরা সাধারণ মানুষ হয়ে যান!

শমীমের সঙ্গে বেশ ভাব জমে যাবার পর রাজীব বলল, ভাই বড় আফশোষ রয়ে গেল, খাঁ সাহেবের এত কাছে এসেও ওঁর গলার কাজ কিছু পেলাম না।

শমীম বললো, ঘাবড়াচ্ছ কেন, আমি তোমাদের ঠিক শোনাব। ধীরে বসে যাও, একদম বে-ফিক্‌র থাকো!

বাল্যকাল থেকেই চেনা বলে শমীম বেশ লঘু ভাবে কথা বলতে পারে খাঁ সাহেবের সঙ্গে। ও বেশ অম্লানবদনে মিথ্যে কথাও বলে।

রাত নটার সময় ঘর একটু হালকা হলে শমীম হঠাৎ বলল, খাঁ সাব, কাল জ্ঞানবাবু ভীমসেন যোশীর গানের খুব আদ্‌ত দিচ্ছিলেন। উনি বললেন কী, এমন সুর আর লিয়াকৎ আজকাল খুব ভাগ্যে শোনা যায়!

আলিম খাঁ ভুরু তুলে বললেন, ভীমসেন আচ্ছা?

শমীম বলল, গত শীতে হাফেজ আলি খাঁর নামে যে মস্ত কনফারেন্স হলো কলকাতায়, তাতে আমিও শুনেছি, আহা, ঠিকই বলেছেন জ্ঞানবাবু, এইসান জমজমার বুনানি...

—বটে? আর কী শুনলে?

—খেয়াল গানে এরকম গলার লিয়াকৎ, আর সুরেলা লবজদার তান, কী বলব আপনাকে খাঁ সাব, অপূর্ব বাড়ত-ফিরত্‌, রাগের শকলই যেন আলাইদা...

আলিম খাঁ অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, হাঁ, কলকাত্তায় এখন ভীমসেনের নামে খুব কুদনা-পিটনা হচ্ছে বটে।

স্পষ্টই বোঝা যায়, শমীম খাঁ সাহেবকে খেপিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। কারণ, ইতিমধ্যেই আমরা জেনে গেছি যে আলিম খাঁ সারা ভারতবর্ষের আর কোনো গায়ক বা বাদককে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না। এমনকি আলাউদ্দীন খাঁর সম্পর্কেও উনি ঈষৎ ঠোঁট বাঁকিয়ে বলেছেন, লয় জ্ঞান থোড়া কম্‌ থা!

খাঁ সাহেব এই ধরনের কথা বলার সময় আমি রাজীবের দিকে চোখ টিপি। রাজীবের ধারণা, কোন বড় শিল্পীর নামেই নিন্দে করা উচিত নয়। কিন্তু আলিম খাঁর মতন প্রতিভাবান মানুষ শুধু নিজের তৈরি করা একটা জগতের অধীশ্বর হয়েই থাকতে ভালোবাসেন, সেখানে তাঁর সমকক্ষ অন্য কোন মানুষের স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথও অন্য বাঙালি লেখকদের পিঠ চাপড়ে দিতে ভালোবাসতেন, কথায় কথায় সার্টিফিকেট দিতেন, কিন্তু কারুকেই সত্যিকারের প্রতিভাবান বলে মনে করতেন না।

রবিশঙ্কর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তিনি যদি এক নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত

হন, তাহলে যে দশখানা সঙ্গীতের রেকর্ড নিয়ে যাবেন, তার মধ্যে একটা হবে আলিম খাঁর মারোয়া রাগের খেয়াল। সেই রবিশঙ্কর সম্পর্কেও আলিম খাঁ বলেছিলেন, হাঁ হাঁ, সাহাবলোগ ওর বাজনা খুব পসন্দ করে...আজকাল তো সাহাবলোগই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সবসে আচ্ছা সমঝদার...হা-হা-হা ! আমরা জানি আলিম খাঁ অনেকবার আমন্ত্রণ পেয়েও বিলেত আমেরিকায় যাননি।

এমনকি উনি আলী আকবর খাঁ সম্পর্কেও একদিন বলেছিলেন, ও তো যন্তরই সামাল দিতে জানে না, দশবার তার ছেঁড়ে, ওর বাজনা কি মন দিয়ে শোনা যায় !

এই কথা শুনে আমি খুব মজা পেয়েছিলুম। আলী আকবরের নিন্দে করার জন্য রাজীব নন্দিতার ওপর রাগ করে কথা বন্ধ করেছে। ও কি আলিম খাঁ'র ওপর রাগ করতে পারবে ?

রাজীবের মুখে গাঢ় বেদনার ছায়া পড়েছিল, ও মুখ নিচু করে বসেছিল অনেকক্ষণ।

এবার শমীম বলল, তবে আপনার ঘরের লিহাজের সঙ্গে কার তুলনা ! আপনি পশ্চিমের আফতাব পূবে উঠিয়েছেন। ইন্দোরে থাকতে রিয়াজের সময় আপনার গলায় আমি যে লড়ী আর ঠোকদার তান শুনেছি...এ বেচারিরা শোনেনি।

খাঁ সাহেব নকল রাগের ধমক দিয়ে বললেন, বেটা, তু দিললগি বন্ধ কর ! খাটের নিচে সে বোতল লিয়ে আয় !

প্রায় সারা দিন ধরেই মদ্যপান করলেও আলিম খাঁকে কখনো একটু বেতাল হতে দেখিনি। আমাদের আগে ধারণা ছিল, মদ খেলেই লোকে মাতাল হয় আর হল্লাবাজি শুরু করে। কিন্তু রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলিম খাঁর মুখখানা যেন বেশি ঝকঝকে হয়ে উঠে।

আর কত জায়গায় যে ওঁর মদের বোতল লুকোনো থাকে, তার ঠিক নেই। খাটের নিচে, বালিশের তলায়, বাথরুমে।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ মদ্যপানের পর আলিম খাঁ বললেন, ওহি ভীমসেন তো ভজন গাতা হ্যায়, ভজন ! খ্যায়াল দুসরা চীজ, পাল্লাদার আবাজ আর মরদের মতন তানতরকীবের সমঝদারী করতে পারে কতজন ? উসসে এই পরমিলা অনেক আচ্ছা গানা করে। শুনাও তো পরমিলা !

প্রমীলা দে সরকারকে আমরা প্রমীলাদি বলে ডাকতে শুরু করেছি। ওঁর গান খুব একটা সুবিধের নয়, কিন্তু গানের প্রতি কী ভক্তি ! দিন রাত পড়ে থাকেন এখানে, অথচ উনি বিবাহিতা, একটি ছেলেও আছে।

ভীমসেনের সঙ্গে তুলনায় প্রমীলাদি একেবারে লজ্জায় মাথা নুইয়ে ফেললেন। রাজীব আর শমীম বলল, গান না, প্রমীলাদি, একটা সুর ধরুন।

কিন্তু উনি কিছুতেই গাইতে রাজি হলেন না।

তখন শমীম বলল, আচ্ছা খাঁ সাব, ইমন-এ তীব্র মধ্যমটা কী রকম ভাবে লাগে? আমি একটা গান করছি, ঠিক কিনা দেখেন তো—

শমীম গেয়ে উঠল:

গুরু বিনা কৈসে গুণ গাবে

গুরু না মানে তো গুণ নাহি আবে

গুনীয়ন মে বেগুনী কহাবে।...

শমীমের বেশ তৈরি গলা, ইচ্ছে করে শেষের দিকে একটু ভেঙে দিল। অর্থাৎ সেই পুরোনো কায়দা। ভালো গায়কদের সামনে কেউ বেসুরো গান গাইলে তিনি থাকতে না পেরে নিজে ঠিক সুরটা গেয়ে দেবেন।

আলিম খাঁ মৃদুমন্দ হাসি মুখে শুনলেন শমীমের গান। তারপর বললেন, আরে বাচ্চা, তুই ফিরভি দিল্লগি করছিস? তুই যা শুনালি তার থেকে ইয়ামন কমসে কম এক হাজার মাইল ফারাক!

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আলিম খা বললেন, তব চলো! তুমলোগোকো আচ্ছা গানা শুনাউঙ্গা! আর রাতকা কলকাত্তা ভি দেখাউঙ্গা।

পাশের ঘরে গিয়ে আটপৌরে পোশাক বদলে উনি শেরওয়ানী আর কুর্তা পরে এলেন, মাথায় দিলেন জরির কাজ করা একটা টুপি। যথেষ্ট মদ্যপানের জন্য ওঁর মুখখানা চকচক করছে, বাদামি রঙের চক্ষু দুটি যেন অদ্ভুত কোন মাণিক্য।

তিনি হাঁক দিয়ে বললেন, নাদের এক ট্যাক্সি বোলাও।

তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, চলো! পরমিলা, তুম ঘর যাও।

প্রমীলাদি ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে বললেন, খাঁ সাব, আমি যাব না আপনাদের সঙ্গে? আপনি গান শোনাবেন, আমি বাদ পড়ব?

আলিম খাঁ বললেন, বহোৎ রাত হোয়ে যাবে, তুম ঘর চলে যাও—।

প্রমীলাদি কাতরভাবে মিনতি করলেও আর কথা ফেরালেন না আলিম খাঁ। নাদের ট্যাক্সি ডেকে আনতেই আমরা সবাই নিচে নেমে এলাম। উনি প্রমীলাদিকে বললেন, ট্রামে উঠে পড়তে।

খাঁ সাহেব ট্যাক্সিতে উঠে বসলেন সামনে, ড্রাইভারের পাশে। আমরা তিনজন পেছনে। গাড়ি চলবার আগে উনি কুর্তার পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করে বাঁ হাতে সেটা ড্রাইভারের দিকে বাড়িয়ে বললেন, ই লেও! পহলে চলো সুরেশবাবুকা কোঠি!

সুরেশবাবুকে আমরা চিনি, বেশ নামকরা তবলচি। রবীন্দ্র সদনে উনিই খাঁ সাহেবের সঙ্গে বাজিয়েছেন। সুরেশবাবু থাকেন টালার কাছে, এখন সেই অতদূরে যেতে হবে? এখনই প্রায় দশটা বাজে। বেকার ছেলেদের বেশি রাত করে বাড়ি ফিরলে চলে না। রাজীবেরও বেশ কড়াকড়ি আছে বাড়িতে।

আমি শঙ্কিতভাবে বাজীবেব দিকে তাকালুম। বাজীব মাথা ঝাকিযে বলল, চল না। একদিন দেবি হলে আব কী হবে।

আলিম খা গান শোনাবেন বলেছেন, এতেই ও সব উৎসাহ ফিবে পেযেছে।

পার্ক সার্কাস থেকে টালা যেতে আধঘণ্টা লেগে গেল। সুবেশবাবুব বাড়ি অন্ধকাব। এব মধ্যেই খেযে দেযে শুযে পডেছেন মনে হয। খাঁ সাহেব তবু ট্যাক্সি থেকে নেমে ওপব দিকে চেযে চেচিযে ডাকলেন, সুবেশবাবু। সুবেশবাবু। প্রথমে দোতলাব একটা জানলা দিযে মুখ বাড়িযে রুক্ষ গলায সুবেশবাবু বললেন, কে? তাবপবই আলিম খাকে চিনতে পেবে যেন আকাশ থেকে পডলেন। ধডমড কবে নিচে নেমে এসে আলিম খাঁ-ব হাত জডিযে ধবে বিগলিত ভাবে বলতে লাগলেন, আবে খাঁ সাব, আপনি এত বাতে কি সৌভাগ্য আমাব, ভেতবে আসুন।

খাঁ সাহেব বললেন, না, ভিতবে যাব না। আপ তৈযাব হোকে আইযে। হামলোগা সাথ যেতে হোবে। বিবিজীকে বলে আসন কি বাত হোবে।

ব্যাপাবটা ঠিক ধবতে পাবলুম না। আমবা ভেবেছিলুম, তবলচি নেই বলেই খাঁ সাহেব গান শোনাচ্ছিলেন না, সেই জন্য এখানে এসেছেন। এখনকি উনি সুবেশবাবুকে নিযে যাবেন পাক সার্কাস? ভদ্রলোক তা হলে আব ফিববেন কী কবে?

সুবেশবাবু ধুতি-পাঞ্জাবী পবে, বেবিযে এলেন অল্পক্ষণেব মধ্যে। খাঁ সাহেব তাকে বসালেন পিছনে। তাবপব ট্যাক্সিওযালাব পিঠে হাত বেখে জিজ্ঞেস কবলেন, আভি দাৰু মিলেগা কাহা?

ট্যাক্সিচালকটি খুব একটা বসিক প্রকৃতিব নয মনে হলো। গোমডামুখো বাঙালি। সে বলল, হাম নেহি জানতা।

—ঠিক হ্যায়, চলো, বহুবাজাব চলো—। সুবেশবাবু, সিগ্রেট হ্যায আপনাব পাশ?

সুবেশবাবু সিগাবেটেব একটি প্যাকেট বাডিযে দিলেন।

বৌবাজাব-সেন্ট্রাল এভিনিউযেব মোডেব কাছে এসে খাঁ সাহেব ট্যাক্সি বাখতে বললেন। তাবপব ড্রাইভাবকে নির্দেশ দিলেন, হিযা ঠাব যাও এক-দো ঘণ্টা।

ফুটপাথেব ওপব চোখ বুলিযে উনি কী যেন খুঁজতে খুঁজতে হাঁটতে লাগলেন। বশংবদেব মতন আমবাও ওব পিছু পিছু। এক জাযগায খাটিযা পেতে কযেকজন লোক শুযে আছে। তিনি একটি খাটিযাব সামনে থমকে দাঁডিযে পডে বললেন, এই দেখো, ঠিক এহিখানে। এহি বকম এক খাটিযামে হামি শুযে থাকতোম। আভি দুসরা কোই আলিম খাঁ হিঁযা শো গ্যযা।

সেই খাটিযাব লোকটি অবাক হযে উঠে বসেছে।

আলিম খাঁ লম্বা শরীরটা নিচু করে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেয়া জী, হামাকে চিনতে পার ?

উত্তরের অপেক্ষা না করে তিনি হেসে উঠলেন হা হা শব্দে। তারপর সেই লোকটির পাশে চেপেচুপে বসলেন খাটিয়ার ওপরে। সুরেশবাবুর সিগারেটের প্যাকেটটি তখনও তাঁর হাতে, সেটি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, লেও।

চেহারা, পোশাক ও গ্রীবার ভঙ্গি দেখেই যে-কেউ বুঝবে ইনি একজন বিশিষ্ট মানুষ। এই রকম একজন মানুষ ঘোর রাত্তিরে দলবল নিয়ে এসে রাস্তার একটা খাটিয়ার ওপরে বসে পড়লে একটা তো আলোড়ন হবেই। অন্যান্য খাটিয়া থেকে লোকজন উঠে এসে এখানে জড়ো হলো।

খাঁ সাহেব তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, রামধারী সিংকো তুম লোগ কোই চিনহো ? তিনি আভিতক জিন্দা আছেন ?

একজন জানাল যে রামধারী সিং ছিল তার কাকা, সেই রামধারী সিং মারা গেছে প্রায় দশ বছর আগে।

সেই লোকটিকে কাছে ডেকে আলিম খাঁ তাঁর মাথার ঘ্রাণ নিলেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ, ঠিক সেই গন্ধ, ভাল মানুষের গায়ের গন্ধ ! রামধারী সিং, এই সামনের কোঠির দারোয়ান ছিলেন, কিন্তু তাঁর মনটি ছিল খাঁটি সোনার। পাক্কা পাঁচ বছর তিনি অচেনা-অজানা এক বেহুদা ছোকরাকে রুটি আর ভিণ্ডির ঘ্যাঁট খাইয়েছেন মুফৎসে আর শোওয়ার জায়গা দিয়েছেন। সেই সময় সেই ছোকরা আলিম খাঁ দিনের বেলাতেই ঘুমোত বেশির ভাগ, আর সারা রাত গঙ্গানদীর ধারে বসে গলা সাধত। আহা কী চমৎকার দিন ছিল তখন।

আমরা নীরব শ্রোতা।

একটু পরে রাস্তার মোড়ের একটা বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে আলিম খাঁ আমায় জিজ্ঞেস করলেন যে, ওখানে একটা কচৌরি-জিলাবির দোকান ছিল না? জিলাপির জন্য খুব লালচ্ ছিল তাঁর, পয়সার অভাবে খেতে পারেননি। এখন সেখানে দোকানটা আছে ? তিনি ঐ দোকানের সব কিছু আজ কিনবেন।

একজন জানাল, সে দোকান আর নেই, সে জায়গায় এখন একটা চশমার দোকান হয়েছে।

কুর্তার পকেট থেকে দু'খানা এক শো টাকার নোট বার করে তিনি রামধারী সিং-এর ভাইপোর হাতে দিয়ে বললেন যে, আগামী কাল যেন ওরা সবাই সেই টাকায় খানাপিনা-মজা করে।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তিনি আবার হাঁটতে লাগলেন। ট্যাক্সির দিকে না গিয়ে পার হয়ে গেলেন রাস্তা। দীর্ঘকায় লোকটি বেশ জোরে হাঁটছেন, আমাদের প্রায় দৌড়োতে হচ্ছে।

খানিক হাঁটার পর তিনি একটা বাড়ির সামনে দাঁড়ালেন। এ বাড়ির দরজা খোলা, আলো জ্বলছে ভেতরের প্যাসেজে। সেখানে ঢুকে পড়ে আলিম খাঁ সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন কয়েক ধাপ, তারপর কী ভেবে নেমে এলেন আবার। বাইরে এসে তিনি বাড়িটার দিকে দেখলেন ভালো করে।

সেখানে পরপর চার পাঁচ খানা বাড়িরই সদর দরজা খোলা, ভেতরে দেখা যায় আলোকিত সিঁড়ি।

একেবারে শেষ বাড়িটার কাছে এসে আলিম খাঁ বললেন, হাঁ ইয়ে...হামার সাথ্ সাথ এসো!

শমীমের বোধহয় একটু দ্বিধা হলো, তাই জিজ্ঞেস করল, খাঁ সাব, এটা কার কোঠি?

তিনি উত্তর দিলেন, ইযে কোঠি নেহি, পেঁব। হবেক কিসিমের কোয়েল এখানে থাকে। চলো, দেখাবো।

একতলা জনশূন্য, কিন্তু দোতলা টানা বারান্দার এক পাশে অনেকগুলো ঘর, প্রত্যেক ঘরেই আলো জ্বলছে, নারী-পুরুষের গলার আওয়াজ, হারমোনিয়াম আর ঘুঙুরের শব্দও শুনতে পেলুম। একটি ঘরের দরজার কাছে শুধু শায়া আর কাঁচুলি পরা একজন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা গেলাস।

আমি বা রাজীব ছেলেমানুষ নই। ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের বাড়ির বর্ণনা অনেক পড়েছি। তবু মধ্যবিত্ত সংস্কারে আমার শরীর ছমছম করতে লাগল। আলিম খাঁ আমাদের এ কোন জায়গায় নিয়ে এলেন?

তিনতলাতেও ঐ একই দৃশ্য, আমরা উঠে এলুম চারতলায়। বারান্দায় একেবারে শেষ প্রান্তে একটা বেশ চওড়া মতন দরজা আমাদের মুখোমুখি খোলা। ভেতরে অসম্ভব উজ্জ্বল আলো। সেখানে দাঁড়িয়ে আলিম খাঁ ডাকলেন, রাধা, রাধা!

কোন রমণীর বদলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, লম্বা চুলওয়ালা এক ছোকরা। সে দেখা মাত্র আলিম খাঁকে চিনেছে, একেবারে যেন বিগলিত হয়ে গিয়ে সে কোমর সম্পূর্ণ ঝুঁকিয়ে সেলাম বাজাতে লাগল।

—আলিম খাঁ সাব! আরে বাপ রে বাপ! আইয়ে, আইয়ে, তসরিফ লাইয়ে!

ভেতরে ঢুকে খাঁ সাহেব বললেন, রাধা কোথায়?

—আমি ডাকছি! এখুনি আসবে। আপ বয়ঠিয়ে সাব।

ঘরটি বেশ বড়, প্রায় হলঘরের মতন। এক পাশে একটা তক্তপোষের ওপর পুরু জাজিম পাতা, দেয়ালের গায়ে গায়ে কয়েকটা চেয়ার। এক পাশে একটা কাচের আলমারি, সেটা শুধু কাচের গেলাসে ভর্তি। অন্তত আড়াইশো তিনশো তো বটেই। এর আগে কারুর বাড়িতে আমি এক সঙ্গে অত কাচের গেলাস দেখিনি।

দু'দিকের দেয়ালে ঝুলছে দুটি বাঁধানো ছবি, তার মধ্যে একটি ছবি কার তা আমি তখন বুঝতে পারিনি। পরে জেনেছিলাম, সেটি বৃদ্ধ বয়েসে, শুকনো চেহারার আবদুল করীম খাঁ'র। অন্য ছবিটি দেখা মাত্র চমকে উঠলুম, সেটি স্বয়ং আলিম খাঁর ফটোগ্রাফ। মধ্যযৌবনের তেজস্বী মুখ, যেন এক পুরুষসিংহ।

লম্বা চুলওয়ালা লোকটি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে আমাদের বসবার জন্য অনুরোধ করতে লাগল। কার উদ্দেশ্যে যেন বলল, এ কাল্লু, দো চার কুরসি ঔর ভি তো নিকালো ! পান লাও, আপনারা কী সেবা করবেন ? সরবৎ ?

খাঁ সাহেব দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে বসলেন জাজিমের ওপর। যেন তিনিই এখানকার অধিপতি। সারা ঘরে একবার চোখ বুলোলেন, নিজের ছবিটি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করলেন না। লম্বা চুলওয়ালা ছোকরাটি জিজ্ঞেস কবলেন, তুম্ কওন হো ?

ছেলেটির চেহারা দেখে তাকে আমি উত্তর প্রদেশের মুসলমান ভেবেছিলাম, কিন্তু সে বলল, জী, আমার নাম রতন মিত্র। আমি সামান্য তবলা বাজাই।

খাঁ সাহেব বললেন, বহোৎ দিন বাদ হামি এখানে এসেছি...দশ বারো সাল হোবে...আগে এক বুঢঢা তবলিয়া ছিল...রাধা কোথায় ? রাধাকো বুলাও ! আর গিলাস আর পানি লাগাও, মাল মেরে পাশ হ্যায় !

লম্বা কুর্তার পকেট থেকে খাঁ সাহেব প্রায় ম্যাজিশিয়ানের ভঙ্গিতে এবার বাব করলেন একটি ছোট হুইস্কির বোতল।

রতন মিত্তির জিভ কেটে বলল, নেহি নেহি জী, আপনার কাছে মাফি মাঙছি, আপনি মহামান্য মেহ্‌মান, তবু আপনার এই নোকরের বেয়াদপি মাফ করবেন, ও জিনিস এখানে খাওয়া চলবে না।

খাঁ সাহেব প্রচণ্ড এক হুংকার দিয়ে বললেন, কেয়া ? তু কৌন রে বুরবক্ ! পানি লাগা, তুরন্ত !

তখনই পাশের ঘরে পর্দা সরিয়ে এঘরে এলেন একজন স্ত্রী লোক। পরনে চওড়া লাল পেড়ে সাদা শাড়ি, গোলগাল, মাঝবয়সী, মা-মাসীদের মতন চেহারা।

বাইরের দরজার কাছে আরো কয়েকজন খাঁ সাহেবের হুংকারে আকৃষ্ট হয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। আলিম খাঁ বোতলের ছিপি খুলে নির্জলাই খানিকটা ঢেলেছেন গলায়। তারপর বোতলটা এগিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সুরেশবাবু, চুমুক চালাবেন কি ?

সুরেশবাবু হাত জোড় করে বললেন, না।

মাঝবয়সী স্ত্রীলোকটি এসে আলিম খাঁর দু'পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই তিনি দু'হাত ধরে তাকে তুলে বললেন, রাধা ! মেরি পেয়ারী ! বহোৎ দিন বাদ...কেমুন আছো তুমি ?

আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, ইনি বাধা বাঈ হচ্ছেন। ঠুংরী আর দাদরা খুব ভালো গান করেন।

আমি বেশ খানিকটা নিরাশই হলুম। একে বাঈজী, তারপর নামটাও বাধা, সিনেমার নায়িকার মতন চেহারা হবে আশা করেছিলাম, তার বদলে এই লাল পেড়ে শাড়ি পরা পিসীমা। বাধাদেরও যে বয়েস বাড়ে, তারা এক সময় বুড়ি হয়, একথা ঠিক যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না।

আলিম খাঁ এরপর খানিকটা রাগত স্বরে জানালেন যে তিনি গেলাস আর পানি চাইবার পরও দিতে আপত্তি করে, এমন বেওকুফ ঐ ছোকরাটি কে?

রূপা নম্র স্বরে বলল, খাঁ সাব, আজ থেকে রোজা শুরু হয়েছে, আজও কি আপনার ও জিনিস না খেলে চলে না?

খাঁ সাহেব এবার তার দরাজ গলায় হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, আমি মুসলমান বলে ও রোজার দিন আমায় সরাব পিতে মানা করেছে। মীর্জা গালিবের সেই কহানিটা জানো? সিপাহী গদরের সময় কয়েক বেটা ইংরেজ ঢুকে পড়েছে গালিবের কোঠিতে। মীর্জা তখনও লুকোবার ফুরসৎ পায়নি। এক ইংরেজ মীর্জার গলা চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল, তুমি মুসলমান? গালিব বলল, আধা। মদ খাই, কিন্তু শুয়ার খাই না। হা হা হা হা।

তারপর বোতলে আর এক চুমুক লাগিয়ে বললেন, বয়ঠো। বাধা মেরে পাশ বয়ঠো। হাল হকিকৎ কেমন চলছে, বাতাও।

আলিম খাঁ এসেছেন বলে বাধা বাঈয়ের কিন্তু সে রকম কোন উচ্ছ্বাস নেই। মুখে খানিকটা যেন ঔদাসীন্য বা অভিমানের ছাপ। কথা বলছে এত আস্তে যে আমরা ভালো শুনতেই পাচ্ছি না।

একটা পুরোনো আমলের দেয়াল ঘড়িতে টং করে একটা শব্দ হলো। রাত সাড়ে এগারোটা। আজ বাড়ি ফেরার পর যে কী হবে, তা চিন্তাই করতে পারছি না। বাজীরের যেন ভ্রূক্ষেপই নেই।

শমীম বলল, খাঁ সাব, বাধা বাঈ ভালো গান করেন আপনি বললেন, আমরা একটু শুনতে পাব না?

খাঁ সাহেব বললেন, হাঁ হাঁ। সেই জন্যই তো তুমাদের নিয়ে এসেছি। সুরেশবাবুকে এনেছি সঙ্গত করবেন। বাধা পেয়ারী, সেই হোরি ঠুংরীটা শুনাও তো, খুব মিঠিমিঠি বোল..

বাধা তৎক্ষণাৎ দু' কানে হাত দিয়ে বলল, আরে ছি ছি ছি ছি ছি ছি। রোজার মাস, আপনি আমায় গান গাইতে বলছেন খাঁ সাব। আমি রোজা রাখি, এ সময় গান করা বড় গুনাহ।

খাঁ সাহেব বললেন, বড়ি তাজ্জবকি বাৎ! তুমি রোজা রাখ? কেন, তুমি কি

মুসলমান হয়েছ? রাধা বাঈ, তুমি বিলকুল হিন্দু ছিলে, লছমী দেবীর পূজা করতে...

—হিন্দু এখনো আছি। তা বলে আমার গুরুর ধর্মের সম্মান করব না?

—কে তোমার গুরু? আমিই তো। আমি নিজে রোজা রাখি না।

—আলিম খাঁ সাব, আপনি গুরুর গুরু মহাগুরু, আপনি এই হিন্দুস্থানে সঙ্গীতের বাদশা। আপনাকে গুরু হিসেবে পাব, এমন ভাগ্য করে তো আমি জন্মাইনি। আমার গুরু লখনৌ-এর দদ্দু শেখ। তিনি রোজার সময় কখনো গলা খুলতেন না। আমিও তাই মানি।

দদ্দু শেখের নাম শুনে আলিম খাঁর মুখে যথারীতি অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠল। তারপর হালকা ভাবে বললেন, তুমি দেখছি মহেশ্বর বরবুয়ার মতন কথা বলছ। মহেশ্বর বরবুয়া কিছুদিন নাড়া বাঁধতে গিয়েছিল কুমার গন্ধর্বের কাছে। কুমার খুব ঝাল খান, তাই শুনে মহেশ্বর বলল কি, আমিও খুব ঝাল খাব আর কুমারের মতন নামজাদা গায়ক হব! তারপর সে বেচারা টিয়া পাখির মতন মির্চা খেতে শুরু করল। হে-হে-হে! রাধা বাঈ, আমি তোমার গুরু না হই, এক সময় তোমার সঙ্গে আমার যথেষ্ট দিল-চসপী ছিল। সেই সুবাদে তুমি আমার কথা রাখো, দু'একটা গান শুনাও।

রাধা হাত জোড় করে বলল, আমার গানের কথা বলে কেন লজ্জা দিচ্ছেন, খাঁ সাব। আমি আর কী শিখেছি। কলকাতার আর ক'জনই বা বাঈজী আছে আর কে-ই বা এসবের সমজদার! একবার আপনি মেহেরবানী করে আমায় তালিম দেবেন বলেছিলেন। আসাওরীর শুধু মুখটা শোনালেন...

—আসাওরীর কোন গান?

—আঁখিয়া লাগী রহত নিসদিন...প্যাবে তিহাবে দেখন কাঁহি...শুধু স্থায়ীর দুটো লাইন...তারপর বলেছিলেন পরের দিন এসে অন্তরাটা দেখাবেন। হায় আমার বদ নসীব, আমি নিশিদিন আঁখি মেলে চেয়েই রইলাম, আপনি আর এলেন না, সে যে কত বছর হয়ে গেল!

—রাধা, আমার ফরামোশী উ ঔর গফ্‌লত-এর জন্য তোমার মনে খুব দুঃখ রয়ে গেছে দেখছি। ভুলে যাও ওসব, এবার তো আমি আবার ফিরে এসেছি।

—খাঁ সাব, আমরা মাটির দেবতার পূজা করি। কোনদিন সেই দেবতাকে সশরীরে কাছে পাব, এমন আশা করি না। আপনি আমার সেই দেবতা।

—ওসব কথা ছাড়ো, রাধা! আবার সব জমাও। সুরের সিলসিলায় এ ঘর ভরে দাও! আমি তোমার কাছে আবার বারবার আসব।

—গুরুজী, এখন আর সেই পুরোনো দিন ফিরবে না। জিন্দগী তো শেষ হয়ে এলো প্রায়।

—জিন্দগী তো সব মানুষেরই থাকে। কিন্তু জানদারি থাকে ক'জনের? তোমার আছে সেই জানদারি! হাসো, ফুর্তি করো, তোমার নসিবের নতিজা এখনও বাকি আছে।

রাধা বাঈ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল আলিম খাঁ'র দিকে।

আলিম খাঁ তাঁর কণ্ঠস্বরে সবটুকু ব্যক্তিত্ব আরোপ করে বললেন, রাধা, তুমি গান শুনাবে না? আমি মেহ্মানদের নিয়ে এসেছি।

রাধা বাঈ আস্তে আস্তে দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, আমায় মাফ্ করুন, খাঁ সাহেব। এখন আমি শুধু খদ্দেরের জন্য গান গাই। আপনার মতন গুণীর কাছে গলা খোলার যোগ্যতা আমার নেই।

খাঁ সাহেব এবার খানিকটা রুক্ষ স্বরে বললেন, তুমি রোপেয়া মাঙছো আমার কাছে? ঠিক আছে দেবো টাকা, বন্ধুদের এনেছি, তোমার গান শুনাবার জন্য। গাও?

—আজ রোজার দিন, আজ কেউ লাখ টাকা দিলেও আমি গান গাইব না। আলিম খাঁ'র বেশ আঘাত লেগেছে বোঝা গেল। তিনি ভেবেছিলেন, তার অনুরোধ বা আদেশ অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা কোন রমণীর নেই। কিন্তু পুরোনো প্রেমের প্রসঙ্গ তুলে কিংবা ধমকিয়ে কিংবা টাকার লোভ দেখিয়েও রাধার মতন একজন বউবাজারের বাঈজীর মন ফেরাতে পারলেন না আলিম খাঁ।

রাগত ভাবে তিনি বোতলটায় একটা দীর্ঘ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের বললেন, চলো!

রাধা এবার আলিম খাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, রাগ করে চলে যাচ্ছেন? তা হবে না। আপনি এসেছেন, আমাদের কত বড় ভাগ্য, আমাদের একটু সেবা করার সুযোগ দিয়ে ধন্য হতে দিন।

আলিম খাঁ গম্ভীর ভাবে বললেন, আমি আমার বন্ধুদের গান শুনাতে এখানে এসেছি, রাধা বাঈ। তোমার সঙ্গে দিল্লগি করতে আসিনি।

—গান শুনতে এসেছেন, শোনাব গান। আমার গান তো আপনাকে শোনাবার যোগ্য নয়...আর একটি মেয়ে আছে, সে বেশ গায়, মিরাজ সাহেবের কাছে তালিম নিয়েছে। রতন, এ রতন, ময়নাকে একবার ডাক্ তো!

আলিম খাঁ ও রাধার উত্তর-প্রত্যুত্তরের নাটকীয় দৃশ্যটির সময় দরজার কাছে আরো ভিড় জমেছে। সেখান থেকে একটি তন্বী মেয়ে এগিয়ে এসে বলল, কী বলছ, রাধা দি?

এ মেয়েটি ঠিক সিনেমার নায়িকার মতন না হলেও, বয়েসে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে মনে হয়, একটু ভারী গড়ন, বেশ একটা জমকালো লাল শাড়ি পরা। আঁচলটা টাইট ভাবে কোমরে জড়ান।

রাধা বলল, খাঁ সাব, এর নাম চাঁদিনী, আমি ময়না বলে ডাকি। বড় মধুর গলা। আপনি ইজাজত দিলে ও আপনাকে গান শোনাবে...

তারপর রাধা বাঈ সেই মেয়েটিকে বলল, আরে হতভাগী পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? জানিস ইনি কে ? ইনিই সঙ্গীতের বাদশা আলিম খাঁ। তোর জীবন ধন্য হয়ে গেল, আজ ইনি তোর গান শুনবেন।

মেয়েটি খাঁ সাহেবকে প্রণাম করে লজ্জারুণ মুখে আঁচলের একটা প্রান্ত পাকাতে পাকাতে বলল, আমি এনার সামনে কী করে গান গাইব, দিদি ? ভয়ে যে আমার বুক কাঁপছে ?

আলিম খাঁ বললেন, শরমাইয়ে মত। পিয়াসী লোকেদের পানী দিতে হয়, সেই রকম আপনি আমাকে আর আমার দোস্তদের কিছু সুর শুনান।

মেয়েটি তবু লজ্জায় শরীর মোচড়াচ্ছে দেখে রাধা বাঈ বলল, বোস। সেই কাজরীটা গা। কাল্লু তানপুরা ধরবে, আর এখানে সুরেশবাবুর মতন তবলিয়া এসেছেন, ওঁর সঙ্গে বুঝে সুঝে গাইবি।

জাজিমের ওপর রাখা ডুগি-তবলার দিকে সুরেশবাবু উঠে যাচ্ছিলেন, এমন সময় খাঁ সাহেব বললেন, না, না, সুরেশবাবু বাজাবেন না। ওহি ছোকরে বাজাক, ওর হাতটা দেখি !

আলিম খাঁর সম্মানার্থে সেই চাঁদনী বাঈ আর তার সাথ সঙ্গতিয়ারা সবাই মেঝেতে বসল, তারপর শুরু হলো গান। বেশ জোরালো গলা মেয়েটির—একটু বেশি তীক্ষ্ণ, কিন্তু শুনতে ভালোই লাগছে। মাঝে মাঝে একটু যেন কেঁপে যাচ্ছে, সেটা নিশ্চয়ই অতবড় একজন গায়কের উপস্থিতির জন্য মানসিক চাপের কারণে।

আলিম খাঁ মদের বোতলটা নীচে নামিয়ে রেখে হাত দুটি কোলের ওপর রেখে পদ্মাসনে বসে চোখ বুজে শুনতে লাগলেন।

বোধহয় তিন চার মিনিটও হয়নি গান, তারপরই আলিম খাঁ চোখ খুলে বলে উঠলেন, ওয়াহ্ ওয়াহ্ ওয়াহ। বেশক্ ! বেশক্ !

সদর্পে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি আমাদের প্রতি হুকুম করলেন, অভি ঘর চলো ! বহোৎ রাত হো গ্যয়া !

অর্থাৎ গান তাঁর একেবারেই পছন্দ হয়নি।

কারুর কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

আমরাই বরং একটু কিন্তু কিন্তু ভাবে রাধা বাঈ এবং অন্যান্যদের অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে প্রায় দৌড়াতে লাগলুম আলিম খাঁকে অনুসরণ করবার জন্য।

তিনি ততক্ষণে রাস্তায় নেমে আবার জোর পদক্ষেপে হাঁটতে শুরু করেছেন। বাঙালি ট্যাক্সি ড্রাইভারটি বে-রসিক হলেও অবিশ্বাসী নয়। এখনও সে

অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। এবার সে পোঁ পোঁ হর্ন দিয়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দিল।

গাড়িতে ওঠার পর সেটা চলতে শুরু করতেই আলিম খাঁ নিজের কুর্তার জেব থাবড়ে বললেন, আমার দারুর বোতল!

সেটা তিনি অর্ধ সমাপ্ত অবস্থায় রাধা বাঈয়ের ঘরে ফেলে এসেছেন।

শমীম বলল, গাড়ি ঘুরান। আমি নিয়ে আসছি।

খাঁ সাহেব বললেন, ছোড়দে, ইয়ার! চলো, গঙ্গার ধার চলো।

কিন্তু আমরা কি বাড়ি যাব না? রাত প্রায় সাড়ে বারোটা। রাজীবের বাড়িতে এতক্ষণ হুড়োহুড়ি পড়ে যাবার কথা। কিন্তু কেমন যেন নেশা লেগে গেছে, বাড়ি ফেরার কথা মুখে উচ্চারণও করলুম না। সুরেশবাবুকে প্রায় ঘুম থেকে জাগিয়ে বাড়ি থেকে টেনে আনা হলো, উনিও দিব্যি চুপচাপ রয়েছেন। অবশ্য নানান জলসায় ওঁর সারারাত জাগার অভ্যেস আছে।

উট্রাম ঘাটের কাছে ট্যাক্সি থামান হলো। এত রাত, তবু জায়গাটা জনশূন্য নয়। কয়েকটা আলুকাবলি, চপ ভাজা আর টক-মিষ্টি জলের বোতলওয়ালা রয়েছে, এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা গাড়ি।

আলিম খাঁ নেমে প্রথমে ফুচকার খোঁজ করলেন, ফুচকার নাম উনি বললেন, গোলগাপ্পা। কিন্তু ফুচকা নেই। তখন গরম ঘুগনি খাওয়া হলো বেশ খানিকটা। দারুণ খিদেও পেয়েছিল, আর এ জিনিসটা তো যে-কোন সময়েই খুব সুস্বাদু।

তারপর আলিম খাঁ বাদে সবাই একটা করে ঠাণ্ডা পানীয়। আলিম খাঁ দোকানদারের কানে কানে বললেন, হুয়া বেঞ্চমে বৈঠতা হ্যায়, গিলাস লাগাও। আউর সোডা।

এক জায়গায় গাছের নিচে বাঁধিয়ে গোল করে বেঞ্চ পাতা। আমরা সবাই গিয়ে বসলুম সেখানে। কাছাকাছি আরো দু' একটা বেঞ্চেও বসে আছে কয়েকজন। গঙ্গার বুকে দুটো জাহাজ এত আলো ঝলমল যে মনে হয় দুটি উৎসব বাড়ি। জাহাজে কি সারারাত আলো জ্বেলে রাখে? এত রাতে কখনো গঙ্গার ধারে আসিনি।

ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগছে আমার গায়ে। নিঃশব্দ, জীবন্ত জলের দিকে তাকালেও চোখে বেশ আরাম হয়।

ক'দিন আগেই রাজীব আর আমি এখানে এসে বসেছিলুম। এত তাড়াতাড়ি যে সেখানেই একজন অতি বিখ্যাত পুরুষের সঙ্গে এসে আবার বসব তা কে জানত!

আশ্চর্যের ব্যাপার, আলিম খাঁ কলকাতায় এত সব গুপ্ত ব্যাপার জানলেন কী করে! সেই লোকটা একটা গেলাস সোডার বোতল আর একটি রামের বোতল নিয়ে এলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

খাঁ সাহেব বললেন, রম নেহি, হুইস্কি পিতা হুঁ। এক পাঁইট হুইস্কি লাও!

লোকটি আবার ছুটে গিয়ে নিয়ে এলো অন্য জিনিসটা। গেলাসে সব জিনিস পরিপাটি করে মিশিয়ে এক চুমুক দিয়ে আলিম খাঁ বললেন, কমবখত্!

বুঝলুম, এই উক্তিটি সেই রতন মিত্তির নামে ছোকরা তবলচির উদ্দেশ্যে। রাধা বাঈর ঘরে শেষ পর্যন্ত গেলাস পাননি আলিম খাঁ, যদিও সেখানকার কাচের আলমারিতে অত গেলাস।

আলিম খাঁ'র মেজাজ ঠিক নেই বলে আমরা কেউ কোন কথা বলতে সাহস পাচ্ছি না। এমনকি শমীম, যে বেশ ইয়ার্কির সুরে কথা বলে, সেও একেবারে চুপ। আমরা সবাই নৈশ নদীর রূপ দেখছি।

দুটি সেপাই লাঠি ঠকঠকিয়ে এসে আমাদের পাশে দাঁড়াল। ঠিক যেন গন্ধ শুঁকছে। প্রকাশ্য জায়গায় বসে এরকম মদ্যপান নিশ্চয়ই বে-আইনী, ওরা যদি আমাদের সব্বাইকে ধরে থানায় নিয়ে যায়? তা হলেই সেরেছে, বাড়িতে জানাজানি, কেলেঙ্কারি! শিরশির করতে লাগল আমার শরীর।

আলিম খাঁ কিন্তু একটু ভ্রূক্ষেপও করলেন না, পুলিশ দেখেও লুকোবার চেষ্টা করলেন না হাতের গেলাস। এক দৃষ্টে তিনি চেয়ে আছেন জলের দিকে। শিরদাঁড়া একেবারে সোজা।

আমাদের দলে কোন মেয়ে নেই বলেই বোধহয় সেপাই দু'জন চলে গেল বিনা বাক্যব্যয়ে। বেশি রাতে কোন মেয়ের সঙ্গে এখানে বসলে ওদের বখশিস দিতে হয়।

খানিকবাদে খাঁ সাহেব বলে উঠলেন, আশমান থেকে ঝরে পড়ছে সুর, হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে সুর, এই নদী বহে নিয়ে চলেছে সুর। তোমরা বাচ্চারা কান পেতে শোনো।

তখনই আমার মনে পড়ল, গঙ্গার আর এক নাম সুরধনী।

আলিম খাঁ আবার বললেন, এই নদীর পানিতে তুমি ডুব দাও, তুমি শুনতে পাবে এক সুরের জমজমা। ম্যায় তো বহোৎবার শুনা। পানির নিচে ডুব দিয়ে আমি স-র-গ-ম করেছি সেই সুর তোলার জন্য...কোন মানুষ তা পারে না...পানির ভিতরে অনেক সুর, নহর, তালাও, সমুন্দর, সব রসিলা সুরে ভরা। জমিনকে উপর যখন বরযাত নামে তখন জমিনও সুরে ভরে যায়...তাই তো আমি বলি, ওরে বেচারা আলিম, তুই ভাবিস, তুই খুব বড়ো কলাবন্ত খেয়ালী হয়েছিস, তুই পারিস সমুন্দরের ঢেউ যে আবাজ তোলে তার এক কণা তোর গলায় উঠাতে?

কিছুক্ষণ এই রকম স্বগতোক্তি করতে করতে আলিম খাঁ আমাদের অবাক করে হঠাৎ সুর ধরলেন। ঠিক সমুদ্রের তরঙ্গের মতন।

একটুখানি শুনেই বুঝলুম, আলিম খাঁ দরবারী কানাড়া সাধছেন। আমি যে

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সব সুর শুনেই চিনতে পারি তা নয়। তবে দরবারী কানাড়া চেনা সোজা। তাছাড়া আমি কয়েকটি ক্লাসিকাল নির্ভর রবীন্দ্রসংগীতের রাগরাগিণীর নাম মুখস্থ করে রেখেছি, সেগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে নিই। যেমন, 'এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবি রে...' দরবারী কানাড়া!

রাজীব আর শমীম সম্মোহিত মানুষের মতন এক দৃষ্টে চেয়ে আছে খাঁ সাহেবের দিকে। একথা ঠিক, কনফারেন্সে দূর থেকে শোনা কিংবা রেকর্ডে শোনার সঙ্গে এ অভিজ্ঞতার কোন তুলনাই হয় না। এই যে মানুষটা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে সাধারণ ভাবে কথা বলছিলেন, তাঁরই গলা থেকে বেরুচ্ছে এই অপূর্ব সুরের মূর্ছনা!

সারাদিন ধরে নেশা করা সত্ত্বেও খাঁ সাহেবের কণ্ঠে একটুও খিঁচ নেই। গলা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আমাদেব চার পাশে একটা সুরের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়ে গেল। যৌবনে এই গঙ্গার ধারে বসে রাত্রে গলা সাধতেন, সেই কথা নিশ্চয়ই খাঁ সাহেবের বারবার মনে পড়েছে এখানে এসে, আবার তিনি এই সুরধনী নদীকে নিবেদন করছেন তাঁর সঙ্গীত-অর্ঘ্য।

কিন্তু সেই কলকাতা আর নেই। সেই নদীও এখন অন্যরকম। অকস্মাৎ এই সুরের বাতাবরণ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। একটু দূরের এক বেঞ্চি থেকে খাঁ সাহেবের কণ্ঠস্বরকে ভেঙচিয়ে কয়েকটি লোক চেঁচিয়ে উঠল, অ্যা-অ্যা-অ্যা-অ্যা!

আমরা সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলুম, এই, চুপ! চুপ!

লোকগুলোও পাল্টা ধমকে বলল, চোপ! তারপর তাদের একজন বিকট মাতালের গলায় গেয়ে উঠল, মার কাটারি মেরে জান আ, আঁখিয়া মিলানা মিলানা—

এ যেন সুরলোকে অসুরের উপদ্রব, কিংবা পদ্মবনে মত্ত হস্তী। শমীম দারুণ উত্তেজিত ভাবে বলল, ওদের আমি খুন করব। রাজীবের মতন শান্ত ছেলেও ক্রুদ্ধ ভাবে উঠে দাঁড়িয়েছে।

প্রথম গোলমালের সঙ্গে সঙ্গেই আলিম খাঁ গান থামিয়ে দিয়েছেন। রাজীবের হাত চেপে ধরে উনি শান্ত ভাবে বললেন, যানে দো! উ লোগকো গান করনে দো!

শমীম তবু ছুটে গেল ওদের দিকে। সুতরাং আমিও গেলুম তার সঙ্গে।

শমীম রাগ সামলে হাত জোড় করে অতি কাতর ভাবে বলল, আপনারা দয়া করে চুপ করুন, জানেন উনি কে গাইছেন? উনি আলিম খাঁ!

ওদের একজন শমীমের পেটে হাত দিয়ে খুব জোর ঠেলে দিয়ে বলল, আবে যাঃ।

আর একজন বলল, আলিম খাঁ আবার কোন্ লাটের বাঁট?

ওদের দলে পাঁচ ছ'জন তার মধ্যে দু'জন দাড়িওয়ালা বেশ ষণ্ডামার্কা, সঙ্গে

ছোরাছুরিও থাকতে পারে। ওদের সঙ্গে আমরা মারামারিতে পারব না। কিংবা, মারামারিতে হারি বা জিতি, তারপর তো আর গান শোনা যাবে না!

সুরেশবাবু উঠে এসে আমাদের দু'জনের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, চলুন, ওস্তাদজী আপনাদের ডাকছেন।

অপমান সহ্য করেও আমাদের ফিরে আসতে হলো। খাঁ সাহেব ততক্ষণে হাটতে শুরু করেছেন।

৬

নন্দিতাদের বাড়িতে ঢুকতে প্রথমটা বেশ ভয় হয়। কুকুর আছে। সামনের ছোট বাগানটাতেই ঘুরে বেড়ায় কুকুরটা।

মিনিবাস থেকে নেমে আমি আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলুম ওদের বাড়ির দিকে। বাসে একটা লোক বুট জুতো দিয়ে আমার বাঁ পা'টা প্রায় পিষে দিয়েছে, তাই মেজাজটা একটু খারাপ। যারা বড় চাকরি করে, তাদের শু-মোজা পরে অফিসে যেতে হয়, কেরানিদের চটি, আর আমার মতন বেকারদের বরাবের হাওয়াই।

নন্দিতাদের বাড়ির রান্নার ঠাকুরকে সেই সময় গেট দিয়ে ঢুকতে দেখে আমি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে তাকে ডাকলুম। এর সঙ্গে গল্প করতে করতে বাগানটা পেরিয়ে যাওয়া যাবে।

বেশ পুরোনো আমলের বাড়ি, অনেক দিন বাইরেটা রং-টং করা হয়নি। এ পাড়ায় বাঙালির বাড়ি আর বিশেষ টিকে নেই। এ বাড়িটাও কেনার জন্য মাড়োয়ারীরা অনেক টোপ দিয়েছে নিশ্চয়ই।

নন্দিতা বেশ অবাকই হলো আমাকে দেখে। আমি এর আগে কোনদিনই একা এ বাড়িতে আসিনি। কিন্তু বিস্ময় লুকোতে জানে নন্দিতা। হাসি মুখে বলল, আজ সকালে আমাদের পেয়ারা গাছটায় দেখলুম, একটা ইস্টকুটুম পাখি বসেছে। তখনই মনে হলো, আজ কোন অতিথি আসবে!

আমি বললুম, নিশ্চয়ই কোন বইতে পড়েছিস যে ইস্টকুটুম পাখি দেখলে অতিথি আসে। ইস্টকুটুম পাখি চিনিস! কী রকম দেখতে বল তো?

—ইস্টকুটুম পাখি আমি ভালোই চিনি। কিন্তু কারুর সামনে আমি পরীক্ষা দেওয়া পছন্দ করি না।

—তাহলে অতিথি যখন এসেছে, তার সেবা করবি তো?

—চা না কফি?

—কোনটাই না। আরেকবার তোদের বাড়িতে এসে খুব ভালো সসেজ খেয়েছিলুম। তোদের এ পাড়ায় পাওয়া যায়। সেই রকম সসেজ খাওয়াবি!

—আমি সসেজ মসেজ একদম খাই না। ছোড়দা থাকতে আনত খুব। ছোড়দা সুইডেনে চলে গেছে, জানিস তো?

—তা হলে ক্যাস্পিয়ান সাগরের এক রকম মাছের ডিম খুব বিখ্যাত, সেটা খাওয়াতে পারবি?

—ক্যাভিয়ের? মাছের ডিমের বদলে ঘোড়ার ডিম দিতে পারি।

—যাক গে ওসব, এবার আসল কথাটা বলি।

—তা হলে আসল কথা কিছু একটা আছে, সেই জন্যই আগমন। অর্থাৎ তুই হঠাৎ আসা অতিথি নয়, দূত! কী সংবাদ, দূত?

—না, নন্দিতা দেবী, আমি দূতও নই। আমি স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী। আমার একটা প্রস্তাব আছে। এখন এই বিকেলবেলা নন্দিতা দেবী যদি আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ বেড়াতে যান, তা হলে এ বাড়ির গুরুজনরা কি আপত্তি করবেন?

নন্দিতা ভুরু তুলে বলল, আপত্তির প্রশ্ন পরে. কিন্তু আমি তোর সঙ্গে বেড়াতে যাব কেন?

—আমি এমন কিছু অচ্ছুৎ নই, আমার সঙ্গে কোথাও যাওয়া যায় না? ধর, কোন সিনেমা দেখতে।

—নীলু, মনে হচ্ছে তুই তোর আসল কথাটা এখনো বলিসনি?

—তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে। তোকে নিয়ে আমি বেরুব।

—কোথায়?

—যেখানে আমি নিয়ে যাব...কেন, আমার সঙ্গে যেতে ভয় আছে নাকি কিছু? তুই একটা লাল্টু-মার্কা লোকের সঙ্গে গানের জলসায় যেতে পারিস, আর আমার সঙ্গে বাইরে যেতে ভয়?

—ভয়ের কথা হচ্ছে না, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কে তোকে মাথা গলাতে বলেছে?

—লোকটা তোর কাঁধে মাথা হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছিল।

—বেশ করেছে!

—ওসব ঠাকুর বাড়ির ছেলেই হোক, আর যে বাড়ির ছেলেই হোক, ওদের সঙ্গে তোর ঘোরাঘুরি আমি মোটেই পছন্দ করি না।

—দ্যাখ নীলু, তোর এ ধরনের কথাবার্তাও আমি অত্যন্ত অপছন্দ করছি। আমি কোথায় যাব কিংবা কার সঙ্গে মিশব, তা নিয়ে অন্য কারুর কিছু বলার অধিকার নেই।

—হ্যাঁ, অধিকার আছে!

নন্দিতা দপ করে জ্বলে ওঠার ভঙ্গিতেই উঠে দাঁড়াল। বেশি রেগে গেলে নন্দিতার কোন জ্ঞান থাকে না। এখুনি হয়তো আমাকে পেপার ওয়েট ছুঁড়ে মারবে।

এবার হেসে বললুম, আমি এই কথাই বলতে চাই যে, তুই কোন উটকো লোকের সঙ্গে সারারাতের গানের জলসায় যেতে পারিস, আর আমি কোথাও নিয়ে যেতে চাইলে তুই যাবি না?

—তুই যদি ভেবে থাকিস, তুই আমাকে রাজুদার কাছে নিয়ে যাবি...

—কেন, আমি কি পুরুষমানুষ নই? আমি তোর মতো একটি অ্যাকমপ্লিশড মেয়েব সঙ্গ চাইতে পারি না কিছুক্ষণের জন্য?

—এখানে বসেই তো কথা বলা যায়!

—না, তুই যেতে রাজি থাকিস তো বল, নইলে আমি উঠছি।

—তোর আসল মতলবটা কি খুলে বল তো?

—রাস্তায় না বেরুলে আমি আর কোন কথাই বলব না!

নন্দিতাদের বসবার ঘরটার দেয়ালে নোনা লেগেছে, প্লাসটার উঠে উঠে আসছে গাছের ছাল-বাকলের মতন। একটা স্টাফ করা বাঘের মাথা আটকানো রয়েছে ঠিক দরজার ওপরে। নন্দিতার ঠাকুর্দা শিকারী ছিলেন, বাঘ শিকারের গল্প নিয়ে একটা চটি বইও লিখেছিলেন, আমি পড়েছি। স্পষ্ট দেখা যায়, বাঘটার থুতনিতে উইপোকার বাসা জমেছে। চোখ দুটো কি কাচের, এখনও এত জ্বলজ্বলে?

মেয়েদের পক্ষে চমকপ্রদ রকমের তাড়াতাড়ি সময়ে তৈরি হয়ে এলো নন্দিতা। একটা হালকা নীল রঙের শাড়ি পরেছে। কপালে নীল রঙের টিপ। রাস্তায় বেরিয়ে বাস স্টপে দাঁড়ালুম না, ট্যাক্সিও খুঁজলুম না, হাঁটতে লাগলুম পাশাপাশি।

সাসপেন্স জমিয়ে তোলার জন্য আমি কোন কথা বলছি না দেখে খানিকবাদে নন্দিতা নিজেই জিজ্ঞেস করল, এবার কি আসল কথাটা বলা হবে?

—নন্দিতা, আমি তোকে ভালোবাসি।

থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে গভীর অবাক দৃষ্টিতে দেখল নন্দিতা। শুধু মুখ-চোখ নয়, আমার আপদমস্তক। যেন আমি কোন অচেনা অদ্ভুত প্রাণী।

—তোর মাথায় ভূত চেপেছে বুঝি, নীলু? রানীকে কিন্তু আমি সব বলে দেব।

—আমি রাজীবকেও ভালোবাসি। বাংলা ভাষায় শব্দ সংখ্যা কম, তাই এক সঙ্গে অনেককে ভালোবাসা যায়।

—তখনই বুঝেছিলুম, তুই দূতের কাজ করতে এসেছিস।

—না, তুই কিছুই বুঝিসনি। বিলায়েত খাঁকে ভালো লাগলে যে আলী আকবর কিংবা রবিশঙ্করকেও ভালো লাগা যায়, তা তুই বুঝিস? গান-বাজনার জগতে কি ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান চলে?

—ওসব তুই যাই বলিস, রাজুদাকে আগে ক্ষমা চাইতে হবে। আমি যেচে আর কোনদিন ওর সঙ্গে কথা বলতে যাব না!

—কীরকম ভাবে ক্ষমা চাইতে হবে। হাঁটু গেড়ে বসে?

—আমরা এদিকে কোথায় যাচ্ছি?

—পার্ক সার্কাস ময়দানে।

—মোটেই ওরকম কোন বিচ্ছিরি জায়গায় আমার যাবার ইচ্ছে নেই। তুই আর কোন জায়গা খুঁজে পেলি না। ঐ পার্কে বসা যায়?

—ওখানকার গাছগুলো আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে। ওদের কাছে আমার কথা দেওয়া আছে।

পার্ক সার্কাস মোড়ে এসে ময়দানে ঢোকার বদলে আমি ঘুরে গেলুম ডান দিকে। নন্দিতাকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে আমি চোখের ইঙ্গিতে বললুম, আয় না।

কিন্তু তারপর নির্দিষ্ট বাড়িটির খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে পা বাড়াতেই নন্দিতা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভুরু কুচকে বলল, এটা কার বাড়ি? না, না, আমি কারুর বাড়িতে যাব না!

—কেন, আমার সঙ্গে যেতে তোর ভয় আছে?

—অচেনা কোন লোকেব বাড়িতে আমি যাব কেন?

—অচেনা নয়, গেলেই দেখবি, খুব চেনা।

তবুও দ্বিধান্বিতা নন্দিতার হাত আলতো ভাবে ধরে উঠে এলাম ওপরে। সিঁড়িতেই শুনতে পাচ্ছিলুম সরোদের গম্ভীর শব্দ।

আশ্চর্য ব্যাপার, আজ আলিম খার ঘরে মোটেই ভিড় নেই, শুধু মুগ্ধ চোখ-মুখে বসে আছে শমীম আর রাজীব। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার গভীর নিবিষ্ট ভাবে একটা সরোদ নিয়ে বাজাচ্ছেন আলিম খাঁ।

পরে অবশ্য বুঝেছিলাম যে এতে এমন কিছু বিস্ময়ের নেই। বড় বড় সঙ্গীতগুণীরা যে-কোন যন্ত্রই বাজাতে পারেন। সুরের ওপর দখল যাঁদের ষোলো আনা, যে-কোন মাধ্যমেই তাঁরা ফোটাতে পারেন সেই সুর। বিলায়েৎ খাঁ যদি আসরে বাজনা থামিয়ে মাঝে মাঝে গান গাইতে পারেন, তাহলে আলিম খাঁ-ই বা কেন সরোদ বাজাতে পারবেন না? অমিয়নাথ সান্যালের বইতে পড়েছি, বিখ্যাত খেয়াল-গায়ক কালে খাঁ'র ধারণা ছিল, তাঁর মতো বীনকার আর কেউ নেই! সেইজন্য হাতে সব সময় মেজরাব পরে থাকতেন।

রাজীব বা আলিম খাঁ এই দু'জনের মধ্যে যাকেই দেখে হোক, নন্দিতার মুখের ঘুচিমুচি ভাবটা কেটে গেল। রাজীব আমাদের দেখে যতই চমকে যাক, এখন তো কথা বলার উপায় নেই। নন্দিতাকে নিয়ে আমি বসলুম একপাশে। খাঁ সাহেব

মাথা নিচু করে চোখ বুজে এক মনে বাজিয়ে যাচ্ছেন। তবলচি নেই, উনি আলাপ করে চলেছেন শুধু। দারুণ জোরালো স্ট্রোক। কী রাগ বাজাচ্ছেন চিনতে পারলুম না, মনে মনে খুঁজতে লাগলুম চেনা কোন গান।

সেই রাতে গঙ্গার ধারে সেই বেসুরো ব্যাপারের পর আলিম খাঁ কয়েকদিন বেশ গম্ভীর হয়ে ছিলেন। মাঝখানে দু'দিন আমি আসিনি। কিন্তু রাজীব প্রায় সারাক্ষণই এখানে পড়ে থাকে। ধর্মের টানে কত লোক কত তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে হত্যে দেয় কিংবা গুরুর কাছে জমা দেয় নিজের জীবন। আলিম খাঁ-ও রাজীবের সেই রকম গুরু আর এই ঘরখানা ওর সর্বতীর্থ সার।

হঠাৎ বাজনা থামিয়ে খাঁ সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেয়া, নীল্লু বহোৎদিন তোমাকে দেখিনি। আমাদের মনে দুখ দিয়ে তুমি কোথায় একেলা মজা করছিলে?

আমি হাসতে লাগলুম। বোঝা গেল আজ খাঁ সাহেবের মেজাজ বেশ ভালো আছে।

নন্দিতাকে দেখিয়ে বললুম, খাঁ সাব, এর নাম নন্দিতা। আমাদের বন্ধু। গান-বাজনায় খুব ভালো কান আছে। নিজেও গান গায়।

আলিম খাঁ কৌতুক করে বললেন, তুমহার গারল ফেরেণ্ড?

—আমার নয়, রাজীবের!

উনি এবার দারুণ অবাক হবার ভাণ করে বললেন, হাঁ? রাজীব চুপচাপ থাকে, আমাদের কিছু বলেনি!

নন্দিতা আর রাজীব দু'জনে দু'দিক থেকে আমার প্রতি ভুরুর চাবুক হানল।

খাঁ সাহেব নন্দিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, বেটী, তুমি কী গান করো? রবীন্দর সঙ্গীত? শুনাও তো, এক্‌ঠো শুনাও!

নন্দিতা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, না, না, আমি কী গান শোনাব!

আমি বললুম, খাঁ সাহেব, ও ডাগরজীর কাছে ধ্রুপদের তালিম নিয়েছে।

—বেশক্! শুনাও, কুছ ভি তো শুনাও!

যে-কোন পরিবেশেই হোক লজ্জায় কুঁকড়ে-মুকড়ে যাবার মতো মেয়ে নয় নন্দিতা। সব জায়গাতেই সে বেশ সপ্রতিভ থাকতে পারে।

নন্দিতা বলল, ওস্তাদজী, আমি সেরকম কিছুই গান শিখিনি। এই নীলু সম্পর্কে আপনি একটু সাবধান থাকবেন। ও যা বলে, তা সব বিশ্বাস করবেন না। আমি গান শুনতে ভালোবাসি।

আমি বললুম, খাঁ সাব, ও সরোদ শুনতে বেশি ভালোবাসে। আপনি ওকে বিলায়েৎ খাঁ'র ক্রীতদাসী বলে ধরে নিতে পারেন।

নন্দিতা বেশ রেগে আমার দিকে ফিরে বলল, কী হচ্ছে, নীলু?

তবু আমি বললুম, জানেন, খাঁ সাব, ও বিলায়েৎ ছাড়া আর কারুকে শিল্পী বলেই মনে করে না।

আলিম খাঁ হা-হা করে হাসতে লাগলেন।

কথা ঘোরাবার জন্য নন্দিতা বলল, সেদিন রবীন্দ্র সদনে আমি আপনার প্রোগ্রাম শুনতে গিয়েছিলুম। আপনাকে এত কাছাকাছি দেখার সৌভাগ্য আমার কোনদিন হবে, একথা ভাবতে পারিনি। এই সুযোগ দেবার জন্য নীলুর সব দোষ ক্ষমা করে দেওয়া যায়।

খাঁ সাহেব চোখ বড় বড় করে রাজীবকে বললেন, আরে রাজীব বেটা, তুমি চুপ মেরে বসে আছো? তোমার জিগরি দোস্ত নীলু দেখছি এই খুবসুরৎ লেড়কিকে তোমার কাছ থেকে ছিনকর নিয়ে যাবে। ঝগড়া মানেই যে বেশি ভাব, তা জানো না?

লজ্জায় রাজীবের প্রায় মাটিতে মিশে যাবার মতন অবস্থা।

নন্দিতা বলল, ওস্তাদজী, আপনি যে আমাকে খুবসুরৎ বললেন, এ জন্য আপনাকে এক হাজার বার নমস্কার। এরকম কথা আমাকে কেউ বলেনি আগে। রূপ নিয়ে আমি মাথাও ঘামাই না।

—আরে বেটা, কী বলছ তুমি। তোমার আঁখ দুটো যেন মালকৌষ-এর মধ্যমের মত জগমগ করছে। তোমার জন্য আমার এই দুই দোস্ত ঝগড়া-মারামারি করে না খতম হয়ে যায়!

শমীম বললো, খাঁ সাব, আমায় বাদ দিচ্ছেন কেন? আমার প্রতি বে-ইনসাফি হচ্ছে না?

খাঁ সাহেব বললেন, তু চুপ যা। "ইস ইশককে মখতবমে মিলতা হ্যায় সবখ পহলে। গর বসলকি খবায়িশ হো তো হসতীকো ফনা কর না।"

এর শের-এর অর্থ শমীম বুঝলেও আমাদের মাথায় কিছু ঢুকল না। তবু বোঝার ভাণ করে নীরব রইলুম।

এর পর নন্দিতা এক সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করল। বোধহয় তাকে নিয়ে পুরুষ মানুষদের লড়াইয়ের প্রসঙ্গটা তার পছন্দ হয়নি। ফস করে বলে উঠলেন, ওস্তাদজী, সেদিনের ফাংশানে আপনার গান কিন্তু তেমন ভালো জমেনি। আপনার কি মেজাজ ভালো ছিল না?

আমরা ভয়ে কাঁটা। এই ক'দিনের মেলামেশাতেই বুঝে গেছি যে আলিম খাঁ তাঁর আত্মম্ভরিতায় সুড়সুড়ি দেওয়া পছন্দ করেন, সমালোচনা একদম সহ্য করতে পারেন না।

তক্ষুনি কোন উত্তর না দিয়ে তিনি এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন নন্দিতার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, হাঁ, সেদিনের গান তেমন জমেনি, ম্যায় মানতা

হুঁ। কিন্তু কত খারাপ হয়েছিল? বিলায়েতের বাজনার চেয়ে খারাপ?

খাঁ সাহেবের কথার তীব্র খোঁচাটা ঠিক ধরতে পারল না নন্দিতা। ও আবার বলল, সেদিনে তো বিলায়েৎ খাঁ সাহেবের বাজনা ছিল না, আমরা শুধু আপনার গান শুনবার জন্যই গিয়েছিলাম।

—প্যায়সা উসুল হয়নি বুঝি?

—ওস্তাদজী, এখনকার কোন গায়কের সঙ্গে আপনার তুলনাই হয় না। আমাদের বাড়ির সবাই আপনার গানের নামে পাগল। বাড়িতে গিয়ে যখন বলব, আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না।

—ঐ দিনের গানের কথা কী বলছিলে? তোমার ভালো লাগেনি...তুমি আগে আমার গান কোথায় শুনেছ?

—ঐ প্রথম দিনই আপনাকে দেখলাম আর সামনাসামনি গান শুনলাম। কিন্তু রেকর্ড শুনেছি। তবু আমি বলব, সেদিন আপনি যে মিয়াঁকি মল্লার গাইলেন, তার চেয়ে ঐ গানই আপনার রেকর্ডে অনেক ভালো আছে।

খাঁ সাহেব আমাদের সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন, এ বেটীর কথা শুনে আমি সান্নাটা বনে গেছি! ঠিকই ধরেছে, সেদিন আমার গলার আবাজ তেমন পাল্লাদার ছিল না। শুধু দো নিখাদের কারচোবি আর মেহনত দিয়ে ভুলাবার চেষ্টা করছিলাম। তোমরা তো কেউ সে কথা বলোনি? আর কেউ বলেনি! এ বেটীর সত্যিই কান আছে।

নন্দিতা সরল ভাবে বলল, এখন একটু গান শোনাবেন? আপনার এত সামনে বসে যদি গান শোনবার সৌভাগ্য হয়—

শমীম উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল, খাঁ সাব, এই মেয়েটির কথা আপনি মেনে নিলেন, এখন কুছ্ শেরকি খেল কুছভি হোনে চাহিয়ে, কমসে কম...।

খাঁ সাহেব চোখ বুজলেন। তাহলে সত্যিই উনি গাইবেন নাকি? আমাদের শত অনুরোধেও উনি কর্ণপাত করেননি, এখন একটি মেয়ে ওঁকে বলছে বলেই উনি রাজি হবেন?

নন্দিতা আমায় বলল, নীলু, তুই এত পাজি কেন রে? আগে যদি বলতি যে এখানে আসব, তা হলে টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে আসতুম।

খাঁ সাহেব চোখ মেলে বললেন, আজ হোবে না। তোমার বাড়িতে দাওয়াত দেও, সেখানে গান শুনাব।

—আপনি সত্যিই যাবেন আমাদের বাড়ি?

—মওকা মিলনে পর জরুর যায়ুঙ্গা!

এর পরই এক দঙ্গল লোক এসে গেল ঘরের মধ্যে। তাদের মধ্যে রয়েছেন

ফারুক সাহেব, যিনি এই ফ্ল্যাটটায় থাকতে দিয়েছেন আলিম খাঁকে। তিনি বললেন, একি খাঁ সাব, আপনি এখনো তৈরি হননি ? আমাদের আটটার সময় পৌছবার কথা।

কথাবার্তায় বুঝলুম, গ্র্যাণ্ড হোটেলে আজ আলিম খাঁর সম্মানে একটা বিরাট পার্টি আছে। সেখানে নিয়ে যাবার জন্য ফারুক সাহেবরা এসেছেন।

আলিম খাঁ আমাদের দেখিয়ে বললেন, ইনলোগোকি ভি সাথ্ লে চলো।

ফারুক সাহেব আলগা ভাবে বললেন, হাঁ, হাঁ, যেতে পারে, সবাই যেতে পারে, কোন হরজা নেই। চলুন না, আপনারাও চলুন।

এসব জায়গায় প্রত্যাখ্যান করাই নিয়ম। আলিম খাঁ আরো দু'তিনবার অনুরোধ করলেও আমরা সবাই কাল্পনিক কাজের দোহাই দিলুম। যদিও আমার একটু একটু লোভ হচ্ছিল যাওয়ার, গ্র্যাণ্ড হোটেলের ভেতরটা কোনদিন ঢুকে দেখিনি...

তখুনি বেরিয়ে পড়লুম আমরা। শমীম অন্য দিকে চলে গেল। আমি বললুম, চল, পার্ক সার্কাস ময়দানে গিয়ে একটু বসি। ওখানকার গাছদের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

নন্দিতা বলল, তোমরা যাও। আমি বাড়ি ফিরব, আটটা বেজে গেছে।

আমি বললুম, তুই কি পাগলিরে, নন্দিতা ? খাঁ সাহেবের মুখের ওপর বললি যে ওঁর গান ভালো লাগেনি !

—বাঃ, ভালো না লাগলেও বলতে হবে নাকি !

রাজীব এ পর্যন্ত নন্দিতার সঙ্গে একবারও সবাসরি কথা বলেনি। এবারও সে আপন মনে বলল, আলিম খাঁর গান কোন দিনই খাবাপ হতে পারে না। উনি গলা খুললেই ম্যাজিক হয়ে যায়।

নন্দিতা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ম্যাজিক-ট্যাজিক বুঝি না। গান হচ্ছে ভালো-লাগা মন্দ-লাগার ব্যাপার। সেদিন আমার তেমন ভালো লাগেনি। কেমন যেন জমছিল না—

রাজীব বলল, সেদিন উনি মানুষের গলায় গাইছেন না গলা দিয়ে বিন আর রবাবের আওয়াজ বাব করছেন, তা বোঝাই যাচ্ছিল না। মানুষের পক্ষে যে এরকম সম্ভব...

নন্দিতা বলল, ওস্তাদজী তো নিজেই বললেন, সেদিন ওঁর গলা ভালো ছিল না, তাই না রে নীলু ?

রাজীব বলল, সেটাও ওঁর মহত্ত্ব, উনি ইচ্ছে করে মেনে নিলেন !

নন্দিতা আর রাজীবের মধ্যে এই রকম অপ্রত্যক্ষ উত্তর প্রত্যুত্তর চলছিল, এর মধ্যে আমি একটা গোলমাল করে ফেললুম। আমি রাজীবের পক্ষ নিয়ে একটু

শ্লেষের সঙ্গে নন্দিতাকে বললুম, আজেবাজে লোকের সঙ্গে গেলে এসব গান বাজনা ঠিক মতন উপভোগ করা যায় না। পাশে বসে যদি কেউ ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়—

নন্দিতা যেন দৃষ্টিতে একটা শেল বিঁধিয়ে দিল আমার বুকে। তারপর দৃপ্তভাবে বলল, আমি চললুম!

আমি ওর হাত চেপে ধরে বললুম, দাঁড়া!

রাগে-অভিমানে নন্দিতার মুখখানা অন্যরকম হয়ে গেছে। খুব জোরে হাত ছাড়িয়ে নেবার জন্য ও টানাটানি করতে লাগল। এরকম অবস্থা চললে রাস্তায় ভিড় জমে যাবে। রাত আটটায় পার্ক সার্কাসের মোড়ে এক তরুণীর ওপরে বলপ্রয়োগ!

আমি বোঝাবার চেষ্টা করলুম, নন্দিতা, শোন, শোন, আমি সেরকম কিছু ভেবে বলিনি...

নন্দিতা আর একটিও কথা না বলে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল প্রাণপণে। অগত্যা আমাকে ছেড়ে দিতেই হলো, সঙ্গে সঙ্গে ও হাঁটতে লাগল পেছন ফিরে।

রাজীব মৃদু স্বরে আমাকে বলল, ওরকম বলা তোর উচিত হয়নি, ও খুব আঘাত পেয়েছে।

তাকিয়ে দেখলুম, গাড়ি-ঘোড়ার মাঝখান দিয়ে বেপরোয়ার মতন রাস্তা পার হবার চেষ্টা করছে নন্দিতা।

—রাজু, এখন একমাত্র তুই-ই ওকে আটকাতে পারিস। দৌড়ে যা।

একটু ইতস্তত করে রাজীব ছুটে গেল সেদিকে। নন্দিতা তখন রাস্তা পেরিয়ে ওদিকে গিয়ে একটা রিকশায় উঠে পড়ছে, সেই সময় রাজু গিয়ে ধরে ফেলল ওকে।

দূর থেকে দেখতে লাগলুম, নির্বাক চলচ্চিত্রের মতন হাত-পা নেড়ে অনেক কথা বলছে ওরা দু'জনে।

ব্যাপারটা যে হঠাৎ এরকম দিকে মোড় নেবে, আমি বুঝতেই পারিনি। আমারই ভুলের জন্যই হোক বা যে-জন্যই হোক, পাকা তিন বছর বাদে মুখোমুখি কথা বলছে ওরা দুজন।

যাকে বলে খুশির হিল্লোল, সেরকমই একটা কিছু ছড়িয়ে গেল আমার শরীরে। এখন একটা সিগারেট টানা দরকার। কিন্তু আমার কাছে সিগারেটের প্যাকেটও নেই, বাস ভাড়ার অতিরিক্ত পয়সাও নেই।

ওদের ব্যাঘাত ঘটানো উচিত নয় বলে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম একই জায়গায়। বেশ কয়েক মিনিট রাজীব আর নন্দিতা রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে কথা বলল,

তারপর...যাচ্চলে! আমার কথা একদম ভুলে গিয়ে ওরা হাঁটতে লাগল বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের দিকে।

৭

দিব্যি সুস্থ ছিলাম বাড়িরে ঘুমোবার আগে, সকালবেলা হঠাৎ কোথা থেকে ভাল্লুক জ্বর এলো। রীতিমতন কাঁপুনি এবং সারা গায়ে ব্যথা, ফ্লু কিংবা ডেঙ্গু!

জ্বর হলে আমার বেশ ভালোই লাগে। এমনিতে তো সারা দিন বিছানায় শুয়ে আলস্য করার উপায় নেই। বেকারের পক্ষে সারাদিন বাড়িতে থাকাই এক বিড়ম্বনা। যারা অফিসে কাজ করে, তারা ইচ্ছে করলে দু' তিনদিন ছুটি নিয়ে এক টানা ঘুম মারতে পারে, কিন্তু বেকারের পক্ষে তা সম্ভব নয়। কোন কাজ না থাকলেও তাকে বাড়ির বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয় টো-টো করে। নইলে সকলে ভাবে এ ছেলেটার কাজ খোঁজার কোন উদ্যম নেই।

জ্বর খুব বেশি হলে আরো ভালো। বেশ একটা অর্ধেক তন্দ্রাচ্ছন্ন নেশা নেশা ভাব। তা ছাড়া বাড়ির লোকদের কাছ থেকে খাতিরও পাওয়া যায় বেশি। কপালে জলপট্টি কিংবা মায়ের ব্যাকুল মুখ। তখন বোঝা যায়, আমার জীবনটারও তা হলে কিছুটা মূল্য আছে।

টানা তিনদিন ধরে এক শো চার পাঁচ ডিগ্রি জ্বরে বেশ আনন্দে কাটল। এর মধ্যে রক্ত পরীক্ষা করে জানা গেল যে টাইফয়েড নয়। তাতে একটু নিরাশ হলুম অবশ্য। টাইফয়েড হলে অন্তত দু' তিন সপ্তাহ বিছানায় শুয়ে নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দেওয়া যেত! এসব রোগ-ফোগে তো আজকাল মানুষ মরে না!

পঞ্চম দিনে সিঙি মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে আবার বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলুম আমি। এর মধ্যে রাজীব যে একবারও আমার খোঁজ নিতে আসেনি, সেটাও খুব আনন্দের বিষয়। তাতে এই প্রমাণ হয় যে, রাজীব আর নন্দিতার ছেঁড়া সম্পর্কটা আবার জুড়ে গেছে, এই সময় রাজীবের পক্ষে অন্য ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সময় থাকবে কেন? আলিম খাঁর আড্ডায় আমার অনুপস্থিতি নিশ্চয়ই সবার নজরে পড়বে, আমার বিষয়ে আলোচনা হবে। কোন একটা জায়গায় আমাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, এটা ভাবলেই খুশি খুশি লাগে না? নন্দিতার সঙ্গে এর পর দেখা হলে বেশ প্যাঁচে ফেলা যাবে। জ্বরের কথাটা চেপে গিয়ে বলব, সেদিন তোরা আমার কথা একদম ভুলে গিয়ে ফেলে চলে গেলি, সেইজন্যই তো আমি রাগ করে চার-পাঁচ দিন আসিনি। তখন দেখতে হবে নন্দিতার মুখখানা।

এক জ্বরের জন্য এতগুলো মজা!

সেইদিনই বিকেলের ডাকে নন্দিতার একটা চিঠি পেলুম।

নীলু,

সেদিন বিকেলে তুই যে আমাকে প্রায় জোর করে বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে ওস্তাদ আলিম খাঁ সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলি, সে জন্য তোর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এমন মানুষের দেখা পাওয়া সত্যিই একটা বিরাট সৌভাগ্যের কথা। আমি গান-বাজনা কিছুই বুঝি না, কিন্তু এমন ভাবে সুরের মধ্যে নিমগ্ন মানুষ যে থাকতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। পরদিনও ওঁর কাছে আবার গেছি। এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়ে রইল। ক্যাভিয়ের কোথায় পাওয়া যায় জানি না, তবে এরপর তুই এলে তোকে নিশ্চয়ই একদিন সসেজ খাওয়াবো, তুই যত খেতে পারিস! তুই আসছিস না কেন?

তোর অনেক গুণ থাকলেও এত মেয়েলি কৌতূহল কেন রে? তোর কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য জানাচ্ছি যে ঠাকুর ফ্যামিলির একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া আর কারুকেই আমি প্রত্যক্ষ ভাবে চিনি না। রবীন্দ্র সদনের অনুষ্ঠানে আমি যাঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম, তাঁর পদবী বসুঠাকুর, তিনি আমার জামাইবাবু, আমার পিসতুতো দিদি নীপাদির বর। উনি হাইকোর্টের জজ। তুই সুকুমার রায়ের লেখায় পড়িসনি যে, জজসাহেবেরা চোখ বুজেও জেগে থাকেন?

ইতি
নন্দিতা

এ চিঠিতে রাজীবের কোন উল্লেখ না থাকলেও আমি যেন আগাগোড়াই রাজীবের চিহ্ন দেখতে পেলুম। হয়তো, রাজুই এ চিঠি লিখতে বলেছে নন্দিতাকে। আলিম খাঁর বাড়িতে নন্দিতা নিশ্চয় রাজীবের সঙ্গেই যাচ্ছে।

পরদিন আমার মেজকাকা এসে আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেনই এই সংকল্প জানিয়ে আমায় নিয়ে গেলেন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারের বাড়িতে। যোধপুর পার্কে বেশ শৌখিন বাড়ি। বাংলা সিনেমার নায়িকার বাবার মতন একটা ড্রেসিং গাউন পরে সেই ম্যানেজার ভদ্রলোক সন্ধেবেলা রেকর্ড প্লেয়ারে গান শুনছিলেন। কী অদ্ভুত যোগাযোগ, শোনামাত্র বুঝতে পারলুম, আলিম খাঁর গান!

ভদ্রলোককে আমার বলতে ইচ্ছে হলো, আরে মশাই, আপনি আমায় কী চাকরি দেবেন! জানেন, এই আলিম খাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে? আমার কাঁধে হাত দিয়ে উনি গঙ্গার ধারে হেঁটেছেন। আমাকে দু' এক দিন না দেখলেই উনি জিজ্ঞেস করেন, আরে নীলু, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? আমাদের বাদ দিয়ে তুমি কোথায় একা মজা মারছিলে?

ভদ্রলোক আমাদের খাতির করে বসিয়ে সরবৎ অফার করলেন। নিজে অবশ্য বিলিতি সিরাপ পান করছিলেন। মেজকাকার সঙ্গে আগেই কিছু কথা হয়ে থাকবে, ভদ্রলোক আমার আপাদমস্তক দু' একবার দেখে নিয়েই বললেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে, কোন অসুবিধে নেই. হলদিয়ায় আমাদের একটা নতুন প্লান্ট বসছে, সেখানেই...আর মাস ছয়েক লাগবে...

আমি যে শুধু মেজকাকার মুখরক্ষা করবার জন্যই এসেছি, তা আর বুঝবেন কী করে বেচারি ম্যানেজারবাবুটি। আমাকে কি চাকরি দেওয়া সহজ নাকি ? যা হোক একটা কিছু পেলেই আমি নিয়ে নেব কেন ? আমার নিজস্ব মতামতের দাম নেই ? দেশের সমস্ত বেকার সমাজের পক্ষ থেকে এই আমার প্রতিবাদ, কারুর দয়ায় চাকরি আমি নিই না। অবশ্য একেবারে খেতে না পাওয়ার স্তরে পৌঁছে গেলে কী হতো জানি না। সে অবস্থায় মানুষ অনেক কিছুই করে। হয়তো আমিও এই ম্যানেজারবাবুটির পা জড়িয়ে ধরতুম।

এই সময় আর একজন ভদ্রলোক উপস্থিত হলেন সেখানে। জানা গেল, তিনিও আর একটি কোম্পানির ম্যানেজার। আমাকে আমার মেজকাকার ভাইপো হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো বটে, কিন্তু দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি আমার দিকে বক্রভাবে চাইতে লাগলেন। আমার গায়ে বেকার-বেকার গন্ধ আছে, উনি নিশ্চয়ই শুঁকেই টের পেয়েছেন। বেকারের সামনে এই সব উচ্চাঙ্গের মানুষেরা স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে পারেন না।

মেজকাকা গল্পে জমে গেছেন, আমি উঠে দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে বললুম, আমি তা হলে বাড়ি যাই ?

রাস্তায় বেরুনো মাত্র মনটা গ্লানিতে ভরে গেল। কেউ কোন খারাপ ব্যবহার করেনি, তবু মনে হতে লাগল, এইরকম পরিবেশে এলে আমি যেন দূষিত হয়ে যাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, আর কোনদিন আসব না, তবু আসতে হয়। এই গুরুজনদের নিয়ে আর পারা যায় না ! সরাসরি দরখাস্ত করে চাকরি পাওয়ার দিন শেষ ? চেনাশুনো লোকের সূত্র ধরে খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকে চাকরির জোগাড় করতে হবে ?

মনটা ভালো করবার জন্য, আর কোন দ্বিধা না করে সামনেই একটা মিনিবাস পেয়ে উঠে পড়লুম। সোজা পার্ক সার্কাস।

আজ আলিম খাঁর ঘরে প্রচুর মানুষের ভিড়। একটা কোন জলসা-পার্টি আগামী শনিবার আলিম খাঁকে গাইবার জন্য ঝুলোঝুলি করছে, কিন্তু উনি রাজি নন। ওঁর তবিয়ৎ ভালো নেই, গলাও ভালো নেই।

উপবিষ্ট সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে দেখলুম, রাজীব কিংবা নন্দিতা নেই। তবে প্রমীলাদি আর শমীম এক পাশে বসে গল্প করছে। শমীম আমাকে দেখে

চোখের ইশারায় ডাকল।

ওদের কাছে গিয়ে বসলুম। প্রমীলাদি জানালেন যে রাজীব আর নন্দিতা অনেকক্ষণ ছিল, এই একটু আগে চলে গেল। নন্দিতার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছে। বেশ মেয়েটি। কী সুন্দর পরিষ্কার চোখে তাকায়।

শমীম জিজ্ঞেস করল, তুমি এক হপ্তাভর আসোনি কেন? তোমার কী হয়েছিল?

আমি বললুম, এক সপ্তাহ নয়, পাঁচদিন। এই একটু অন্য কাজে...এর মধ্যে আমি কিছু মিস করে গেছি নাকি? খাঁ সাহেব গান শুনিয়ে ছিলেন?

প্রমীলাদি বললেন, না, ভাই। বলো তো কী দুঃখের কথা! এবারে এতদিন রইলেন, আমায় একদিনও তালিম দিলেন না। তাও না হয় না দিলেন, কিন্তু এক আধদিন কাছে বসে গান শোনারও সুযোগ পেলাম না! খাঁ সাহেবকে এবার যেন কী রকম উদাসীন দেখছি।

শমীম বলল, ঘাবড়াবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি জানি তো, মাঝে মাঝে এরকম হয়, মুড থাকে না, আবার দেখবেন হঠাৎ সব ঠিক হয়ে গেছে...।

প্রমীলাদি ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, কিন্তু উনি তো এই রবিবার ইন্দোর ফিরে যাবেন বলছেন!

শমীম বলল, কোন ঠিক নেই। আবার হয়তো মেজাজ বদল হয়ে যাবে।

খাঁ সাহেব এখনো আমায় দেখতে পাননি। জলসার লোকজন সরে যাবার পর আরো দু' তিনজন ওঁর কাছে গিয়ে বসল। এরা সিনেমা কোম্পানি। কোন একটা বাংলা ফিলমের জন্য এরা আলিম খাঁকে সুরকার হিসেবে চায়। আলিম খাঁ এমন ভাবে দুটো হাত ঝাড়তে লাগলেন যে তিনি ওদের প্রস্তাবটা গ্রাহ্যই করতে চান না। আমরা শুনতে পেলুম, তিনি বলছেন যে, একদম সময় নেই, এখন তিন বছরের মধ্যে তিনি ও সব কাজ করতে পারবেন না।

যতদূর জানি, বছর পনেরো-কুড়ি আগে উনি বোম্বাইতে দুটি হিন্দী ফিলমের সুর দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটা তানসেনের জীবনী। তারপর যে-কোন কারণেই হোক, উনি আর সিনেমার সঙ্গে নিজের নাম জড়াতে চান না। অনেক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিলেত-আমেরিকা থেকে বারবার গান গাইবার আমন্ত্রণ পেয়েও উনি যাননি। রবিশঙ্কর কিংবা আলী আকবরের প্রসঙ্গ উঠলেই উনি বিদ্রূপ করে বলেন, হাঁ, হাঁ! ওরা খুব ভালো বাজায়, সাহেবলোগ তারিফ করে। এই নয়া জমানায় তো ফিরিঙ্গিরাই ভারতীয় মার্গ-সঙ্গীতের আসল সমঝদার।

শমীম আমায় বলল, কাল রাতে খুব জমেছিল। কাল আবার মাঝ রাত্তিরে খাঁ সাহেব শহর ঘুরতে বেরিয়েছিলেন।

—কোথায় গেলেন? আবার সেই গঙ্গার ধারে?

—না, ওখানে না। ওঁর এক চেলা কাল গাড়ি নিয়ে এসেছিল, সেই গাড়ি নিয়ে আমরা চলে গেলাম বেহালা পেরিয়ে সরসুনা। ঐখানে এক বাগান বাড়িতে উনি গান করেছিলেন, সেই জমিদার ওনাকে খুব খাতির আর ইনাম দিয়েছিলেন, উনি বললেন সে জমিদারের সঙ্গে মুলাকাৎ করবেন। গিয়ে শুনলাম, সে জমিদার মরে গেছেন বহুৎ দিন, সেই বাড়িও আধ-ভাঙা, এখন সেখানে মোটর-গ্যারাজ। তারপর আমরা এক খোলা মাঠে বসলুম।

—গান করেননি নিশ্চয়ই?

—তা করেননি। তবে ফেরার সময় বড় আমোদ হয়েছিল। রাজীব ছিল সঙ্গে। খাঁ সাহেব বললেন, চলো রাজীববাবু, নন্দিতাকে জাগাবো। তার সঙ্গে কথা আছে।

আমি চমকে উঠে বললুম, তখন কত রাত?

—সওয়া বারো, সাড়ে বারো হবে। খাঁ সাহেব বহোৎ পিকে একদম মস্ত হয়ে আছেন। রাজীব বলল কি, এখন ডাকা যাবে না। খাঁ সাহেব বললেন, চলো আমি ডাকবো।

—তারপর? নন্দিতাকে ডাকা গেল?

—গেটে ঠেলা দিতেই ইয়া বড়া এক কুত্তা খুব শোর তুলে দিল। আমাদের ডর লাগছিল, কিন্তু খাঁ সাহেব চুঃ চুঃ শব্দ করতে করতে কুত্তাটার দিকে এগিয়ে গিয়ে ওর মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন, সে আর কিচ্ছু বলল না। তারপর আমাদের হাকাহাকি শুনে একজন বড়া মতন মানুষ আগে নেমে এলেন, হাতে এক রাইফেল! হাঃ হাঃ হাঃ।

—নন্দিতার বাবা! তিনি কী বললেন?

—নন্দিতার পিতাজী প্রথমে আমাদের মনে করেছিলেন ডাকু, তারপর রাজীব যেই বলল, ইনি আলিম খাঁ হচ্ছেন, বাস, সিরিফ জাদুর ভেল্কি হয়ে গেল, ভদ্দরলোক একই সঙ্গে হেসে আর কেন্দে বললেন, আই বাপ! আই বাপ! এত্তোবড় গুণী আমার বাড়িতে...আইয়ে, অন্দর আইয়ে, তশরীফ রাখিয়ে...। একটু পরে নন্দিতাও নেমে এলো, খাঁ সাহেব তাকে বললেন, বেটী, তুমি যে তোমার বাড়িতে আমায় দাওয়াত করবে বলেছিলে, কই করলে না তো? আমি ইন্দোর চলে যাব...কবে খানা পিনা হবে, বলো? আমি গান শুনাব...। তুমি ভুলে গেছ সে কথা? দেখ, আমার ঠিক ইয়াদ আছে...।

কল্পনা করলুম দৃশ্যটা। রাত দুপুরে দলবল নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন আলিম খাঁ, নন্দিতার বাবা রাইফেল নিয়ে নেমে এসেছেন। ভাগ্যিস উনি গান-বাজনার খবর রাখেন। এই যদি ওঁর বদলে রাজীবের বাবা ধীরুকাকা হতেন, তিনি আলিম খাঁর নাম শুনে চিনতেও পারতেন না।

শমীমের কাছে শুনলুম বাকি ঘটনার বিবরণ। নন্দিতার বাবা তারপর খুব

খাতির করতে লাগলেন। তিনি বললেন, সত্যিই যদি খাঁ সাহেব একদিন তাঁর বাড়িতে গান শোনাতে আসেন, তিনি ধন্য হয়ে যাবেন। তা হলে তিনি ব্যবস্থা করবেন, বাছাই করা কিছু লোককে ডাকবেন সেদিন। রাজীবের ওপর ভার দিলেন খাঁ সাহেবের সুবিধে মতন দিন ঠিক করে ওঁকে জানানোর।

শমীম আরো বলল যে, এটা আলিম খাঁ'র একটা খেলা। তিনি অন্য কোন লোকের বাড়িতে যান না, দৈবাৎ কখনো গেলেও গান করেন না। কিন্তু কারুর সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা হলেই তিনি বলেন, কী ব্যাপার, আমাকে তোমাদের বাড়িতে একদিনও নেমন্তন্ন করছ না? তোমার বাড়ি গিয়ে একদিন একটু গান শুনাব, তা তুমি চাও না? আবার কেউ সত্যি সত্যি খুব আন্তরিক ভাবে নিমন্ত্রণ করলে উনি বলেন, হাঁ, হাঁ, জরুর যায়ঙ্গা। মওকা মিলনে পর জরুর যায়ঙ্গা। ঐ মওকা মিলনে পর শুনলেই বুঝতে হবে, সে মওকা ওঁর কোনদিন মিলবে না। ওটা এড়িয়ে যাবার কথা।

একটু পরে আলিম খাঁর দৃষ্টি পড়ল আমার ওপর। তখন ঘর অনেকটা ফাঁকা হয়ে এসেছে। উনি প্রত্যাশিত মতনই আমায় বললেন, আরে নীল্লু, দো-তিন হপ্তা তোমার পত্তা নেহি! তুমি কোথা ছিলে আমাদের ফেলে? তোমার সঙ্গে ডায়মণ্ড হারবার যাবার কথা ছিল, তুমি ভুলে গিয়েছ?

আমি মনে করলুম, এটাও নিশ্চয়ই খাঁ সাহেবের একটা খেলা। সুতরাং হাসতে হাসতে বললুম, হ্যাঁ, খাঁ সাব, যাব। যেদিন আপনার মওকা মিলবে...।

কিন্তু তখনই তিনি পরিকল্পনা শুরু করে দিলেন। কবে যাওয়া হবে? আগামীকাল সম্ভব নয়, তাঁর কাছে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসবেন, আগে থেকে ঠিক হয়ে আছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ওঁকে সম্মানিত ডকটরেট দিতে চান, উনি রাজি নন, উনি বলেছেন, আরে আমি পড়ালিখা কিছু জানি না, এখন কালেজের টিপছাপ নিয়ে কী করব? তবু সে লোক নাছোড়বান্দা। সেই প্রস্তাব নিয়ে কাল আবার দেখা করতে চায়। আর আসবে রেকর্ড কোম্পানির লোক।

তবে পর্শু হতে পারে। বেশ সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তে হবে। কী, ঠিক আছে? নীলু, সির্ফ তুমি আর আমি!

শমীম বলল, ওসব চলবে না। আমি যাবই!

আমি বললুম, খাঁ সাব, রাজীব আর নন্দিতা যাবে না? ওরা কি ছাড়বে?

প্রমীলা দে সরকার বললেন, গুরুজী, এরা সব যাবে, আর আমি কি বাদ পড়ব?

আলিম খাঁ উদার ভাবে বললেন, ঠিক আছে, তোমরাও সব চলো। লেকিন, তোমরা যাবে দুসরা কম্পার্টে। নীলু আর আমি তো ফোঁকটসে যাব, বিনা টিকিট,

ধরা পড়লে জেলের দানাপানি খেয়ে আসব দু' চার রোজ।

শেষ পর্যন্ত সত্যি এক সাংঘাতিক মজার ব্যাপার হলো। নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে আমরা সবাই জড়ো হলুম বালিগঞ্জ স্টেশনের সামনে। শমীম, প্রমীলাদি, রাজীব আর নন্দিতাও এসেছে। কিন্তু ওদের আলাদা দল। খাঁ সাহেব হুকুম দিলেন যার যার টিকিট কিনে আনবার জন্য। আমি আর উনি ডব্লু টি। খাঁ সাহেব আমার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে আছেন, চোখে মুখে বেশ একটা উত্তেজনার ভাব। চকিত দৃষ্টিপাত করছেন এদিক ওদিক, যেন আমরা দু'জনে স্মাগলার কিংবা ডাকাতদলের সদস্য।

আমার পরনে সাধারণ পাজামা পাঞ্জাবি, কিন্তু খাঁ সাহেব লক্ষ্ণৌর কাজ করা পাঞ্জাবির ওপরে পরেছেন একটা জরির কাজ করা কুর্তা, মাথায় টুপি। আমাদের এই বিচিত্র যুগলের প্রতি লোকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে।

শিয়ালদা স্টেশনে কড়াকড়ি আছে, সেই তুলনায় বালিগঞ্জ স্টেশনে কিচ্ছু না। রেল লাইন পেরিয়ে প্লাটফর্মে উঠে দাঁড়ালেই হলো, চেকারের নামগন্ধও নেই। ট্রেন আসতেই আমরা উঠে বসলুম, রাজীবরাও খাঁ সাহেবের নির্দেশ অমান্য করে উঠল একই কামরাতে, কিন্তু ওরা সবাই বসল অন্যদিকে। আমি আর খাঁ সাহেব দুটো জানলার পাশে মুখোমুখি। উনি এমন ভাব দেখাতে লাগলেন, যেন রাজীবদের চেনেনই না। আমার সঙ্গেও উনি কথা বলতে লাগলেন নিচু গলায়। যেন ওর বয়েস আমার চেয়েও কমে গেছে, এমনই ছেলেমানুষী চাঞ্চল্য ওঁর শরীরে, প্রতিটি স্টেশান আসবার আগে ব্যগ্রভাবে বাইরে দেখছেন। এক স্টেশান থেকে দু'জন সাধারণ পুলিশ কিংবা সি আর পি উঠল এই কামরায়। খাঁ সাহেব ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে চোখাচোখি করলেন আমার সঙ্গে। যেন ঐ দু'জন আমাদেরই সন্ধানে এসেছে। আগে থেকেই ঠিক করা আছে যে চেকার বা পুলিশ এসে ধরলে আমরা বলব যে আমাদের পকেটমার হয়ে গেছে।

আমি অবশ্য জেলে যাবার ভয় পাচ্ছি না একটুও। সত্যিই চেকার এসে ধরলে খাঁ সাহেবের বিস্তারিত পরিচয় জানিয়ে দেব। এমন লোককে অ্যারেস্ট করলে প্রত্যেক খবরের কাগজে বিরাট খবর হবে। রেলের লোকদের মধ্যেও খাঁ সাহেবের গানের ভক্ত নিশ্চয়ই অনেকে আছে। খাঁ সাহেবের ঘরের আড্ডায় কলকাতা পুলিশের দুজন বড়কর্তাকে বেশ কয়েকবার বসে থাকতে দেখেছি।

একবার এক স্টেশনের প্লাটফর্মে একজন চেকারকে দেখেই খাঁ সাহেব চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সেই চেকারটি আমাদের কামরায় ওঠে কি না তা না দেখেই আলিম খাঁ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো!

আমাদের বসবার জায়গায় দুটো রুমাল চাপা দিয়ে আমরা নেমে পড়লুম। এটাও আগে থেকেই ঠিক করা ছিল যে, চেকার এই কামরায় উঠলেই আমরা

কামরা বদলাব। সেই চেকারবাবুটি একটা আমওয়ালার সঙ্গে একমনে কথা বলছেন। সাধারণত ইলেকট্রিক ট্রেন আধ মিনিটের বেশি থামে না, সিগনাল না পেয়ে এই অজ্ঞাত স্টেশনটিতে কিন্তু আটকে গেল। সিগারেট ধরিয়ে চেকারবাবুটির থেকে অনেক দূরে গিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন খাঁ সাহেব। তাঁর দীর্ঘ দেহটি বহু দূর থেকেই নজরে পড়ে। চেকারবাবুটিও দু' একবার মুখ তুলে দেখলেন তাঁকে।

খাঁ সাহেব ফিসফিস করে আমায় বললেন, উধার মত্‌ দেখো, এইসান ভাব করো কি, আমরা পিলাটফর্মে বেড়াতে এসেছি।

শমীম আর রাজীবও উৎকণ্ঠিত ভাবে কামরার দরজার কাছে এসে আমাদের দেখছে।

আবার ট্রেন ছাড়তেই খাঁ সাহেব আর আমি ছুটে এসে পুরোনো কামরায় উঠে পড়লুম। আলিম খাঁ'র ভাবখানা এই যে, খুব জোর বেঁচে গেছি আমরা। চেকারবাবুটি যদিও সেই আমওয়ালার কাছ ছেড়ে শেষ পর্যন্ত নড়েননি।

ডায়মণ্ড হারবার পৌঁছোবার পর গেট দিয়ে বেরুবার একটা সমস্যা আছে। ট্রেন থেকে নেমেই কাছের একটা বেঞ্চের কাছে গিয়ে উনি বসলেন, চুপচাপ বয়েঠ যাও।

অর্থাৎ একটু পরে প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা হয়ে গেলে আমরা বেরুব, তখন আর কেউ আটকাবে না।

রাজীবরা ব্যাগ-ট্যাগ হাতে নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল, আলিম খাঁ তাদের চোখের ইঙ্গিত করতে লাগলেন, চলে যাও। চলে যাও।

তারপর সেখানে বসে তিনি বেশ নার্ভাস ভঙ্গিতে পরপর তিনটি সিগারেট শেষ করলেন। এখানে বেশ কয়েকজন চেকার ও পুলিশ ঘোরাঘুরি করে বটে, কিন্তু আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না কেউ। ক্রমশ প্ল্যাটফর্ম একেবারে জনশূন্য হয়ে যেতে আমি বললুম, খাঁ সাব এবার চলুন।

উনি বললেন, একটু পরে। ওদিকে দেখো, একটা লোক দেখছে। চুপ সে বয়েঠ যাও।

এক সময় আমরা গেট দিয়ে বেরিয়ে এলুম। আলিম খাঁ যেন ফেটে পড়লেন উল্লাসে। বুক বাজিয়ে বলতে লাগলেন, দেখো, শকা কি নেহি ? তোমরা ভেবেছিলে ধরা পড়ে যাব, না ? এই নীল্লু বহোৎ চালু ছোকরা, আমি আউর বেশি চালু ! ঠিক কিনা ! মানতে হো ?

নন্দিতা আর প্রমীলাদি আগাগোড়াই আড়ষ্ট হয়ে ছিল, তারা এই মজাটা ধরতে পারেনি। ওদের ধারণা টিকিটের দাম তো অতি সামান্য, তা ফাঁকি দেবার কী মানে হয় ? বিনা টিকিটে ট্রেন ভ্রমণের যে থ্রিল, তা শুধু শহুরে সমাজের পুরুষরাই উপভোগ করতে পারে।

যেন বিজয়ীর বেশে আমরা এই শহরটি দখল করতে এসেছি, সেইভাবে এগোলুম। সামনেই সাইকেল রিকশার দঙ্গল, কিন্তু খাঁ সাহেব পয়দলে যেতে চান। চমৎকার মেঘলা দিন, পিকনিকেরই উপযুক্ত বটে। প্রমীলাদি দু'টিফিন কেরিয়ার ভর্তি মাংস-টাংস নিয়ে এসেছেন, আর শমীম এনেছে খাঁ সাহেবের অতি প্রিয় চালগুঁড়োর রুটি।

খাঁ সাহেব প্রমীলাদি আর নন্দিতার কাঁধে হাত দিয়ে আগে আগে চলেছেন। ঐ দুই নারীর চেয়ে তিনি প্রায় এক ফুট বেশি লম্বা, সুতরাং গান্ধীজী নয়, পেছন থেকে ওঁকে দেখাচ্ছে সীমান্ত-গান্ধীর মতন। বাংলার মফঃস্বল শহরে মেয়েদের কাঁধে হাত দিয়ে এরকম ভাবে হাঁটা বোধহয় সম্ভব নয়, কিন্তু ডায়মণ্ড হারবারে এসব ব্যাপারে একটু বেশি লাইসেন্স আছে।

শমীম আমার কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, আমি কিন্তু তোমাদের দুইজনেরও টিকিট কেটে রেখেছিলুম।

আমি আঁৎকে উঠে বললুম, অ্যা?

শমীম মুচকি হেসে পকেট থেকে দুটো ট্রেনের টিকিট বার করে দেখিয়ে বলল, এরকম রিস্ক কি নেওয়া যায়? খা সাহেব মজাক করছিলেন, লেকিন আমাদের তো রেসপন্সিবিলিটি আছে।

আমি বললুম, একথা জানতে পারলে খাঁ সাহেব তোমায় খুন করে ফেলবেন!

টিকিট দুটো রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শমীম বলল, এই যে! আর কোনদিন জানতে পারবেন না!

দেখি যে রাজীবও মিটিমিটি হাসছে, অর্থাৎ সে-ও জানত।

গঙ্গার ধারে এসে খাঁ সাহেব বললেন, বাঃ বাঃ! খুব সুন্দর! এ কি নদী, না সমুন্দর? এ-ত্তো বড় নদী আমি কভি দেখি নি। লছমনঝুলায় আমি গঙ্গা দেখেছি, সেই গঙ্গা এখানে এত্তো বড়!

আমি বললুম, খাঁ সাহেব আপনি তো তাও পদ্মা দেখেননি, সে নদী আরো বড়।

হু হু করা হাওয়ার ঝাপটা লাগছে মুখে, খাঁ সাহেবের বড় বড় চুলগুলো এসে পড়ছে চোখে মুখে, দু' হাত দিয়ে চুল সরাতে সরাতে তিনি বললেন, সমুন্দর কত্তো দূর? চলো, সমুন্দরে যাই!

এই দলের মধ্যে আমিই একমাত্র ভবঘুরে, এসব জায়গা আমার নখদর্পণে। মনে মনে হিসেব করতে লাগলুম, এখান থেকে কাকদ্বীপ, তারপর বাস বদলে নামখানা, তারপর নদী পার হয়ে আবার বাসে ফ্রেজারগঞ্জ হয়ে বক্‌খালি, সেখানে সমুদ্রের ব্যাক ওয়াটার দেখতে পাওয়া যাবে বটে। অথবা এখান থেকেই সরাসরি

নৌকোয়। কোনভাবেই একদিনের মধ্যে ফেরা যাবে না। সঙ্গে মেয়েরা রয়েছে, বাড়িতে খবর না দিয়ে ওদের পক্ষে রাত্রিবাস অসম্ভব।

সে কথা খাঁ সাহেবকে বুঝিয়ে বলতে হলো, উনি খুব একটা প্রসন্ন হলেন না, এমন ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন বলতে চান, তা হলে এই সব মেয়েটেয়েদের ঝামেলা সঙ্গে নিয়ে এলে কেন?

তারপর তিনি আপনমনে বললেন, সমুন্দরের ঢেউ-এর আবাজের ভিতরে যে হলক তান আছে...যদি গলায় কোন দিন উঠাতে পারতাম...শমীম বলল, খাঁ সাব, আপনি তো বহোৎ আচ্ছা সরোদিয়াও বটে, সরোদে কিন্তু এই রকম আবাজ তোলা যায়, আমি শুনেছি।

আলিম খাঁ বললেন, গলায় হয় না? আলবাৎ হয়। ঠিকসে সাধনা করলেই হয়। মিঞা তানসেনের একটা গীত আছে, জানো? "কহত এ তানসেন শুন হো গোপাল লালা, যোহি ধাওয়ে সোহি পাওয়া নাদ ভেদ বিদ্যা জ্ঞান।" আমি সব কাম-কাজ, ফাংসান-মাংসান আগর ফলানা ফলানা ইসব ছুট্টি করে এক বরষ সমুন্দরের পাশে গিয়ে বসে থাকব। যদি সমুনদরকে গলায় আনতে পারি, তবে জানব কি আমার মুসিকের সৈয়দ পুরা হয়েছে।

আমরা গিয়ে একটা সিমেন্টের বেঞ্চে বসলুম। ছুটিব দিন না হলেও বেশ কয়েকজন ভ্রমণার্থী এসেছে আজও। দেখলেই বোঝা যায় এর অনেকেই কলেজ পালানো ছেলেমেয়ে। তারা খাঁ সাহেবকে দেখে যাচ্ছে ঘুরে ফিরে। নিশ্চয়ই কেউ চিনতে পারেনি আলিম খাঁকে। ওঁর পোশাক আর চেহারার বৈশিষ্টেই আকৃষ্ট হয়েছে।

আলিম খাঁ কিন্তু আজ এখন পর্যন্ত মদ্যপানের বাহানা করেননি। নদীর ওপরের বিশাল আকাশের দিকে তাঁর চোখ। বেশ কিছুক্ষণ যেন সেই অবস্থায় ঘোরের মধ্যে রইলেন, আমরাও চুপ করে রইলুম। খাঁ সাহেবের সেই ঘোর ভাঙিয়ে দিল কয়েকটি ডাবওয়ালা এসে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। আমরা ডাবওয়ালাদের তাড়িয়ে দিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু প্রকৃতির পূজারীটির মাথায় ডাব দেখেই বুদ্ধি চাপল। খাঁ সাহেব বললেন, আরে, শমীম, এক পাঁট জিন মাঙওয়াও তো। ডাবের সঙ্গে জিন খুব ভালো যায়।

শমীম আমতা আমতা করে বলল, খাঁ সাব, এখানে বসে তো...এক কাম করব, আমি নীল্লু গিয়ে হিঁয়া যো বড়া হোটেল হ্যায়, সেখানে একটা কামরা বুক করে আসি!

খাঁ সাহেব বললেন, হোটেলের কামরা...কেন?

—যদি হাত মুখ ধুতে হয়...আপনি যদি গোসল করেন...দুফারে যদি একটু বিশ্রাম নিতে ইচ্ছা হয়...

—নেহি, নেহি! কামরা-উমরার কোন জরুরৎ নেই। আমরা একটা বড় পানসী

কিরায়া করে নদীর ওপরে ঘুমবো। দো-দশঠো ডাব লে লেও, জিনের সাথ খুব আচ্ছা হবে।

নন্দিতা বলল, না খাঁ সাব, ওসব খাওয়া চলবে না! আজ আপনি মদ খেতে পারবেন না।

খাঁ সাহেব বিস্মিত ভাবে নন্দিতার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেন?

নন্দিতা বলল, আজ আমরা সঙ্গে রয়েছি...এখানে আপনি ওসব খেলে বিশ্রী দেখাবে...আজ একটা দিন এমনিই বেড়ান না!

প্রমীলাদির সাধ্য নেই খাঁ সাহেবকে এভাবে কথা বলার। কিন্তু নন্দিতা অনেক সাবলীল। বস্তুত, আমরা সকলেই প্রায় রামভক্ত হনুমানের মতন খাঁ সাহেবের সামনে সর্বক্ষণ হাত জোড় করে থাকার ভঙ্গিতে আছি। কিন্তু নন্দিতার ব্যবহার একেবারে স্বাভাবিক।

খাঁ সাহেব বললেন, আরে বেটী, তুই কি আমার শরাব ছাড়িয়ে দিবি নাকি? ছেড়েই তো দিয়েছি, শুধু আজকের এই মেখলা দিনে...“গালিব, ছুটি শরাব পর অবভী কভী কভী / পীতা হুঁ রোজে অবর ও শবে মাহতাব মেঁ...।”

আমি শমীমকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলুম, এর মানে কি গো!

শমীম বলল, এই ধরো, গালিব বলছেন কি, আমি তো মদ খাওয়া ছেড়েই দিয়েছি, তবে কখনো সখনো একটু চেখে দেখি, এই দিনের বেলা মেঘলা আকাশ হলে কিংবা রাত্তিরে চাঁদের আলোয়--।

আলিম খাঁ এক ধমক দিয়ে বললেন, শমীম, যাও তুরন্ত যাও, জিন ইয়া ভদকা লাও।

সরলতার যে তেজ আছে, সেই তেজের সঙ্গে নন্দিতা বলল, না, ও যাবে না। বলছি না, আজ ওসব চলবে না। আশঙ্কা করেছিলুম যে আলিম খাঁ এবার নন্দিতাকেও ধমক দেবেন। উনি মেয়েদের বিশেষ রেয়াৎ করেন না। কিন্তু উনি নন্দিতার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, তুমি আমায় শরাব পীতে দেবে না, তার বদলে কী দেবে?

নন্দিতা হালকা ভাবে বলল, নিন না, এই যে এত বড় আকাশ, এত বড় নদী, এত হাওয়া, এসব পেয়েও আপনার মন ভরছে না?

আলিম খাঁ হা হা করে হেসে উঠলেন চারদিক কাঁপিয়ে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো--।

তাঁর আগ্রহে একটা বড় নৌকো ভাড়া করতেই হলো। শমীম আর প্রমীলাদি সাঁতার জানে না, ওদের বেশ আপত্তি ছিল, কিন্তু আলিম খাঁ তাতে কান দিলেন না একেবারেই।

নৌকো মাঝ নদীতে আসবার পর আমরা খাওয়া দাওয়া সেরে নিলুম। খাঁ সাহেব প্রায় কিছুই খেলেন না, ওঁর একটু মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে মনে হলো। লম্বা হয়ে শুয়ে উনি পা নাচাতে লাগলেন, হাতে জ্বলছে একটার পর একটা সিগারেট।

নন্দিতা বলল, ওস্তাদজী, এখন একটা গান শোনাবেন? শোনান না! এমন চমৎকার পরিবেশ।

সত্যিই এই পরিবেশের তুলনাই হয় না। এখানে খাঁ সাহেবের গানে বিঘ্ন ঘটবারও কোন সম্ভাবনা নেই। আমরা সবাই ব্যগ্র ভাবে খাঁ সাহেবের মুখের দিকে তাকালুম। উনি বললেন, তুম লোগ গাও। নন্দিতা বিটিয়া, তুমি কী গান জানো, শুনাও!

নন্দিতার মনের মধ্যে বোধহয় গান গুণগুণ করতে শুরু করেছে আগে থেকেই। হাসি মুখে ও রাজীবকে জিজ্ঞেস করল, গাইব?

খাঁ সাহেব বললেন, উসকো কিঁউ পুছতা? আমি বলছি, গাও!

নন্দিতা শুরু করল একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত : "গগনে গগনে ডাকে দেয়া, ছায়া ঘনাইছে বনে বনে..."। একটু পরেই প্রমীলাদি যোগ দিলেন ওর সঙ্গে।

খাঁ সাহেব ধড়মড় করে উঠে বসে প্রমীলাদিকে বললেন, তুম চুপ যাও, ও একেলা গাইবে।

আমাদের বাঙালিদের স্বভাব, খোলা জায়গায় কেউ চেনা গান গাইলে অন্যরাও গলা মেলায়। খাঁ সাহেব কেন প্রমীলাদিকে বারণ করলেন বুঝলাম না। প্রমীলাদি ওঁর ছাত্রী হয়েও রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে বলে?

নন্দিতার গান শেষ হবার পর আলিম খাঁ শুকনো ভাবে বাহ্‌বা দিলেন। তারপর মাঝিদের জিজ্ঞেস করলেন, তুম লোগ গান জানো না? শুনাও তো।

মাঝিরা লাজুক ভাবে এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। বেশ কয়েকবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাদের মুখে কোন শব্দ নেই। আমরা সিনেমায় দেখি বটে, যে নৌকোর মাঝি মাত্রই ভাটিয়ালি গান জানে। কিন্তু আমি অনেক জায়গায় নৌকোতে চেপেছি, কোন মাঝিকেই সে রকম গান গাইতে শুনিনি। বড় জোর দু'এক জনের মুখে শুনেছি হিন্দী সিনেমার গানের কলি।

মাঝিদের গান আমি নিজে দু'একটা জানি বটে, কিন্তু আমার যা বেসুরো গলা, এই সুরসম্রাটের সামনে সে গলা খুলি কী করে? নন্দিতার সাহস আছে বটে!

ফেরার পথে একটা মজার ব্যাপার হলো। আমরা হেঁটে হেঁটে চলে এসেছি রেল স্টেশনের দিকে। মনে মনে ভাবছি যে ডায়মণ্ড হারবারের লোকেদের কী দুর্ভাগ্য যে তারা জানতেও পারল না, আজ কে এসেছিলেন এখানে! একজনও আলিম খাঁকে চিনতে পারেনি, তারা কেউ এসে কথা বলেনি ওঁর সঙ্গে। অথচ

নিশ্চয়ই এখানে অনেক বাড়িতে ওঁর গানের রেকর্ড আছে।

এমন সময় রাজীব রাস্তার পাশে একটা সাইন বোর্ড দেখাল। দেখে তো আমি তাজ্জব। 'ওস্তাদ আলিম খা সঙ্গীত চক্র।' খাঁ সাহেব বাংলা পড়তে পারেন না, আমরা সবাই থেমে গিয়ে ওকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলুম। উনিও দারুণ অবাক। বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, সাচ মুচ বলছ ? এই জায়গায় ? আমার নামে ? চলো দেখি !

একটা বাড়ির দোতলায় সেই সাইন বোর্ড। আমরা দরজা খোলা পেয়ে উঠে গেলুম ওপরে। সেটা প্রকৃতপক্ষে একটা গানের স্কুল। কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে অসীম উৎসাহে সরগম শেখাচ্ছেন একজন মাঝবয়েসী ভদ্রলোক। একদিকে দেয়ালে ঝুলছে আলিম খাঁর একটা বাঁধানো ছবি, ঠিক যে ছবিটা আমরা দেখেছিলাম রাধা বাঈ-এর ঘরে।

আমরা সবাই গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়ালুম।

গলা সাধা বন্ধ রেখে সেই মাঝবয়েসী লোকটি উঠে এসে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই ?

দেয়ালে ছবি টাঙানো থাকলেও লোকটি চোখের সামনে জলজ্যান্ত আলিম খাঁকে দেখেও চিনতে পারছে না। বেশ কিছুদিন পরে হয়তো লোকটি এই দৃশ্যটি আবার স্বপ্নে দেখে চমকে উঠবে।

৮

কাল আলিম খাঁ চলে যাবেন। প্রথমে বোম্বে, সেখান থেকে ইন্দোর। দিবাসে ওর বাড়ি, সেখানে উনি এখন একটানা অনেক দিন থাকবেন। আমাদের সবাইকে বারবার নেমন্তন্ন করেছেন সেখানে যাবার জন্য।

এখানকার এই আড্ডাটা ভেঙে যাবে বলে আমার একটু একটু মন খারাপ লাগছে। রাজীবের আরো দুঃখ, শেষ পর্যন্ত আলিম খাঁ'র ঘরোয়া গানের গলা শোনা হলো না। মধ্যরাতে গঙ্গার ধারে একটুখানি মাত্র সুর শুনে আমিও বুঝেছিলুম, এ অভিজ্ঞতার তুলনা হয় না। সেদিন অমন ভাবে গানটা নষ্ট হয়ে গেল, এ আফশোষ জীবনে যাবে না।

আলিম খাঁ'র কাছে সারাক্ষণই অনেক নাম করা লোকেরা আসে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা একেবারে আলাদা। যখন অন্যরা এসে নানা রকম কাজের কথা বলে, তখন আমরা ঘরের এক কোণে বসে নিজেরা ফিসফাস করে কথা বলি, তারপর ঘর ফাকা হলে শুরু হয় আমাদের আসল আড্ডা।

শেষ দু'দিন আমরা সর্বক্ষণই ওর সঙ্গ পেতে চাই। সকাল থেকে এসে বসে আছি। কিন্তু সেই চরম সময়টাতেই আমি অনুপস্থিত রয়ে গেলাম। বাড়ির

লোকজনদের পীড়াপীড়িতে আমাকে একটা টিউশনি নিতে হয়েছে। রাত আটটার সময় আমি বললুম, চট করে আমি একটু ঘুরে আসছি। ছাত্রের বাড়ি কাছেই, ঘন্টা দেড়েকের মধ্যেই ফিরে আসতে পারব। ঠিক সেই সময়টাই ঘটে গেল ঘটনাটা। পরে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সব শুনেছি।

আজ প্রায় সারাদিন ধরেই আলিম খাঁ মদ্য পান করে চলেছেন। যারা তাঁর কাছে শেষ দেখা করতে আসছে, তারাও অনেকে উপহার হিসেবে নিয়ে আসছে একটা করে মদের বোতল। নানা রকম স্কচ। কেউ কেউ খাঁ সাহেবের সঙ্গেও বসে খাচ্ছে। কিন্তু আলিম খাঁ মাতাল সহ্য করতে পারেন না। কেউ একটু বেচাল হলেই তিনি কড়া গলায় বলেন, যাও, ঘর যাও, নিকালো।

নন্দিতা নিজে নিজেই এল বিকেলের দিকে। রাজীব আজ নিয়ে এসেছে ওর সরোদটা। আলিম খাঁ গান শোনালেন না। তবে রাজীবের সরোদটা একটু বাজিয়ে যদি শোনান, তা হলেই রাজীব ধন্য হয়ে যাবে। যদি উনি দু'একটা নতুন সুর দেখিয়ে দেন তা হলে তো কথাই নেই।

কিন্তু আজ খাঁ সাহেবের সঙ্গে কথা বলার সুযোগই পাওয়া যাচ্ছে না। সর্বক্ষণই পাঁচমিশালী লোকের ভিড়। আজ আলিম খাঁ বেশ উদার, কারুর প্রস্তাবেই সরাসরি অসম্মতি জানাচ্ছেন না, মদের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে বলছেন, হাঁ, হাঁ, হো জায়গা! কিঁউ নেহি?

আমরা অবশ্য দূর থেকে শুনেই বুঝতে পারছি, এসব একেবারেই ফাঁকা আশ্বাস। অন্যদের চেয়ে আমরা এই ক'জন আলিম খাঁকে সবচেয়ে ভালো চিনি।

নন্দিতার আজকের পরিবেশটা ভালো লাগছিল না। অন্যরাই এসে কথা বলে যাচ্ছে, আমাদের দলটা এক কোণে বসে আছে প্রায় মুখ বুজে। এক সময় নন্দিতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি চলি!

আলিম খাঁ তখন অন্যদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, কিন্তু ঠিক দেখতে পেয়েছেন, তিনি বলে উঠলেন, আরে এ নন্দিতা, তুমি কোথায় যাচ্ছ!

নন্দিতা ঠোঁটকাটার মতন বলল, বসে থেকে কী করব? ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গে ভালো করে কথা বলব, কিন্তু আপনি এত ব্যস্ত!

আলিম খাঁ মজা পেয়ে বললেন, ভালো করে কথা বলব। হা-হা-হাঃ! বয়ঠো, বয়েঠ যাও! হাঁ ভালো করে কথা বলব।

আধ ঘন্টা বাদে নন্দিতা আবার অস্থির হয়ে উঠে পড়ল। বেশি লোকজনের ভিড় সে পছন্দ করে না। তা ছাড়া খাঁ সাহেবের কাছে এক ধরনের লোক আসে, যারা মেয়েদের দেখলেই চোখ দিয়ে গা চাটে।

খাঁ সাহেব বললেন, আরে বেটী, ভালো করে কথা হলো না। তুম্ চল্ যাতি? না, না, না, বয়ঠো। তুমি চলে যাও তো বড়ো দুখ পাব।

তারপর এক সময় ঘর ফাঁকা হলো। রইল শুধু শমীম, রাজীব আর নন্দিতা আর ফারুক সাহেব। কী একটা কাজের ভার দিয়ে ফারুক সাহেবকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে খাঁ সাহেব গেলাস হাতে উঠে এসে বসলেন রাজীবদের মাঝখানে। আলিম খাঁ'র বসবার ভঙ্গিটি সব সময় এক। শিরদাঁড়া একেবারে সোজা, তার মাথা ঊর্ধ্বে থাকে সবাইকে ছাড়িয়ে ওপরে।

লম্বা চুমুকে গেলাস শেষ করে তিনি বললেন, তো বাতাও!

নন্দিতা বলল, আপনি এত মদ খাচ্ছেন কেন? তখন থেকে তো দেখছি, এরকম করলে কি শরীর টিকবে?

আলিম খাঁ খুব আদর করে নিজের গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, লোহা, বিলকুল লোহা!

তারপরই হাঁক দিলেন, নাদের, পানি লাও।

অর্থাৎ আবার গেলাসে সুরা ও জল মেশাতে হবে।

রাজীব ভরসা করে বলল, খাঁ সাব যদি আপনি দয়া করে আমার এই সরোদটা একটু ছুঁয়ে দেন, আর তারপর যদি একটু মারোয়া রাগের সুরটি দেখিয়ে দেন—

আলিম খাঁ সরোদটি নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলেন। একটু পিড়িং পিড়িং করে বললেন, ইয়ে যন্তর আচ্ছা হ্যায়।

তারপর সেটি এক পাশে নামিয়ে রেখে নন্দিতার দিকে চেয়ে বললেন, বলো, বিটিয়া, তুমি যে ভালো করে কথা বলবে বলছিলে?

নন্দিতা হেসে বলল, এই তো বলছি! এতক্ষণ আপনাকে পাওয়াই যায়নি। তবে আপনি যদি আরো বেশি মদ খান, তা হলে আর আপনার সঙ্গে কথা বলা যাবে না।

আলিম খাঁ'র বাদামি রঙের চোখ দুটি যেন জ্বলছে। তিনি এক দৃষ্টে নন্দিতার দিকে চেয়ে বললেন, মোদ খাবো না!

—না!

—মোদ যদি না খাই, তবে তার বদলে তুমি কী দেবে?

—কী আর দেব? আপনাকে আমাদের কী দেবার সাধ্য আছে? আপনি আমাদের গান শোনালেন না?

—বেটী, তুমি আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলবে বলেছিলে, আব তো কহো, কুছ তো কহো!

—বাঃ, এই যে কথা বলছি।

—ভালো করে কথা!

আলিম খাঁ এক দৃষ্টে চেয়ে আছেন নন্দিতার দিকে। যেন ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই। হঠাৎ তিনি হাত বাড়িয়ে এক আঙুলে নন্দিতার ঠোঁটটা ছুঁয়ে দিয়ে

আপন মনে বললেন, এ যেন পূরিয়া রাগ, খাদের গান্ধার সে মুদারার কোমল রেখার তক কে অপূরব মীড়...

নন্দিতা বিব্রত ভাবে মাথাটা সরিয়ে নিল। শমীম বলল, খাঁ সাব, আজ বাইরে কোথাও যাবেন? আমার খুব শখ, আপনাকে চীনাবাড়ির খানা খাওয়াব।

আলিম খাঁ যেন সে কথা শুনতেই পেলেন না। যেন তিনি নন্দিতাকে সম্মোহন করছেন, এই ভঙ্গিতে নন্দিতার মুখের সামনে আঙুল নাড়তে নাড়তে বললেন, এই আখ, মালকৌসের মধ্যমের মতন চমকাচ্ছে!

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তিনি ব্যাকুল ভাবে বললেন, নন্দিতা, তোমার কাছে আমার একটা আরজ আছে। আমি তোমার সঙ্গে খুব ভালো করে কথা বলব, তুমি শুনবে?

—কেন শুনব না?

তৎক্ষণাৎ ঝুঁকে নিচু হয়ে তিনি দু'হাতে পাজাকোলা করে তুলে নিলেন নন্দিতাকে। তারপর কেউ কিছু বুঝবার আগেই তিনি পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন দড়াম শব্দে।

শমীম ফ্যাকাসে ভাবে তাকাল রাজীবের দিকে। রাজীব যেন একটা পাথরের মূর্তি। প্রথমে সে খাঁ সাহেবকে বাধা দেবার জন্য ওঠবার জন্য হাঁটু গেড়েছিল, এখন সেই অবস্থাতেই রয়ে গেছে। কেউ কোন কথা বলল না।

একটু পরে রাজীব সরোদটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রাজীব যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছে সেই সময় পৌঁছোলাম আমি। টিউশনি সেরে ছুটতে ছুটতে আসছি। রাজীবকে দেখেই মনে হলো, একটা প্রাণহীন শরীর যেন নেমে আসছে সিঁড়ি দিয়ে।

—কী রে, রাজু? চলে যাচ্ছিস এর মধ্যে?

—হ্যাঁ।

—নন্দিতা কোথায়?

রাজু আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, তুই বিশ্বাস কর, নীলু, আমার একটুও রাগ হয়নি। আমি নন্দিতাকে দিয়ে দিয়েছি, ওর ওপর আর আমার কোন দাবি নেই। ঠিকই হয়েছে, আমি তো ওকে বিয়ে করতুম না। বিয়ে, ঘরসংসার, এসব আমার জন্য নয়।

—কী বলছিস পাগলের মতন! নন্দিতার কী হয়েছে? চলে গেছে?

—নন্দিতাকে খাঁ সাহেব নিয়ে নিয়েছেন। ভালোই হয়েছে। নন্দিতা এখন খাঁ সাহেবের সঙ্গে পাশের ঘরটায়...

বলতে বলতে চোখ ভিজে গেল রাজুর। কিন্তু চড়াক করে রাগ চড়ে গেল আমার মাথায়। কী হয়েছে তা বুঝতে আমার দেরি হলো না, এ রকম যে হতে

পারে, তা আমি আবছা ভাবে আগেই সন্দেহ করেছিলুম।

গান-ফানের চিন্তা আমার মন থেকে একেবারে ঘুচে গেল। শুধু মনে হলো নন্দিতা একটি নারী, সে আমাদের, তাকে অন্য পুরুষ নিয়ে নিচ্ছে।

রাজীবকে একটা ঝাকুনি দিয়ে বললুম, তুই এই অবস্থায় নন্দিতাকে ফেলে চলে এলি? নন্দিতা তোকে আর কোনদিন ক্ষমা করবে?

—আমি তো আর নন্দিতাকে চাই না!

—ঐ লোকটা যদি নন্দিতার গায়ে হাত দেয়, তা হলে ওকে আমি খুন করব।

এক সঙ্গে দু'তিনটে সিঁড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে আমি উঠতে লাগলুম ওপরে।...

আলিম খাঁ নন্দিতাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নেবার পর নন্দিতা হাত পা ছুঁড়ে নাটক করেনি। খাঁ সাহেব পাশের ঘরে গিয়ে নন্দিতাকে নামিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করলে সে শান্ত ভাবে জিজ্ঞেস করল, এটা কী হলো?

খাঁ সাহেব তাঁর বাদামি চোখ দুটিতে ব্যাকুলতা ও তৃষ্ণা মিশিয়ে বললেন, নন্দিতা, তুমি সা না লেড়কি নও, তুমি রসিলা সুর। আমার জখমি জিগর তুমি ঠিক করে দাও।

—আপনি দরজা বন্ধ করলেন কেন?

—আমি তোমার মুহরার স্বোয়াদ চাই।

আলিম খাঁ নন্দিতাকে আলিঙ্গন করবার জন্য এগিয়ে আসতেই সে বলল, এ আপনি কী করছেন? আপনি আমায় বেটা বলে ডেকেছেন, আমি তো সত্যিই আপনার মেয়ের মতন!

আলিম খাঁ বললেন, উ তো বাৎ কি বাৎ। এ দুনিয়ায় আমার কোন মা নেই, বহিন নেই, বেটী নেই, সব নারীই আমার সখী। আমার মনে হয়, আমিই শুধু একমাত্র পুরুষ, সব নারীকে আমার চাই।

নন্দিতা একটুও ভয় না পেয়ে দৃঢ় গলায় বলল, তা হলে বুঝতে হবে, আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এরকম উদ্ভট চাওয়া...শুধু পাগলের পক্ষে সম্ভব। আপনি বড় গায়ক হতে পারেন, কিন্তু আপনি চাইলেই সব মেয়ে আপনার কাছে আসবে কেন?

—তুমি আসবে না?

—না। কোন প্রশ্নই ওঠে না।

—তোমার মুখ থেকে একটা গানের মুহরা তুলে নিতে দাও আমায়—

আলিম খাঁ চুম্বনের জন্য মুখ নিচু করতেই নন্দিতা বেশ জোরে ঠাস করে এক চড় কষালো তাঁর গালে।

আলিম খাঁ গালে হাত দিয়ে বললেন, তুম...তুমি আমায় মারলে? তুমি ছোটা লেড়কী, এবার যদি আমি তোমার ওপর জবরদস্তি করি?

—আপনি কি জানেন না, অনিচ্ছুক নারীব ওপর যারা জোর-জবরদস্তি করে তারা মানুষ নয়, পশু!

—আমি কি তবে জানবার?

—না, আপনি জানোয়ার নন্, আপনি একজন মস্ত বড় গুণী। মদ খেয়ে আপনার মাথার ঠিক নেই।

আলিম খাঁকে সেই অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখে দরজা খুলে বেরিয়ে এল নন্দিতা। এদিক ওদিক তাকিয়ে রাজীবকে খুঁজল।

আমার পেছনে পেছনে রাজীবও উঠে এল ওপরে। আমি নন্দিতার হাত ধরে বললুম, তুই ঠিক আছিস?

নন্দিতা বলল, হ্যাঁ। তারপর রাজীবের কাছে গিয়ে ওর বুকেব ওপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, তুমি ভয় পাওনি তো?

তাকিয়ে দেখলুম, পাশেব ঘরের খাটের ওপব বসে আছেন আলিম খাঁ, আমাদের দিকে পেছন ফেরা। ঘাড়টা ঝুঁকে গেছে, অভিমানী শিশুব মতন ভঙ্গি।

হঠাৎ শিরদাড়া সোজা কবে পরিচিত ভঙ্গিতে বসলেন। তাবপর গলা দিয়ে বেরুল স্বব। প্রথমেই একটা হলক তান দিলেন এমন যে দরজা-জানলা পযন্ত যেন কেঁপে উঠল। সমুদ্রের ঢেউযেব শব্দেব কথা উনি কী বলছিলেন, তাব চেযে এ আওয়াজ অনেক সুমধুর ও জোরালো।

আমাব মাথা থেকে তখনও ক্রোধ যায়নি, আমি ভেবেছিলাম আলিম খাঁ'র মুখোমুখি হয়ে কৈফিয়ৎ চাইব। কিন্তু ঐ সুরের ঝাপটায় আমি যেন স্থাণু হয়ে গেলাম।

এইবার আলিম খাঁ একটা একটা করে সারগম ধরলেন। রাগ মারোয়া। কে যেন বলেছিল, কোনো দ্বীপে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড পেলে আলিম খাঁ'র মারোয়ার একটা রেকর্ড অন্তত সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। সেই মারোয়ার আলাপ।

শমীম ফিসফিস করে বলল, এই হচ্ছেন আসলি আলিম খাঁ। হিন্দুস্তানকে রিবাজেওয়ালা।

এই সুর যেন মায়াপাশ, আমাদের বেঁধে ফেলল একেবারে। যেন কেটে যাচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এক যুগ, এক কাল।

এক সময় দেখলুম শমীম আর রাজীব গিয়ে আলিম খাঁর পায়ের কাছে মাটিতে বসে মাথা দোলাচ্ছে। নিবিষ্ট ভাবে। ওদের দৃষ্টি যেন চুম্বকেব মতন লেগে আছে আলিম খাঁর মুখে। তিনি চোখ বুজে আছেন। তাঁর কণ্ঠের ঐশ্বর্য তিনি দিচ্ছেন উজাড় করে। মাঝখানের দরজার কাছে আমি আর নন্দিতা দাঁড়িয়ে। নন্দিতা আমার হাত ছুঁয়ে বলল, চল নীলু, আমরাও ওঁর সামনে গিয়ে বসি।